ইসলামের দিশারীগণ এমনই হন

(উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর জীবনী এবং তাঁর কতিপয় আকাবির ও বন্ধুদের জীবনচরিত)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللـه وعلى الـه وصحبه ومن والاه وبعد

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, তার

সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের উপর এবং তাঁর ভক্ত অনুরাগী সকলের উপর।

হামদ ও সালাতের পর

মানব ইতিহাস যতটা প্রাচীন, সত্য-মিথ্যার সংঘাত ততটাই প্রাচীন। এই সংঘাতে মিথ্যা অপচেষ্টা চালায় সত্যকে বিকৃত করতে, সত্যের পরিচয় ও গুণাগুণ মানুষকে ভুলিয়ে দিয়ে সত্য থেকে দূরে সরাতে। নবী- রাসূল আলাইহিমুস সালামের সঙ্গে বিরুদ্ধচারীরা এমনটাই করেছে। নবী-রাসূলদের অনুসারীদের সঙ্গেও একই আচরণ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর সুন্নাহ অনুযায়ী আহলে হক তথা সত্যপন্থিরা মিথ্যার পথযাত্রীদের বিরুদ্ধে সর্বদাই বিজয়ী হয়। সত্যের পথিকদের ইতিহাস রচিত হয় এবং মিথ্যার অন্ধকার কেটে যায়। সত্যের আলোকময় মিনার দেখে মানবজাতি সীরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল-সঠিক পথ চিনতে পারে। আল্লাহ তাআলার কুদরতে যুদ্ধের অঙ্গনেও ইসলামের দিশারীগণ মানবজাতির জন্য কল্যাণের দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দেন। তাদের সত্যনিষ্ঠা ও সততা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়।

মুসলিমরা আজ অধঃপতনের শিকার। আহলে বাতিলের মোকাবেলায় তারা পরাজিত ও ব্যর্থ। চারিদিকে পশ্চিমা অসভ্য জাহিলি সংস্কৃতি ও ধর্মনিরেপক্ষতার জয়জয়কার দেখা যায়। এই অবস্থায় কোথাও ইসলামের আওয়াজ শোনা গেলেও তা পশ্চিমা সভ্যতার ছাচে সাজানো। তাই ইসলামের অল্প কিছু বিধি-বিধান পালিত হতেযায়। পরিপূর্ণ দীনকে প্রতিষ্ঠিত এবং বিজয়ী করার জন্য যদি কেউ সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগের মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা উত্তোলন করে, তখন এই তথাকথিত সভ্য দুনিয়া তাকে সন্ত্রাসী কট্টরপন্থি মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে কোণঠাসা করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। তারা চায় সত্যের প্রতিধ্বনি যেন মানবজাতির

[2]

কানে না পৌঁছায়। মানুষ যেন সত্যর ডাকে সাড়া দিতে না পারে। কারণ তা একবিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত ও মিথ্যাচারপূর্ণ পৃথিবীর জন্য মৃত্যু ঘোষণার নামান্তর।

কিন্তু মিথ্যবাদীরা এজন্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও কৌশল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী। পশ্চিমাদের বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্বের মাঝেও কোথা থেকে মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর মতো ব্যক্তিদের আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটে। তারা এবং তাদের আন্দোলন গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটি অঞ্চলে কিছু মুসলিম তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথ চলতে শুরু করে এবং মুসলিমদের প্রতিটি ভূখণ্ডে ইসলামের প্রকৃত দিশারীদের উপস্থিতি দেখা যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাকিস্তান সহ গোটা উপমহাদেশে এই যুগেও এমন দিশারী দান করেছেন, যারা চেষ্টা শ্রম ব্যয় করে এই অধঃপতনের যুগেও স্বজাতির মাঝে ইসলামের বাতাস বইয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। জাতির মনে মননে ইসলামের প্রকৃত চিত্র একে দিয়েছেন। এমন ব্যক্তিদের যদি তালিকা করা হয়, তাহলে পাকিস্তানের ইসলামাবাদের উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এবং তার সঙ্গী-সাথি ও নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহে সেই তালিকায় থাকবেন। এমন ব্যক্তিদের কীর্তি ও অবদান সম্পর্কে অনেকেই জানেন। অনেকেই তাদেরকে দেখেছেন শুনেছেন। কিন্তু যারা এখনও পর্যন্ত তাদের কথা, জীবন ও কর্মের কথা জানেননি, আমাদের এই গ্রন্থ তাদের জন্যই।

এই গ্রন্থ উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এবং তার সঙ্গী-সাথিদের ইতিহাস। এই গ্রন্থে তার কীর্তি ও অবদানের আলোচনা রয়েছে। তার দাওয়াত ও

[3]

বার্তা রয়েছে। একটা যুগের নানান ঘটনা এতে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থ মুসলিমদের উত্থানের পথ দেখাবে। স্নায়ু যুদ্ধের পর এক মেরুর বিশ্ব ইতিহাসে পাকিস্তান ও উপমহাদেশের অধিবাসীদের জন্য ইতিহাসের এই গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যাচারীরা পাকিস্তান ও উপমহাদেশের অধিবাসীদেরকে এই ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চায়। তাই গ্রন্থ আল্লাহর দীনের মায়া লালনকারী এবং মুসলিনদের অবদান অনুধাবনকারী প্রত্যকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই যার কাছে এই কিতাব রয়েছে, তিনি যেন সাধ্যমত ইন্টারনেট এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে এই গ্রন্থ সমভাষী ন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

এ সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার অবদান হাফেজ সুহাইব গৌরী হাফিযাহুল্লাহর, যিনি এই ইতিহাস বিন্যস্ত করেছেন। এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, হাফেজ সুহাইব গৌরী হাফিযাহুল্লাহ নিজেও এই ইতিহাসের অংশ। যে সমস্ত ব্যক্তিত্বের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, হাফেজ সাহেব নিজে তাদের সহচর ছিলেন এবং তাদের অবদানগুলোতে শরীক ছিলেন। হফেজ সাহেবের এই অংশগ্রহণ গুরু শিষ্যের সাহচর্যের মতো ছিল না বরং হাফেজ সাহেব নিজে এই ইতিহাসের অন্যতম চরিত্র। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহতারাম হাফেজ সাহেবকে এই মেহনতের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। এই কাজকে তাঁর জন্য সাদকায়ে জারিয়া এবং আখিরাতে দিবসের পাথেয় হিসেবে কবুল করুন। তাকে ইসলাম ও সকল মুসলিমের জন্য উপকারী প্রমাণ করুন, তাকে দুনিয়া আখিরাতে কামিয়াবী ও সাফল্য দান করুন। তাকে জান্নাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের সান্নিধ্যে তার প্রিয়জনদের সঙ্গ দান করুন, আমীন।

[4]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العـــالمين وصـــلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين

ইদারায়ে হিত্তিন

জুলাই ২০২০ ঈসায়ী

সূচীপত্র

প্রারম্ভিকা 4

প্রথম অধ্যায় : পরিবার , শৈশবকাল এবং প্রাথমিক শিক্ষা 18

শহীদ ফারুক ভাইর (রহিমাহুল্লাহ) সম্মানিত পিতা 18

কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা সমাপন এবং আমেরিকা যাত্রা 19

আফগানিস্তান জিহাদ এবং আফগান জাতির সঙ্গে সম্পর্ক 20

ধর্মহীনদেরকে পশ্চাদ্ধাবন 21

শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্মানিত মাতা ...23

পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির ব্যাপক অধ্যয়ন 24

দীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে জামাতে ইসলামীতে অন্তর্ভুক্তি 24

কুরআনিক ক্লাসের ধারাবাহিক আয়োজন 25

‘কুরআনের আলো’..25

শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শৈশবকাল ও ছেলেবেলা...26 পারিবারিক দীক্ষার আলো..26 ফিরিঙ্গি মক্তবে..30 ক্যাডেট কলেজে কুরআন শিক্ষা...............................31 কলেজে শিক্ষা সমাপন এবং ইলমে দীনের প্রতি মনোনিবেশ...32 দ্বিতীয় অধ্যায়: শরীয়াহর ইলম অর্জন.............33 ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে...33 শরীয়াহ অ্যান্ড আইন ডিপার্টমেন্টে..................36 শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি ভদ্রতা .... 39 শিক্ষার রেকর্ড..40 প্রবীণ উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে উপকৃত হবার সুযোগ..40 ইউরোপেও আমরা মুসলিম জীবনাচার ছাড়বো না..........41 তৃতীয় অধ্যায়: দীনী দাওয়াতে মনোনিবেশ.........45 কুরআনের ধারাবাহিক ক্লাস....................................45 দাওয়াতের উপর শরীয়াহ ইলম অর্জন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাব..47 বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং উম্মাহর অবস্থা...........47 সংশোধক ও সংস্কারক...49 কুরআন তিলাওয়াতে অধ্যবসায়..............................50 আমলের খোঁজখবর নেয়া..52 সৃষ্টির সেবার আগ্রহ..53 এমন পুষ্প বাগিচা, যার সুবাস সর্বদা সবার জন্য..54 [6]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উলামায়ে কেরামের মসনদে..55 চতুর্থ অধ্যায়: জিহাদের খোঁজে সফর....................56 শৈশব কাল থেকেই জিহাদ ও শাহাদাতের আগ্রহ...........58 দরসগুলোতে জিহাদ ও শাহাদাতের আলোচনায় আবেগ আপ্লুত হয়ে ওঠা...58 তালেবানের আফগানিস্তানে সফর..............................59 ১১ই সেপ্টেম্বরের রণাঙ্গন: সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের দিন......................................64 আমেরিকা জুলুম ও অনাচারের উৎসমুখ.......................64 আজ আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম......................66 আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা এবং মুসলিম উম্মাহর পাল্টা জবাব..67 জেগে ওঠো হে গাযী ময়দানের ডাক এসেছে চলে..........70 আফগানদের সঙ্গে সম্পর্ক কিসের? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...71 মিছিল মিটিং-এ অনাগ্রহ...73 জ্বলছে কাশ্মীর; বাঁচাও কাশ্মীর….....................73 কাশ্মীর জিহাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে….............74 পাকিস্তানের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলোর ভূমিকা...76 পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি কাশ্মীরি মুরুব্বির ক্ষোভ কেন?..77 শহীদ আব্দুল রহমান বাঙ্গালী শহীদ রহিমাহুল্লাহ সাক্ষাৎ..78 আরব মুজাহিদীনকে সাহায্যের সৌভাগ্য..................79 পুনরায় দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ........................81

[7]

হাফেজ মালিক তৈয়ব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহ: সমকালীন জিহাদের একজন অখ্যাত নেতা.....................81 আলেমে রব্বানী শায়খ ঈসা আলমাসরী রহিমাহুল্লাহর শরীয়াহ ক্লাস..85 জিহাদ যদি ফরযে আইন হয়ে থাকে তাহলে বিলম্ব কিসের?...86 হাফেজ সাহেবের সঙ্গে ফারুক ভাইয়ের সাক্ষাৎ.....87 হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লাহোর সফর...................................87 যেন আমার অন্তর প্রশান্তি পায়...........................88 জিহাদের দাঈ ইঞ্জিনিয়ার শায়খ আহসান আজিীজ রহিমাহুল্লাহর খেদমতে...88 পঞ্চম অধ্যায়: জিহাদী কাফেলায় অংশগ্রহণ........92 আনসারুল মুজাহিদীন হলেন যখন…............................92 ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রথম বিবাহ...............92 মরুভূমিতে তৈরি হয় ফারুকী ও সালমানী................93 আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে........................95 প্রথম সারিতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ...............96 দ্বিতীয় বিবাহ..97 শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ও অবদান.................................97 মুহসিনে উম্মাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক পাকিস্তান জিহাদের ঘোষণা .... 101 পাকিস্তান জিহাদের কার্যকরী পদক্ষেপ..............102 পাকিস্তান জিহাদে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর অবস্থান..................103

[8]

শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর হাতে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জিহাদের বায়আত.........................107 আল-কায়েদার সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা...........................107 ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বের ছায়ায়..108 ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত..112 মরদে মুসলমান..113 যুদ্ধের পতাকা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সামনে নেন .... 116 শাহাদাত এবং সবর...117 ষষ্ঠ অধ্যায়: দলের (মাজমুআর) নেতৃত্ব প্রদানের সময়কাল..119 উত্তম ও যোগ্যতা সম্পন্ন সাথিদের সঙ্গ............119 মাজমুআর নেতৃত্ব দানকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি..121 ভানায় দাওয়াতী কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি........122 ওয়াজির গোত্র সমূহের সঙ্গে উজবেকদের যুদ্ধ...122 ওয়াজির মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ .... 123 ইসলাহ, আত্ম সংশোধন ও দাওয়াতের জন্য সর্বব্যাপী পরিকল্পনা...124 শত্রুপক্ষের দিক থেকে প্রতিক্রিয়া................125 পাঞ্জাবি যোদ্ধাদের নিষ্ঠার প্রতি আস্থা........125 আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা................................126 কেনিয়ার দুই সিংহ: আজ-মরায়ে রহিমাহুল্লাহ এবং ইয়াকুব রহিমাহুল্লাহ.......................................126

[9]

কিছুতো করা উচিত?...128 নাপাক আর্মির আরও এক বিশ্বাসঘাতকতা.................131 পরিখা খননের সুন্নাহ পুনর্জীবিত করা...............132 অন্য মুজাহিদীনকে উৎসাহ প্রদান........................134 কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ..136 ভানার সামরিক দায়িত্ব......................................139 মেহসুদ গোত্রের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে.................139 সোয়াতের পালা..140 বাংলা ভূখণ্ডে জিহাদী তানজীম...........................142 ইদাদ সংস্থা এবং আবু খাববাব শহীদ রহিমাহুল্লাহ ওয়ার্কশপ...146 পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ বিভাগ.............................148 শিশুদের মক্তব বিভাগ..149 চিকিৎসা বিভাগ..150 মুজাহিদীনের গুদাম..150 সপ্তম অধ্যায়: মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য প্রচেষ্টা .... 152 তালেবানের রাহবার এবং প্রসিদ্ধ আলেমে দীন উস্তাদ ইয়াসির শহীদ রহিমাহুল্লাহর নসীহত..................152 মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সাধন ও পারস্পরিক সংযুক্তি প্রকল্প..153 পাকিস্তানি মাজমুআ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?....155 আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহর ঐক্য সাধন প্রচেষ্টা................156 আপন সত্তা মিটিয়ে দেয়া:..................................160 ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আশ্চর্য বিনয়.........160

[10]

শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত এবং মেহসুদ অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণ.....163 আলেমে রব্বানী পূর্বসূরিদের স্মৃতিচিহ্ন সাহেবুল কলামি ওয়াস সাইফ (অসি ও মসি উভয়টি সমানতালে ব্যবহারে পারদর্শী) হযরত মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর আগমন....................................166 মাওলানা সাহেবের শৈশব..167 ইলমী সফর...168 ভারতের মুসলিমদের সমস্যাবলী এবং সেগুলোর সমাধান? .... 171 জিহাদ ই সমাধান!..175 হিজরতের পথে..176 তালেবানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে…......................178 জিহাদে কাশ্মীর: আইএসআই'র বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাশ্মীরি জিহাদী সংগঠনগুলোর নিরুপায় অবস্থা180 সীমান্ত অঞ্চলের ফ্রন্টগুলোতে….....................183 ওয়াজিরিস্তানে হিজরত.......................................184 মুজাহিদীনের ইসলাহ ও আত্মিক সংশোধনের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা.....................................185 ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য....................186 হযরত মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ এবং তানজীম আল-কায়েদার নেতৃত্ব..187 কেনান ভূমির হীরক মানব শায়খ আবু দুজানা পাশা রহিমাহুল্লাহ...188 জামাতের ইমারত বা নেতৃত্ব.................................190 কিছু এমন গুণ যা শুধু তার মাঝেই পাওয়া যায়....192 আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক......................................194 [11]

ইসলামী সভ্যতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের পুনর্জীবন দান..196 ঈমানী দূরদর্শিতা..197 আমরা সবাই আহলে সুন্নাহ: আমরা সবাই একতাবদ্ধ...198 ইলমী বিনয়..201 রচনাকর্ম...203 মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর হাতে জিহাদের বায়আত..204 উপমহাদেশে জামাত আল-কায়েদার দায়িত্বসমূহ....205 অষ্টম অধ্যায়: কিছু বিশিষ্ট সফর সঙ্গী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু..206 শায়েরে জিহাদ দৃষ্টান্তহীন দাঈ শহীদ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ............206 মুহাজিরদের সাহায্যে এগিয়ে আসা…...................208 দাওয়াহ ইলাল্লাহ..209 দৃষ্টান্তহীন শায়ের...209 হিজরত এবং শাহাদাত...210 ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শায়খ ও মুরুব্বী.......210 উলামায়ে কিতাবে গ্রন্থাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন..212 পশ্চিমাদেরকে বড় ভাবার ব্যাধি এবং তার চিকিৎসা .... 214 সুন্নাহর অনুসরণ এবং নিষিদ্ধ বিষয় প্রতিরোধ.217 হিজরতের প্রয়োজনীয়তা.....................................218 মিকদার নয় মিইয়ার (পরিমাণ নয়; মাপকাঠিই মুখ্য) .... 219 গোপনীয়তা রক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বন.................220 [12]

মতবিরোধ কিন্তু সাহাবা সুলভ চরিত্র.................223 সালফে সালেহীনের দৃষ্টান্ত দুনিয়াবিমুখী দরবেশ আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান শহীদ রহিমাহুল্লাহ...226 কাশ্মীরের গাযী..227 ইলমে দীনের ভালোবাসা..228 জিহাদের দিগন্তগুলো আপনাকে স্মরণ করছে...........230 আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর পরিকল্পনা......231 ওয়াজিরিস্তানে দাওয়াতী কাজ...........................232 শাহাদাত…...232 প্রথমে শরীয়তের হুকুম জিজ্ঞেস করো তারপর কাজ করো..233 আমরা কেন এক নয়?..234 আরব আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ...............................234 ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা....................235 সাইয়েদুনা সালমান ফারসি রাযিয়ল্লাহু আনহুর মতো চিন্তা..236 মুফাককিরে জিহাদ (চিন্তাবিদ) মাসিহুল মুজাহিদীন ডক্টর আবু খালেদ মুহাম্মাদ সারবুলন্দ যুবায়ের খান শহীদ রহিমাহুল্লাহ......................................237 রুশ জিহাদে অংশগ্রহণ..237 মেডিকেল কলেজের রাজনৈতিক জীবন..........................238 কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি...................239 ইতিহাস অধ্যয়ন..239 নেতৃত্বের জন্য ইতিহাসের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া জরুরি..240 নেতা বন্ধু এবং তর্জুমান...................................241 [13]

চিত্তাকর্ষণের ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী...................................242 পাকিস্তান স্টাডিজ বইয়ের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি .... 243 আকাবিরদেরকে চেনো!...244 রেশমি রুমাল আন্দোলন এবং কাবায়েলি অঞ্চল.......245 জিহাদ: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর…...................246 রুশ জিহাদ এবং বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন............247 উম্মাহ দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হোক........................247 আরব বিশ্বের সমকালীন জিহাদের ইতিহাস...............248 সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব .... 248 আফগানিস্তানে দুই সমুদ্রের মিলন......................251 মুজাহিদীন এবং তাদের নেতৃবৃন্দের জন্য দাওরা আয়োজন..251 সমকালীন জিহাদের চিন্তাগত ভিত্তি....................252 প্রজ্ঞা হলো ঈমানদারের মিরাস...........................253 সমর বিদ্যা ক্লাস...254 ‘যরবে ওজব’ নামক বর্বর অপারেশন চলাকালে চিকিৎসা সেবা..254 হসপিটালে বিশ্বাসঘাতক আর্মির বোমা বর্ষণ........255 শাহাদাতের ঘটনা..255 দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়ার অচেনা ঘোড়সওয়ার ইঞ্জিনিয়ার ইবরাহীম গৌরী শহীদ রহিমাহুল্লাহ258 প্রাথমিক জীবন..258 ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব........259 জিহাদে অংশগ্রহণ..260 [14]

জীবনের জন্য জীবনের আগমন...................................261 রণাঙ্গনের অস্থিরতা...263 দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়া বিভাগে.....................264 জিহাদী মিডিয়া বিনির্মাণ................................266 শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা...270 একজন সফল নেতা ও সংস্কারক..................................271 ভালোবাসা যার অন্তরে বাসা বেঁধে নয়................273 পারিবারিক পরীক্ষা এবং ধৈর্যধারণ....................274 হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের মতো ধৈর্য..........276 প্রতি মুহূর্তে যার ছিল শাহাদাতের ধ্যান........277 শহীদী মর্যাদা লাভের সময় ঘনিয়ে.....................278 নবম অধ্যায়: বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন এবং তৎ সংযুক্তি...280 ইমামুল জিহাদ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহ...280 অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা...280 সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ এবং তার সহচরদের সঙ্গে সম্পর্ক......................................281 মিশরে অগ্নিপরীক্ষার পরের যুগ এবং দীনদারদের তিন শ্রেণি..283 পরীক্ষা যাদের পদস্খলন ঘটিয়েছে......................284 নিছক আবেগের বশবর্তী..285 রুশ জিহাদে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদান...............288 মুজাহিদীনের দাঈ, সংগঠক এবং অভিভাবক................288 যে ফরয আমরা ভুলে গিয়েছি..................................289

[15]

উম্মাহর জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি...........................292 বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের রূপকার....................295 শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তগণ...296 মুসলিম উম্মাহর শায়খ; শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ...298 আমেরিকা-ই জুলুম অনাচারের উৎস স্থল..................302 উম্মাহর অবলম্বনগুলোর ছিনতাইকারী আমেরিকা.....303 গোটা বিশ্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা .... 304 আমেরিকা: সাপের মাথা এবং নিকৃষ্ট বৃক্ষ...........305 লস্করে উসামার উত্তরাধিকারী হাকীমুল জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ..................306 শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর পরিচিতি .... 307 বৈশ্বিক জিহাদের প্রজ্ঞাবান পরিচালক..............308 দীন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক পন্থায় সম্ভব নয় .... 310 কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষের পাশাপাশি ঈমানদারদের প্রতি ভালোবাসাও জরুরি......................................311 আমেরিকাকে তার ঘরেই আঘাত করো............................313 জালিম গোষ্ঠী এবং শরীয়ত-দ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ..313 জ্ঞানে পরিপক্কতা এবং উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সুসম্পর্ক...314 আরব জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প............................315 আফগানিস্তানের জিহাদই ফিলিস্তিনের জিহাদ.......317

[16]

আরব এবং আফগান সমাজের পার্থক্য.........................318 ইমারতের ইসলামিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক, সাহায্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার.......................................318 খেলাফতে রাশেদা; স্বৈরাচারীদের খেলাফত নয়.....320 জিহাদী মানহাজের সংস্কার..................................323 ওয়াসিকা নুসরতিল ইসলাম (ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রমাণপত্র)..324 জিহাদী কার্যক্রমের সাধারণ দিকনির্দেশনা.......325 ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নেতা..........................329 ‘ফুরসান’ গ্রন্থের সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্পৃক্ততা...............................330 জিহাদের আকাবির ও শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ..331 শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ...................................333 শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং আলজেরিয়ার জিহাদ..336 মুজাহিদীনের সংশোধনকারী ও পথপ্রদর্শক............339 প্রান্তিকতা বিলোপকারী.....................................339 ইরাকের জিহাদে পথপ্রদর্শন................................340 খোরাসানের ইমারত..342 পাকিস্তান জিহাদে সংস্কার কর্ম........................343 অসি ও মসির অধিকারী শায়খ, ফকীহ আবু ইয়াহিয়া হাসান কয়েদে লীবী রহিমাহুল্লাহ......................346

[17]

জিহাদী অঙ্গনের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জ্ঞান অর্জন .... 349 বুঝমান, সুসভ্য, উচ্চ মনোবল সম্পন্ন ও নিয়মানুবর্তী ব্যক্তিত্ব...............................351 জিহাদী বিভিন্ন বিষয় বোঝার জন্য আহমদ ফারুকের শরণাপন্ন হন..351 দশম অধ্যায়: একক গুণাবলি স্বভাব চরিত্র ও অভ্যাস .... 353 শওকে জান্নাত..353 নফসে মুতমাইন্নাহ..354 আমি ভালো আছি...354 মোবারক ইনসান..355 সালাত যার চক্ষু শীতলকারী ছিল..........................355 কুরআনে কারীমের সঙ্গে তার সম্পর্ক...................356 কুরআনের সঙ্গে ভালোবাসাই বন্ধুত্বের মাপকাঠি357 হিশাম রহিমাহুল্লাহ...357 হামজা রহিমাহুল্লাহ...358 জাওয়াদ আরিফ রহিমাহুল্লাহ..............................359 জটিল অবস্থায় কুরআন থেকে পথনির্দেশনা লাভ.....360 আমরা তো কুরআন থেকেই জযবা ও আবেগ শিখেছি..........360 কুরআনকে সময় দিন...361 মুচকি হাসি..361 সহনশীলতা ও পরোপকার...362 জবানের হেফাযত..364

[18]

উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা......................366 নেতৃত্ব তো আসলে উলামায়ে কেরামেরই কাজ..........367 আদব আছে যার, সফলতা তার.......................................367 সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা লাভ: যে কারও থেকে..368 শহীদ কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য..369 বদর মনসুর একজন কায়েদে জিহাদ..........................370 আরব মুজাহিদীনের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা...........372 প্রতিটি নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে হিংসা করা হয়...372 অল্পতুষ্টি ও পরনির্ভরহীনতা............................378 জিহাদের নেতৃবৃন্দের অল্পে তুষ্টি ও সাদাসিধে জীবন..379 ওয়াজিরিস্তান গোত্রগুলো সাহায্য-সহযোগিতার দাবি যথার্থ পূরণ করেছে.....................................379 ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আনন্দ উদযাপনের চিত্র .... 382 দৃঢ় বিশ্বাস ও ধৈর্য: নেতৃত্বের জন্য দুটি শর্ত .... 383 ইমামাহ'র দ্বিতীয় শর্ত ধৈর্য...........................384 যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে…..................385 বিপ্লবী প্রজন্ম গড়ে তোলা...............................386 গোলামির আলামত থেকে বেরিয়ে আসা.......................387

[19]

এক পবিত্র প্রজন্ম গড়ে তোলা............................388 বীরত্ব ও সাহসিকতা...391 ক্রুসেদারদের গোলাম আফগান আর্মির <(((৩৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায়)))> ... ক্যাম্পে হামলা........................391 টিয়ারজা কেল্লায় প্রথম হামলা........................393 টিয়ারজায় দ্বিতীয় হামলা..............................393 একাদশ অধ্যায়: দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রম.395 আকাবিরদের দিকনির্দেশনা: দাওয়াত ও মিডিয়া অঙ্গনে..396 জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এ অংশগ্রহণের দাওয়াত...398 পাকিস্তানে জিহাদ ফরয….....................................399 ওঠো, জালিমকে প্রতিহত করো..................................400 পাকিস্তান জিহাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন........400 পাকিস্তান জিহাদ আফগানিস্তান জিহাদেরই পরিশিষ্ট .... 401 পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের দাওয়াত....403 সকল অনাচারের জন্য সেনাবাহিনী দায়ী...............403 চেহারা নয়; সিস্টেম পরিবর্তন করো....................404 এ সেনাবাহিনী ফিরিঙ্গিদের উপমহাদেশীয় রেজিমেন্টের ধারাবাহিকতা.................................405 সেনাবাহিনীর নিম্ন স্তরে দাওয়াত....................406 ফেরাউনের লোকদের মাঝে একজন ঈমানদার.................407

[20]

পাকিস্তানি নৌ বাহিনীতে জিহাদের দাওয়াত........408 মুজাহিদীন মধ্যমপন্থার ওপর অটল রাখা...............410 মুসলিমের রক্তপাতের নিষিদ্ধতা.........................410 মুসলিমকে তাকফীরের ক্ষেত্রে সতর্কতা..............412 জিহাদের আদব সমূহ এবং কাজ-কর্মের পরিশুদ্ধি....416 কিতাব ও বই পুস্তক..419 তরজমা ও অনুবাদ...421 দরস ও বয়ান বক্তৃতা..422 বয়ান বক্তৃতা:...423 জিহাদী ভিডিও..424 দাওয়াতী চিঠিপত্র..426 উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিপত্র .... 426 মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাহুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি পত্র...........................426 দ্বাদশ অধ্যায়: সৌভাগ্যময় শাহাদাত...............431 জরবে ওজব অপারেশন...431 ক্রুসেডার এবং তাদের সহযোগীদের কৌশল...............431 মুজাহিদীনের কর্ম পন্থা কর্মকৌশল....................432 মুজাহিদীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা...................433 শেরে খোদা সাইয়েদুনা আলী মুর্তাজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো কীর্তি......................434

[21]

শাওয়াল উপত্যকায় অবস্থান..............................435 শাওয়াল উপত্যকায় নিচ দিয়ে ড্রোন ফ্লাই.......435 সাথি ভাইদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয়া......436 মার্কিন ফাঁদের গুজব..436 মেহসুদ পাহাড়-সারি: ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শেষ নির্বাচন..437 সুকৌশলী আমীর মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে…..................................438 আমীর খালেদ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ..441 একাকী বন্দীর মতো অবরুদ্ধ.................................442 শেষ নিঃশ্বাসের সময়ও উম্মাহর চিন্তা.............442 বন্দী মুক্ত করো! : নববী নির্দেশে আমল করো.......445 কুরআনে কারীমের মুজেযা ও অলৌকিক শক্তি; বন্দীদের ইসলাম গ্রহণ..446 চাচা ইসহাক আমরিকী রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মুহব্বত ও বন্ধুত্ব..449 দীনের জন্য শির বিসর্জন দিয়ে তিনি সফল...........450 ত্রয়োদশ অধ্যায়: অসিয়তনামা........................451 পরিশিষ্ট: প্রতিটি প্রভাত নিয়ে আসে সন্ধ্যার বার্তা..461 শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ রচিত...461

[22]

প্রারম্ভিকা

الحمد لله رب العـالمين والصـلاه والسـلام على سـيد المرسـلين وعلى اله وصحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। তার পরিবার -পরিজনের উপর এবং তার সকল সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর।

হামদ ও সালাতের পর

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

من كـان مسـتنا فليسـتن بمن قد مـات فـإن الحي لا تـؤمن عليه الفتنة أولئك أصـحاب محمد صـلى الله عليه وسـلم كـانوا أفضل هـــذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختـــارهم الله لصـــحبة نبيه ولإقامة دينه فـــاعرفوا لهم فضـــلهم واتبعـــوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسـيرهم فـإنهم كـانوا على الهدى المستقيم

অর্থ : “কেউ যদি কাউকে অনুসরণ করতে চায় , সে যেন এমন ব্যক্তিদেরকে অনুসরণ করে , যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কারণ জীবিত ব্যক্তিগণ ফিতনা থেকে মুক্ত নয়। তারা (অনুসরণীয় ব্যক্তিগণ) হলেন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তারা ছিলেন এই উম্মাহর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী, জ্ঞান-গরিমায় ছিলেন সবচেয়ে গভীরতার অধিকারী এবং লৌকিকতা ছিল তাদের মাঝে সবচেয়ে কম। আল্লাহ তাআলা নবীর সান্নিধ্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। অতএব তোমরা তাদের মর্যাদা স্বীকার করে নাও এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। তাদের জীবন-আচার ও স্বভাব-চরিত্র যতটুকু পারো নিজেদের মাঝে ধরে রাখো। কারণ তারা সীরাতে মুস্তাকীম তথা সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

1

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের বাস্তব উদাহরণের সন্ধানে

প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর থেকেই এমন কাউকে খোঁজঁ করছিলাম, যার মাঝে সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জীবন-আচার প্রতিফলিত হবে; যে প্রতিটি কাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত সমূহ অনুসরণের উদাহরণ হবে। তাকে দেখে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের স্মৃতি জেগে উঠবে। নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম এমন মহান ও বরকতময় ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ও সহযাত্রার জন্য বাছাই করেছেন। অতঃপর পুণ্যবান এই সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের হাতেই আল্লাহ তাআলার মোবারক দীন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই পবিত্র ব্যক্তিদের মাধ্যমেই দীনি শিক্ষা, কুরআনে কারীম এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

1

মিশকাতুল মাসাবিহ

[24]

সাল্লামের হাদীস সম্ভার আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। তারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ পুরোপুরিভাবে আপন করে নেন এবং আমাদের জন্য বাস্তব উদাহরণ হয়ে ওঠেন। অতঃপর এই সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এমন সব গুণ ও স্বভাব চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, যা প্রতিটি সচেতন মুসলিমের জন্য জীবন-আচার ও স্বভাব-চরিত্রের উদাহরণ হয়ে আছে। নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়েও এমন আউলিয়ায়ে কেরাম, মাশায়েখ, মুজাহিদীন ফী সাবীলিল্লাহ, উলামায়ে রাব্বানী এবং সৎকর্মশীল মুত্তাকী ব্যক্তি রয়েছেন, যারা সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের বাস্তব উদাহরণ। তাদের জীবনী পাঠ করে যেমনিভাবে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের স্মৃতি জেগে ওঠে, তেমনি আমাদের অন্তরে প্রিয় দীন ইসলামের মাহাত্ম্যবোধ ও সত্যতার বিশ্বাস আরও পাকাপোক্ত হয়।

প্রিয় পাঠক! আপনাদের হাতে থাকা এই গ্রন্থটি একবিংশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দশকে দীনের আলো বিস্তারকারী কামেল দরবেশ, আমলদার আলিমে দীন, দৃষ্টান্তহীন দাঈ, দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী মুজাহিদ, গাম্ভীর্যপূর্ণ আমীরে-জামাআত, একনিষ্ঠতা ও তাকওয়ার প্রতীক, সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদার বাস্তব দৃষ্টান্ত, আমাদের প্রিয় নেতা, ভাই, বন্ধু এবং প্রশিক্ষক আহমদ ফারুক (রাজা মুহাম্মদ) সালমান রহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের উপর লিখিত। [তাঁর ব্যাপারে এমনটাই আমাদের ধারণা, আল্লাহ তাঁর জন্য যথেষ্ট] আমরা তাঁকে উপর্যুক্ত গুণাবলির অধিকারী দেখেছি, তাঁর ব্যাপারে আমাদের সুধারণা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

[25]

মরণ যদি হয় আনন্দের, সে তো মরণ নয়

আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এখন শহীদ হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য আর আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো) প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। তাই আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহও মৃত্যুর পেয়ালা মুখে নিয়েছেন। মৃত্যুর স্বাদ অনেক তিক্ত হয়। প্রাণ বায়ু বের হতে গিয়ে হাত পা পর্যন্ত বেঁকে যায়। সাকারাতুল মউত তথা মৃত্যু যন্ত্রণার তীব্রতার কথা সকলেরই জানা আছে। সম্ভবত প্রাণ বায়ু বের হবার এই কষ্টের ভয়ে মানুষ মৃত্যুকে এতটা ভয় করে। কিন্তু সাদিক মাসদুক (সত্যবাদী এবং সৎ ব্যক্তিদের নিকট সত্যায়িত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শহীদের এমন কোনো যন্ত্রণা হয় না; বরং সে জান্নাতের নেয়ামত সমূহ, হুর ও বালাখানা দেখার পর বলতে থাকে, হে আল্লাহ! আমাকে আবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন আমি পুনরায় শাহাদাতের সুধা পান করতে চাই। তাই শহীদের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয় না। দুশ্চিন্তা, হিসাব-কিতাবের পরীক্ষা, কাফন-দাফনের লৌকিকতা, কবরের সংকীর্ণতা —এগুলোর কোনোটাই শহীদের নয়। সাধারণ মৃত্যুতে এই সমস্ত দুশ্চিন্তা ও কষ্টের বিষয় রয়েছে। যেহেতু এই সব কিছু শাহাদাতের মাঝে নেই, তবে তো একে মৃত্যুই বলা যায় না। যেই মরণে রয়েছে আনন্দ, উৎফুল্লতা, শান্তি ও প্রশান্তি, সম্মান মর্যাদা— এতসব নেয়ামত ও সম্মানকে, মাহবুবের সাক্ষাতের এই স্বর্ণালী দৃশ্যকে খবরদার কেউ যেন মৃত্যু না বলে। এই সকল আনন্দ উৎসব দুনিয়ার জীবনে ছিল না। তবে তো শাহাদাত পরবর্তী জীবনই আসল জীবন। শাহাদাত ছাড়া সবই যেন নিষ্প্রাণ নির্জীব। এ কারণে শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

[26]

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

অর্থ : “বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করো না। ”[2]

আল্লাহ তাআলা কতটা ভালোবেসে ডাক দিচ্ছেন , “হে প্রশান্ত অন্তর হে প্রিয় প্রশান্ত প্রাণ ! চলে আসো রবের কাছে। ” এই বিচ্ছেদ ও পরীক্ষার পর এখন সময় হয়েছে। এখন তো আনন্দ উল্লাস ও বিশ্রামের সময় শুরু। টেনশন ফ্রি। ব্যস্ততার অবসান। অবিরাম ছুটি। এখন নেই কোনো ক্লান্তি। এখন জান্নাতে আল্লাহর নেয়ামত সমূহ দেখো। আরাম করে হেলান দাও। মাহফিল সাজাও আয়োজন করো এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত নবী -রাসূল সিদ্দিকীন সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ এবং শহীদদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত হও। তাদের সঙ্গে বসে যাও। এখন থেকে তুমি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সঙ্গী। অতএব এখন দুনিয়া থেকে চলে আসো। আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

আমাদের ভাইদের আনন্দে আমরা আনন্দিত

মুজাহিদীনের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার কথা আমরা জানি। আমরা জানি আল্লাহ তাদের বন্ধু। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ ওই সমস্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। ”[3]

---

[2] সূরা বাকারা , আয়াত নং: ১৫৪

[3] সূরা সাফ , আয়াত নং: ৪

[illegible]:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

“[illegible]”[4]

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

[illegible] “[illegible]”[5]

[illegible]

﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

[illegible]: “[illegible]”[6]

[illegible]

رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

[4] [illegible], [illegible]: [illegible]
[5] [illegible], [illegible]: [illegible]
[6] [illegible], [illegible]: [illegible]

অর্থ: “রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি, দীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট।”

আমাদের ভাইজান চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন। এখন তিনি কতই না আনন্দিত! তাই শহীদ ভাইদের আনন্দে আমরা আনন্দিত।

খবরটা শুনে হৃদয় কেঁপে ওঠে

যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের সংবাদ পাই, সে সময় জিহাদী একটি দায়িত্বে আমি অন্য ভাইদের থেকে দূরে আফগানিস্তানের নানগারহর প্রদেশে অবস্থান করছিলাম। কয়েকদিন ধরেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের সংবাদ মুখে মুখে শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু অন্তর মেনে নিচ্ছিলো না কিংবা বলা যায়: মেনে নেয়ার মতো অন্তর ধারণের সাহস করতে পারছিলাম না। যদিও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে সংঘর্ষ ও যুদ্ধের আধিক্যের কারণে শাহাদাত এবং সাথি ভাইদের মৃত্যু মামুলি ঘটনা ছিল; কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মতো মানুষের বিচ্ছেদ কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মেনে নেওয়াটা খুবই কষ্টকর ছিল। কিন্তু তবুও ওই সময়টা চলে আসে, যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট সহচর আস্থাভাজন ব্যক্তি উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ একটি পত্রের মাধ্যমে হযরত ফারুক রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত সত্যায়ন করেন এবং এই বিরাট পরীক্ষায় আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ ও অবিচল থাকার নসীহত করেন। সে সময়কার মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এতোটুকু বলতে পারি, সে সময় দুনিয়ার ব্যাপারে মন একেবারেই উদাস হয়ে যায়। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। অস্থিরতার কারণে মনে হতে থাকে, বুক ফেটে অন্তর বেরিয়ে [29]

আসবে। আমরা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের প্রতি নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট ছিলাম এবং এখনও সন্তুষ্ট। শৈশবকাল থেকেই মনের মাঝে এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, যিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন তাকে যেতেও হবে। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বিদায়ের কথা বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

ফারুক ভাইর (রহিমাহুল্লাহ) জীবন চরিত

হৃদয়ে তখন এই চিন্তার উদয় হয়, নিজের প্রিয় মানুষের জীবন চরিত নিয়ে দুই কলম কেন লিখবো না? কেন মুসলিম উম্মাহকে এই অমূল্য রত্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব না? এভাবে কেন আমি অন্তরকে সান্ত্বনা দেবো না? ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিত্বের কারিগর ছিলেন। ব্যক্তি তৈরি করতেন। দীনের দাওয়াত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অশ্বারোহী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে মুসলিম উম্মাহর জন্য সাধারণভাবে এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনরত মুজাহিদীনের জন্য বিশেষভাবে হিকমত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মুক্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাই মহান মুজাহিদ, দীনের দাঈ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দুর্লভ সুবাস মুসলিম উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে হয়। আল্লাহ তাআলার সাহায্য চেয়ে পাগলের মতো এভাবেই লেখা আরম্ভ করি। লেখা চলতে থাকে —যতক্ষণ না আমার অন্তরের বেদনা হালকা হয়। জিহাদী দায়িত্ব এবং সফরের ব্যস্ততার কারণে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও শয়তান মনের মধ্যে মন্ত্রণা দিয়ে বলে, নিশ্চয়ই যোগ্যতা সম্পন্ন এমন অনেকেই রয়েছেন এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আমার চেয়ে কম নয়। অতএব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জীবন চরিত

[30]

পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা তাদের দায়িত্ব। কিন্তু যখন পাণ্ডুলিপির ফাইল চোখে পড়ে এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর স্মৃতি জেগে ওঠে, তখন লজ্জিত হয়ে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ি। অপরদিকে যদি আমাদের দাওয়াত ও প্রকাশনা বিভাগের ভাইয়েরা এই গ্রন্থটি পরিপূর্ণ করে প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলবার জন্য পীড়াপীড়ি না করতেন, অনুপ্রেরণা না দিতেন, তাহলে সম্ভবত উদাসীনতা ও আলস্যের কারণে এই কাজটি সম্পন্ন হতো না। যা হোক ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের কয়েক বছর পর এই লেখা পূর্ণাঙ্গ হয়। আল্লাহ তাআলা একে উপকারী হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

গ্রন্থের ব্যাপারে কিছু কথা

** গ্রন্থটি ১৪ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। সূচিপত্রে তা বিশদভাবে উল্লেখ করা আছে।

** গ্রন্থটিকে হযরত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পূর্ণাঙ্গ জীবনী বা জীবন চরিত বলা সমীচীন হবে না। কোনো বড় ব্যক্তির জীবনচরিত লেখার সময় সমসাময়িক অবস্থা বিস্তারিত উল্লেখ করে বিভিন্ন রায় ও মত অ্যানালাইসিস (বিশ্লেষণ) করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি এ কাজটি পুরোপুরিভাবে হয়নি। অবস্থার বিশদ উল্লেখ এবং পারিপার্শ্বিকতা বিশ্লেষণে উপায় অবলম্বনের অভাববোধ আমাকে খুব বেশি লিখতে দেয়নি।

ইতিহাস এমনিতেই একটি জটিল ও প্যাঁচালো বিষয়। দীনের দাওয়াতের জন্য কেউ যদি ইতিহাস বিন্যস্তভাবে রচনা করতে চায়, তখন শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়; বরং সে সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ ও বিভিন্নজনের অবস্থান তুলে ধরাও জরুরি হয়। কিন্তু এটা অনেক জটিল কাজ। একে তো যোগ্যতার অভাব, অপরদিকে আমার মতে ইতিহাসের সঠিক বিশ্লেষণ ওই সময়টাতে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, [31]

যখন ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত না হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের বাস্তবিক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব কখনও কখনও কয়েক দশক পর অথবা কয়েক শতাব্দী পর প্রকাশিত হয়ে সমাজে কোনো শক্তিশালী পরিবর্তন সাধিত করে। উম্মাহর এমন আকাবিরীন রয়েছেন, যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের কয়েক শতাব্দী পর তাদের ইতিহাস শিক্ষা-দীক্ষা জীবন ও কর্মের মর্যাদা বুঝে উম্মাহ তাদেরকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছে। কোনো কাজটি লাভজনক ছিল আর কোনটি ক্ষতিকর, কোনো কাজে কল্যাণ অগ্রগণ্য ছিল আর কোনো কাজে অকল্যাণ —দীর্ঘ একটা সময় পরেই এজাতীয় বিষয় সঠিকভাবে বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। অতএব এই গ্রন্থে শুধু একজন মুজাহিদ দাঈ নেতার ব্যক্তিত্ব, উম্মাহর সামনে যথাযোগ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তার ইতিহাস, ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, তার প্রিয় ব্যক্তিবর্গ এবং ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দের আলোচনা আনা হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক অবস্থা, পারিপার্শিকতা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বিশেষভাবে গোত্রীয় বা গোত্রীয় অঞ্চলের মুজাহিদীনের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

** পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং শৈশবকালীন অবস্থার আলোচনা এই গ্রন্থে আমার দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্পূর্ণ। অবস্থার প্রতিকূলতা এবং তাগুত গোষ্ঠীর জুলুমের কারণে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আরও অধিক তথ্য এনে হাজির করা এবং নিজের স্মৃতিশক্তি থেকে কিংবা শৈশবের বন্ধুদেরকে দিয়ে সেগুলো সংশোধন করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। অবশ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্মানিত স্ত্রী এবং তার খালাতো ভাই শহীদ রায়হান আফফান রহিমাহুল্লাহ কিছু তথ্য সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। কিন্তু তবুও এ

[32]

সম্পর্কে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে শোনা কথা অথবা নিজের চোখে দেখা বিষয়ের উপরেই ক্ষান্ত দিতে হয়। কিছুকাল পূর্বে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্মানিত স্ত্রী ‘তিনি দিয়ে চলেছেন পৃথিবীতে তাওহীদের সাক্ষ্য’ শিরোনামে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জীবনের কিছু উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন। আমাদের প্রিয় উস্তাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর অন্যান্য নিকটজন ও পরিবারের সদস্য তার আরও প্রশংসনীয় গুণাবলি, তার জীবনী—বিশেষভাবে শৈশবকালের ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত করতে পারবেন। তবেই এই গ্রন্থের শূন্যস্থান পূরণ হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এই মহান নেতার জীবনী যথাযোগ্যভাবে বর্ণনা করার তাওফীক দান করুন আমীন।

** এই কিতাবের শিরোনাম তো আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর জীবনী এবং মৌলিক বিষয়বস্তু এটাই; কিন্তু এই কিতাবে আরও কতক মহান ব্যক্তির আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এটা করার প্রয়োজন ছিল, কারণ কোনো ব্যক্তিকে বোঝার জন্য তার আকাবিরীন গুরুজন, সহযাত্রী সহচর ও কাছের লোকজনকে দেখা জরুরি যে, তারা কারা এবং কেমন? সেই সঙ্গে সমকালীন জিহাদের কিছুটা ইতিহাস তুলে ধরাও উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাস তো রচনা হবেই; যদি আমরা রচনা না করি, তাহলে গুপ্ত সংস্থাগুলোর শয়তানরা কিছুদিন পর মিথ্যাচার ও অপবাদ ঠেসে নিজেদের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জিহাদের নেতৃবৃন্দের চিত্র বিকৃতভাবে তুলে ধরবে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বিশ্বস্ততার দাবি হলো - সমকালীন জিহাদের কিছু ইতিহাস, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জীবনী এবং কর্ম অবদানের আলোচনা সঠিক পন্থায় সংরক্ষণ করা। এ গ্রন্থটি তেমনি একটি প্রয়াস।

[33]

** এমনিতেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আকাবিরীন সহচর ও ভক্ত অনুরাগীদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। ইসলামের শহীদানের মাঝে প্রত্যেকেই অমূল্য রত্ন এবং ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির দিক থেকে সালফে সালেহীনের নমুনা; কিন্তু এই কিতাবে শুধু ওই আকাবিরীন গুরুজন সহচরবৃন্দ ও ভক্ত অনুরাগীদের আলোচনা বাছাই করা হয়েছে, যাদের সান্নিধ্য ও সম্পর্ক আমার দৃষ্টিতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জিহাদী জীবনে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। তাদের সান্নিধ্য ও সম্পর্ক অন্যদের তুলনায় অধিক উল্লেখযোগ্য। তবুও কয়েকজন মহান শহীদের আলোচনা ছুটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমার মতো অক্ষম ব্যক্তিকে তার ওলিদের যথার্থ মূল্যায়নের তাওফীক দান করুন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের এই ধারা মুসলিম উম্মাহর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোর জন্য দীনদারী ও ঈমান বৃদ্ধি, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দাওয়াত এবং বৈশ্বিক বিশৃঙ্খলাকারী কুফরী শাসন ব্যবস্থার অবসানের ঘোষণাপত্র হিসেবে কবুল করুন। এই কাজকে আমার জন্য এবং আমার সম্মানিত পিতা-মাতার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন।

** শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত কতক হযরত এখনও জীবদ্দশায় রয়েছেন, যাদের বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জীবনী পূর্ণাঙ্গতা পেতে পারে না। কিন্তু নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা এবং আমার স্বভাবগত ভয়ের কারণে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে আমি অক্ষম। এমন ব্যক্তিদের শীর্ষে রয়েছেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অতি প্রিয় সহচর উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ এবং জিহাদী নেতা, প্রশিক্ষক, সুকৌশলী নেতা, দক্ষ নেতা, আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় আমীর শায়খ আবু আব্দুর রহমান ইবরাহহীম আল-মাগরিবি হাফিযাহুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা

[34]

তাদেরকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন এবং তাদেরকে সর্বদা কাফেরদের গলার কাঁটা বানিয়ে রাখুন, আমীন।

** একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট স্পষ্ট করা এখানে জরুরি মনে করি। এই কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় এমন কিছু ব্যক্তির আলোচনা ও পরিচিতি রয়েছে যারা হয়তো ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর খুবই ঘনিষ্ঠজন, নয়তো জিহাদের ইতিহাসে ওই সময়ে তাদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এমন ব্যক্তিদের মাঝে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সরাসরি যাদের সম্পর্ক ছিল, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জীবনে অথবা চিন্তাধারায় যাদের সান্নিধ্যের প্রভাব দৃশ্যমান ছিল অথবা কিতাবের কোনো মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সরাসরি তাদের সম্পর্ক ছিল, তাদের আলোচনা কিতাবের মূল অংশে করা হয়েছে। এছাড়া অন্যদের আলোচনা পাদটীকায় আনা হয়েছে। কিন্তু এখানে স্পষ্ট থাকা চাই, কোনো ব্যক্তির আলোচনা কিতাবের মূল অংশে অথবা টীকা-অংশে আনার দ্বারা তার ইহলৌকিক বা পরলৌকিক মর্যাদা কিছুতেই অনুমান করা যেতে পারে না। আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউসে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল প্রজন্মের মাঝে তাদের প্রশংসামাখা স্মৃতি জীবন্ত রাখুন- আমীন।

** শহীদ উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে আমার মতো অধিকাংশ শিষ্যের জন্য একজন প্রশিক্ষক ও নেতার মতো ছিল। কিন্তু যেহেতু আমার সাথে তার সম্পর্কের মাঝে অন্য গুণাবলির ওপর বন্ধুত্ব সম্প্রীতি এবং লৌকিকতা বিবর্জিত ঘনিষ্ঠতা প্রবল ছিল, এজন্য প্রিয় বন্ধুর নামের সঙ্গে উস্তাদ বলাটা আমার [35]

কাছে লৌকিকতা মনে হয়। আমরা সর্বদা তার উপস্থিতিতে তাকে সালমান ভাই অথবা ফারুক ভাই ডেকেছি। এখন তার বিদায়ের পরেও তাকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বলতে মন চাচ্ছে। আশা করি পাঠকবর্গ আমার এই অপারগতা মেনে নেবেন।

** গ্রন্থের শেষাংশে ‘শেষ সুবাস’ হিসেবে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছের বন্ধু এবং প্রথম সহচর ইঞ্জিনিয়ার উসামা ইবরাহীম গৌরী শহীদ রহিমাহুল্লাহ তার শাহাদাতে যে আবেগপূর্ণ লেখা লিখেছেন, সেটিও এ গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। সেটি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সারমর্মও বটে।

** এ পর্যায়ে ওই সকল হযরতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা এই গ্রন্থ প্রস্তুত করার কাজে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, আগাগোড়া পুরো গ্রন্থ দেখে ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন, বিভিন্ন স্থানে উপকারী বিষয় যুক্ত করেছেন। এমন ব্যক্তিদের মাঝে আল-কায়েদার নেতা উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অনেক দিনের প্রিয় সাথি বিজ্ঞ আলেমে দীন মাওলানা মুসান্না হাসান হাফিযাহুল্লাহ, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর খালাতো ভাই এবং বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি শহীদ রায়হান আফফান রহিমাহুল্লাহ, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অতি প্রিয় ব্যক্তি - ভাই দাউদ গৌরী হাফিযাহুল্লাহ এবং ফারুক রহিমাহুল্লাহর দীক্ষাপ্রাপ্ত মিডিয়া বিভাগের ভাই নোমান হিজাজী হাফিযাহুল্লাহ শামিল রয়েছেন। শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্মানিত স্ত্রীর প্রতিও সীমাহীন কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশেষ করে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ সংশোধন করেছেন এবং মূল্যবান

[36]

কিছু বিষয়ের সংযোজন করেছেন। আমি আমার স্ত্রীর প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞ, যিনি আমার পাশে থেকে জিহাদী জীবনের অন্যান্য বিষয়ের মতো এই কিতাব প্রস্তুত করার কাজেও প্রতি মুহূর্তে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং দুনিয়া আখিরাতের সকল কল্যাণ দান করুন আমীন।

যেমন ছিলেন ইসলামের দিশারীগণ

শহীদ উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ একজন মুজাহিদ, দাঈ, আলিমে দীন ও দীনী নেতা ছিলেন। এটা কেবল মুজাহিদীনের কোনো বিশেষ গ্রুপপ্রধানের অথবা শুধু আল-কায়েদা উপমহাদেশের একজন নেতার আলোচনা নয়। বরং এখানে একদিকে মুজাহিদীনকে একজন প্রকৃত নেতার জীবনাচার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত করা এবং অপরদিকে সমাজের ধার্মিক লক্ষ কোটি মুসলিমের সামনে মুজাহিদীনের একজন নেতার জীবনালেখ্য তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁর জীবনের উজ্জ্বল কর্ম অবদান, আকাশছোঁয়া চিন্তাধারা, নীতি-নৈতিকতা, স্বভাব-চরিত্র এবং তার ভক্ত অনুরাগীদের পরিচিতি তুলে ধরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এমন একজন নেতা ছিলেন. যিনি ৩৩ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে আল্লাহ তাআলার দীন প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাট অবদান রেখেছেন। বর্তমান সময়ে মিডিয়ার জাদু মুসলিম জনসাধারণের অন্তরে মুজাহিদীন এবং তাদের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ তৈরি করে রেখেছে। নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে তীব্র, নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক প্রোপাগান্ডার এমন স্বতন্ত্র প্রয়াস সরলমনা মুসলিমদেরকে চিন্তিত করে তোলে। এমন অবস্থায় মুসলিম উম্মাহর সামনে উস্তাদ ফারুক

[37]

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِـذْنَا إِنْ نَسِـينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِـلْ عَلَيْنَا إِصْـراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اللهم انصر من نصر دين محمد صـــلى الله عليه وســـلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم

হে আল্লাহ যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের সাহায্য করবে আপনি তাদেরকে সাহায্য করুন , আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আর যারা দীনে -মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি করবে আপনি তাদের ক্ষতি করুন, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না , আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم

প্রথম অধ্যায়: পরিবার, শৈশবকাল এবং প্রাথমিক শিক্ষা শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পরিবারের বসবাস পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি জেলার কাছেই। পোথোহার অঞ্চলের প্রসিদ্ধ রাজপুত বংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক, যাদের বসবাস ছিল রাওয়ালপিণ্ডি, গুজার খান চকওয়াল সহ পোথোহারের বিভিন্ন এলাকায়।

শহীদ ফারুক ভাইর (রহিমাহুল্লাহ) সম্মানিত পিতা
শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পিতা মহোদয় জনাব রাজা ইহসান আজীজ সাহেব ধর্মপ্রেমিক ইসলামের প্রতি গভীর আস্থাশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইসলামী মর্যাদাবোধ তার ব্যক্তিত্বের শিরোনাম ছিল। তিনি বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মাস্টার্স কমপ্লিট করেন। ওই সময়টাতে পাকিস্তানের শিক্ষাঙ্গনগুলো সমাজতন্ত্র সমর্থক ও ইসলামপন্থিদের বিবাদস্থল ছিল। গোটা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিস্তারে পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী রাশিয়া সামরিক শক্তির পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মুসলিম উম্মাহর উপর আগ্রাসন থাবা বসিয়ে রেখেছিল। কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে ছাত্র শিক্ষকেরা ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশ্যে ঠাট্টা করে। তারা মুসলিমদেরকে চ্যালেঞ্জ করে। অপরদিকে ইসলামপ্রেমী ছাত্ররা তাদের ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের চেয়ে পিছিয়ে না থেকে সমানতালে তাদের জবাব দেয়।

[40]

প্রতিটি ফ্রন্টে তারা ইসলামের প্রতিরক্ষায় বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায়।

কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা সমাপন এবং আমেরিকা যাত্রা
এমন পরিস্থিতিতে রাজা ইহসান সাহেব একজন বিবেকবান আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলিম হিসেবে ইসলামাবাদের একটি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর তিনি উক্ত ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

7 বিষয়ে
উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য তাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি আমেরিকায় অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করেন। আমেরিকা থেকে কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সমাজতন্ত্র এবং তার দুর্গন্ধময় দৃষ্টিভঙ্গি ভালোভাবে বুঝতে তাকে সাহায্য করে, সেই সঙ্গে এসব চিন্তাধারা অপনোদন ও চ্যালেঞ্জ করতে তাকে সাহস দেয়। অপরদিকে কুফরী ও নাস্তিকতার উৎসমুখ আমেরিকায় অবস্থানের দ্বারা পশ্চিমা সভ্যতা- সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণাভাব, ইহুদী গোষ্ঠী এবং তাদের এজেন্ডা ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয় তার মাঝে। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী বিশ্ব ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মন্দ দিকগুলো তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর উচ্চতর পড়াশোনার জন্য কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ইসলামের সত্যতা ও মাহাত্ম্যবোধ এবং কুফরী ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণাভাব ও অনাস্থা তার মাঝে তৈরি করে দেন। আমেরিকা থেকে তিনি ইসলামের একজন পরিপক্ক মুজাহিদ

7
International relations

[41]

হয়ে ফিরে আসেন। এ সময় প্রতিটি ফ্রন্টে, প্রতিটি পরিবেশে, ইসলামের প্রতিরক্ষা তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এখানে বলে রাখা ভালো, সে সময়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমেরিকার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেন।

আফগানিস্তান জিহাদ এবং আফগান জাতির সঙ্গে সম্পর্ক
আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় করে কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ওই সময়টাতেই রাশিয়া সর্বশক্তি নিয়ে আফগানিস্তানের হামলা করে। লাল ভালুক এমন হিংস্রতা ও পাশবিকতা নিয়ে আফগানিস্তানের মুসলিমদের উপর হামলা করে এবং জুলুম-নির্যাতনের এমন কালো অধ্যায় রচনা করে, যা ইসলামী বিশ্বের সংবেদনশীল মানুষের অন্তর কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এদিকে আফগান মুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতিগত মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশে সারা বিশ্বের মুসলিমগণ হতবাক হয়ে যায়; আবার আনন্দিতও হয়। নেহাত সীমিত উপায় মাধ্যম, পুরানো বন্দুক; এমনকি প্রথম প্রথম পাথর ও খঞ্জর নিয়ে রাশিয়ার বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া আফগানিস্তানের দরবেশদের ঈমান ও তাওয়াক্কুলের শক্তি প্রদর্শনের সূচনা ছিল। তারা নিজেদের লাশের বাঁধ নির্মাণ করে ধর্মহীন রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধ করে এবং ইসলামের প্রতিরক্ষা করে। এই দৃশ্য দেখে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঈমানের পুনর্জাগরণ ঘটে। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, মুসান্না ইবনে হারিসা, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের স্মৃতি পুনরায় জেগে ওঠে। কয়েক শতাব্দী কালীন দাসত্বের ফলে যেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ উম্মাহকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, তা পুনর্জীবিত হয়। কয়েক

[42]

শতাব্দী যাবৎ নিদ্রা শেষে আল্লাহর সিংহরা আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে। কয়েক দশক আগে মরহুম কবি ইকবাল তার এমনই স্বপ্ন কবিতার ভাষায় তুলে ধরেছিলেন:

« যারা মরুভূমি থেকে আবির্ভূত হয়ে রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসন উল্টে দিয়েছিল | জ্ঞানী লোকদের কাছে আমি শুনেছি ওই সিংহের দল আবারও জেগে উঠবে »

আরব-অনারব হাজার হাজার মুসলিম বিশ্বের চতুর্দিক থেকে আফগান ভাইদের সাহায্যের জন্য পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোর বিভিন্ন এলাকায় একত্রিত হন। যখন গোটা মুসলিম বিশ্ব আফগানদের প্রতি সমব্যথী ছিল, সে সময় জনাব রাজা সাহেবের মতো আত্মমর্যাদাশীল দীনদার ব্যক্তি কেমন করে নীরবে বসে থাকতে পারেন? আফগান মুজাহিদীনের সাহায্য-সহায়তার জন্য নিজের সমস্ত যোগ্যতা তিনি উৎসর্গ করে দেন। এর জন্য এক দিকে তিনি সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করেন, অপরদিকে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত মুহাজিরদের সঙ্গে আফগান ভাইদের সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করেন। আফগান জিহাদ চলাকালে কয়েকবার তিনি আফগান জিহাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি জিহাদ ও মুজাহিদীনের নৈকট্য লাভের সুযোগ লাভ করেন। এই বিষয়গুলো জিহাদ ও মুজাহিদীনের প্রতি তার অন্তরে এমন ভালোবাসা তৈরি করে, যার প্রতিফলন পরবর্তীতে আমরা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে দেখতে পাই।

ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে পরবর্তীতেও জনাব রাজা সাহেবের মাঝে আফগানদের ভালোবাসা বরাবরের মতো বহাল থাকে। ২০০০ সালে তালেবান শাসন আমলে যখন আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে আফগানিস্তানে [43]

তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনও আফগানিস্তানের মুসলিমদের প্রতি সমব্যথী হয়ে তিনি রেশন ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহযোগে নিজেই আফগানিস্তানে গমন করেন এবং সেখানে ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে গরীব-মিসকীনদের মাঝে সেগুলো বণ্টন করেন। ওই সফরে তার পুত্র ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার সঙ্গে ছিলেন। সামনেও ইনশাআল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জীবনীতে এই সফরের কথা আলোচনা করা হবে।

ধর্মহীনদেরকে পশ্চাদ্ধাবন আফগানিস্তানের সমভূমি ও পাহাড়ি ভূমিতে মুসলিমদের হাতে রাশিয়ার দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় গোটা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বেলুন ফুটো করে দেয়। এক এক করে রাশিয়ার শাসনাধীন অঞ্চল স্বাধীন হতে আরম্ভ করে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাদর্শন -অতীত হতে আরম্ভ করে। প্রিয় মাতৃভূমির শিক্ষাঙ্গন ও কলেজ ভার্সিটিগুলোতেও বামপন্থি সমাজতন্ত্রের সমর্থক এবং ধর্মহীনতার আহ্বায়ক প্রফেসর ও শিক্ষার্থীরা মাথা নত করে পিছিয়ে আসতে আরম্ভ করে। সুবিধাবাদীরা তখন মনিব পরিবর্তন করে। বিগতকাল পর্যন্ত যারা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মহীনতা এবং ইসলামী আকীদা- বিশ্বাসের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ ছড়িয়ে যাচ্ছিলো, আজ তারা রাশিয়ার পরাজয়ের পর সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ মার্কিন ও পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে। এখন তাদের কাজ লিবারেলিজম তথা উদারনৈতিকবাদ এবং সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বর্ণনা করা। এই নতুন দর্শনকে ভিত্তি বানিয়ে তারা সেই পুরানো কাজ তথা ইসলামের সমালোচনা, অদৃশ্যের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসকে আঘাত করা, জান্নাত-

[44]

জাহান্নাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, ধর্মীয় সর্বসম্মত বিষয় অস্বীকার করা এবং কুফরী ও নাস্তিকতা বিস্তার আরম্ভ করে। পাকিস্তানের অন্যান্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদে নাস্তিক ও লিবারেলদের লবি শুরু থেকেই মজবুত ছিল। এখানে বিভিন্ন প্রফেসর সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীদের মনে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে গভীর দ্বিধা-সংশয় তৈরি এবং ধর্মীয় সর্বসম্মত বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন। উল্লেখ্য যে, চিন্তাগত নৈকট্যের পাশাপাশি অবস্থানগতভাবেও মার্কিন দূতাবাসের যথেষ্ট কাছাকাছি থাকার কারণে ইউনিভার্সিটির সেকুলার পক্ষ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। এমনকি আজও পর্যন্ত কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটির সেকুলার ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক্যবাদী প্রফেসরদের লবি গোটা দেশে প্রসিদ্ধ। এই ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর পারভেজ হুদভয় এবং ডক্টর এএইচ নায়ার ধর্মবিদ্বেষ, লিবারেল তথা উদারনৈতিক চিন্তাধারা এবং নাস্তিক্যবাদ প্রচার-প্রসারে কতটা পরিচিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রুশ বিরোধী জিহাদ শেষ করার পর প্রফেসর রাজা ইহসান সাহেব কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটিতে নাস্তিক গোষ্ঠী, পূর্বেকার সমাজতন্ত্রপন্থি এবং বর্তমান সময়ের লিবারেল গোষ্ঠীকে পশ্চাদ্ধাবন করতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থেকে আরম্ভ করে প্রফেসরদের মিটিং পর্যন্ত সব জায়গায় তিনি ইসলামের পক্ষে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যান এবং দীনের শত্রুদেরকে ওপেন চ্যালেঞ্জ করেন। ইউনিভার্সিটিতে তার অধিকাংশ সভা ও বৈঠক হতো এই ধর্ম বিদ্বেষী লিবারেল গোষ্ঠীর সমালোচনা এবং তাদের দুষ্কৃতির মুখোশ উন্মোচনের লক্ষ্যে।

[45]

ইউনিভার্সিটিতে তার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে কুরআনের এই আয়াতের অংশ:

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ

অর্থ : "আল্লাহর দীন অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে তারা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করে না।"

সত্য বলা সত্যের উপর অবিচল থাকা এবং দীনের শত্রুদেরকে অকাট্য পন্থায় দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে মোকাবেলা করাটাই তার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

অপরদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং মার্কিন দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত লিবারেল গোষ্ঠী রীতিমতো পরিকল্পিতভাবে প্রফেসর রাজা ইহসান সাহেবের বিরুদ্ধে নেমে পড়ে। তাকে কোণঠাসা করা, হুমকি-ধমকি দেয়া, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। অতঃপর যখন তিনি বুঝতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে কোণঠাসা করা হয়েছে, এখন তিনি স্বাধীনভাবে দীনি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, লিবারেল গোষ্ঠীর আরোপিত শর্তাবলী না মেনে ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতে পারবেন না, তখন তিনি ইহজাগতিক ভবিষ্যৎ সরাসরি দৃষ্টি থেকে সরিয়ে শুধু ঈমানী উদ্দীপনা ও ধর্মীয় আত্মমর্যাদা বোধের প্রকাশ ঘটিয়ে ইউনিভার্সিটির চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং আলাদা হয়ে যান। এটা ৯০ দশকের শেষ বছরগুলোর কথা। সে সময় আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছেন।

শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্মানিত মাতা
শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুহতারাম মাতা আমেরা ইহসান প্রিয় মাতৃভূমির দীনদার বিখ্যাত একজন নারী ছিলেন। তিনি রাওয়ালপিন্ডির একটি ধার্মিক পরিবারের কন্যা। পাকিস্তানে কুরআনে কারীমের দাওয়াত বিস্তারে তার ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ধর্মীয় ও ইলমী বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২০-এর অধিক পুস্তক পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বর্তমান অবস্থা নিয়ে ছেপে আসা তার ধর্মীয় আবেগপূর্ণ লেখালেখি পাকিস্তানের আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমদের হৃদয়ের কথা। একইভাবে নারীদের সংশোধন নিয়েও উর্দু সাহিত্যে তার রয়েছে কিছু রচনা।

পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির ব্যাপক অধ্যয়ন ঐতিহ্য সূত্রেই তিনি দীনদারী পেয়েছিলেন। কিন্তু যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পিতা মহোদয়ের সঙ্গে তিনি পশ্চিমা ও মার্কিন সভ্যতা সংস্কৃতি কাছ থেকে দেখার ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ পান, তখন তার জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। দুর্বল ও লাঞ্ছনাময় সংস্কৃতি দেখার পর তার অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা ও মাহাত্ম্যবোধ বৃদ্ধি পায়। তিনি বুঝতে পারেন, ইসলাম এবং কুরআনে কারীম মানব জাতির কল্যাণের ব্যবস্থাপত্র, কেবল ইসলাম একজন মুসলিমের সর্বাগ্রে গর্বের বিষয়, ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনের দ্বারাই দুনিয়া আখিরাতে সাফল্য লাভ করা সম্ভব এবং হেদায়াতের গ্রন্থ কুরআনের ওপর আমল করার দ্বারা মানুষ স্থিতি নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। এ পরিবর্তন তার মাঝে কুরআনে কারীমের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা তৈরি করে। কুরআনে কারীমের দাওয়াত [47]

বিস্তার, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং কুরআনের শিক্ষা প্রয়াসই তার মিশন হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে পশ্চিমা চিন্তাধারার সমালোচনা এবং পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির অসারতা ও বিভ্রান্তি বর্ণনা করে ইসলামের মাহাত্ম্য সৌন্দর্য ইসলামিক সভ্যতা সংস্কৃতির পুনর্জীবিত করার দাওয়াত দেয়া তার মৌলিক ব্যস্ততা হয়ে ওঠে। সেকুলার (তথা ধর্মনিরপেক্ষ) লিবারেল (তথাকথিত উদারনৈতিকবাদী) এবং পশ্চিমা সভ্যতার নাস্তিক্যবাদী যে চিন্তাধারা সরকারি প্রেসার ও মিডিয়া ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সমাজের ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সেগুলোর অপনোদন এবং সমাজের নারীদেরকে সেগুলোর ব্যাপারে সচেতন করা তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

দীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে জামাতে ইসলামীতে অন্তর্ভুক্তি
কুরআনের দাওয়াতের তাড়নায় তিনি জামাতে ইসলামীতে যুক্ত হন। এ প্ল্যাটফর্ম থেকে তিনি কাজ শুরু করেন। তিনি জামাতে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বেশ কিছু দায়িত্ব লাভ করেন। জামাতে ইসলামীতে যুক্ত থাকাকালে দেশের রাজনীতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। এমনকি ১৯৯০ সালে তিনি নারীদের বিশেষ আসনে পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু যখন তিনি অনুভব করেন, জামাতে ইসলামীতে কিছু রাজনৈতিক প্রয়োজনকে শরীয়া অনুশাসনের উপর প্রাধান্য দেয়া হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বহুবার ধর্মীয় মূলনীতির ব্যাপারে সমঝোতা করা হয়, তখন তিনি ১৯৯৩ সালে এ সংগঠন থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যান। সে সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বয়স হয়েছিল শুধু বারো বছর।

[48]

কুরআনিক ক্লাসের ধারাবাহিক আয়োজন
শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুহতারাম আম্মা কয়েক দশক যাবৎ কুরআন ক্লাসের ধারাবাহিক আয়োজন করেন। ওই ক্লাসগুলোতে সাধারণত কুরআন থেকে নসীহত উপদেশের বিষয়গুলো নির্বাচন করা হতো। জটিল ও প্যাঁচালো ফিকহী (ইসলামী আইন শাস্ত্রীয়) আলোচনা উলামায়ে কেরামের জন্য ছেড়ে দেয়া হতো। কুরআন একজন মুসলিম নারীকে কি বার্তা দেয়, মুসলিম মা- বোনদেরকে কি কি দায়িত্ব দেয়, তাই তার ক্লাসের মৌলিক পয়েন্ট হতো। হাজার হাজার মা-বোন ওই ক্লাসে অংশগ্রহণ করে পূর্বের জীবনে ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে তওবা করেন এবং আমরণ ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করার অঙ্গীকার করেন। পর্দা এবং লজ্জার শরীয়তী বিধি-বিধান নারীদের মাঝে বিস্তারে ওই ক্লাসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীন ইসলামের প্রতি ভালোবাসা, গর্ববোধ, আস্থা পোষণ, শেষ যুগের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতি প্রকৃত অর্থে ঈমান আনয়ন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও জীবন-আচরণগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা, কাফের গোষ্ঠী এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণাভাব তৈরি, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আম্মাজানের ঐ কুরআনিক আয়োজন বিরাট ভূমিকা পালন করে।

‘কুরআনের আলো’
শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুহতারাম আম্মা ‘কুরআনের আলো’ নামে কুরআন পাকের ক্লাসগুলো এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণমূলক পয়েন্টগুলো সংকলন

[49]

করেন। বিরাট এই সংকলন গ্রন্থ মুসলিম জনসাধারণ — বিশেষ করে মা-বোনদের জন্য কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপনে এবং কুরআন-সুন্নাহকে পরিবার ও সংসারে বাস্তবায়নে বেশ সহায়তা করে। গ্রন্থখানা উলামায়ে কেরামকেও দেখানো হলে তারাও বেশ পছন্দ করেন। গ্রন্থের শুরুতে জামিয়া ফরিদিয়া ইসলামাবাদের ইফতা বিভাগের প্রধান মুফতী ফারুক সাহেব (হাফিযাহুল্লাহ) প্রশংসামূলক মন্তব্য লিখে দেন।

শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শৈশবকাল ও ছেলেবেলা

পারিবারিক দীক্ষার আলো ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ একটি সম্ভ্রান্ত দীনদার ধর্মভীরু ইসলাম প্রেমী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এটি তার প্রতি আল্লাহ তাআলার বড় ইহসান ও অনুগ্রহ ছিল। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ পৃথিবীতে আগমন করেন। পিতা-মাতা তার নাম রাখেন মুহাম্মাদ সালমান। পরবর্তীতে মুজাহিদীনের মাঝে তিনি আরও বেশ কিছু নাম ও উপনামে পরিচিতি পান। তন্মধ্যে উস্তাদ আহমদ ফারুক, কারী আব্দুল হাদী এবং সুরাকা বেশি প্রসিদ্ধ। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, তার পিতা-মাতা আমেরিকায় অবস্থানকালে, তিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে যেহেতু তার সম্মানিত পিতা কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অধ্যাপনার চাকরি পেয়েছিলেন, সেজন্য ফারুক ভাই শৈশবকাল থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগ পর্যন্ত

[50]

অধিকাংশ সময় কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের কলোনিতে অতিবাহিত করেন।

নিঃসন্দেহে সবদিক থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান অবদান ছিল তার পিতা-মাতার। সারা জীবন তার ব্যক্তিত্বের উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী সবকিছুর মাঝে আল্লাহ তাআলা তার পিতা-মাতাকে এবং তাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সান্নিধ্যকেই সবচেয়ে ফলপ্রসূ প্রমাণিত করেছিলেন। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি শৈশবকাল ও ছেলেবেলাতেই সমবয়সীদের মাঝে বিশেষ উচ্চতর গুণাবলিতে অনন্য ছিলেন। পারিবারিকভাবে এবং পিতা-মাতার কাছ থেকে যে সমস্ত গুণ তিনি লাভ করেছিলেন, সেই সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়; কিন্তু তার মধ্যে কিছু বিষয় পয়েন্ট করে এখানে উল্লেখ করছি:

** আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া শহীদ ভাই রহিমাহুল্লাহ অল্পতেই পেয়ে যান। জীবনের প্রতিটি বাঁকে আল্লাহকে ভয় করতেন। প্রতি মুহূর্তে এই চিন্তা করতেন যে, আল্লাহ কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছেন? ধর্মীয় বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও কুণ্ঠিত না হওয়া, বরং আত্মসংশোধনের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকা, নিরবচ্ছিন্নভাবে সুন্নাহ পালন করে যাওয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা পোষণ করা — এগুলো ফারুক ভাইয়ের গুণ ছিল।

** কুরআনে কারীমের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। অধিক পরিমাণে কুরআন পাকের তিলাওয়াত। তাজবীদ সহকারে ও সুরেলা কন্ঠে কুরআন তিলাওয়াত। কুরআনের মর্ম ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। কুরআন পাকের একটা বড় অংশ নিজ উদ্যোগে মুখস্থ করা। কুরআনের [51]

অর্থ অনুবাদের প্রতি খেয়াল রাখা। এককথায় শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাঝে কুরআনে কারীমের সঙ্গে সীমাহীন সম্পর্ক ও ভালোবাসা তার পিতা- মাতার শিক্ষা-দীক্ষার সুফল ছিল।

** দীনি দাওয়াতের অস্থিরতা। দাঈ সুলভ গুণাবলি হযরত শহীদ ভাইয়ের পারিবারিক শিক্ষা ছিল। তিনি দীনের একজন মহীয়সী দাঈ নারীর সুসন্তান ছিলেন। প্রতিনিয়ত ইসলামী বিধি-বিধান সমাজে প্রচার প্রসার করা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ বিস্তারের জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। এটা ওই সময়ের কথা যখন তিনি সবে মাত্র শিশুদের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করছিলেন। একজন সফল দাঈ যে বিষয়ের দাওয়াত দেন, তার ওপর নিজে আমল করেন। এই গুণ হযরত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাঝে শুরু থেকেই ছিল। এছাড়াও এই অঙ্গনের অন্যান্য গুণাবলি, তীব্র অস্থিরতা, হৃদয়ের উত্তাপ, উম্মাহর দরদ ও ব্যথ্যা, মুসলিমদের প্রতি মায়া-মমতা, যাদেরকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তাদের প্রতি সুধারণা, একনিষ্ঠতা, ভালোবাসা, নিষ্কলুষতা এবং রাতে উঠে তাদের জন্য দোয়া করা, সরলতা দোয়া, তাদের বিরোধিতায় সুন্দর আচরণ উপহার, গাম্ভীর্য, আত্মবিশ্বাস, বয়ান বক্তৃতা অর্থাৎ নিজের বক্তব্য ভালোভাবে শ্রোতাদের কানে পৌঁছে দেয়া ইত্যাকার গুণাবলি শুরু থেকেই তার মাঝে ছিল।

** পাঠের আগ্রহ তথা অধ্যয়ন এবং বইপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক শহিদ ভাই রহিমাহুল্লাহর শৈশবকাল থেকেই ছিল। তিনি পড়তে খুবই ভালোবাসতেন। সাধারণত উপকারী ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতেন। সেগুলো মুখস্থ করে নিতেন। গুরুত্বপূর্ণ

[52]

স্থানগুলো চিহ্নিত করে রাখতেন। সেই সঙ্গে নিজের ডায়েরিতে অথবা কোনো খাতায় সেগুলো টুকে রাখতেন।

** পশ্চিমা সভ্যতার সংস্কৃতি এবং সেগুলোর মন্দ দিক সম্পর্কে সচেতনতা। এই সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের প্রতি ঘৃণা। ছেলেবেলা থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এর মাঝে এ বিষয়গুলো ছিল। ইংরেজি ভাষায় দখল থাকার কারণে ইংরেজ গোষ্ঠী এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা অধ্যয়নের সুযোগ পান তিনি। পশ্চিমা শাসন ব্যবস্থার দুর্গন্ধময় বিকল অঙ্গগুলো স্পষ্ট হওয়ার দ্বারা শহীদ ভাইয়ের মাঝে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ভালোবাসা এবং তা প্রচার প্রসারের উদ্দীপনা ছেলেবেলা থেকেই ছিল।

** কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটিতে অবস্থান এবং সেখানকার ধর্মবিদ্বেষী লিবারেল ধর্মহীন শ্রেণির আচরণগত ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের পরিবেশে থাকার কারণে শৈশবকাল থেকেই শহীদ ভাই রহিমাহুল্লাহ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, উদারনৈতিক সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ ইত্যাদি পরিভাষাগুলোর সঙ্গে শুধু পরিচিতই ছিলেন না; এগুলোর অন্ধকার দিক সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। চিন্তাগতভাবে ধর্মহীন লোকদের দ্বৈতনীতি ও চিন্তাভঙ্গি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। সেই সঙ্গে এই বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদের পরিবেশ থাকায় ঈমানী সৎ সাহস, সত্য প্রকাশে নির্ভীকতা, বাতিলকে চ্যালেঞ্জ, মিথ্যার সামনে শির উন্নত রাখার শিক্ষা এবং আল্লাহর রাস্তায় কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করার গুণ পারিবারিকভাবেই তিনি লাভ করেছিলেন।

[53]

** তিনি যখন বিচার বিবেচনা করার মতো প্রাপ্তবয়স্ক হন, ওই সময়টাতে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তান জিহাদ। সৌভাগ্যক্রমে তার পরিবার কোনো না কোনোভাবে এই জিহাদে যুক্ত হয়। মুজাহিদীনের সাফল্যের ঘটনা এবং শহীদানের কারামত ও ত্যাগ-তিতিক্ষার উপাখ্যান তার সামনেই বর্ণনা করা হতো। বড় হয়ে ইসলামের মুজাহিদ হতে হবে এবং উম্মাহকে রক্ষা করতে হবে—এই স্বপ্ন শৈশবকাল থেকেই তার ছিল। এ অবস্থায় যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বয়স ১০ বছরও হয়নি, তখন বিশ্ব এক বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। আফগানিস্তানের দরবেশগণ মুহাজির ভাইদেরকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর সুপার পাওয়ারকে আফগানিস্তানের পাহাড়ি ভূমিতে পরাজিত ও ভূলুণ্ঠিত করে। তাই শৈশবকাল থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বিজয় এবং মুসলিম উম্মাহর অগ্রযাত্রার স্বপ্ন দেখতেন। জিহাদী গজল এবং চেতনা উদ্দীপক কবিতা শুনে ছোটকাল থেকেই তিনি মুজাহিদীনের মাঝে থাকার পরিকল্পনা করে নেন। ১০-১১ বছর বয়সেই প্রসিদ্ধ জিহাদী কবিতা তার মুখে উচ্চারিত হতো—

خون شہیداں رنگ لایا فتح کا پرچم لہرایا

جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی

অর্থ: « শহীদানের রক্ত এনেছে রঙ বিজয়ের পতাকা করেছে উড্ডীন

জাগো জাগো ভোর হয়েছে জাগো জাগো ভোর হয়েছে »

** সাধারণভাবে সারা পৃথিবীর এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কেও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর যথেষ্ট ধারণা ছিল।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মন্দ দিক সমূহ এবং রাজনীতিবিদ ও জেনারেলদের অসৎ কার্যকলাপ শুরু থেকেই তার কাছে স্পষ্ট ছিল। তিনি এমন সমাজে বেড়ে ওঠেন, যেখানে কাছাকাছি অনেকেই রাজনীতি, সরকার ও পাকবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিল। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানের নামমাত্র সম্ভ্রান্ত ও সুশীল শ্রেণিকে কাছ থেকে দেখার এবং তাদের মন্দ দিক ও বিভ্রান্তিগুলো প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন পক্ষ ও শাসকবর্গ অধিকাংশই যে দীন ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান নয়, তাদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক অবস্থা যে ইসলামিক নয়, আর তাদের চিন্তাধারা ও মনস্তত্ত্ব যে ইসলাম মাফিক নয় —শৈশকাল থেকেই এই বাস্তবতা তাঁর সামনে স্পষ্ট ছিল।

ফিরিঙ্গি মক্তবে.. শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ স্কুলের প্রাথমিক ৮টি ক্লাস রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদের বিভিন্ন স্কুলে পড়েন। এরপর তিনি পাকিস্তান আর্মির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ক্যাডেট কলেজ হাসান আবদালে ভর্তি হন। জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে চালু হওয়া এই ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের এমনভাবে শিক্ষা দান করা, যেন ভবিষ্যতে তারা সেনাবাহিনীর অফিসার হতে পারে। ক্যাডেট কলেজ হাসান আবদাল মানসম্মত পড়াশোনার কারণে গোটা দেশে বিখ্যাত ছিল। এই কলেজে ভর্তির জন্য একটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সুপারিশের ভিত্তিতেই অধিকাংশ স্টুডেন্ট ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকে। অবশ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ [55]

অসাধারণ মেধার কারণে ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এই কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ক্যাডেট কলেজের শিক্ষাকার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে ছিল শিশুদের ঈমান হরণের অপর নাম। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের উপর তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। একদিকে এটা শিক্ষা ক্ষেত্রে তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও মেধাবিকাশের কারণ হয়, অপরদিকে তিনি সামরিক ব্যবস্থাপনা ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তার অধীন সংস্থাগুলো যে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের তৈরি, তাদের সাধারণ চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি,প্রকৃতি, অভ্যাস আচার-আচরণ ও ঐতিহ্য যে পশ্চিম থেকে আমদানিকৃত, এই দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা, পর্যালোচনা করা এবং পরিবর্তন করে প্রকৃত ইসলামী মাপকাঠির উপর সেনাবাহিনী গঠনের উৎসাহ খুব সম্ভব ক্যাডেট কলেজে থাকতেই তার মাঝে তৈরি হয়। সেখানে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, ঈমান, তাকওয়া, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর যে ভিশন সেনাবাহিনী এবং তার অধীন সংস্থাগুলোর রয়েছে, তার ব্যাখ্যাগুলো একটু ভিন্নতর। এই সেনাবাহিনীর ঈমান পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি। তাকওয়া অর্থ আল্লাহর ভয় কিন্তু এই সেনাবাহিনীর তাকওয়া আমেরিকার প্রতি। আমেরিকার চোখ রাঙ্গানি দেখে সোজা হয়ে যাবার খ্যাতি রয়েছে তাদের। তারা ঝগড়া-বিবাদও আমেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির স্বার্থেই করে থাকে। পারিবারিক শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে ক্যাডেট কলেজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে তিনি বেঁচে থাকেন। উল্টো তার মাঝে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি হয় এবং তা সংশোধনের উদ্দীপনা জাগ্রত হয়।

[56]

ক্যাডেট কলেজে কুরআন শিক্ষা ক্যাডেট কলেজের সময়কার কথা। সম্ভবত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তখন ম্যাট্রিকে ছিলেন। কলেজে প্রতি সপ্তাহে বেশিরভাগ সময় শুক্রবারে শিক্ষার্থীদের বিনোদনের জন্য মিউজিক্যাল শো অথবা ফিল্ম দেখার প্যারেড অনুষ্ঠিত হতো। আধুনিক ফিরিঙ্গি প্রাইমারি স্কুলে মুসলিম শিশুদের মানসিকতা সেকুলার লিবারেল ধাঁচে গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের মাঝে আমোদ-প্রমোদের অভ্যাস তৈরি করার জন্য বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। বর্তমান সময়ে কট্টরপন্থা প্রতিরোধের নামে বৈশ্বিকভাবে পশ্চিমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাচ-গান ও মিউজিকের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। আমাদের দেশের শাসকবৃন্দ এবং সেনাবাহিনী সমাজকে এবং বিশেষভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রমোদের প্রশিক্ষণস্থল বানানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু ওই সময় শুধু মিশনারী কনভেন্ট স্কুল, কিছু বড় প্রাইভেট স্কুল এবং সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুলেই গান-বাদ্য ও নাচ শিখানোর ব্যবস্থা ছিল।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ওই প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে শুধু অস্বীকারই করেননি বরং কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্পষ্ট বলে দেন, আমি আমোদ-প্রমোদের এই তামাশা চলাকালে কলেজের মসজিদে গিয়ে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করবো। সেনাবাহিনীর অধীন কলেজের নির্বাহী পরিষদের কাছে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর এই অস্বীকৃতি বোধগম্য ছিল না। তারা রাগান্বিত হয় এবং কঠোরতম শাস্তির হুমকি দেয়। কিন্তু তিনি নিজ কথার ওপর অবিচল থাকেন। তিনি বলেন, যা কিছুই হোক না কেন, আমি কোনো হারাম কাজের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো না। কলেজের প্রিন্সিপাল নিজে তাকে ডেকে পাঠান এবং হুমকি ধমকি দেন। কিন্তু তিনি অনড় থাকেন। অপরদিকে [57]

ছুটির সময় যখন তিনি বাড়িতে আসতেন, তখন তার পিতা তাকে সাহস দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, সঠিক পথে অবিচল থাকতে উৎসাহিত করতেন এবং সর্বাবস্থায় হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার নসীহত করতেন। অবশেষে দুর্নামের ভয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কথা মেনে নেয়। তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপে আরও কিছু শিক্ষার্থী সাহস পায় এবং তারাও হারাম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর থেকে তারা সাপ্তাহিক মিউজিক্যাল প্যারেড চলাকালে কলেজের মসজিদে সমবেত হতো এবং তিনি সেখানে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে কুরআনে পাকের তালিম দিতেন। এটাই ছিল তাঁর কুরআন শিক্ষাদানের সূচনা।

কলেজে শিক্ষা সমাপন এবং ইলমে দীনের প্রতি মনোনিবেশ

তিনি ক্যাডেট কলেজ হাসান আবদাল থেকে প্রি মেডিকেলে এসএসসি তথা ইন্টার ডিগ্রি বেশ ভালো নাম্বার পেয়ে পাস করেন। এরপর তার সামনে দুটো পথ খোলা ছিল যার মাধ্যমে জাগতিক উন্নতি অগ্রগতি তিনি অর্জন করতে পারতেন। প্রথমটা হচ্ছে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে কমিশন পেয়ে সেনা অফিসার হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর জন্য এই পথ বেছে নেয়া অসম্ভব ছিল। কারণ তিনি সেনাবাহিনীর প্রকৃত অবস্থা জেনে গিয়েছিলেন। তাদের ধর্ম বিদ্বেষী পরিবেশ কাছ থেকে দেখেছিলেন। দ্বিতীয় অপশন হলো: তিনি নিজের শিক্ষা অনুযায়ী কোনো মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে একজন ডাক্তার হতে পারতেন। এরপর দীন ও মিল্লাতের খেদমত সেই সঙ্গে দুনিয়াবি উন্নতি অগ্রগতি অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমন রুচি প্রকৃতি ও শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন, যা [58]

তাকে ভবিষ্যতে কর্মজীবনের জন্য এমন বিভাগ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে, যার মাধ্যমে একদিকে তিনি আখিরাত ও পরজাগতিক উন্নতি অর্জন করতে পারেন, অপরদিকে দুনিয়াতেও দীন ইসলামের প্রকৃত অর্থে খেদমত করতে পারেন। তিনি দীনি ইলম অর্জন এবং দীন ইসলামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিতে চান। নিঃসন্দেহে তিনি ওই সময় থেকেই নিজেকে দীনের দাওয়াত এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যের জন্য দীনি ইলম অর্জন করা জরুরি ছিল। স্বভাবগতভাবে তিনি একজন দাঈ ছিলেন। আর দাঈদের জন্য দীনি ইলমে পরিপক্কতা অর্জন করা জরুরি। এ কারণে তিনি শিক্ষাজীবনের অবশিষ্ট অংশকে ইলমে দীন অর্জনে কাটাতে মনস্থ করেন। তার এমন সিদ্ধান্ত সহপাঠী ও সমবয়সীদের কাছে খুবই আশ্চর্যের ছিল। তারা ভেবে পাচ্ছিলো না, কেমন করে একটা ছাত্র ক্যাডেট কলেজ থেকে ভালো নাম্বার পেয়ে ইন্টার পাশ করা সত্ত্বেও ক্যারিয়ারের চিন্তা না করে ইলমে দীন অর্জনকে লক্ষ্য বানাতে পারে? কিন্তু তিনি যেহেতু শুরু থেকেই দীন ইসলামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা লালন করতেন, এ কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া তার জন্য সহজ হয়ে যায়। যাই হোক তিনি শরীয়ার ইলম অর্জনের জন্য ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: শরীয়াহর
ইলম অর্জন

[59]

ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে.. ১৯৮০ সালের শুরুর দিকে ইসলামাবাদে আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারকে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বলা হয়ে থাকে। বিশেষ করে শরীয়াহ ও আইন ডিপার্টমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই চালু ছিল। স্পষ্টত এই বিভাগ চালুর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী শরীয়ত এবং ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে এমনভাবে পারদর্শী করে তোলা, যেন তারা সমাজে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করতে পারে এবং শরীয়তী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পর শরীয়তী আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর গোটা বিশ্ব থেকে শরীয়াহ ইলমের অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামকে সেখানে নিয়ে আসা হয়। এটা ওই সময়কার কথা, যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ, উলামায়ে কেরাম, দীনের দাঈ ও মুজাহিদীন পাকিস্তানে আগমন করছিলেন। এ অবস্থায় ইসলামী ইউনিভার্সিটি মুহাজিরদের একটা বিরাট অংশের অবস্থানস্থল হয়ে ওঠে। এভাবে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত নিষ্ঠাবান শত শত তালিবুল ইলম পেয়ে যায়, অপরদিকে এমন একদল আল্লাহওয়ালা আলেম পেয়ে যায়, যারা নিজেদের দেশ থেকে শুধু দীন ইসলামের তরে হিজরত করে পাকিস্তানে এসেছেন। এমন ব্যক্তিবর্গ ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দাওয়াত ও অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। এমন উলামায়ে কেরামের মাঝে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ইমামুল জিহাদ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহ, যিনি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর শুরুর দিকেই শরীয়াহ বিভাগের

[60]

অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবেই গোটা এক দশকের অধিককাল যাবৎ জামিয়া ইসলামিয়া (ইসলামিক ইউনিভার্সিটি) মুজাহিদীন ও দীন প্রতিষ্ঠাকামী মুসলিমদের আশ্রয়স্থল ও উৎসমুখ হিসেবে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। এমনকি এক সূত্র অনুযায়ী ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষকতায় ফিলিস্তিনের মুসলিমদেরকে জাতিগত নিধনকারী বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকায় প্রথমবার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলাকারী ইসলামের মুজাহিদ গাযী রমজী ইউসুফ (আল্লাহ তাআলা তাকে কাফেরদের কারাগার থেকে মুক্তি দান করুন) গ্রেফতার হবার সময় এই ইউনিভার্সিটিতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক, গাদ্দার, ধর্ম ও জাতির শত্রু শাসকবর্গ ইসলামের এই মহান সন্তানকে গ্রেফতার করে অল্প কিছু ডলারের বিনিময়ে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়। রুশ বিরোধী জিহাদ থেকে অবসর পাবার পর যখন আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এবং পাকিস্তানের আইএসআইয়ের চক্রান্তের ফলে আফগান মুজাহিদীনের মাঝে পারস্পরিক যুদ্ধ শুরু হয়, তখন এসব ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আরব মুজাহিদীনের বিরাট একটা অংশ ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা ও অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করেন।

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপক ছিলেন আরব আলেম, এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার মান অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যথেষ্ট উন্নত ছিল। সে সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের উলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমগণ ওখানে সমবেত হওয়ার কারণে যদি শিক্ষার্থীরা নিজেরা চেষ্টা করে শিক্ষকদের মনোযোগ অর্জন করতো, তাহলে দীনী ইলমে গভীরতা অর্জন হতো।

[61]

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানকেই ইলমে দীন অর্জনের জন্য বাছাই করেন। রুশ বিরোধী জিহাদ শেষ হওয়ার পর মুজাহিদীন যখন আমেরিকার প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং আমেরিকা নিজের ও ইসরাইলের অস্তিত্বের জন্য মুজাহিদীনকে হুমকি মনে করে, তখন থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদে মার্কিন গোপন সংস্থাগুলোর শ্যেন দৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে। এরপর যখন ওখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কতক মুজাহিদকে গ্রেফতার করা হয়, তখন আইএসআই এবং অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সেখানকার দীনদার শ্রেণির জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। কিন্তু এরপরও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ১৯৯৯ সালে যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তখনও সেখানে প্রবীণ উলামায়ে কেরাম ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে সাধারণ দীনদারি ও সৎ কর্মের বাতাস বইছিল। আরব উলামায়ে কেরাম তালিবুল ইলম এবং অন্যান্য মুহাজিরের আধিক্য ছিল এবং ইলমে দীন হাসিলের জন্য তাদের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। অবশ্য ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের মোবারক হামলার পর আমেরিকার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পাকিস্তানি শাসকবর্গ ইসলামী ইউনিভার্সিটি ভেতর বড় পরিসরে পরিবর্তন আনে, যার দরুন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোই পরিবর্তিত হয়নি; এই বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতোই ধর্মবিদ্বেষী দুর্গন্ধময় কর্মপ্রয়াসে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাজির শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপকদেরকে বের করে দেয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগতদের মধ্য থেকে বাছাই করে এমন অধ্যাপক এবং কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেয়া হয় যারা দীন ইসলামের আধুনিক পশ্চিমা ব্যাখ্যার প্রবক্তা। শিক্ষা সিলেবাসে পরিবর্তন আনা হয়। শরীয়াহ সাবজেক্টগুলো থেকে সুযোগ-

[62]

সুবিধা সরিয়ে অন্যান্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ডিপার্টমেন্টকে উন্নত করা হয়। কোনো অধ্যাপক বা শিক্ষার্থীর মাঝে যদি জিহাদের প্রতি ভালোবাসার সন্দেহ হলেই গোপন সংস্থার মাধ্যমে তাকে গুম করা হয়। এভাবেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কল্যাণের উল্লেখযোগ্য সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

শরীয়াহ অ্যান্ড আইন ডিপার্টমেন্টে
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির শরীয়াহ ও আইন বিভাগে

8 ভর্তির সুযোগ পান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগকে সর্ব প্রধান বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য মনে করা হতো। এমনকি এই বিভাগটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই চালু ছিল। গোটা বিশ্ব থেকে বিদগ্ধ পারদর্শী উলামায়ে কেরামকে এই বিভাগে অধ্যাপনার জন্য বাছাই করা হয়। মৌলিকভাবে এই বিভাগে আল ফিকহুল ইসলামী পড়ানো হতো। ধারাবাহিকতা এমন ছিল: প্রথম বছর আরবী ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগী করা হতো। পরবর্তী দুই বছর ইলমুল ফিকহ; সেই সঙ্গে শরীয়াহর অন্যান্য শাস্ত্র অতিরিক্ত সাবজেক্ট হিসেবে পড়ানো হতো। পরের বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রীয় আইন অধ্যয়ন করানো হতো। সেই সঙ্গে শরীয়াহ আইন-কানুনের বিস্তারিত দলীল প্রমাণ এবং বাস্তবায়ন পন্থার ওপর জোর দেয়া হতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর তিনি ইলমে দীন অর্জনে ডুবে যান। শুরু থেকেই তিনি পরিশ্রমী ছিলেন কিন্তু এখন শুধু ইলমে দীন তার একমাত্র ব্যস্ততা হয়ে দাঁড়ায়। অসাধারণ মেধার কারণে তিনি

8
Faculty of Shariah and Law
[63]

সহপাঠীদের চেয়ে সর্বদাই এগিয়ে থাকতেন। ওই সময়টাতে আমি তাকে দেখেছি যে, সফর অবস্থায় এবং পানাহারের সময় তিনি পাঠগুলো পুনরাবৃত্তি করতেন এবং শরীয়াহর মাসায়েল মনে মনে আওড়াতে থাকতেন। ওই সময়কার কথা। তিনি অধিকাংশ দিন সময় কাটানোর জন্য আমাদের এখানে আসতেন। দিনের বেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা এবং সন্ধ্যায় দাওয়াতী ক্লাসের ফাঁকে যে সময়টা থাকতো, অধিকাংশই আমাদের এখানে কাটাতেন। তাই যখন দিনের বেলা খাবার শেষে সকলেই বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়তো তখন তিনি কোনো পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ফিকহী মাসায়েল মুখস্থ করতে আরম্ভ করতেন। এ উদ্দেশ্যে কখনও কখনও আমার কাছে এসে পড়াশুনিয়ে নিজের তাকরার (পড়ার রিভাইজ) সম্পন্ন করতেন। আমার মনে আছে, যখন তিনি যাকাতের মাসায়েল মুখস্থ করতেন, তখন বকরি উট গাভী ইত্যাদির নেসাব মুখস্থ করতেন। তিনি পড়াগুলো আমাকে বারবার শোনাতেন। তখন আমার বেশ ভালো লাগতো।

তিনি ওই সময় খুবই ব্যস্ত জীবন-যাপন করতেন। দুপুর বেলা পড়া রিভাইজ করতেন। সন্ধ্যায় দাওয়াতী ক্লাস এবং রাতে পরের দিনের পাঠ প্রস্তুত করা। এসব কিছুর পাশাপাশি ইবাদত বন্দেগিতে নিমগ্নতা, রাতে দীর্ঘ সময় সালাতের কিয়াম এবং দিনে অধিক পরিমাণে নফল আদায়। এতটা ব্যস্ত ক্লান্তিকর নিজামুল আউকাত (রুটিন) সত্ত্বেও তিনি পড়াশোনায় সবচেয়ে অগ্রসর থাকতেন।

প্রথম বছর যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন শাস্ত্র শিখতে হতো— যেখানে সবচেয়ে মৌলিক শাস্ত্র ছিল আরবী ভাষা; এ কারণে তিনি আরবী ভাষা শেখার জন্য প্রচুর শ্রম দেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সহপাঠীদের মাঝে সবচেয়ে অগ্রসর হয়ে ওঠেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী ভাষা এবং অন্যান্য শাস্ত্রে পরিপক্কতা একদিকে যেমন ভবিষ্যতে [64]

একাডেমিক পড়াশোনায় গভীরতার পথ উন্মুক্ত করে, অপরদিকে এই যোগ্যতা জিহাদের ময়দানে আরব উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখের দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য সহজ করে দেয়।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এমন ব্যক্তির সম্মান মর্যাদা বেশি, যার রুজি রোজগার ও অর্থবিত্ত বেশি। এমন ব্যক্তিকেই সফল এবং সমাজের এলিট মনে করা হয়। তার বিপরীতে যে সমস্ত লোক ধর্মীয় নীতিমালার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও প্রশংসনীয় গুণাবলির অধিকারী, কিন্তু অর্থ বৈষয়িক দিক থেকে দুর্বল, তাদেরকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অসম্ভ্রান্ত মনে করা হয়। একই দৃশ্য দেখা যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ‘ফ্যাকাল্টি অব শরীয়াহ এন্ড ল’ বা শরীয়াহ ও আইন বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষার্থী শরীয়াহ বিষয়গুলো শুধু পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়ে। অপরদিকে আইনের বিষয়গুলো অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে পাঠ করে। এই বিভাগ পাশ করার পর একদিকে যেমন ইলমে শরীয়াহয় তারা একাডেমিকভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠে, অপরদিকে ওকালতির সার্টিফিকেট এল এল বি (LLB) তাদের হাতে চলে আসে। এর ফলে পরবর্তীতে উকিল অথবা জর্জ হবার সুযোগ তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। যাই হোক সাধারণ শিক্ষার্থীদের বেশি আগ্রহ থাকে এলএলবি সার্টিফিকেট এবং আইন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার প্রতি। এর একটি কারণ হলো, শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করে, আমাদের দেশে শরীয়াহ আইন চালু নেই এবং আদালতগুলোতে শরীয়তী সিদ্ধান্ত সমূহ এবং ফুকাহায়ে কেরামের মতামতগুলো পালনযোগ্য মনে করা হয় না। বরং পুরো শাসন ব্যবস্থা পশ্চিমা আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে পশ্চিমা আইনশাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয় এবং

[65]

শরীয়তকে বাস্তবায়ন-অযোগ্য মনে করে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রায়োরিটি দেয়া হয়।

কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে ভীষণ অনুতপ্ত ছিলেন। তার খুবই দুঃখ ছিল। তিনি এমন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে শরীয়াহ পাঠগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়ার, সেগুলোতে দক্ষতা অর্জন করার, শারঈ বিধানাবলীর গুরুত্ব, তাৎপর্য, আবশ্যকতা এবং সেগুলোর মাঝে মানবজাতির কল্যাণ নিহিত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করার উপদেশ দিতেন। একই সময়ে পশ্চিমা আইন-কানুন শিক্ষা লাভ করা তাঁর খুবই অপছন্দের বিষয় ছিল। যদিও তিনি নিজের সকল সবক একাগ্রতা ও মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, কিন্তু পশ্চিমা আইন পড়তে গিয়ে তিনি এমন পেরেশান হতেন, যেমনিভাবে একজন মেডিকেলের ছাত্র কোনো মরণব্যাধি নিয়ে পড়াশোনা করার সময় পেরেশান হয়।

যাই হোক আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তিনি শিক্ষার্জন করতে থাকেন এবং তার ইলম ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমনিভাবে সামাজিক পারিপার্শিকতা অতঃপর ক্যাডেট কলেজে পড়াশোনা করার কারণে তাঁর সামনে পাকিস্তানের সম্ভ্রান্ত ও সুশীল শ্রেণি এবং সেনাবাহিনীর প্রকৃত রূপ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, একইভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ওকালতি নিয়ে পড়াশোনা করার কারণে পশ্চিমা আইন-কানুনের অপকারিতা কদাকার চিত্র এবং সকল প্রকার দুর্বলতা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। সেই সঙ্গে তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়, আমাদের দেশে যে আইন চালু আছে, তা পশ্চিমা আইন থেকেই নেয়া হয়েছে। এই আইন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের জুলুম অত্যাচার-অনাচার এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে এই শিক্ষা তাঁর সামনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তের প্রতি ভালোবাসা ও আস্থা বৃদ্ধি করে। [66]

তিনি এই বিশ্বাস অর্জন করেন যে, আমাদের সমাজ; এমনকি গোটা পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান বিশ্ব স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত আইন-কানুনের মাঝেই রয়েছে। তাই একদিকে যেমন শরীয়াহ আইন-কানুন বাস্তবায়নের অস্থিরতা তার মাঝে বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে ঐশী আইনের বিপরীত আইন-কানুনের মূলোচ্ছেদ করার আকাঙ্ক্ষা তার মাঝে জেগে ওঠে।

শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি ভদ্রতা
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সৎ কর্ম, মেধা, উন্নত চারিত্রিকতা, আদব শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের কারণে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের দৃষ্টিতেও অনন্য ছিলেন এবং তিনি শিক্ষকদেরকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি শিক্ষকদেরকে সীমাহীন আদব শ্রদ্ধা জানাতেন। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের প্রতি ভদ্রতার গুরুত্ব একেবারেই নেই কিন্তু তিনি ব্যতিক্রমী ছিলেন। আমি আজ পর্যন্ত তার মুখ থেকে কোনো শিক্ষকের ব্যাপারে কোনো নেতিবাচক কথা শুনিনি। তিনি ক্লাস শেষ হবার পরেও শিক্ষকদের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হতেন এবং পাঠ্য বই-পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্র তাদের কাছ থেকে শিখতে চেষ্টা করতেন। শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মুজাহিদীনের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগের পর যখন প্রথমবার তিনি আরবী থেকে উর্দু ভাষান্তরের কাজ আরম্ভ করেন এবং মিশরের আলেমে দীন শায়খ আবুল হাকিম হাসসান শহীদ রহিমাহুল্লাহ রচিত জিহাদী মাসায়েল সংবলিত একটি কিতাব উর্দুতে ভাষান্তর করেন, তখন আরবী মূল গ্রন্থের কিছু জটিল জায়গা বোঝা এবং

[67]

সেগুলোর সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্য তিনি তার একজন প্রবীণ শিক্ষক আলেমে দীনের শরণাপন্ন হন। অতঃপর তার তত্ত্বাবধানে তিনি অনুবাদটি করেন। ঐ শিক্ষক পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ ও আইন ফ্যাকাল্টির প্রধানও হয়েছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা বোঝা যায় শিক্ষকদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে তিনি কেমন ছিলেন? শিক্ষকদের প্রতি যদি শ্রদ্ধাবোধ নাই থাকতো, তাহলে সরকারি চাপ থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ সিনিয়র শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে সমকালীন জিহাদী মাসায়েল সংবলিত গ্রন্থ অনুবাদ করা সম্ভব হতো না।

শিক্ষার রেকর্ড
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে নিজের ক্লাসে সহপাঠীদের মাঝে অনন্য ছিলেন। সর্বদা তিনি সবার আগে থাকতেন। তাকে তার বিভাগের সবচেয়ে উপযুক্ত ও মেধাবী শিক্ষার্থী মনে করা হতো। পাঁচ বছর পর যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা সমাপ্ত করেন তখন তার সাফল্য ও পড়াশোনার রেকর্ডের কারণে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী তিনি গোল্ড মেডেল পাবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ বছর আইন বিভাগের একজন ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার শিক্ষকের সঙ্গে শরীয়ত ও জিহাদ বিষয়ে তাঁর তর্ক হয়। উক্ত শিক্ষক যখন তার লিবারেল চিন্তা প্রকাশ করেন, তখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার প্রতিবাদ করেন এবং দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার দৃষ্টিভঙ্গি অপনোদন করেন। ফলে ওই শিক্ষক ক্ষুব্ধ হন এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে হুমকি দিয়ে বলেন, আমি তোমার পড়াশোনার সকল রেকর্ড নষ্ট করে দেবো। ঐ শিক্ষক তার সাবজেক্টে ফারুক ভাই

[68]

রহিমাহুল্লাহকে অনেক কম নাম্বার দেন যার ফলে তিনি গোল্ড মেডেল হারান। কিন্তু তবুও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবার মাঝে অনন্য ছিলেন। নিজস্ব রুচি ও দাওয়াতী ব্যস্ততার কারণে যদিও তিনি পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রতিভা ও মেধার কারণে তাকে দুইবার বিভিন্ন সম্মাননা প্রদান করা হয়।

প্রবীণ উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে উপকৃত হবার সুযোগ
খুব সম্ভব ২০০২ সালের কথা। তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদের তত্ত্বাবধানে ইসলামাবাদের কনভেনশন সেন্টারে গোটা বিশ্বের বড় বড় উলামায়ে কেরামকে নিয়ে ‘ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আইন এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন’ শীর্ষক একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ওই কনফারেন্সে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে ফিকহী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর যোগ্যতা ও আগ্রহ দেখে তিন দিনব্যাপী ওই কনফারেন্সের জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের খেদমত এবং কনফারেন্সের ব্যবস্থাপনা ও সঞ্চালনায় অংশগ্রহণের জন্য বাছাই করা হয়। যতদূর আমার মনে পড়ে ওই কনফারেন্সের সভাপতি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ আলেমে দীন আল্লামা ওয়াহ্বাতুল্লাহ যুহাইলি আলোচনা করছিলেন। ওই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার সুযোগে তিনি আল্লামা ওয়াহ্বাতুল্লাহ যুহাইলি সাহেব রহিমাহুল্লাহ, মুফতী তাকী উসমানী সাহেব, মুফতী রফি উসমানী সাহেব এবং সারা বিশ্ব থেকে আগত বড় মাপের অনেক উলামায়ে

[69]

কেরামের খেদমতে থেকে তিনি উপকৃত হবার সুযোগ লাভ করেন। এই সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে ওই আলেমদের সঙ্গে কথা বলেন এবং নিজের পড়াশোনার জন্য দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন।

ইউরোপেও আমরা মুসলিম জীবনাচার ছাড়বো না বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার শেষ বছরে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ফ্রান্সে একটি ইলমি বিতর্ক অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করেন। ঘটনা এরকম— রেডক্রস অথবা আইসিআরসি (ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেডক্রস)

9

-এর
তত্ত্বাবধানে ফ্রান্সে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সামরিক আইন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রত্যেক দেশ থেকে তিনজন শিক্ষার্থীকে বাছাই করা হয়। ওই শিক্ষার্থীরা নিজেদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করে কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে। বাছাই পর্ব এমন ছিল— প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে যারা উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে রেড ক্রসের বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। জাতীয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ তাদের মাঝে প্রথম তিনজনকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বাছাই করা হয়।

ওই কনফারেন্স এবং তার বাছাইপর্বে অংশগ্রহণের কোনো ইচ্ছা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ছিল না। স্বভাবতই তিনি এ জাতীয় অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হবার আগে

9
International Committee of the Red Cross

[70]

তার প্রিয় বন্ধু এবং সহপাঠী মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান রহিমাহুল্লাহ তার কাছে আসেন এবং পীড়াপীড়ি করে তাকে টেনে পরীক্ষার হলে নিয়ে যান। মাওলানা রহিমাহুল্লাহর ইচ্ছা ছিল ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যেন অবশ্যই ফ্রান্স সফর করেন, পশ্চিমা বিশ্বের সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে ইসলামের বার্তা প্রচার করেন এবং নিজের জ্ঞান-গরিমা ও অভিজ্ঞতার ঝুলিটি এই সফরের মাধ্যমে আরও কিছুটা সমৃদ্ধ করেন। তাই মাওলানা রহিমাহুল্লাহর পীড়াপীড়িতে তিনি কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং উত্তীর্ণ হন।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শারঈ দাড়ি, লম্বা জামা, টাখনুর ওপর পায়জামা এবং মাথার ওপর চিত্রালি টুপি (যা একসময় মুজাহিদীনের আলামত মনে করা হতো) পরিধান করে ফ্রান্সে গমন করেন। পথিমধ্যে যখন বিভিন্ন জাহাজে আরোহণ করেন তখন তাকে দেখিয়ে লোকে উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ বলতো। তিনি বলেন, যখন আমি প্যারিসের সড়ক পাড় হতে নিতাম, তখন আমাকে দেখার জন্য প্যারিসের ট্রাফিক থেমে যেতো এবং লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে, কেমন করে এই মুজাহিদ প্যারিসে এসে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছে? ওই আয়োজনের এক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকলকে নিজেদের দেশের সংস্কৃতি দেখানোর জন্য বলা হয়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পালা এলে তিনি পশতু ভাষায় এমন এক কবিতা পাঠ করেন, যার মধ্যে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের এবং এই লক্ষ্যে শহীদ হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়। প্যারিসের পরিবেশে তাঁর সুন্দর কন্ঠ থেকে এই কবিতাগুলো অনুরণিত হতে থাকে:

হে পালনকর্তা! সহায় হও তুমি আমার! তোমার আইনের তরে করবো লড়াই!
[71]

হয় শরীয়তের আইন এনে তবেই থামবো নয়তো আজ এখানেই শহীদ হয়ে যাবো!

কবিতার অর্থ যারা বুঝতে পারছিল না, তারা এতটুকু অবশ্যই বুঝতে পারছিল যে, তিনি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো নাচ-গান প্রদর্শনের পরিবর্তে তার ধর্মীয় কোনো বিষয় শোনাচ্ছেন। আর যারা কবিতার অর্থ বুঝতে পারছিলেন, তারা তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে দাঁত দিয়ে আঙ্গুল কামড়াচ্ছিলেন এবং হতবাক হয়ে সব দেখছিলেন। যাই হোক, প্রতিযোগিতা হয়। পাকিস্তানি গ্রুপ যদিও সাফল্যের বিশেষ কোনো স্তরে উন্নীত হতে পারেনি কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ফিরে আসার পর ওই কনফারেন্সে কি কি ঘটেছে সেগুলো তিনি সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের মতো পাঠ পাঠ আলাদা করে বিশদভাবে আলোচনা করেন। পশ্চিমা বিশ্বের প্রকৃত চেহারা সম্পর্কে তিনি আগেই জানতেন। ফ্রান্সের ওই অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হবেন দূরের কথা, উল্টো তাদেরকে প্রভাবিত করে আসেন। এই সফরের দ্বারা তাঁর মাঝে পশ্চিমা শাসন ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, পশ্চিমা বিশ্ব খুবই নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ সময় কাটাচ্ছে। যেকোনো সময় তাদের পতন ঘটতে পারে। চাকচিক্য এবং নিয়ম-নীতির চমৎকার মোড়কে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও গণতান্ত্রিক সভ্যতার উজ্জ্বল চেহারার অপর পাশে আঁধারের সমুদ্র। পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মাণে অন্যতম প্রধান অংশীদার রাষ্ট্র ফ্রান্সের উন্নতি অগ্রগতি দ্বারা প্রভাবিত হবার পরিবর্তে তিনি ফরাসিদেরকে প্রভাবিত করে এসেছেন। এখানে তিনি পশ্চিমা সাংস্কৃতির এক আজব দৃশ্য অবলোকন করেছেন। এতদিন যা কিছু তিনি শুনে এসেছেন তা [72]

প্রত্যক্ষ করেছেন। প্যারিসে কোথাও যাওয়ার জন্য তিনি বাসে ওঠেন। নিজের সিটে বসেন। সে সময় স্থানীয় একজন বৃদ্ধা বাসে ওঠে এবং সিট খালি না থাকার কারণে দাঁড়িয়ে থাকে। পশ্চিমা সভ্যতায় বড়দেরকে শ্রদ্ধা সম্মান করা হয় না বললেই চলে। সেখানকার মানুষেরা এমন জিনিসের গুরুত্ব বোঝে যার দ্বারা জাগতিক স্বার্থ হাসিল হবে। এমন স্বার্থান্বেষী বাহ্যিক ও তাৎক্ষণিক স্বার্থে লালায়িত সংস্কৃতিকে যদি এক বাক্যে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা পাঠ করা যেতে পারে:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

অর্থ: "তারা জাগতিক জীবনের শুধু বাহ্যিক বিষয়টা জানে আখিরাতের ব্যাপারে তাদের অবস্থা হলো, তারা একেবারেই গাফিল উদাসীন।" [সূরা আর রুম ৩০:০৭]

এখন পশ্চিমারা মুরুব্বী ও প্রবীণ লোকদের সেবা যত্ন শ্রদ্ধা সম্মান করার মাঝে বাহ্যিকভাবে যেহেতু জাগতিক কোনো স্বার্থ দেখতে পায় না, এগুলোর দ্বারা যেহেতু অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পায় না এবং মান-মর্যাদাও বাড়ে না; তাদের ওখানে তো তাদের মূল্যবান সময় ও পুঁজি প্রকৃতপক্ষে অর্থ উপার্জন এবং স্ট্যাটাস বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করতে হয়, অতিরিক্ত সময় ও পুঁজি ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে খরচ করতে হয়, এখন এইসব কিছুর মধ্যে যদি পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন অথবা অন্য মানুষদের প্রতি সমবেদনা জানাবার কথা বলা হয়, তাহলে উন্নতি অগ্রগতির এই যাত্রায় সেটাকে তারা প্রতিবন্ধকতা মনে করে— যেখানে তাদের কোনো লাভ বা মুনাফা নেই। তবে যদি কখনও সৃষ্টির সেবা, মানব সেবা করে জাগতিক প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন করার সুযোগ আসে, তখন এই সংস্কৃতির গোলামরা বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন খুলে

বয়স্কদের সেবা যত্নের স্লোগান তুলে সড়কে নেমে আসে।

তার বিপরীতে দীন ইসলামের পবিত্র শিক্ষাসমূহে উন্নত চারিত্রিক প্রবণতাকে মুসলিম ব্যক্তির ঈমানের লক্ষণ বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়; যারা বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ না করবে, তাদের প্রতি তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে হাদীসে। ইসলামে মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত খোঁজার কথা বলা হয়েছে। দীন ইসলামে এমন ব্যক্তিকে দুর্ভাগা মনে করা হয়, যে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার কোনো একজনকে পেল কিন্তু তাদেরকে সন্তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে নিজের রবকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না।

যাইহোক ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আলোচনা চলছিল। প্যারিসে সফরকালে একজন ফরাসি বৃদ্ধা তার বরাবর এসে দাঁড়ান। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়ান। নিজের আসন ছেড়ে দেন এবং বৃদ্ধাকে ইশারায় বলেন তার সিটে বসার জন্য। মুসলিমদের সমাজে এটা তেমন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। কিন্তু ওই ঘটনায় যাত্রী সকলেই বড় বড় চোখ করে হতবাক হয়ে তাঁকে দেখতে থাকে যে, এই লোক করছেটা কি? একজন মহিলা তাও আবার বৃদ্ধা; তার বসার জন্য নিজের আসন ছেড়ে দিচ্ছে। এই কাজটা ওই বৃদ্ধার জন্য খুবই আশ্চর্যের ছিল। তিনিও আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁকে দেখতে থাকেন। অতঃপর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসনে বসে যান।

বাহ্যিকভাবে এই সাধারণ ঘটনার দ্বারা যতটা বিস্তারিতভাবে পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির সমালোচনা এবং মন্দ দিকগুলো আলোচনা করা হলো, এটা তাঁরই বর্ণনাভঙ্গি। ফ্রান্সের সফর থেকে ফিরে এসে এভাবেই তিনি বিভিন্ন ঘটনা আমাদেরকে শোনান এবং সেগুলোর আলোকে বিভিন্ন শিক্ষা নসীহত ও উপদেশ

[74]

বর্ণনা করেন। তিনি নিজের ভ্রমণ কাহিনীর আরও অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে একটা সময় পার হবার পর আমার স্মৃতি থেকে সেগুলো হারিয়ে যায়। তাই আমি আশাবাদী, অন্য কোনো ভাই হোক অথবা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পরিবারের সদস্যবৃন্দ হোক —তারা যেন বিস্তারিত প্যারিসের ঘটনাগুলো বর্ণনা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়: দীনী দাওয়াতে
মনোনিবেশ

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আসল পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হলো তিনি একজন দীনি দাঈ। শৈশবকালের শুরু থেকে যখনই তাকে দেখেছি তখনই নিজের উন্নত চরিত্র ও সুন্দর আচরণের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে চলাফেরায় দীনী দাওয়াত প্রদান করতে দেখেছি। দাওয়াতী কার্যক্রমের সূচনা ওই সময় হয়, যখন তিনি কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের কলোনিতে থাকতেন। ওই সময় সেখানকার যুবক ছেলেদেরকে সমবেত করে তিনি দীনি বিষয়ে শিক্ষাদান এবং ক্লাসের ধারাবাহিক আয়োজন করেন। অতঃপর ক্যাডেট কলেজে পড়াশোনার সময় কলেজের অভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি মিউজিক্যাল প্যারেড চলাকালে মসজিদে গিয়ে তাফসীর খুলে ধারাবাহিক কুরআনিক ক্লাসের আয়োজন করেন। তিনি টুইন সিটিতে সময়ে সময়ে যুবকদেরকে একত্রিত করে দীনি

[75]

দাওয়াতের কাজ করতেন। কলেজে থাকতেই ছুটির দিনগুলোতে কিছু আলেমের ক্লাসে গুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং ওই আলেমদের দ্বারা উপকৃত হন।

কুরআনের ধারাবাহিক ক্লাস

তিনি রাওয়ালপিন্ডি এবং ইসলামাবাদে কয়েকটি দাওয়াতী আয়োজন করেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে ওই আয়োজনে গিয়ে বিভিন্ন দীনি বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করতেন। যুবকরাই ছিল সাধারণত তার শ্রোতা ও অডিয়েন্স। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বয়ান জাদুময় ছিল। বয়ানের ধরন কখনোই জযবাতি বা আবেগপ্রবণ ছিল না। তিনি থেমে থেমে কথা বলতেন , খুবই স্পষ্ট করে স্থিরভাবে শ্রোতাদেরকে বিষয়বস্তু পুরোপুরি বুঝিয়ে দিতেন। ওই সময় তাঁর ক্লাসের বিষয়বস্তু হতো সাধারণত আখিরাতের প্রতি ঈমান এবং পারলৌকিক চিন্তা। এই উদ্দেশ্যে সাধারণত তিনি কুরআনে কারীমের শেষ দুই পারার সূরা সমূহের ওপর ক্লাস করাতেন। আখিরাত এবং মৃত্যুর সত্যতা নিয়ে আলোচনা করতেন। জান্নাতের নেয়ামত সমূহের আগ্রহ এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয় তৈরি করতেন ক্লাসগুলোতে। আমার আজও পর্যন্ত মনে আছে , যখন তিনি সূরাতুল ইনফিতার ক্লাস করাচ্ছিলেন , শুরুতে আসমান ফেটে যাওয়া , নক্ষত্রগুলো ঝরে পড়ার দৃশ্য ও বর্ণনা করছিলেন অতঃপর এই ভয়ানক কিয়ামতের দৃশ্য বর্ণনার পর বিশেষ পন্থায় সকলকে সম্বোধন করে এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করছিলেন :

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾

অর্থ : "হে মানুষ কোন জিনিস তোমাকে দয়ালু রবের ব্যাপারে প্রতারিত করলো ?" »

তিনি যুবকদের অন্তরে এই অনুভূতি সঞ্চার করতেন যে , আপনাদের স্কুল -কলেজের শিক্ষা , আপনাদের পরিবার -

পরিজন, সমাজ অথবা আপনাদের ক্যারিয়ার চিন্তা আপনাদেরকে রবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে? আমরা কি ভুলে বসেছি যে, আমাদেরকে ওই রব সৃষ্টি করেছেন এবং তার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে? অতঃপর এর আলোকে তিনি যুবকদেরকে তাদের জীবনের লক্ষ্যপানে আহ্বান জানাতেন। ছেলেদের মনে এই অনুপ্রেরণা বসিয়ে দিতেন যে, আমাদের জন্ম উদ্দেশ্যহীন নয়। বরং দীনের ওপর আমল করে আমাদের রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতি জোর দিতেন এবং নামাযের ব্যাপারে উদাসীনতার ভয়াবহতা তুলে ধরতেন। এক কথায় কুরআন ক্লাসের উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের মাঝে দীনের মুহব্বত, দীন অনুযায়ী আমল করার আগ্রহ, কুরআনে কারীম তিলাওয়াত এবং তদনুযায়ী আমলের জযবা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত জীবনী এবং সুন্নত সমূহ অনুসরণের কর্মস্পৃহা তৈরি করা এবং পূর্ণাঙ্গভাবে দীনের উপর আমল করার দাওয়াত। সাধারণত সপ্তাহে দুইবার এবং কখনও কখনও তিনবার কয়েক ঘন্টা যাবৎ বাস বা ওয়াগনে চড়ে তিনি কুরআন ক্লাসের জন্য পৌঁছে যেতেন।

দাওয়াতের উপর শরীয়াহ ইলম অর্জন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাব
প্রকৃতপক্ষে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দ্বারা সুবিন্যস্ত একটি দাওয়াতী কর্ম প্রয়াস ঐ সময় আরম্ভ হয়, যখন তিনি ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছার পর আরবী ভাষায় এবং শরীয়াহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেন। একইভাবে তিনি কুরআনের ক্লাস করাবার অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে কুরআন অনুধাবন

[77]

এবং শরীয়াহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকেন। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বয়ান বক্তৃতা এবং ক্লাসের আলোচনাগুলো অধিক পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী হতে থাকে। তার বয়ান বক্তৃতাগুলো অন্তর সমূহ প্রকম্পিত এবং আমলের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। এরপর ঐশী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আসমানি ইলমের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় তথা তাকওয়া ও খোদাভীতির ক্ষেত্রে তিনি অনেক অগ্রসর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে ব্যক্তি কয়েক মুহূর্ত কাটিয়েছে, সে নিজের দেখা অনুযায়ী তাঁর তাকওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে। এমনকি যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক অথবা সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতার কারণে তার থেকে দূরে থাকতেন, তারাও তার গাম্ভীর্য, তাকওয়া, মেধা এবং আদব শিষ্টাচার-পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেতেন। তাঁর আলোচনার ধরন হতো খুবই প্রমাণ নির্ভর এবং তা যুবকদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করতো। ইসলামাবাদের স্বাধীনচেতা যুবকদের কানেও যদি একবার তার আলোচনা পৌঁছে যেতো, তাহলে তারা দ্বিতীয়বার অবশ্যই আসতো। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে দাওয়াত ও শুদ্ধিমূলক কর্মপ্রয়াসের এমন জ্যোতি বের হতো, তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারীরা প্রভাবিত না হয়ে পারতো না। কুরআন শিক্ষা এবং সুন্নতের অনুসরণের আগ্রহ তার ক্লাসের প্রধানতম বিষয় ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তার ক্লাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি ক্লাসের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন এবং বয়ান বক্তৃতায় অধিকাংশ শরীয়াহ প্রমাণপঞ্জির মূল বর্ণনা মুখস্থ থাকতো।

বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং উম্মাহর অবস্থা যদিও শুরুতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ক্লাসে কুরআনে কারীম শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী আকীদা

[78]

বিশ্বাস, ঈমানের পরিপক্কতা, ইবাদত বন্দেগির গুরুত্ব ও যত্ন এবং তাযকিয়াতুন নফস তথা আত্মশুদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দিতেন কিন্তু ধীরে ধীরে তার ক্লাসগুলোতে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে। তিনি প্রতি সপ্তাহে এমন কোনো বিষয়বস্তুর প্রস্তুতি নিয়ে আসতেন, যা শ্রোতাদের জন্য মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এবং দীন ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র বুঝতে সহায়তা করবে। তার এই ক্লাসগুলো খুবই হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ হতো। কখনও কখনও একটি বিরস ধরনের বিষয়বস্তুর উপর দুই ঘণ্টার উপরে আলোচনা করতেন কিন্তু যুবকেরা পূর্ণ আগ্রহ সহকারে সে আলোচনা শুনতো। সমকালীন বহুল চর্চিত বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনার প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন পয়েন্ট নোট করে এনে বিশদভাবে আলোচনা করতেন। তিনি কেমন করে নিজের বন্ধু বান্ধব সহচর ও সাথি ভাইদের সচেতনতা ও দীক্ষার জন্য বিভিন্ন শিরোনাম বাছাই করে বিস্তারিত ক্লাস করাতেন, সে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কিছু উদাহরণ দেয়া করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে এগুলো কেবল উদাহরণ; নয়তো তাঁর ক্লাস প্রায় সাত থেকে আট বছর পর্যন্ত চালু ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তিনি বয়ান পেশ করেছেন। এ কথা মনে রাখতে হবে, শহরে শহরে ধারাবাহিক এই ক্লাস তার ১৬ বছর বয়স থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত সময়কালের:

০১. যখন খুব সম্ভব ২০০০ সালে তালেবানের শাসন ব্যবস্থা তিনি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান, তখন তালেবানের ইসলামী আন্দোলন এবং আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বারাকাহ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কয়েকটি ক্লাসে তিনি আলোচনা করেন। তিনি ইসলামাবাদের শহুরে ছেলেদেরকে তালেবানের সাফল্য

[79]

ও বিজয়ধারা সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁর ওই ক্লাসগুলোর বদৌলতে তার বন্ধুবান্ধবের অন্তরে ওই সময় থেকেই তালেবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা স্থান করে নিয়েছিল।

০২. একইভাবে কিয়ামত নিকটবর্তী হবার ফিতনা সামনে রেখে আধুনিক পশ্চিমা শাসন ব্যবস্থার ফিতনা; দাজ্জাল, ইহুদী গোষ্ঠী এবং ফ্রিম্যাসনরির ষড়যন্ত্র বোঝানোর জন্য তিনি বিস্তারিত দলীলনির্ভর আলোচনা করেন।

০৩. যখন তিনি শিক্ষা কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য ফ্রান্সে গমন করেন, সেখান থেকে ফেরার পরেও তার মূল্যায়ন, প্রতিক্রিয়া, সেখানকার কারগুজারি এবং পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

০৪. আফগানিস্তানে যখন আমেরিকা নৃশংস হামলা ও আগ্রাসন চালায়, এমন বেদনাদায়ক সময়ে তিনি কয়েকটি বৈঠকে হস্তী বাহিনীর ঘটনা সামনে রেখে তাদের পরিণাম, আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ, আবরাহার বাহিনীর সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শনকারী আরবদের পরিণাম ইত্যাদি আলোচনা করেন। তিনি উপর্যুক্ত ঘটনার আলোকে বর্তমান সময়ের আবরাহা আমেরিকা এবং তার স্থানীয় সাহায্যকারী দালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিণাম ভবিষ্যৎবাণী করেন এবং কুরআনের আয়াত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণ করেন যে, বিজয় ও সাফল্য শেষ পর্যন্ত ঈমানদারদেরই পদচুম্বন করবে।

সংশোধক ও সংস্কারক
দাওয়াতী আন্দোলনের একজন সফল সাধক শুধু দাওয়াত দেন না বরং যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তাদের [80]

আত্মিক সংশোধন ও পরিশুদ্ধির কথা চিন্তা করেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাজের ব্যাপারেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ঘোষণা করেছেন :

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ

অর্থ : « "এবং তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। " »

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের প্রকৃত ওয়ারিস ও উত্তরসূরিদের দাওয়াত ও তাবলীগের পন্থাও এমনটাই হবে।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটানোটাই আত্মসংশোধন ও পরিশুদ্ধির নিয়ামক বলে প্রমাণিত হত। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং তার ক্লাসে যাতায়াতের দ্বারা যুবকদের মাঝে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দিতো। তারা নামাযের প্রতি যত্নবান হয়ে উঠতো। জামাতের সাথে তাকবীরে উলা পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টাশীল হতো। হঠাৎ পরিবর্তনে তাদের দেহে সুন্নতের সজ্জা চলে আসতো। তাদের মুখে শোভা পেতো দাড়ি। তারা অন্যায় -অনাচার থেকে বাঁচার চিন্তায় নিমগ্ন থাকতো। স্কুল -কলেজের ছেলেদের লাগামহীন ভাষা ব্যবহার একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এটাকে আজকাল মিডিয়া সেলফ কনফিডেন্স বলে প্রচার করে থাকে। এর ফলে অনর্থক অশ্লীল কথা -বার্তা ঠাট্টা -বিদ্রূপ উপহাস টিভি ফিল্মের ডায়ালগ বলা বেয়াদবি -আচরণ ছোটোকাল থেকেই তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে আসার পর এমন ছেলেরাও পুরোপুরি পাল্টে যেতে আরম্ভ করে। গালিগালাজ অশ্লীল কথাবার্তা দূরের কথা ; তারা অনর্থক আলাপ -আলোচনা থেকেও বেঁচে থাকতে আরম্ভ করে। "মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি কথা নোট হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন সেগুলোর হিসাব হবে "—এই অনুভূতি তাঁর বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণকারী

প্রত্যেকের মাঝে স্থান পেতো। তিনি শুধু বিরস দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন না। কখনোই এমনটি নয়। তিনি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন, ছুটির দিনগুলোতে সবাই মিলে খোশগল্প এবং আনন্দ করতেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তার বৈঠকগুলোতে গাম্ভীর্য ও পরিমিতিবোধ একটি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

কুরআন তিলাওয়াতে অধ্যবসায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে আসার পর সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ইতিবাচক প্রভাব যেটা দেখা দিতো, তা হলো: কুরআন তিলাওয়াতে অধ্যবসায়। স্বয়ং তার দিন রাতের একটা বড় সময় কুরআন তিলাওয়াতে কেটে যেত। তার বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝেও এর প্রভাব পড়তো। বাসে যানবাহনে সফরের সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতেন।

তিনি একাডেমিকভাবে হাফেজে কুরআন ছিলেন না। কিন্তু কুরআনে কারীম হিফজ করার সীমাহীন আগ্রহ তার ছিল। যে সময়টাতে তার জীবন খুবই ব্যস্ত ছিল তখন থেকেই তিনি কুরআনে কারীম নিজ উদ্যোগে হিফজ করতে আরম্ভ করেন। অধিক মাত্রায় তিলাওয়াতের কারণে কুরআনের অনেক জায়গা থেকেই তার মুখস্থ ছিল। সফরে ভ্রমণে যখনই সময় পেতেন তিনি হিফজের প্রতি মনোযোগী হতেন। তিনি হাফেজ হবার প্রচেষ্টার কথা সকলের কাছে প্রকাশ করতেন না; কিন্তু কাছের বন্ধুদের কাছ থেকে বিষয়টা গোপন করা কঠিন ছিল। কারণ তাদের মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে অবশ্যই কুরআন শোনাতে হতো। এভাবে প্রায় ১০ পারা তিনি হিফজ করে নেন। এরপর হিজরত ও জিহাদ এবং ব্যবস্থাপনা দায়িত্বের ব্যস্ততার ভিতরে তিনি

[82]

হিফজ সম্পন্ন করতে পারেননি। কিন্তু যেটুকু হিফজ করেছিলেন , সেটা ভালোভাবে আত্মস্থ রেখেছেন।

যদিও তিনি কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্নতা এবং কুরআনের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সর্বদাই অনন্য ছিলেন কিন্তু তবুও তিনি এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তিত থাকতেন যে, জিহাদী সফর এবং দায়িত্বের ব্যস্ততার মধ্যে কুরআন পাকের সঙ্গে তিনি ঠিকভাবে সম্পর্ক রাখতে পারছেন না —যেমনটা যুবক বয়সে পেরেছিলেন। অতঃপর শাহাদাতের প্রাক্কালে যখন তিনি শত্রুর কাছে অবরুদ্ধ হয়ে সকল সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করছিলেন , সে সময় কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতে তিনি মনোযোগ দিতে পারার কারণে সীমাহীন আনন্দিত ছিলেন —যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তিনি নিজের এই আনন্দকে প্রিয় সঙ্গী ব্রাদার দাউদ গৌরী হাফিযাহুল্লাহর নামে প্রেরিত সর্বশেষ চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তার শেষ চিঠিটি ছিল একটি অসিয়ত নামা। তার কথাগুলো এমন ছিল :

“কুরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থ যা আমাকে সম্বোধন করছে।

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ [10]

وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ [11]

— এই দুই আয়াতের মর্মবাণী অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। কয়েক বছর পূর্বেও কুরআনের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক হয়েছিল —বিশেষ করে ফার্স্ট ইয়ারের পর। কিন্তু জিহাদী দায় -দায়িত্বের মাঝে এ সম্পর্কে আরও রঙ এসেছে ; এটি আরও সুশোভিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পুনরায় তার গ্রন্থের

---

[10] অর্থ : আমি তোমাদের কাছে এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে ” [সূরা আল আম্বিয়া , আয়াত নং: ১০]

[11] তাকে (আল্লাহকে) ছাড়া তুমি কারো আশ্রয় পাবে না , [সূরা কাহাফ , আয়াত: নং ২৭]

সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং প্রতি পদক্ষেপে "এই গ্রন্থে তোমাদের আলোচনা রয়েছে" এই বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। দৈনিক তিনি এই গুণ অনুভব করিয়েছেন, যা সম্পর্কে নিজেই এরশাদ করেছেন:

رَّسُـولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَـاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَـاتٍ لِّيُخْـرِجَ الَّذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّـورِ[12]

আল্লাহ তাআলা এই কয়েক দিনে বহু আয়াতের নিগূঢ় তত্ত্বের কিছুটা উপলব্ধি করিয়েছেন। কুরআনের সঙ্গে এই জীবন্ত সম্পর্ক আর কখনও যেন হারিয়ে না যায় এবং মুজাহিদীন সহ গোটা উম্মাহকে এই কিতাবের কামাহাক্কুহু (যথার্থ হক আদায় করে) তিলাওয়াতের তাওফীক যেন আল্লাহ তাআলা দান করেন, সেই কামনা করি।"

আমলের খোঁজখবর নেয়া

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সংশোধন পন্থা ও দীক্ষা দানের একটি পন্থা হলো: তিনি সঙ্গীদের কাছ থেকে মুহব্বত স্নেহ সহকারে তাদের কাজের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি সঙ্গীদের নামাযের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তিলাওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, প্রত্যেক সাথিকে তার আমলের কারণে সান্ত্বনা দান করতেন। একইভাবে যদি কোনো সাথির ভুল ত্রুটি অথবা গুনাহের কথা জানতে পারতেন, তাকে আলাদাভাবে মুহব্বত সহকারে বোঝাতেন, তার সম্মানের কথা লক্ষ্য রাখতেন, তার ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করতেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে তাকে সংশোধন করতেন। তিনি শুধু বড় বড় নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সংশোধনের চিন্তা করতেন না, বরং সাথি ভাইদের আদব-আখলাক চাল-

---

[12] ওই রাসুল যিনি তোমাদের সামনে আল্লাহর আলো দানকারী আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনান ঈমানদার ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য [সুরা তালাক আয়াত নং ১১]

চলন —এক কথায় সমস্ত বিষয় অভিভাবকের মতো সংশোধন করে দিতেন। ওই সময়টাতে আমি কত যুবককে দেখেছি তাঁর নামে পাগল! তারা তাঁকে সবকিছু উজাড় করে ভালোবাসতো। তাকে নিজেদের শায়খ ও মুরুব্বি মনে করতো এবং তার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করাতো।

সৃষ্টির সেবার আগ্রহ
বিভিন্ন দাওয়াতী ও শুদ্ধিমূলক কর্মপ্রয়াসের পাশাপাশি যখন কোথাও কোন দুর্বল কিংবা অসহায় ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হতো সেখানে তিনি সাহায্যের জন্য পৌঁছে যেতেন। তিনি সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য অন্যান্য কার্যক্রম স্থগিত করে দিতেন। সর্বোপরি তিনি দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্যের জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন এবং নিজের সকল যোগ্যতা এই কাজের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন।

খুব সম্ভব ১৯৯৯ সালের কথা; কিছুটা আগে পরে হতে পারে। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রসিদ্ধ লাই নালায় অত্যধিক বৃষ্টি বর্ষণের কারণে পানি উপচে পড়ে এবং বন্যায় রাওয়ালপিন্ডির কয়েকটি বসতি ডুবে যায়। কিছু লোক ওই বন্যায় নিহত হয় এবং হাজার হাজার মানুষ বাস্তুহারা হয়। তিনি এ সময় বন্ধু- বান্ধবদেরকে নিয়ে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য যান। খাদ্য পানীয় থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে সেখানে বিতরণের চেষ্টা করেন। সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে লোকদের প্রয়োজনের তথ্য নেন এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে ত্রাণ প্রস্তুত করেন। বন্যা এতটা ধ্বংসাত্মক ছিল যে, সেখানে মহামারী দেখা দেয়। পানিতে রোগের প্রভাব দেখা দেয়। লাই নালার আশপাশের কিছু বস্তিতে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে ওই পানিই পান করতে হয়। পানি খাওয়ার পর তাঁর পেটে কঠিন ইনফেকশন হয় এবং তিনি [85]

অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর অনেক চিকিৎসা করানো হয় কিন্তু শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত ওই ইনফেকশনের প্রভাব আর দূর হয়নি। শেষ সময় পর্যন্ত তিনি পেটের বিভিন্ন অসুখে ভোগেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আমীন।

সহায়তা কার্যক্রমের সময় যেখানেই সুযোগ পেতেন তিনি দীনী দাওয়াতের কাজ করতেন। লোকদেরকে নামাযের প্রতি যত্নবান হবার এবং অনৈতিক কাজ পরিহারের নসীহত করতেন। তার নসীহত ও উপদেশের মাঝে স্নেহ নম্রতা প্রবল হতো।

ওই দিনগুলোতেই একবার তার এক বন্ধু তাকে বলেন, আপনি সহায়তা কার্যক্রমের ছবি তুলে রিপোর্ট বানিয়ে সেগুলো ছাপছেন না কেন? এরপর এখানে বন্যা কবলিত বস্তিতে অথবা মিডিয়াতে সেগুলো প্রচারের জন্য দিন। এটা আপনার দাওয়াতী কার্যক্রমে ভূমিকা রাখবে। কিন্তু তিনি বন্ধুর ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তার কথা ছিল, এভাবে আত্মপ্রদর্শনের পন্থায় দাওয়াত দেয়ার দ্বারা ফায়দার পরিবর্তে ক্ষতি হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের নিষ্ঠা দেখেন। যদি নিষ্ঠা থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজেই আমাদের কাজে বরকত দান করবেন।

এমন পুষ্প বাগিচা, যার সুবাস সর্বদা সবার জন্য

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে যখন থেকে আমি দেখেছি, তখন থেকে নিয়ে তার শাহাদাতের আগ পর্যন্ত আমি তার বন্ধুদের তালিকায় সর্বদা ছিলাম। এটা আমার জন্য অনেক বড় গর্বের বিষয়। কিন্তু এ কথাও সত্য, এই পুরো সময়ে তার অফিসিয়াল সাথিদের মধ্যে অফিসিয়ালি আমি সবচেয়ে বেশি বাহিরে এবং তার থেকে দূরে ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনই ব্যক্তিগত আত্মসংশোধনের বিষয় এসেছে, তখন তিনি

[86]

আমার চেয়েও বেশি আমার কল্যাণকামী হয়ে আমার উদাসীনতা দূর করেছেন। যাই হোক, এতক্ষণ কথা হচ্ছিলো শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জিহাদ ও হিজরত-পূর্ব সময়কার। তিনি সর্ব বিষয়ে বন্ধু- বান্ধবের দীক্ষা সংশোধন এবং দীনী কল্যাণের চিন্তা করতেন। আমার মনে পড়ে, ইন্টার শেষ করার পর ফয়সালাবাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটরিনারি মেডিসিন

13 বা পশু চিকিৎসা বিভাগে আমার ভর্তি হতে
হয়। পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ ঘর থেকে বের হই এবং বের হওয়া মাত্রই তাঁর সঙ্গে মিলিত হই। ভালো কথা। কিছুদিন পর যখন ছুটিতে ঘরে ফিরি তখন তিনি কপট রাগ দেখিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর খুব গাম্ভীর্য সহকারে আমাকে নিয়ে বসে পড়েন এবং বলতে থাকেন, “ভাই আল্লাহ আপনাকে পশু চিকিৎসার পেছনে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার চেয়ে অনেক বড় উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে বোঝাতে থাকেন, দীনী উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন-যাপন করা এবং দীনী বিষয় শিখতে চেষ্টা করা উচিত। এটা ওই সময়কার কথা, যখন তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর পড়াশোনা করেছিলেন আর এ কারণেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তাই তিনি বলেন, “আমি এ কথা বলছি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলমী মান অনেক ভালো; কিন্তু তবুও পশু দেখাশোনার কাজের চেয়ে কয়েকগুণ ভালো তাতে সন্দেহ নেই। তাই আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কিছু দীনি ইলম ও শাস্ত্র শিখে নিন — যা কাল কিয়ামতের দিন আপনার কাজে আসবে।” এরপর তাঁর এবং আরও কিছু ভাইয়ের পীড়াপীড়ির কারণে আমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিই এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হই। আল্লাহ তাআলা এই সিদ্ধান্তের মাঝে কল্যাণ দান করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের

13 Veterinary medicine
[87]

আসাটাই পরবর্তীতে আমার এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জন্য জিহাদের সঙ্গে যুক্ত হবার বাহ্যিক কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়। হে রব! সকল প্রশংসা একমাত্র আপনার জন্য।

যাই হোক কথা হচ্ছে ফারুক রহিমাহুল্লাহ বন্ধু- বান্ধব এবং সাথিদের সঙ্গে নিষ্ঠাপূর্ণ নিখাদ সম্পর্ক রাখতেন। তার সঙ্গে কারও সম্পর্ক থাকলে ঐ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাকতো, তার ঈমান ও আখিরাতের ব্যাপারে তিনি খেয়াল রাখবেন এবং নসীহত করবেন। এখানে আবারও বলতে চাই, যে সময়ে তিনি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে খুবই উদ্বুদ্ধ করেন, তখন আমি তার সাথি সঙ্গীদের থেকে আলাদা ছিলাম; এমনকি আমার নির্বুদ্ধিতার কারণে তার কিছু দাওয়াতী কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমার মতপার্থক্য পর্যন্ত ছিল; কিন্তু তা তাঁর ভালোবাসা নিষ্ঠা ও বন্ধুত্বে কোনো প্রভাব ফেলেনি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উলামায়ে কেরামের মসনদে..
জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামাবাদে আমাদের সময়ে একটা রীতি চালু ছিল। সপ্তাহে একবার সন্ধ্যার সময় হোস্টেলের সবুজ প্রাঙ্গনে (যা ওই সময় জামে মসজিদের ভূমিকা পালন করতো) আসর নামাযের পর কুরআনের ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। কুরআনের ওই ক্লাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই ক্লাসের আয়োজন করতো এবং প্রতি সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় আলেম অধ্যাপকদের মধ্য থেকে কোনো একজন আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের উপর [88]

আলোচনা করতেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব অনারব এমন উলামায়ে কেরামকে বাছাই করা হতো, আত্মশুদ্ধির অঙ্গনে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা দেখে এবং তার শিক্ষকদের সুপারিশের ভিত্তিতে একবার কুরআন ক্লাসের জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁকে নির্বাচন করা হয়। অথচ তখন পর্যন্ত তিনি তালিবুল ইলম তথা শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে এটা আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, আলেমদের আসনে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে বসানো হয়েছে। আমি তখন কোনো ব্যস্ততার কারণে উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে না জানার কারণে তার প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন কিছু ছাত্রের মুখে ওই ক্লাসের ব্যাপারে প্রশংসা শুনেছি।

এতক্ষণ পর্যন্ত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রথম জীবনের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হলো। সামনে থেকে শুরু হবে জিহাদের দাওয়াত লাভ এবং এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময়কালের আলোচনা। তিনি দীনি দাওয়াত এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ উভয় অঙ্গনের অশ্বারোহী ছিলেন। তার জীবনের দ্বিতীয় মারহালা সম্পর্কে সামনের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ অধ্যায়: জিহাদের খোঁজে
সফর

[89]

বন্ধুদের মজলিসে রেশমি কাপড়ের মতো নরম *** হক-বাতিলের রণাঙ্গনে ঈমানদার হলো লোহার মতো শক্ত

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ পূর্ণাঙ্গ দীনের ওপর চলার কথা বলতেন। কুরআন হাদীস আমাদেরকে কোন্ বিষয়ের আহ্বান জানায়, এটাই ছিল তার আসল বিষয়বস্তু। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার মতো আমলগুলোতে প্রতিযোগিতা করা ছিল তার পরিচয়। কুরআন হাদীস থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা নেয়া ছিল তার কর্মপন্থা। এমন ভাগ্যবান ব্যক্তি দীন ইসলামের সবচেয়ে মহান অধ্যায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকে দূরে থাকা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? তিনি এমন ময়দানে কেন নিজের দেহে ধুলো মাখবেন না, যে পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছেন? তিনি কেমন করে ওই সমস্ত ফ্রন্ট থেকে দূরে থাকবেন, যেখানে এক মুহূর্তে অবস্থান করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম? সুন্নতের আশেক যে ব্যক্তি- চলাফেরা এবং পোশাক পরিচ্ছদেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি ব্যাকুল, সে ব্যক্তি তরবারি ওয়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিহাদ ও কিতালের সুন্নত কেমন করে পরিত্যাগ করতে পারেন? ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জানতেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এতটাই গভীর সম্পর্ক ছিল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সঙ্গে, যার কারণে ফুকাহায়ে কেরাম “সিয়ার” শব্দটিকে জিহাদ ও কিতালের জন্য বিশেষায়িত করেছেন। অথচ সিয়ার বা সীরাত শব্দটি আরবী ভাষায় মূলত জীবনী বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেহেতু জিহাদ ও কিতাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় [90]

জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অঙ্গ— অথবা এমনটা বলা যেতে পারে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সবিস্তার অঙ্গ— এজন্য শারঈ আইনশাস্ত্রে সীরাত অথবা সিয়ার শব্দকে জিহাদের মাসায়েল বর্ণনার জন্য বিশেষায়িত করে দেয়া হয়েছে।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব দেখে মনে হতো, তার দীক্ষা এবং ঈমানী অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা এমন স্তরে উন্নীত করতে চাচ্ছিলেন, যার পর তিনি যে কোনো জায়গা থেকে জিহাদের দাওয়াত পাওয়া মাত্রই এতদিনের দাওয়াতী কাজ স্থগিত করে জিহাদী কাজ আরম্ভ করে দেবেন। তিনি ইবাদতের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব শোনাতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে অগ্রসর ছিলেন। এখন তিনি যখন জিহাদের বিরাট ও সীমাহীন ফযীলতগুলো পড়েন; খোদ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমলের চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ কোনো পথ পাননি, তা থেকে দূরে থাকা তাঁর পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

অতঃপর উম্মাহর মায়া-মমতায় নিমজ্জিত সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী এবং মুসলিম উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশা, ইহুদী কাফের ও হিন্দু মুশরিকদের প্রতারণা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির জন্য উম্মাহর প্রতিষ্ঠার কোন পথ পেয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে পথে সবকিছু উজাড় করে না দিয়ে স্থির থাকা কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

শৈশব কাল থেকেই জিহাদ ও শাহাদাতের আগ্রহ

[91]

তাঁর পরিবার ও শৈশবকালের আলোচনায় আমরা বলেছি, জীবনের প্রথম বছরগুলোতে জিহাদ ও শাহাদাতের আগ্রহ তার মাঝে বিদ্যমান ছিল। রুশ বিরোধী জিহাদ চলাকালে মুজাহিদীনের সঙ্গে সম্পর্কের কিছু স্মৃতি তাঁর মাঝে জিহাদের আগ্রহ সর্বদাই জাগ্রত রাখতো। তার স্মরণ ছিল, যখন তিনি একেবারেই ছোট ছিলেন, তার সম্মানিত পিতার সঙ্গে মুজাহিদীনের কয়েকজন বড় নেতার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ধীরে ধীরে যখন তিনি পরিণত বয়সে পৌঁছুতে থাকেন, কুরআনের সঙ্গে যখন তার সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন জিহাদ ও শাহাদাতের আগ্রহও তার মাঝে বৃদ্ধি পায়। যখন কাশ্মীর জিহাদের গর্জনে পাকিস্তানের দেয়ালগুলো প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, তখন কিশোর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কাশ্মীর জিহাদের ঘটনাবলী ও কবিতা শুনে শুনে জিহাদের আগ্রহ মনের মধ্যে লালন করতে থাকেন।

দরসগুলোতে জিহাদ ও শাহাদাতের আলোচনায় আবেগ আপ্লুত হয়ে ওঠা
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রথম দিকের ক্লাসগুলো আসলে আত্মশুদ্ধিমূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপর হতো। মৌলিকভাবে তার আলোচনা অরাজনৈতিক ছিল এবং তাতে আবেগ জযবার পরিবর্তে গাম্ভীর্য ও সরলতা অধিক পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন কুরআন তালিমের মাঝে জিহাদের আলোচনা আসতো এবং শাহাদাতের ব্যাপারে কথা হতো, তখন তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠতেন। তিনি নিজের জন্য এবং সাথি- সঙ্গীদের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণের দোয়া চাইতেন, শাহাদাতের তামান্না করতেন, তার আওয়াজ ভারী হয়ে উঠতো এবং চোখ ভিজে যেত। তিনি বারবার এই কথা বলতেন যে, জিহাদ ফরয হবার পর আমাদের সবকিছু ছেড়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর

[92]

ক্লাসগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি এমন প্রজন্ম তৈরি করে যাচ্ছিলেন, যারা আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য প্রতিনিয়তই প্রস্তুত থাকবে। এরপর যেই মাত্র তিনি জিহাদ ফরয হওয়ার কথা জানতে পারেন এবং এপথ তার সামনে খুলে যায় তৎক্ষণাৎ তিনি সে পথে অগ্রসর হন।

তালেবানের আফগানিস্তানে সফর ১৯৯৯ সালে আফগানিস্তানে দুর্ভিক্ষের অবস্থা তৈরি হয়। আমেরিকা এবং জাতিসংঘ অন্যায় অবরোধ আরোপ করে আফগানিস্তানের জন্য বাণিজ্যের সকল পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে শস্যের অভাব দেখা যায় এবং খাদ্য সামগ্রীর মূল্য অনেক বেড়ে যায়। অপরদিকে আফগানিস্তানে অনাবৃষ্টির কারণে স্থানীয় ফসলের অভাব দেখা দেয়। সবকিছু মিলিয়ে আফগানিস্তানে দুর্ভিক্ষ আসে। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী সেখানকার সাধারণ মানুষের জন্য জীবন ধারণ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। অপরদিকে পশ্চিমা সমর্থনপ্রাপ্ত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে পুরোদমে যুদ্ধ চলার কারণে তালেবানের পক্ষে জনসাধারণের প্রতি মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ প্রাণ খুলে আফগান ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তারা আফগান ভাইদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ করেন। রেশন তাঁবু কাপড় সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সরবরাহে তারা ভ্রাতৃত্বের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মুসলিমদের প্রয়োজনের এই সংবেদনশীল সময়ে তিনি নিজের সকল ব্যস্ততা ছেড়ে আফগান ভাইদের সাহায্য-সহযোগিতায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। ঘরে বাজারে মহল্লায় গিয়ে গিয়ে রেশন, আর্থিক সহযোগিতা, [93]

কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকেন। এই কর্ম প্রয়াসে আমারও তার পাশে থাকার সৌভাগ্য ঘটে। আমরা দুজন বের হতাম এবং যেখানে কোনো হৃদয়বান লোকের সন্ধান পেতাম, সেখানে গিয়ে আফগান মুসলিমদের অবস্থা উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্যের আবেদন করতাম। এ সময় অপরকে প্রাধান্য দান ও আত্ম-উৎসর্গের এমন দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, যা হতবাক করে দেয়। পুরুষেরা নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স খালি করে দেয় এবং মা-বোনেরা তাদের গলার হার ও বালা খুলে দিয়ে দেয়। প্যাকিং করার জন্য যখন আমরা দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বসতাম, তখন কখনও কখনও এমন কিছু জিনিস চোখে পড়তো, যা আমাদেরকে বিস্মিত করে দিতো। নব দুলহানের মূল্যবান বিয়ের পোশাক দ্রব্য সামগ্রী বের হয়ে আসতো। সেগুলো দেখে আমাদের মুখ হা হয়ে যেত। আমরা বলতাম, এই নাজুক সময়ে আফগানরা এগুলো দিয়ে কি করবে? কিন্তু প্রেরণকারীদের পক্ষ থেকে জবাব আসতো, ভাই নিজেদের ঘরের সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রিয় জিনিস যেহেতু আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতে হবে, তাই এখন আমাদের ঘরে এগুলোই সবচেয়ে মূল্যবান; তাছাড়া আমাদের আফগান বোনদেরও তো বিয়ে-শাদী হবে, সে কারণে এগুলো রেখে দিন।

যাইহোক বেশ কয়েকদিনের কর্মপ্রচেষ্টার পর অনেক দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত হয়। অনেকগুলো ট্রাকে সেগুলো বোঝাই করা হয়। প্রথম গাড়িতে আফগান পথপ্রদর্শক চড়ে বসেন। তার পিছনে কাফেলা চলতে আরম্ভ করে। রাহবার সাহেবের গাড়িতে একটি সিট খালি দেখে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সঙ্গে যাবার আবেদন করেন। যাওয়ার জন্য আমরা দুজনেই আগ্রহী ছিলাম কিন্তু আমার বয়স কম হওয়ার কারণে তিনি যান। (আমার বয়স সে সময় ১৪ বছর এবং ফারুক রহিমাহুল্লাহ এর বয়স ১৭ বছর ছিল) এভাবেই তিনি গাড়িতে বসে যাত্রা আরম্ভ করেন আর আমি চোখে অশ্রু

[94]

নিয়ে ঘরে ফিরে আসি। তিনি প্রায় এক সপ্তাহের জন্য আফগানিস্তানে অবস্থান করেন। যতদূর আমার মনে পড়ে, জালালাবাদ এবং কাবুলে তিনি এই সময়টা অতিবাহিত করেন। এখানে তার আব্বাজানের সাথি ভাই তালেবানের উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি সাক্ষাতের সুযোগ পান— যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন প্রধান মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখুন্দ

14

রহিমাহুল্লাহ। তালেবানের অনুমতিক্রমে ও দিকনির্দেশনায় আফগানিস্তানের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলগুলোতে গিয়ে তিনি দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করেন। তালেবানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং এই সফর তাঁকে সীমাহীন প্রভাবিত করে। তাঁর ছিল অনুসন্ধানী মন এবং সত্য উদ্ঘাটনের কৌতূহল। তাই তিনি ইমারতে ইসলামিয়ার দায়িত্বশীলদের সঙ্গে তালেবানের শাসন ব্যবস্থা এবং আফগানিস্তানের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নেন।

সফর থেকে ফিরে আসার পর তিনি বন্ধু-বান্ধবদেরকে জড়ো করে তার আফগানিস্তানের সফর-কাহিনী বর্ণনা করেন। কয়েকটি বৈঠকে তিনি পুরো বিষয়টি আলোচনা করেন। এই বৈঠকগুলোতে তিনি আফগানিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি, তালেবান আন্দোলন পরিচিতি, তাদের সাফল্য এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহের দাওয়াতের উপর জোর দেন।

যদিও ওই সময় তালেবান মুজাহিদীন আফগানিস্তানের ৯০% এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিল, এমনকি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করে নিজেদের দেশে শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল কিন্তু

14 মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখন্দ প্রথম টার্মে তালেবান সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তানি সিকিউরিটি এজেন্সি তাকে গ্রেফতার করে। ২০১০ সালে তিনি আটক অবস্থায় শহীদ হন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!! পাকিস্তানবাসীকে তাঁর প্রতিশোধ নেওয়ার তৌফিক দান করুন আমীন!!

[95]

আন্তর্জাতিক মহলে মুসলিম বিশ্বের একটা বড় অংশ আফগানিস্তানে তালেবান আন্দোলনকে অভ্যন্তরীণ জাতীয়তাবাদী লড়াইয়ের একটি দল মনে করতো। তাই দেখা যেত তালেবানের সরলতা ও তাকওয়া দ্বারা প্রভাবিত অনেক হযরত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে তাদের ভয়াবহ যুদ্ধের ঘটনা শুনে তালেবানের পক্ষে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকতো। ‘যরবে মুমিন’ মিডিয়ার মাধ্যমে তালেবানের বিজয় ধারা এবং ইতিবাচক সংবাদ আসতো, কিন্তু বিপরীত দিকের ভারী আওয়াজে তা শুনতে পাওয়া যেত না। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর ক্লাস আমাদেরকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তার ওই আলোচনায় যে সমস্ত চিত্তাকর্ষক তথ্য পেশ করেন, তন্মধ্যে বাছাইকৃত কিছু পয়েন্ট নিম্নরূপ:

০১- আফগানিস্তানে তালেবানের পূর্ণাঙ্গ সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত। আফগানিস্তান বিবদমান যুদ্ধরত একাধিক গ্রুপের মাঝে বন্টিত কখনোই নয়; বরং পঞ্চশীর উপত্যকার ছোটো এলাকা এবং তাজিকিস্তান সংলগ্ন উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের কিছু এলাকা ছাড়া গোটা আফগানিস্তানে তালেবানের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

০২- তালেবান আফগানিস্তানে ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। তারা দৈনন্দিন ছোটো ছোটো কাজ-কর্ম থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ের সমাধান শরীয়তের আলোকে গ্রহণ করে থাকে। তালেবানের এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়তের মাপকাঠি রয়েছে। এটাই তাদের আইন এবং এই আইন অনুসারেই তারা বিচার-ফয়সালা করে থাকে। তারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে বারণ করে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ওই সফরে একজন সাথি ছিলেন যিনি পেশার দিক থেকে চিত্রশিল্পী (ফটোগ্রাফার)। আল্লাহর কুদরত এবং বিভিন্ন পবিত্র [96]

জায়গার চিত্তাকর্ষক ছবি তৈরি করা তার কাজ ছিল। তার কাবুলে গমনের একটা উদ্দেশ্য ছিল তালেবান আমলের কাবুল এবং যুদ্ধ পরবর্তী কাবুলের কিছু চিত্র তৈরি করা। কিন্তু যখন কাবুলে পৌঁছে তিনি ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলতে আরম্ভ করেন তখন তালেবানের আমর বিল মারূফ তথা সৎ কাজের আদেশ বিভাগের দায়িত্বশীলগণ তাকে বারণ করেন। অতঃপর তাকে নম্রতা সহকারে সরলভাবে বোঝান, আপনি কি চান আল্লাহ আপনাকে দোযখে নিক্ষেপ করুন? আপনার কি জানা নেই আল্লাহ ছবি তৈরি কারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন?” তালেবান দায়িত্বশীলের উপদেশে কাজ হয়। ঐ ভাই উক্ত পেশা থেকে তওবা করেন।

তিনি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট করেন, তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত উক্ত উত্তরাঞ্চলীয় জোট নামে যে গ্রুপটা রয়েছে, আফগানিস্তানের দশ শতাংশের চেয়েও কম এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে। এই গ্রুপকে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে আমেরিকা ও ফ্রান্স পুরোপুরিভাবে আর্থিক, সামরিক ও ইন্টেলিজেন্স সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রুপের মধ্যে সাবেক রুশ বিরোধী জিহাদের কতক মুজাহিদ রয়েছেন, কিন্তু তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার জন্য একদিকে হাজার হাজার মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করেছে, অপরদিকে যেখানেই তারা ক্ষমতা পেয়েছে, সেখানে শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সন্তোষজনক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ কারণে এমন জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কোনোরূপ গৃহযুদ্ধ নয়; বরং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

গোটা বিশ্বে প্রসিদ্ধ তালেবান এবং তাদের নেতৃবৃন্দের সরলতা ও অকপটতা দ্বারা তিনি সীমাহীন প্রভাবান্বিত হন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সরলতা লিল্লাহিয়াত, নিষ্ঠা, মহব্বত তাকে তালেবানের [97]

গুণগ্রাহী বানিয়ে দেয়। মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয় নাম শুনলেই আমাদের পাকিস্তানিদের মানসপটে ভেসে ওঠে বিরাট আলিশান দালান, এরপর প্রটোকলের সারি সারি গাড়ি এবং সিকিউরিটি ফোর্সের সরো সরো হাঁকডাক, আর এই সব কিছুর মধ্যে দাম্ভিক অহঙ্কারী কিছু চেহারা। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তানে যা দেখেছেন সেটা তো সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ঘটনাবলীর মাঝেই কেবল পাওয়া যায়।

একইভাবে তালেবানের ব্যাপারে একটা প্রোপাগান্ডা ছিল, তারা নারীদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করে। তিনি এই প্রোপাগান্ডার জবাবে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এতে আফগান সমাজে পারিবারিক ও সাংসারিক সুসংহত জীবন গঠনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের সামনে চলে আসে। এ বিষয়গুলো তিনি ওই সময় প্রত্যক্ষ করেন যখন তিনি সহায়তা সামগ্রী বন্টনের জন্য আফগানিস্তানের বিভিন্ন মহল্লায় যান।

তিনি ধ্বংস ও আঘাতপ্রাপ্ত কাবুল নগরী প্রত্যক্ষ করেন, যেখানে দেয়ালগুলো গুলির আঘাতে ছড়ে গিয়েছিল এবং জায়গায় জায়গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষ নজরে পড়ছিল। কিন্তু এই ধ্বংসের পর ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শরীয়তের বরকতে কাবুলে শান্তি নিরাপত্তা বিরাজ করে এবং প্রত্যেকের প্রাণ সম্পদ এবং অন্যান্য বিষয় সুরক্ষিত থাকে। এসব দেখে তিনি এই শিক্ষা অর্জন করেন যে, আল্লাহ তাআলার দীন প্রতিষ্ঠার পথ সহজ নয়। এটি ফুল বিছানো পথ নয়। এই পথে কখনো সবুজ শ্যামল শহরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে; কিন্তু মানুষ যদি ধৈর্য ও অবিচলতা সহকারে নিজ দায়িত্ব পালন করে, জুলুম অত্যাচার

[98]

থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে ওই ধ্বংসাবশেষের নিচ থেকে বিজয়ের দালান উত্থিত হবে এবং আল্লাহর সাহায্যের বহু পথ বের হয়ে আসবে। সত্য অবশ্যই বিজয়ী হবে কিন্তু এই বিজয়ের পথে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পরীক্ষা সহ্য করতে হবে।

এক কথায় তাঁর ওই আলোচনা আফগানিস্তান সম্পর্কে স্বয়ং তার ওপর এবং তার সাথি-সঙ্গীদের ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তালেবানের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে মহব্বত ভালোবাসা এবং তাদেরকে সাহায্য-সহায়তা করার অনুপ্রেরণা তৈরি হয়। এরই মধ্য দিয়ে তারা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহির একটা নগদ দাওয়াত পেয়ে যান। রণাঙ্গনে যাবার —এবং সত্যি করে বলতে.. সবার আগে তালেবানকে দেখার আগ্রহ তাদের মাঝে তৈরি হয়। কিন্তু একে তো ওই সময় কেউ নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদেরকে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়নি, অপরদিকে রুটিন মাফিক তাদের শিক্ষা জীবন চলছিল। এ কারণে ওই সময় জিহাদের জন্য বের হবার কোন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়নি।

১১ই সেপ্টেম্বরের রণাঙ্গন: সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের দিন
২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে বিশ্বের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনার আগ পর্যন্ত পুরো পৃথিবী দীর্ঘ সময় যাবৎ বিভিন্ন ব্লক, বিবিধ জোট এবং এমনই চটকদার দুইয়ের অধিক পক্ষে বিভক্ত ছিল। এ ঘটনার পর পুরো বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে ইসলামী ব্লক, যা প্রতিষ্ঠা করেছেন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহ এবং কায়েদে জিহাদ

[99]

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, অপরদিকে কাফেরদের ব্লক, যা প্রতিষ্ঠা করেছে বুশ, টনি ব্লেয়ার, পারভেজ মোশাররফ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। গোটা বিশ্বের মুসলিমদের এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবেগ এই সময় দেখার মতো ছিল।

আমেরিকা জুলুম ও অনাচারের উৎসমুখ

ইহুদীদের বৈশ্বিক পরিকল্পনা এবং অবৈধ ক্ষমতার সবচেয়ে বড় সমর্থক ও মদদদাতা ছিল আমেরিকা। আম্বিয়া কেরামের সালাতের স্থান আমাদের প্রথম কেবলা, যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাহমাতুল্লাহ আলামিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সালাতের ইমামতি করেছেন; ওই পবিত্র ভূমি, যেখানে শত শত নবী এসে নিজেদের দাওয়াত প্রচার করেছেন; ওই পবিত্র ভূখণ্ড, যেখানকার পাহাড় ও ফলের শপথ করে আল্লাহ তাআলা কুরআনে মাজীদে আয়াত নাযিল করেছেন; ওই ফিলিস্তিন ভূখণ্ড, যেখান থেকে আল্লাহ তাআলা ইহুদীদেরকে তাদের অপরাধের কারণে বহিষ্কার করেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আল্লাহর অলিদের হত্যাকাণ্ড, আল্লাহর আয়াত সমূহ বিক্রি করে জাগতিক স্বার্থ হাসিল করা এবং অন্যান্য কুকর্মের কারণে সেখান থেকে আল্লাহ তাদেরকে বের করে দিয়েছেন, সেই ভূখণ্ডে এই আমেরিকার তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইহুদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং এখন থেকে ফিলিস্তিনিদেরকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হচ্ছিলো। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর নৃশংসতা, পাশবিকতা, ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যাকাণ্ড, গ্রেপ্তারি চাপিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় ইহুদীদেরকে বসবাসের সুযোগ দেয়া হচ্ছিলো। [100]

ইসরাইলের অভিশপ্ত অস্তিত্ব গোটা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ভূমি হয়ে উঠছিল। এই সবকিছুতে আমেরিকা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছিলো। খোদ আমেরিকা ইরাকে উপাসাগরীয় যুদ্ধ এবং সাদ্দামের জুলুম অত্যাচারের বাহানায় খাদ্য ও ওষুধ সামগ্রীর ওপর অবরোধ আরোপ করে। এভাবে আমেরিকা ১৫ লক্ষের অধিক নিষ্পাপ ইরাকি শিশুকে হত্যা করে। জাযিরাতুল আরবে ইরাকের বিরুদ্ধে সহায়তার অজুহাতে মার্কিন সেনাবাহিনী হারামাইন শারিফাইনের (আল্লাহ উভয়ের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করুন) আশেপাশে ঘাঁটি স্থাপন করে। এভাবেই কার্যত তারা আরব দখল করে নেয়। এই আমেরিকাই সারা পৃথিবী বিশেষত মুসলিম বিশ্বে অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির মাধ্যমে এমন অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র নীতি চালু করে রাখে, যার কারণে মুসলিম দেশগুলো কার্যতভাবে তার আনুগত্য মেনে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। আমেরিকা এবং তার বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় অঙ্গ জাতিসংঘের পলিসি, প্রতারণামূলক সিদ্ধান্ত এবং পরোক্ষ সরকারের কারণে বায়ান্নের অধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কোনটাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছিলো না। মুসলিম বিশ্বের খনিজ সম্পদ, নানান উপায় সম্ভাবনা এবং বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর তেল ও গ্যাসের খনি লুট করা এবং হাতিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে মার্কিন পলিসির কারণেই। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মুসলিম দেশ সামগ্রিক বিবেচনায় পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশ ও জাতি হিসেবে অবস্থান নিয়েছে। এক কথায় পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের পেছনে আমেরিকার হাত থাকার দর্শনটি একটা চাক্ষুষ বাস্তবতা ও সর্বসম্মত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

[101]

আজ আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম
এই অবস্থায় ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলাগুলোতে মুসলিমরা কতটা আনন্দিত হতে পারে তা বোধগম্য বিষয়। এতে মুসলিমদের মাথা উঁচু হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তারা আমেরিকার শান-শওকতের ঘটনা শুনে এসেছে। আমেরিকার এটম ও হাইড্রোজেন বোমা এবং বিমানবাহী নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘটনা শুনে এসেছে। আমেরিকার শহর নগরের আকাশচুম্বী ইমারত এবং নাসার মহাকাশ গবেষণা ও নভোযাত্রার ঘটনা শুনে এসেছে। কিন্তু আজ গোটা পৃথিবী আমেরিকার শান-শওকত মাটিতে মিশে যেতে দেখে। আজ মুসলিমরা শতাব্দীকালের প্রতিশোধ নেয়ার আনন্দ লাভ করে। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের হাতে রোম সাম্রাজ্যের শান-শওকত মাটিতে মিশিয়ে দেয়া ইয়ারমুক যুদ্ধের স্মৃতি সেদিন জাগ্রত হয়েছিল। সেদিন মুসলিমদের নিজেদের দীনের উপর, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের উপর এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহের উপর আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এভাবেই কুফরের অসারতা ও তুচ্ছতা স্পষ্ট হয়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর মুসলিম উম্মাহর নবজাগরণের সূচনা ছিল।

এই হামলা কেন করা হয়েছে তাই স্পষ্ট। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরের দিন সন্ধ্যায় আমি মহল্লার একজনকে জিজ্ঞেস করি, আমেরিকার উপর কারা এবং কেন হামলা করলো? ওই ব্যক্তি হেসে উদ্দীপ্ত হয়ে বলে: সম্ভবত ফিলিস্তিনিরা করেছে। দিন শেষে তাদের কাছে এছাড়া আর কিই বা করার ছিল?” আমি সরল ভাবে জিজ্ঞেস করি: “ফিলিস্তিনিরা যদি করে থাকে তাহলে ইসরাইলের পরিবর্তে আমেরিকার ওপর কেন?” ওই ব্যক্তি তখন অকপটে বলে ওঠেন: “ভাই আমেরিকা এবং ইসরাইল মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইসরাইল যা কিছু করছে আমেরিকার ভরসাতেই করতে পারছে।” এক কথায় ১১ই সেপ্টেম্বরের পরপরই আমেরিকা কারও ওপর অপবাদ আরোপের আগেই মুসলিম উম্মাহর একজন সাধারণ সদস্যের [102]

কাছে এই হামলার কারণ স্পষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের একজন সাধারণ মুসলিমের মধ্যে এই হামলার পর সর্বপ্রথম এই চিন্তা এসেছে যে, এটা ফিলিস্তিনের প্রতিশোধ। আর এ বিষয়টাই মুজাহিদীনের হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য, যা কায়েদে জিহাদ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ একটি বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছেন। তাতে তিনি ঐতিহাসিক শপথ করে বলেন:

“আমি ওই আল্লাহর কসম করে বলছি যিনি আসমান সমূহ কোনো খুঁটি ছাড়া স্থির রেখেছেন... আমেরিকা এবং সেখানে যারা রয়েছে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিলিস্তিনে শান্তি ও নিরাপত্তা না পাবো এবং সকল কাফের বাহিনীকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরব ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কৃত না করবো”

আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা এবং মুসলিম উম্মাহর পাল্টা জবাব
হামলার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমেরিকা তৎক্ষণাৎ আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর সাথি-সঙ্গীদেরকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়ার জন্য তালেবানকে নির্দেশ দেয় এবং এই নির্দেশ পালন না করলে প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেবার হুমকি দেয়। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহর আত্মমর্যাদা ও দীনি আবেগপূর্ণ জবাবে গোটা বিশ্ব হয়রান হয়ে যায়। তিনি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস সহকারে গর্জে ওঠেন: “এটা (মুসলিমদেরকে সাহায্য করা) একটি ঈমানী দায়িত্ব। আমরা সর্বপ্রকার বিপদ মেনে নিতে প্রস্তুত। আমেরিকা যা করার করুক। আমেরিকা যদি আফগানিস্তানের প্রতিটি বৃক্ষ পাথর [103]

এবং দালান জ্বালিয়ে কয়লা বানিয়ে দেয়, তবুও উসামা রহিমাহুল্লাহকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়ার চিন্তাও আমরা করতে পারি না।”

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে আমীরুল মুমিনীন রহিমাহুল্লাহ নিজের ঐতিহাসিক ইলহামী যুক্তি উপস্থাপন করেন:

“বুশ আমাদেরকে বলেছে তোমরা পরাজিত হবে, অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ঈমানদাররা বিজয়ী হবে। এখন আমরা দেখবো কার কথা সত্য? আল্লাহর নাকি বুশের!”

তালেবানের এই ঈমানী সাহসিকতাপূর্ণ অবস্থানের কারণে মুসলিম উম্মাহর মাথা গর্বে উঁচু হয়ে যায়। উম্মাহর যুবক শিশু বৃদ্ধ সকলেই রাজপথে বেরিয়ে আসে। তারা গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিতে থাকে: দিল দিল জান জান তালেবান তালেবান » আমীরুল মুমিনীন এই অবস্থানের কারণে মুসলিম উম্মাহর অনুসরণীয় ও প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব হয়ে যান। মোল্লা উমর নামটি সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদার প্রবাদ হয়ে ওঠে। অপরদিকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, আমেরিকায় হামলার পরিকল্পনা এবং উম্মাহকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করার কারণে ইসলামের সিংহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ উম্মাহর হিরো ও নেতা হয়ে ওঠেন। গলিতে গলিতে মহল্লায় মহল্লায় এই স্লোগান ধ্বনিত হতে থাকে:

[104]

ইসলামের হিরো নাম্বার ওয়ান ♠ আমাদের সিংহ উসামা বিন লাদেন

ইসলামের তরে নিবেদিত যার দেহ মন মনন ♠ (তিনি হলেন) আমার শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লা

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর কতটা গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ছিল তা আমরা অনুমান করে নিতে পারি একটা বিষয় থেকে। বিভিন্ন কোম্পানি নিজেদের খ্যাতি ও বিক্রি বাড়ানোর জন্য শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর ছবি অঙ্কিত প্রোডাক্ট বানাতে শুরু করে। ওই সময়ের একটি ঘটনা মনে পড়েছে। আমাদের কলেজের সহজ-সরল কিসিমের একজন শিক্ষার্থী একবার কলেজ থেকে বের হওয়ার পর একটা তেঁতুলের খালি প্যাকেট দেখতে পায়, যেখানে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর ছবি ছিল। তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে সে প্যাকেটটি ওঠায়। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর ছবিতে চুমু খায় এবং অত্যন্ত আদব-সম্মান সহকারে তেঁতুলের প্যাকেট কলেজের দেয়ালের উপর রেখে দেয়। এই ঘটনার দ্বারা শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর প্রতি মুসলিম জনসাধারণের ভালোবাসা এবং আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা ভাব অনুমান করা যায়।

[105]

জেগে ওঠো হে গাযী ময়দানের ডাক এসেছে চলে ১১ই সেপ্টেম্বরের পর যে অবস্থা তৈরি হয়,
তা গোটা মুসলিম উম্মাহকে আন্দোলিত করে। তখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মতো সংবেদনশীল এবং উম্মাহর প্রতি মায়া লালনকারী ব্যক্তির পক্ষে প্রভাবিত না হয়ে উপায় ছিল না। তার অন্তর কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে আরম্ভ করে। তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁর তর সইছিল না, কেমন করে তিনি উড়ে গিয়ে তালেবানের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন এবং এই মোবারক জিহাদের বাহনে চড়ে বসবেন। তিনি রাতে উঠে আল্লাহ তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে অশ্রু ঝরিয়ে দোয়া করতেন, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে জিহাদে অংশগ্রহণের কোনো পথ দেখিয়ে দেন। যতদূর আমার মনে পড়ে, তিনি সে সময় পাকিস্তানে নিযুক্ত তালেবানের রাষ্ট্রদূত ‘মোল্লা আব্দুস সালাম জয়ীফ’ সাহেবের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়ার চেষ্টা করেন, যিনি সৌভাগ্যক্রমে ওই সময় ইসলামাবাদে তার সফর সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু বোমাবর্ষণের সময় আফগানিস্তান অভিমুখে আসতে বারণ করাই তালেবানের সে সময়কার সাধারণ অবস্থান ছিল। তালেবানের জন্য সহায়তা সামগ্রী সংগ্রহ, দোয়া, কুনুতে নাযেলা —অন্য মুসলিমদের মতো তিনিও এগুলো করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই দিনগুলোতে তিনি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে ক্লাসে ধারাবাহিক আলোচনা করতে আরম্ভ করে দেন। তার দৃষ্টিতে আশা ও বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা দেখা যাচ্ছিলো। এক ক্লাসে তিনি সূরাতুল ফীল-এর তাফসীরের আলোকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য করণীয় শীর্ষক আলোচনা করেন। তিনি আমেরিকা এবং তার সহযোগীদেরকে আবরাহা এবং তার সাথি- সঙ্গীদের সঙ্গে তুলনা করেন। ইয়ামেনের আবরাহার বানানো ঘরে আবর্জনা ফেলে আসার ঘটনাকে আমেরিকায় হামলার সঙ্গে তুলনা করেন। অতঃপর আল্লাহর কাবার

[106]

বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। এই কাবা ঘরের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন এবং দুর্বল পাখির মাধ্যমে কাবা পানে এগিয়ে আসা তাগুত বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন। তিনি আরও বলেন, মুসলিম উম্মাহ এবং মুসলিমের রক্তের সম্মান আল্লাহ তাআলার নিকট কাবা ঘরের চেয়ে কোনো দিক থেকেই কম নয়। আবরাহার বাহিনী চলার পথে যে সমস্ত আরব তাদেরকে পথ দর্শন করেছে, তারা কতটা খারাপ পরিণতি বরণ করেছিল এবং আরব সমাজে কতটা লাঞ্ছিত হয়েছিল, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সে কোথাও বর্ণনা করেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আব্দুল মোত্তালেবের অসহায়ত্ব বর্ণনা করে বলেন, তিনি আবরাহাকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম ছিলেন বটে; কিন্তু যা তিনি করতে পারতেন, সেটা অবশ্যই করেছেন —অর্থাৎ কাবা ঘরের পর্দার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন। ওই ক্লাসগুলোতে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর সাহায্য ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস রাখার কথা আলোচনা করেছিলেন। “আব্দুল মোত্তালেব তো অসহায় ছিলেন কিন্তু আমরা কি অসহায়?” —তিনি এমনও বলেন। “কোনো কোনো বর্ণনায় কিছু আরব লোক আবরাহার মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায় এবং কোনো কোনো বর্ণনাকারী এ কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, আত্মমর্যাদাশীল কিছু আরব লোকই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছিল।” এই পয়েন্ট উল্লেখ করে তো তিনি আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তার শ্রোতাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের আবেগে প্রভাবিত না হতো। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সে সময় কার্যত কোনো কিছু করার ছিল না বললেই চলে। আফগানিস্তানে বি ফিফটি টু বোমারু বিমান, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ক্লাস্টার

[107]

বোমা বৃষ্টির মতো বর্ষণ হচ্ছিলো। তালেবানের পক্ষ থেকে নির্দেশানায় বলা হয়েছিল, এ সময় জনবল ও সরঞ্জাম বাঁচিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিবর্তে গোটা আফগানিস্তানে ছড়িয়ে গিয়ে একটি সুশৃঙ্খল গেরিলা আন্দোলন যেন শুরু করা হয়।

আফগানদের সঙ্গে সম্পর্ক কিসের? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
গোটা বিশ্বের মতো পাকিস্তানের মুসলিমরাও
পথে নেমে আসে। হৃদয়ের আগুন নেভানোর এবং আফগানিস্তানের মুসলিমদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের এটাই একটি পন্থা বলে মনে হচ্ছিলো। তাদের মনে আকাঙ্ক্ষা টগবগ করছিল, হয়তোবা এভাবেই আমেরিকার সঙ্গে লড়াইয়ের কোনো সুযোগ তারা পেয়ে যাবে। সাইয়েদেনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আগুন নেভানোর চেষ্টায় চড়ুই পাখিও অংশ নিয়েছিল। সারাদিন আলজিহাদ আলজিহাদ স্লোগানে পাকিস্তানের অলিগলি প্রকম্পিত ছিল।

ইসলামাবাদে এই দৃশ্যগুলো ছিল আরও আশ্চর্যের। ইসলামাবাদের লাল মসজিদ এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন ওখান থেকে আমেরিকা এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে মিছিল বের হচ্ছিলো। ওই সমস্ত মিছিলে জিহাদের ভালোবাসা এবং আমেরিকা ও তার মিত্রদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হচ্ছিলো। শুক্রবারে হতো মহা সমারোহ। এই দিনের আড়ম্বরই ছিল আলাদা ধরনের। লাল মসজিদে মাওলানা আব্দুল আজীজ হাফিযাহুল্লাহর ঈমানী বক্তৃতা এবং জুমার নামাযের পরে জিহাদ ও মুজাহিদীনের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করার দৃশ্য ছিল খুবই ঈমান জাগানিয়া। এরপর শুরু হতো মিছিল। সাধারণত আবপাড়া চক পর্যন্ত গিয়ে মিছিল থামতো। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যেহেতু শুরু থেকেই ধুমধাম ও [108]

জাঁকজমকের রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন, এজন্য এই সমস্ত বিক্ষোভ মিছিলে তার তেমন আগ্রহ ছিল না বরং তিনি নিজের পড়াশুনা ও দাওয়াতী কার্যক্রমে মনোযোগী ছিলেন।

আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলা করে এবং বোমাবর্ষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, তখন এক শুক্রবারে লাল মসজিদ থেকে মার্কিন অ্যাম্বাসির দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা হয়। এর আগেও নেতৃবৃন্দ এমনই বিভিন্ন হুমকি-ধমকি দিয়েছিল যে, আমরা মার্কিন অ্যাম্বাসির দিকে পদযাত্রা করবো। এই ঘোষণা শুনেই সকলের অন্তরে জিহাদের তাড়না জেগে ওঠে। ঐদিন অধিকাংশ লোক শাহাদাতের নিয়তে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল।

মিছিল যখন আবপাড়া চক পর্যন্ত পৌঁছে, তখন লোকজনের আবেগ চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে এবং কন্ঠে স্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। মার্কিন দূতাবাসে যাওয়ার পথে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ভারি দল রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র মিছিলের দিকে তাক করে পজিশন নিয়ে রেখেছিল। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। জযবা আবেগে তারা টগবগ করছিল। আফগান মুসলিমদের হত্যাকারী আমেরিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ এত তীব্র ছিল যে, আমেরিকা তো বটেই তাদেরকে সুরক্ষা দানকারী সেনাবাহিনীকেও আগুনে জ্বালিয়ে দিতে মন চাইছিল।

এমন আবেগ ও শোরগোলের মাঝখানে হঠাৎ আমি কাঁধে কারও হাতের স্পর্শ পাই। পিছনে তাকিয়ে দেখি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন। জযবা ও আবেগে তার চেহারা জ্বলজ্বল করছিল। তার হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিতাব পত্র ছিল। সম্ভবত ক্লাস থেকে সোজা এখানে চলে এসেছেন। আমি তাকে দেখে হতবাক

[109]

হয়ে যাই। কারণ তিনি তো শোরগোল ও ছলনাময়ী রাজনীতি অপছন্দ করতেন। যাই হোক তার উপস্থিতিতে বেশ আনন্দিত হই এবং মনোবল বৃদ্ধি পায়। আমি তাকে বলি: “হযরত আজ তো পরিবেশ গরম মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়ে যাবে”। জবাবে তিনি বলতে লাগলেন: “এজন্যই তো অংশ নিতে এসেছি”। আমি বললাম: “আজ যদি সেনাবাহিনী এবং পুলিশ ফায়ারিং করে তাহলে কি হবে?” তিনি বলেন: “লড়াই করবো এবং শহীদ হয়ে যাবো আর কি হবে?” আসলে তিনি শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিণতির কথা চিন্তা না করেই চলে এসেছিলেন।

একদিকে যেমন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা আমেরিকান দূতাবাসে ঝড় তোলার জন্য উত্তেজিত ছিল, অপরদিকে এই আশঙ্কা হচ্ছিলো, সরকার এবং সরকারি এজেন্সিগুলো আবার না প্রতারণার মাধ্যমে মিছিলের গতিমুখ পরিবর্তন করে দেয়! কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল, যার আশঙ্কা, সেটাই হতে যাচ্ছে। হঠাৎ মিছিলের নেতৃবৃন্দ যাত্রা ঘোষণা করেন। অংশগ্রহণকারীদের আকাশ কাঁপানো স্লোগানের গর্জনে মিছিল এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পূর্ব দিকে আমেরিকান অ্যাম্বাসি অভিমুখে যাবার পরিবর্তে নেতৃবৃন্দের স্টেজবাহী গাড়ি পশ্চিম দিকে জিরো পয়েন্ট অভিমুখে এগিয়ে যায়। নেতৃবৃন্দের পেছনে যাওয়া ছাড়া অংশগ্রহণকারীদের অন্য কোন উপায় ছিল না। ২০ কিলোমিটারের দীর্ঘ রাজপথে নেতৃবৃন্দের স্টেজবাহী গাড়ির পেছনে চলতে থাকে জনসাধারণ। যখন জিরো পয়েন্টে পৌঁছে তখন স্লোগান দিয়ে দিয়ে এবং পায়ে হেঁটে হেঁটে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আবেগ জযবার অগ্নিশিখাও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কাছেই ওয়াগন দাঁড়ানো ছিল, সকলেই সেগুলোতে চড়ে নিজ নিজ ঘরের পথ ধরে। »

[110]

মিছিল মিটিং-এ অনাগ্রহ
মিছিল মিটিং-এর এমন পরিসমাপ্তি এবং সরকার ও এজেন্সিগুলোর প্রতারণা জানতে পেরে ফারুক রহিমাহুল্লাহ মিটিং মিছিলের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। তার কথা ছিল, এভাবে শুধু স্লোগানের পেছনে যোগ্যতা প্রতিভা ও সময় খরচ করে এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের স্টেজবাহী ট্রাকের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে কি লাভ? অপরদিকে ধর্মীয় দলগুলোর নেতৃবৃন্দ কোনো সুদৃঢ় অবস্থান তুলে ধরতে পারছেন না। তারা অনুসারীদের উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য আবেগপূর্ণ স্লোগান দিচ্ছেন এবং দাবি করছেন অনেক কিছুরই, কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছেন না। বরং পরবর্তী শুক্রবারে অথবা পরবর্তী মিটিং-এর অপেক্ষা করে ধৈর্য ধারণ করার দিকনির্দেশনা দিয়ে তারা প্রোগ্রাম শেষ করছেন। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আগ্রহ উদ্দীপনা কোনো সাময়িক বিষয় ছিল না। বরং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অস্থিরতা উদ্দীপনা তিনি কুরআন মাজীদ থেকে শিখেছিলেন এবং এই আজিমুশ শান কুরআনের ছায়াতলে জিহাদে অংশ নিতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন। আফগানিস্তান জিহাদে অংশগ্রহণের কোন কার্যকরী পথ না পাওয়ার কারণে তিনি জিহাদী প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বের হবার সিদ্ধান্ত নেন। উলামায়ে কেরামের রায় হলো: যদি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে অংশগ্রহণে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে, তাহলেও ইদাদ (প্রস্তুতি গ্রহণ) ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অবশ্যই জরুরি এবং আবশ্যকীয়।

[111]

জ্বলছে কাশ্মীর; বাঁচাও কাশ্মীর…
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কাশ্মীরি জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যান্য সফরের মতো এই সফরেও প্রাণপ্রিয় বন্ধু এবং বিশিষ্ট সফর সঙ্গী শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ সঙ্গে ছিলেন।

কাশ্মীর জিহাদের আবেগ উদ্দীপনা তো আমাদের এই প্রজন্মের প্রতিটি সন্তান খুব সহজেই লাভ করে। কাশ্মীরের মুসলিমদেরকে স্বাধীন করা, কাশ্মীরের মা-বোনদের সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য স্বর্গীয় এই উপত্যকায় যাওয়ার আগ্রহ শৈশবকাল থেকেই অন্তরে লালিত পালিত হচ্ছিলো। সেলিম নায বেরলভি মরহুমের এই কবিতা অন্তরের আকুতি তুলে ধরে:

হে কাশ্মীর তোমার জান্নাতে আসবো একদিন; জুলুম অত্যাচার থেকে তোমাকে মুক্ত করবো একদিন »

অত্যাচারিতদের সাহায্যার্থে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কাশ্মীরীদের ওপর হিন্দুদের নির্যাতন-নিপীড়নের কাহিনী অনেক পুরানো। শুধু মুসলিম হবার কারণে কাশ্মীরীরা গোটা দেড় শতাব্দী যাবৎ সরকারি জুলুম অত্যাচারের মুখোমুখি ছিল। কাশ্মীরি মুসলিমদের ব্যক্তি স্বাধীনতা শেষ করার জন্য তাদেরকে হিন্দুদের দাসত্ব করতে বাধ্য করা হচ্ছিলো। অবশেষে যখন কাশ্মীরিগণ জিহাদের পতাকা সমুন্নত করে, তখন তাদের দেখে পাকিস্তানের মুসলিমগণ লাব্বাইক বলেন। গোটা পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার যুবক ওই জিহাদে রক্ত বিলিয়ে দেন। জটিলতার দিক থেকে কাশ্মীর জিহাদ দুনিয়ার অন্যান্য জিহাদী ফ্রন্টের চেয়ে বেশি ছিল। আকাশচুম্বী যে পাহাড়গুলো বছরের একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বরফের [112]

সাদা চাদরে আবৃত থাকে; গভীর যেই পরিখাগুলো দেখেই কলিজার পানি শুকিয়ে যায়; ঘন জঙ্গল এবং আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ইন্ডিয়ান আর্মির মোকাবেলা করা বাহ্যত অসম্ভব কাজ ছিল। কিন্তু মুসলিমরা ঈমানী শক্তি এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উদ্দীপনায় একে সম্ভব করে তোলেন। অর্থ সম্পদ জীবন ভাষা সহ সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন নিয়ে পাকিস্তানের মুসলিমরা এই দিকে এগিয়ে আসেন। রুশ বিরোধী জিহাদ শেষ হবার পর প্রশিক্ষিত যুবকদের একটা বড় সংখ্যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নতুন দরজা পেয়ে যায়। যেখানে যেখানে রণাঙ্গন প্রস্তুত হয় সেখানেই মুজাহিদীনের সাফল্য ও বিজয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুজাহিদীনের আবেগ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তারা শ্রীনগর থেকে অগ্রসর হয়ে এখন দিল্লির লালকেল্লা এবং বাবরি মসজিদ পুনরুদ্ধার করতে চান।

কাশ্মীর জিহাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে… ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ২০০২ সালে মানসেহরা জঙ্গলে অবস্থিত কাশ্মীর জিহাদী প্রশিক্ষণ শিবির থেকে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দৈহিকভাবে শক্তিশালী এবং উচ্চ মনোবল সম্পন্ন হবার কারণে তাঁকে তিন মাস ব্যাপী উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। তিনি উচ্চতর প্রশিক্ষণের সব কটি স্তর সুন্দরভাবে অতিক্রম করেন। কাশ্মীরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের ধরন এ সমস্ত কঠিন স্তরের কারণে বেশ প্রসিদ্ধ। নিঃসন্দেহে কাশ্মীরের দুর্গম ফ্রন্টে কাজ করার জন্য এমন কঠোর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। ২৫ কেজি বোঝা পিঠে নিয়ে দৈনিক ১৮ ঘণ্টা অস্ত্র সহকারে পাহাড়ের উপর আরোহণ করা অথচ খাবারের জন্য শুধু থাকবে শুকনো চানা বুট এবং পানি। এই কষ্ট দুর্বল প্রকৃতির মানুষদেরকে

[113]

যেভাবে হতোদ্যম করে, অপরদিকে উচ্চ মনোবল সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রত্যয় ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। তিনি পুরোপুরি শহুরে জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তথাপি আশ্চর্যজনকভাবে এই সকল প্রশিক্ষণে তিনি সবার মাঝে অনন্য ছিলেন। যদিও আল্লাহ তাআলা তাকে সুঠাম ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী বানিয়ে ছিলেন, কিন্তু তার উচ্চ মনোবল ও মানসিক দৃঢ়তা তার কাজে বিরাট অবদান রেখেছিল। অতঃপর তার নৈতিকতা স্বভাব চরিত্র ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকার বিষয়টিও তার প্রশিক্ষক ও সাথিদেরকে অনেক প্রভাবিত করে। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর তিনি সর্বস্ব জিহাদের জন্য উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে ছিলেন কিন্তু পড়াশোনা ছেড়ে শুধু কাশ্মীর যাবার তাড়না তাকে পেয়ে বসে। তিনি দায়িত্বশীলদের সঙ্গে জিদ ধরে থাকেন যে, আমাকে কাশ্মীর পাঠিয়ে দিন, আর যদি তা না হয়, তাহলে শুধু এখানে প্রশিক্ষণ শিবিরেই জিহাদ ও সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে পুরোপুরি নিযুক্ত করুন। কিন্তু দায়িত্বশীলদের ইচ্ছা ছিল এই দুজন অমূল্য রত্নকে (শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ এই সকল স্তরে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ছিলেন শুধু, উচ্চতর প্রশিক্ষণে তিনি শরীক হতে পারেননি কোমরে চোট পাওয়ার কারণে) নিচে শহরগুলোতেই রেখে দেয়ার এবং তাদেরকে দিয়ে দাওয়াত ও তহবিল সংগ্রহের কাজ করানোর। ওই সময়ে পারভেজের শাসনামলের কড়াকড়ির কারণে কাশ্মীরে প্রবেশ করাও কঠিন বিষয় ছিল।

অপরদিকে কাশ্মীরি জিহাদী সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ সরল প্রাণ মুজাহিদীনকে এ কথা বলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতো যে, আমরা জিহাদী কার্যক্রম পাকিস্তানি গোপন এজেন্সি থেকে লুকিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন পলিসির অধীনে পরিচালনা করতে পারছি; [114]

এজেন্সির কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ শিবিরে আসলে আমরা নিজেদের অস্ত্র লুকিয়ে ফেলার নাটকও করে যাচ্ছি। কিন্তু একে তো এখন স্বয়ং আইএসআই ধীরে ধীরে এ লৌকিকতা শেষ করতে চাচ্ছিলো, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও যাতায়াত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বেড়ে গিয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিল যে, এই দুই হযরতের মেধা বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা এবং ধর্মীয় বিষয়ে সংবেদনশীলতার কারণে সরাসরি যুদ্ধ ফ্রন্টে থাকা অথবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় থাকার কারণে তাদের কাছে কোন কিছুই আর রহস্য নয়। এককথায় কাশ্মীর জিহাদের দায়িত্বশীলরা তাকে যুদ্ধ-ফ্রন্টে না পাঠাতে অটল সিদ্ধান্ত নেন। তাকে শহরে রিক্রুটমেন্ট এবং তহবিল সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে বলেন। এভাবেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসেন এবং কিছুদিন পর্যন্ত তিনি কাশ্মীর জিহাদের দাওয়াতে ব্যস্ত থাকেন।

এই সময়ে কাশ্মীর জিহাদে পাকিস্তানি গোপন সংস্থার ভূমিকা তিনি কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পান। সেই সঙ্গে তাঁর কল্যাণকামী কিছু লোক যারা নিজেরাও কাশ্মীর জিহাদের দায়িত্বশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাকে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়ার জন্য এই জিহাদে এজেন্সির নিকৃষ্ট ভূমিকা বিস্তৃতভাবে তাকে জানাতে আরম্ভ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হলো সত্যের সঙ্গে চলা- কোথাও বিচ্যুতি দেখেও ব্যক্তি স্বার্থের কারণে নীরব থাকবেন, তিনি এমন ছিলেন না। আইএসআই’র অসৎ ভূমিকা জানার পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং তার বন্ধু উসামা ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ কাশ্মীর জিহাদী সংগঠনগুলো থেকে আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

[115]

পাকিস্তানের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলোর ভূমিকা কাশ্মীর নিয়ে পাক ফৌজ এবং আইএসআই'র ভূমিকা
ছিল চরম নিকৃষ্ট। রাজনৈতিক ফোরামগুলোতে কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থনের স্লোগান উচ্চারণকারী পাকিস্তানের শাসকবর্গ কাশ্মীর সমস্যাকে শুধু নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে যাচ্ছিলো। যখন রাজনৈতিকভাবে ইন্ডিয়াকে চাপে ফেলে স্বার্থ উদ্ধার করা যেত, তখন কাশ্মীরে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া এবং এরপর যখন বৈশ্বিক চাপ শুরু হতো, তখন সকল ত্যাগ প্রতীক্ষা নষ্ট করে শান্তি চুক্তির আলোচনা শুরু করা- শুরু থেকেই সেনাবাহিনীর পলিসি ছিল। এইসব কিছুর মাঝে হাজার হাজার নিষ্ঠাবান ব্যক্তির রক্ত বয়ে যেত অথবা পবিত্র নারীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতো। কিন্তু সেগুলো নিয়ে পাক-ফৌজের কোনো পরোয়া ছিল না। তাদের চাই পাকিস্তানের স্বার্থ। এই স্বার্থের জন্য কাশ্মীরি মারা যাক, আফগান মারা যাক কিংবা খোদ পাকিস্তানি, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। এরপর পাকিস্তানি স্বার্থ বলেও বোঝানো হতো শুধু সেনাবাহিনী এবং আইএস আই'র স্বার্থকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন কাবায়েলি বা গোত্রীয় অঞ্চলের আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলিমরা কাশ্মীর জিহাদ আরম্ভ করে কাশ্মীরের একটা বড় অংশ স্বাধীন করেন, তখন পাকিস্তান আর্মির ওই সময়কার কমান্ডার চিফ জেনারেল ডগলাস গ্রেসি অগ্রসর হতে বারণ করেন। এভাবেই কাশ্মীরীদের দাসত্বের এবং হিন্দুদের অধীন হয়ে থাকার পেছনে পাক আর্মিরই ভূমিকা থাকে। একটি মজার বিষয় এখানে মনে রাখা উচিত। পাকিস্তানি ফৌজের প্রথম দুজন প্রধান ছিলেন কাফের ইংরেজ।

[116]

১৯৬৫ সালে কাশ্মীর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পর কিছু এলাকা জয় করাকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবদান মনে করা হয়। আমাদের এক বন্ধু মুজাহিদ কারী বেলাল ইউসুফ (হাশিম খান) —যিনি পরবর্তীতে আফগানিস্তানে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন— আমাকে বলেছেন, তিনি কাশ্মীরে সুরাংকোট পুঞ্চ জেলায় জিহাদে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন একজন কাশ্মীরি প্রবীণ লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। মুরুব্বি যখনই জানতে পারলেন, বেলাল ভাই পাকিস্তানি, তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিতে আরম্ভ করেন। কারী বেলাল নিজের রাগ দমন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার এই বিশেষ মহব্বতের কারণ জানতে চান। তখন কাশ্মীরি মুরুব্বী লোকটি যা বললেন সেটা আমরা তার ভাষাতেই শুনবো।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি কাশ্মীরি মুরুব্বির ক্ষোভ কেন?
মুরুব্বী অনেকটা এমন বলেছেন: “১৯৬৫ সালের কথা। পাকিস্তানি আর্মির যুবকেরা আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে। আমাদের এলাকায় ইন্ডিয়ান আর্মি আগেও ছিল না। ওই সময়টা আমাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন সময় ছিল। আমরা নিজেদের ঘরের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসগুলো এনে ওই মুজাহিদীনে ইসলামের (!) সেবায় পেশ করি। যেখানে ঐ আর্মির ঘাঁটি ছিল, সেখানে দৈনিক আমাদের গ্রামের প্রত্যেকে স্বচ্ছ মনে তাদের কাছে গিয়ে তাদের সেবা যত্ন করতো, তাদের কাপড় ধুয়ে দিতো এবং তাদের ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতো। এর বিনিময়ে আমরা তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিই, তোমরা কখনও আমাদেরকে ছেড়ে যাবে না; যদি চলে যাও তাহলে হিন্দুরা আমাদের এই সমস্ত কাজের এমন বদলা নেবে, যা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। আমরা তাদেরকে আরও বলি, যদি তোমাদের ফিরে

[117]

যেতে হয়, তাহলে অন্ততপক্ষে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, অন্যথায় আমাদের নারীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে। বেশ ভালোই দিন যাচ্ছিলো। আমরা তাদের সেবা যত্ন করে যাচ্ছিলাম। আমাদের এলাকায় পাকিস্তানের সবুজ হেলালি (চন্দ্রাঙ্কিত) নিশান উড়ছিল। যেন আনন্দে নেচে যাচ্ছে। এরপর হঠাৎ একদিন সকালে যখন আমরা পাকিস্তানি আর্মির ঘাঁটিতে পৌছি, তখন সেখানে খালি প্যাকেট এবং ব্যবহৃত জিনিসের আবর্জনা পাওয়া যায়, কিন্তু ইসলামের মুজাহিদীনের কোন পাত্তা নেই। রাতে তারা পালানোর সময় যখন কোনো মুসলিম সাহস দিয়ে তাদেরকে বলেছে, তোমরা থেকে যাও, তখন তারা বলেছে: উপর থেকে আমাদের অর্ডার এসেছে ফিরে যাওয়ার জন্য। বারণকারীরা পিছন থেকে এ কথাও বলেছে, ভাইয়েরা! ইন্ডিয়ান আর্মির তো কোনো নাম নিশানাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু পেছনে ফিরে দেখারও সাহস তাদের ছিল না। তারা যাওয়ার পর পর ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের এখানে আসে। বিরাট সংখ্যক পুরুষকে শহীদ করে। নারীদের সম্মান সম্ভ্রম নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। আমাদের গ্রামকে পাকিস্তানপ্রীতির এমন শাস্তি তারা দেয়, যার দৃষ্টান্ত পূর্বে গত হয়নি। তাই এখন যখনই কাপুরুষ নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক স্বার্থান্বেষী এ বাহিনীর আলোচনা আসে, অন্তরে আগুন জ্বলে যায় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে হৃদয় ও মুখ দিয়ে গালি বের হয়। তাদের প্রতারণার কারণেই আমাদের সকল মান-সম্মান বরবাদ হয়ে গিয়েছে।”

কাশ্মীরের মুরব্বী যা বলেছেন সেটাই শতাব্দীকাল যাবৎ কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের সারকথা। এরা কাশ্মীরিদের মান-সম্মান ও জীবন নিয়ে খেলে, তাদেরকে নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে অকূল পাথারে ছেড়ে চলে আসে। পরবর্তীকালে জিহাদী সংগঠনগুলোর

[118]

ব্যাপারে তারা এই নীতি অনুসরণ করে। মুজাহিদীনকে ভেতরে পাঠিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ করে দেয়। বিভিন্ন প্রতারণার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান সরল প্রাণ বলিয়ান জিহাদী নেতৃবৃন্দকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। মুজাহিদীনের গোপনীয়তা শত্রুর কাছে ফাঁস করে দেয়। নিজেদের মধ্যে হানাহানির জন্য মুজাহিদীনকে উস্কানি দেয়, ষড়যন্ত্র করে। এমনিভাবে বিভিন্ন নিকৃষ্ট অপপ্রয়াস এই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী শুরু থেকেই করে আসে।

মহান কাশ্মীর জিহাদে দীনের শত্রু সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নেওয়াটা মূল প্রশ্ন নয়; বরং দীন ও জাতির শত্রু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও এজেন্সির অধীনতা ও তত্ত্বাবধানে জিহাদ করাটা হচ্ছে এখানে মূল বিষয়। (সাহায্য নেয়া এক বিষয় আর তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করা ভিন্ন বিষয়) ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য বিশ্বাসঘাতকদের তত্ত্বাবধানে কাজ করা অসম্ভব ছিল। এ কারণে তিনি এমন জিহাদের খোঁজ করতে আরম্ভ করেন, যেখানে সেগুলোর কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর এমনিতেই আইএসআই'র মুখোশ উন্মোচন হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল ওই নাপাক সংস্থা, যা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে আসা আরব মুজাহিদীন ও তালেবানকে ধরে ধরে আমেরিকার হাতে তুলে দেয় এবং বিনিময়ে ডলার কামিয়ে তারা জায়গা জমি ও প্লটের ব্যবসা করে। এমন সংস্থার তত্ত্বাবধানে জিহাদ— এটা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আলোকিত বিচক্ষণ হৃদয় কিছুতেই মেনে নেয় না।

[119]

শহীদ আব্দুল রহমান বাঙ্গালী শহীদ রহিমাহুল্লাহ সাক্ষাৎ
যে সময়টায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কাশ্মীর জিহাদে রত ছিলেন, সে সময় বাঙালি মুজাহিদীনের সংগঠন জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের আমীর শায়খ আব্দুর রহমান বাঙ্গালীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। শায়খ আব্দুর রহমান শত শত বাংলাদেশি মুজাহিদীনের সঙ্গে আফগানিস্তানে তালেবানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবং তার প্রধান সহকারী শহীদ সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই ১৯৯৮ সালে জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলা করে, তখন তার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৭০ জন বাঙালি মুজাহিদ তালেবানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বড় তাগুত আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শাহাদাতের পেয়ালা মুখে তুলে নেন। হাজার হাজার সদস্য বায়আতবদ্ধ হয় এবং বাংলাদেশে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা, সমাজ থেকে অশ্লীলতা অনাচার অপসারণ এবং দেশকে লোক চক্ষুর অন্তরালে ভারত সরকারের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ আরম্ভ করে। ২০০৭ সালে শায়খ আব্দুর রহমান- বাংলাদেশী সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে গ্রেপ্তার হন। দীনের দুশমন ভারতের গোলাম বাংলাদেশ সরকার তাকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং জান্নাতুন-নাঈমে তাকে ঠিকানা দান করুন, আমীন।

যাই হোক খুব সম্ভব ২০০২ সালে শায়খ আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সাক্ষাৎ ঘটে। এটা ওই সময়কার কথা, যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কাশ্মীর জিহাদে যুক্ত এবং আইএসআই'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি জিহাদী সংগঠনের কাজ করতেন। শায়খ আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ তাকে [120]

নসীহত করেন, জিহাদের জন্য যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয়, তাহলে এমন লোকদের হাতে হাত রাখুন, যাদের আসল উদ্দেশ্য শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং যারা তাগুতি এজেন্সির তত্ত্বাবধানে চলেন না। তিনি এদিকে ইশারা করেন যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে আফগানিস্তানে চলে যান এবং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহর বাহিনীতে শামিল হয়ে নিজের জিহাদের জীবন উৎসর্গ করে দিন। শায়খ আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন, আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে যদি তালেবানের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে বৈশ্বিক জিহাদের পতাকাবাহী উম্মাহর নেতা শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সাথিদের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করুন। শায়খ আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহর উপদেশের কারণেও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাঝে ইমারতে ইসলামিয়া এবং শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবার অথবা অন্ততপক্ষে তাদের ব্যাপারে আরও যাচাই-বাছাই করার মনোভাব তৈরি হয়। কিন্তু তখনও এ কাজের কোনো নিয়মতান্ত্রিক পন্থা তার সামনে ছিল না।

আরব মুজাহিদীনকে সাহায্যের সৌভাগ্য
ওই সময়ের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আরব মুজাহিদীনের খেদমত এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ লাভ করেন। গোটা পৃথিবী থেকে সাধারণভাবে এবং আরব বিশ্ব থেকে বিশেষভাবে হাজার সংখ্যক মুসলিম প্রথমে রুশবিরোধী জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য এবং পরবর্তীতে তালেবানের শাসনামলে ইসলামী সরকার প্রতিরক্ষা করে আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার জন্য আফগানিস্তানে জমায়েত হন। আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলা করে তখন এই মুজাহিদীনই তোরাবোরা ও শাহীকোটে জীবন হাতে নিয়ে

[121]

কাফেরদের মোকাবেলা করেন এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেন। অতঃপর যখন আমেরিকা ডেইজি কাটার ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা বাড়িয়ে দেয় এবং ফখরে উম্মাহ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনকে পিছিয়ে গিয়ে দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেন, তখন এই মুহাজির হযরতগণ আফগানিস্তানের সংলগ্ন গোত্রীয় অঞ্চল এবং পাকিস্তানের শহরে চলে যেতে আরম্ভ করেন। ইতিহাসের নাজুক মুহূর্তে পাকিস্তানের পারভেজ সরকার এবং সেনাবাহিনী যে লজ্জাজনক ভূমিকা পালন করে, তা মীর সাদেক ও মীরজাফরের মতো ধর্ম ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী ব্যক্তিদেরকেও হার মানায়। পারভেজ মোশাররফ এবং তার সেনাবাহিনী একদিকে পাকিস্তানের ভূমি আমেরিকানদের যাতায়াত ও রসদ সরবরাহের জন্য অবাধে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়, অপরদিকে আকাশ পথ ও বিমান বাহিনীকে আফগানিস্তানে আগুন বৃষ্টি বর্ষণকারী মার্কিন বিমানের যাতায়াতের জন্য নিযুক্ত করে। এর চেয়েও লজ্জাজনক ভূমিকা তাদের ছিল। তারা আফগানিস্তান থেকে সরে আসা আরব ও অন্যান্য মুহাজিরকে ধরে ধরে ডলারের বিনিময়ে নিজেদের মনিব আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেয়ার কারবার শুরু করে। পারভেজ মোশারফ এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাফের বিশ্বের প্রধান আমেরিকার সাহায্যে এমন হৃদ্যতা ও আন্তরিক প্রশস্ততার উদাহরণ দিয়েছে, খোদ আমেরিকানদের ভাষায় যা তাদের জন্য আশাতীত ছিল।

একদিকে যেমন সেনাবাহিনীর এই ঘৃণ্য ভূমিকা সামনে আসে অপরদিকে ওয়াজিরিস্তান থেকে লাহোর ও করাচি পর্যন্ত এমন বহু ঈমানদার ব্যক্তি ছিলেন, যারা মৃত্যুর মুখে নিজেদের ঈমানী ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ান। তাদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেন। নিজেদের জীবন অর্থ-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের

[122]

চেয়ে তাদের হেফাযত ও সুরক্ষার প্রতি বেশি যত্নবান থাকেন। নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব পালনে তারা সবকিছু উৎসর্গ করে দেন।

২০০২ সালে তোরাবোরা থেকে থেকে কিছু আরব মুজাহিদ বের হন যাদের মাঝে অধিকাংশই জখমি ছিলেন। কোহাত শহরের পথ ধরে চিকিৎসা ও বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তারা পেশোয়ারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পাকিস্তানি সিকিউরিটির সংস্থা তাদেরকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। উভয়পক্ষের সংঘর্ষ হয়। কিছু আরব মুজাহিদ শহীদ হন। কয়েকজন গ্রেপ্তার হন এবং কিছু সাথি আহত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে সফল হন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে সাহায্য-সহযোগিতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করে দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ। যেহেতু সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার কারণে তিনি আরবী ভাষায় বেশ পারদর্শী ছিলেন, এ কারণে আরব মুজাহিদীনের আনসার ভাইগণ তাঁকে তরজুমান তথা অনুবাদক হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি আরব গাযীদের আখলাক, কুরআন তিলাওয়াত এবং দীনকে খুব গভীর থেকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার বিষয়গুলো দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। তিনি সে সময় ওই আরব হযরতদের কাছে আবেদন করেন তাকেও জিহাদী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য। তিনি নিজেকে জিহাদের জন্য উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ওই হযরতগণ এ কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এখন তো আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ ঠিকানায় নিয়ে যেতে ব্যস্ত; নতুন কোন জিহাদী কার্যক্রম সংগঠিত করার অবস্থায় আমরা এখন নেই। এছাড়াও কিছু আরব পরিবার, বিধবা ও ইয়াতীমদের সাহায্য করার সৌভাগ্য তখন তিনি লাভ করেন।

[123]

পুনরায় দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ
জিহাদের ময়দানে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না হওয়াতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিরাশ হয়ে বসে যাননি। তিনি পুনরায় দাওয়াতী ও শুদ্ধিমূলক কার্যক্রম আরম্ভ করেন। এখন তার ক্লাসগুলোতে জিহাদ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো খুব বেশি আলোচিত হতে আরম্ভ করে। যুবকদের মাঝে জিহাদী আবেগ উদ্দীপনা তৈরি করা এ সময় তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে শারীরিক প্রশিক্ষণ, ব্যায়াম, The Margalla Hills / মার্গাল্লা পাহাড়ে পায়ে হেঁটে ওঠাও তার দৈনন্দিন রুটিন-প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ঈমানী ও দৈহিক প্রশিক্ষণের যত পন্থা শহরে থাকা অবস্থায় অনুসরণ করা যায়, তিনি সবকিছুই চালু রাখেন। সেই সঙ্গে আফগানিস্তান জিহাদে অংশগ্রহণের পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন।

হাফেজ মালিক তৈয়ব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহ: সমকালীন জিহাদের একজন অখ্যাত নেতা
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে জিহাদে নিয়মতান্ত্রিকভাবে যুক্ত করতে ‘নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ’ ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জিহাদের দাঈ শহীদ হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহর মৌলিক অবদান ছিল। জিহাদে অংশগ্রহণের কয়েক বছর পর স্বয়ং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাকে একবার বলেছিলেন যে, আমার জিহাদে আসার পেছনে হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহর অবদান ছিল। এ কারণে হাফেজ সাহেবের পরিচয় এবং তার সম্পর্কে কিছু কথা এখানে তুলে ধরা লাভজনক হবে ইনশাআল্লাহ! হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহর জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা উম্মাহর এই অমূল্য রত্ন, মহান [124]

ব্যক্তিত্বের জীবনী মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন, আমীন।

২০০৩ সালে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পরামর্শ ও পীড়াপীড়িতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ ফ্যাকাল্টিতে আমি ভর্তি হই। আমাদের কিছু ক্লাস দিনে হতো আর কিছু ক্লাস জোহরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আবার কখনও সকালে কয়েক ঘণ্টা ক্লাস হবার পর সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা ক্লাস হতো। মাঝখানের সময়টুকু কাটানো একটা সমস্যার বিষয় ছিল। সময় কাটানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট লাইব্রেরিতে চক্কর দেয়াও একটা ভালো উপায় ছিল, কিন্তু ওই বয়সে সাত আট ঘণ্টা লাইব্রেরিতে কাটানো তেমন পছন্দনীয় অপশন ছিল না। এরপর আবার ওই সময়ে দিনের খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য একটা ঠিকানার প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তাআলার সাহায্যে আমার ক্লাসের গুজরাটের একজন সাথি ছিল। তিনি ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে থাকতেন। তিনি যখন আমার কষ্টের বিষয়টি জানতে পেরে সময় কাটানোর জন্য হোস্টেলে নিজের রুমে আসার দাওয়াত করেন। তার রুমে প্রবেশের পর হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। হাফেজ সাহেবের প্রাথমিক সাক্ষাতের পর থেকেই ভবিষ্যতের প্রতিটি সাক্ষাতে তার প্রতি মুহব্বত ভালোবাসা বন্ধুত্ব শ্রদ্ধা ও আস্থা আমার ভেতরে স্থান করে নিতে থাকে। দীর্ঘ সময় তার সান্নিধ্য লাভের পর ২০১৫ সালে আইএসআই’র লুটেরাদের হাতে সাজানো এনকাউন্টারে তিনি শহীদ হয়ে রবের সঙ্গে মিলিত হন। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করুন এবং জান্নাতুল নাঈমে তাকে ভালো রাখুন, আমীন।

হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহ অ্যাটক জেলার হাজরো টাউনের লোক, কিন্তু তিনি লাহোরে জীবন কাটিয়েছেন। পিতা ও চাচার ব্যবসায়ের সুবাদে

[125]

তিনি সেখানেই ছিলেন। তার পিতা মালিক মুহাম্মদ নেওয়াজ সাহেব খুবই দীনদার, রাত্রি জাগরণকারী, সামাজিক ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পেশোয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করেন এবং লাহোরের একটা ইন্ডাস্ট্রির চাকরি শেষ করে অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন। অপরদিকে হাফেজ সাহেবের চাচা পেশায় ডাক্তার ছিলেন এবং লাহোর সরকারি হসপিটালের প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন। কুরআন পাকের সঙ্গে তার পিতার মুহব্বতের সম্পর্ক এমন ছিল যে, তিনি রিটায়ারমেন্টের পর কুরআন হিফজ করেন। হাফেজ সাহেবের মুহতারাম মাতা এমন সময় ইন্তেকাল করেন যখন তার বয়স মাত্র চার বছর ছিল। সে সময় হাফেজ সাহেবের ছোট ভাই হাফেজ ইমরান নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহ দুই বছর বয়সী ছিলেন। পিতাই তাদেরকে লালন-পালন করেন। সন্তান লালনের জন্য পুরো জীবনে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।

হাফেজ সাহেব রুশ বিরোধী জিহাদের শেষ সময়ে যখন তিনি পুরোপুরি যুবক ছিলেন, তখন আফগানিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র বয়সে ইসলামী জমিয়তে তলাবার একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে দীনি নবজাগরণ এবং সমাজ থেকে অনাচার দূরীকরণে আন্দোলনরত ছিলেন। হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ ইসলামী জমিয়তে তালাবার স্থানীয় এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। আফগানিস্তান থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর স্বদেশে ফিরে লাহোর শহরে আমর বিন মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনে নিমগ্ন হন। এ সময় লাহোরে ভিডিও সেন্টারের মালিকদেরকে এই কাজ ছেড়ে দিতে উৎসাহিত করেন। অশ্লীল সাইনবোর্ড নষ্ট করা, সার্কাস ও মেলার মধ্যে নাচ-গানের আসর বন্ধ করা এবং অন্যান্য

[126]

নিষিদ্ধ বিষয় থেকে শহরকে পবিত্র করার কাজে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৯৭ সালে তিনি তথায় গমন করেন। সেখানে উস্তাদুল মুজাহিদীন শায়খ আবু খাব্বাব মাসরী রহিমাহুল্লাহর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর থেকে শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে মুজাহিদীনের সাহায্য-সহযোগিতার পাশাপাশি কার্যত জিহাদে শরীক থাকেন। ২০০০ সাল থেকে তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামাবাদের শরীয়াহু বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত ছিলেন। আগাগোড়া তিনি প্রেমময় ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে আমি তার মহব্বত ভালোবাসা মেহমানদারী আতিথিয়তা কৃত্রিমতা ও দীনদারীর দ্বারা প্রভাবিত হই। হোস্টেলের রুমে আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর মুহূর্তেই এতটা অকৃত্রিম অকপট আচরণ শুরু করেন, যেন বহু বছরের বন্ধুত্ব। হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ প্রতিটি বৈঠকে কোনো না কোনো ইসলাহী বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতেন। উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান বজায় রাখা, নিজেকে শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনা করা, সুন্নতের অনুসরণ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনের ঘটনা—এগুলোই ছিল তার আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রথম কয়েকবারের সাক্ষাতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি হযরতে আকদাস মুফতী রশিদ আহমদ রহিমাহুল্লাহকে জানেন?” যরবে মুমিন-এ আমি হযরত ওয়ালা রহিমাহুল্লাহর নাম বারবার পড়েছি। এতটুকুই জানতাম আর সেটাই বলে দিই। তখন হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে হযরত মুফতী সাহেব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে বিস্তারিত পরিচয় করিয়ে দেন। তার ইলমী অবস্থান ও রচনাবলী সম্পর্কে

[127]

পরিচয় করান। জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি তার মুহব্বত এবং ইমারতে ইসলামিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেন। হাফেজ সাহেব হযরত ওয়ালা মুফতী সাহেব রহিমাহুল্লাহর ওই বয়ানের বাক্যগুলো হুবহু মুখস্থ পারতেন, যেই বয়ানে তিনি আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রণাঙ্গনে যাবার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন। হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে ওই বয়ানের কথাগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে শোনাতেন। শোনানোর সময় যখন আমীরুল মুমিনীন কর্তৃক হযরত মুফতী সাহেব রহিমাহুল্লাহকে রণাঙ্গনে যেতে বারণ করার ঘটনা বর্ণনা করেন এবং হযরত মুফতী সাহেব রহিমাহুল্লাহর অস্থিরতা ও শাহাদাতের ব্যাকুলতা তুলে ধরতেন, তখন শোনাতে শোনাতে হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজেই অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতেন। এভাবেই জিহাদ এবং রণাঙ্গনে যাবার ভালোবাসা তিনি আমাদের অন্তরে সঞ্চার করতেন। এরপর কোনো একদিন হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ হোস্টেলের বৈঠকগুলোতে হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহিমাহুল্লাহর রেশমী রুমাল আন্দোলনের বাছাইকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন। মালটা দ্বীপের বন্দীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন এবং তার আলোকে একদিকে আমাদের অন্তরে জিহাদের ভালোবাসা সঞ্চার করতেন, অপরদিকে উলামায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব আমাদেরকে বোঝাতেন।

হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ যখন আমাদেরকে উলামায়ে কেরামের ঘটনা শোনাতেন, তখন তাদের রচনাবলী বই-পুস্তক বয়ান বক্তৃতা ও উপদেশ বাণীও তুলে ধরতেন। নির্বাচিত উলামায়ে কেরামের সঙ্গে আমাদেরকে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যেতেন এবং কিছু কিছু জুমার বয়ানে বড় গুরুত্বের সঙ্গে আমাদেরকে অংশগ্রহণ করাতেন। হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদীনের দূরত্ব মুছে দিতে

[128]

প্রয়াসী ছিলেন। তাই তিনি একদিকে যেমন উলামায়ে কেরামের কাছে মুজাহিদীনের অবস্থান তুলে ধরার কাজ করতেন, অপরদিকে মুজাহিদীনের এমন মনোভাব তৈরি করতেন, যেন তারা উলামায়ে কেরামের কথা মান্য করেন এবং তাদের সামনে দুই হাঁটু গেড়ে বসতে শেখেন।

কর্মপরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা এবং শরীয়াহ রাজনীতি হাফেজ রহিমাহুল্লাহ বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। তার রায় ও পরামর্শ অনেক বড় বড় অভিজ্ঞতার সার নির্যাস ছিল। তা হতে সর্বদা কল্যাণ ও দূরদর্শিতারই প্রমাণ মিলতো। হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ দলমত নির্বিশেষে সকল মুজাহিদের সাথি এবং সকলের মাঝে তাবলীগকারী ছিলেন। তিনি সকলের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের ফোয়ারা ছিলেন। অন্যান্য দলেরও অনেক মুজাহিদ তার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিষয়ে পরামর্শ করে আশ্বস্তি লাভ করতেন।

হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, তাযকিয়াতুন নাফস, আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক প্রশিক্ষণ ছাড়া সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর চলা খুবই কঠিন বিষয়। দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগ্রহে কখনও কখনও মানুষ চিরকালীন শত্রু অভিশপ্ত শয়তানের ফিতনা ও প্রতারণার কথা ভুলে যায়। এই অবস্থায় যদি কোনো আত্মশুদ্ধির সাধক ও সংশোধনকারীর সান্নিধ্য পাওয়া যায় তাহলে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা খুব সহজ হয়। এ কারণে হাফেজ সাহেব তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির মজলিসে জিহাদরত সাথিদেরকে শরীক করতে আগ্রহী ছিলেন। তার দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই এটা তার জন্য সাদাকায়ে জারিয়ার কারণ হবে ইনশাআল্লাহ!

হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং সাদাকায়ে জারিয়া হচ্ছে - এক দশক যাবৎ

[129]

মুজাহিদীনের অবস্থান প্রতিনিধিত্বকারী ‘নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ’ ম্যাগাজিন। তিনিই এই ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা এবং তারই চিন্তা ও তত্ত্বাবধানে এই ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। গোটা পাকিস্তানে এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে দীন ও জিহাদের দাওয়াত প্রচারিত হয়। বিরাট সংখ্যক লোকের জিহাদে অংশগ্রহণ ও সাহায্য-সহযোগিতার পেছনে এই ম্যাগাজিনেরই অবদান। যতদিন পর্যন্ত প্রেসের মুদ্রণে সুযোগ সুবিধা ছিল, ততদিন পর্যন্ত এই ম্যাগাজিন প্রতি মাসে ২০ হাজার সংখ্যা মুদ্রিত হতো এবং এটি পাকিস্তানের সবচেয়ে বহুল প্রচারিত পত্রিকা ছিল।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ শহীদ রহিমাহুল্লাহর ছিল সালাম কালামের সম্পর্ক; তেমন একটা মিল তাদের ছিল না। তিনি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে একজন মেধাবী ও মুত্তাকী শিক্ষার্থী বলেই মনে করতেন। হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে জিহাদী আলোচনা শুনে আমি ওই কথাগুলো ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে বলতাম। এর দ্বারা তাঁর জিহাদের আগ্রহ আরও বেড়ে যেত। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। সম্ভবত তার বড় কারণ হলো তাঁর দাওয়াতী ব্যস্ততা। জিহাদে বের হবার আগ দিয়ে তাঁর দাওয়াতী ব্যস্ততা, ক্লাস, প্রোগ্রাম এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার নিকটতম বন্ধু হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান রহিমাহুল্লাহ একদিন আমাকে তার ভালোবাসা ও সরলতা মেশানো ভঙ্গিতে বলেন, “ভাই এখন অন্তত তুমি নিজের পড়াশোনা ও সবকে মন দাও এই সালমান

15 খুবই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে
গিয়েছে; এখন নিজের পড়াশোনা ও সবকে তার মনোযোগ কম” আমি হতবাক হয়ে জবাব দিলাম: “সালমান ভাই এবং

15 ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহ-আলাইহির আসল নাম
[130]

রাজনীতি? কি বলছেন মাওলানা সাহেব?” মাওলানা রহিমাহুল্লাহ বলেন: “ভাই! রাজনীতি মানে: তিনি পড়াশোনায় কম মনোযোগী এবং দীনের দাওয়াতে বেশি মনোযোগী।”

যাই হোক হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ যতই আমার অন্তরে জিহাদের আগ্রহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে থাকেন, ততই তার কাছে আমি এই দাবি করতে থাকি, তিনি যেন আমার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণের কোন ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহকে জান্নাতের সর্বপ্রকার নেয়ামত দান করুন। তিনি আলেমে রব্বানী উস্তাদুল উলামা শায়খ আব্দুল হাকিম হাসসান (সালেম মারজান) রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, যিনি শায়খ ঈসা আল মাসরী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আলেমে রব্বানী শায়খ ঈসা আলমাসরী রহিমাহুল্লাহর শরীয়াহ ক্লাস
তিনি ইলমে দীন, তাকওয়া, লিল্লাহিয়াত, নিষ্ঠা, বিনয়, সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রতীক ছিলেন। শায়খ ঈসা রহিমাহুল্লাহ জামিয়া আল-আযহার থেকে দীনী বিষয়ে পড়াশোনা সমাপন করেন। এরপর ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ জামিয়া ঈমানে অধ্যাপনা করতে থাকেন। মিশরে যখন জিহাদী আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনি আন্দোলনের কাজী ছিলেন। কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর ঘনিষ্ঠজন ও সহকারী ছিলেন। রুশ আমলের শেষ দিকে আফগানিস্তানে হিজরত করেন। তালেবানের সময়কালে মুজাহিদীনের নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য শরীয়াহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরবী ভাষায় জিহাদী ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। তিনি দল মত নির্বিশেষে সকল মুজাহিদের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার [131]

পর পাকিস্তানে চলে যান এবং সেখানে শত শত পাকিস্তানি যুবককে শরীয়াহ ক্লাসের মাধ্যমে জিহাদে যুক্ত করেন। ২০০৮ সালে তিনি ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন কিন্তু পথিমধ্যে গ্রেফতার হয়ে মিশরে আসেন। মিশরে কারাগারে তার ব্যাপারে মামলা চলতে থাকে। এরই মধ্যে মিশরের তাগুত হুসনি মুবারকের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয় এবং মুসলিম ব্রাদারহুড ক্ষমতায় আসে। তখন রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তিনিও মুক্তি লাভ করেন। মুক্তির পাওয়ার পুনরায় দীন ও জিহাদের দাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেখানে বসে মুজাহিদীনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাদের বিপক্ষে উত্থাপিত আপত্তির জবাব দেন। মিশরে যখন সময়ের ফেরাউন জেনারেল সিসি ক্ষমতা দখল করে এবং পুনরায় মিশরের মুসলিমদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন আরম্ভ হয়, তখন শায়খ ঈসা রহিমাহুল্লাহও গ্রেফতার হন এবং পরিশেষে কারাগারের নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কারাগারেই রবের সঙ্গে মিলিত হন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং দীন ইসলামের তরে তার সকল খেদমত ও অবদানের কারণে আমাদের পক্ষ থেকে এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদৌসকে তার ঠিকানা বানিয়ে দিন, আমীন।

সিন্ধু নদী থেকে একটু দূরে সুন্দর একটি গ্রামের একটি কক্ষে শায়খ ঈসা রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে শরীয়াহ ক্লাস করান। ধারাবাহিকভাবে তিন দিন পর্যন্ত ক্লাস চলে। সেখানে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মর্মবাণী এবং সংক্ষিপ্ত মাসায়েল বর্ণনা করা হয়। কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার শরঈ হুকুম, শরীয়াহ বহির্ভূত আইন প্রণয়ন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর আলোচনা হয়। উস্তাদ মুহতারাম শায়খ ঈসা

[132]

রহিমাহুল্লাহ প্রমাণ নির্ভর আলোচনা করেন। কুরআন হাদীসের দলীল প্রমাণ তো বটেই; ইতিহাস ও সমকালীন বৈশ্বিক অবস্থার আলোকেও তিনি উত্তম দিকনির্দেশনা দান করেন। তার ওই ক্লাসের দ্বারা আমরা সীমাহীন প্রভাবিত হই। আমরা ক্লাসের আলোচনার নোট তৈরি করি এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে অংশগ্রহণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ঘরে ফিরে আসি।

জিহাদ যদি ফরযে আইন হয়ে থাকে তাহলে বিলম্ব কিসের?
দাওরা বা ক্লাস শেষে যদিও শহীদ হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহর নির্দেশনা ছিল এই ক্লাসে অংশগ্রহণের কথা যেন আমরা পুরোপুরি গোপন রাখি; কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি করে আমার দুইজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে অবশ্যই এ বিষয়ে জানাবার ব্যাপারে হাফেজ সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিই। এ দুজনের মাঝে একজন হলেন আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ। ফিরে গিয়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনিও আমার হঠাৎ নিখোঁজ হবার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করেন। আমি তাকে নিয়ে বাহিরে রাস্তায় আসি। হাঁটতে হাঁটতে আমি তাকে শায়খ ঈসা রহিমাহুল্লাহর দাওরার সংক্ষিপ্তসার এবং সকল বিষয়বস্তুর খোলাসা বর্ণনা করি। তিনি নীরবে শুনতে থাকেন এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন। আমার ধারণার বিপরীতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমার কথা শুনে কোনো আবেগ না দেখিয়ে বরং খুব সরলতা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমাকে বলেন: “ভাই আপনি তো আমার একাগ্রতা নষ্ট করে দিয়েছেন। আমি পুরোপুরি একাগ্রতা সহকারে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এখন এগুলো জানার পর কিভাবে আমি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেব?” তখন থেকে খুব সম্ভব একমাস পর

[133]

বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সর্বশেষ পরীক্ষা ছিল, যার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পড়াশোনা সমাপ্ত হতো। আমি বললাম: “আপনাকে পরীক্ষা দিতে কে বারণ করেছে? কিন্তু যখন মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতির কারণে জিহাদ আমাদের ওপর ফরয তখন আমাদের জবাব কি হওয়া উচিত?” তিনি বলেন: “এজন্যই তো আমি বলছি, আমাকে বিরক্ত করবেন না! এইতো শুধু পরীক্ষার আগ পর্যন্ত! পরীক্ষার পর তো এই কাজই করতে হবে” বিরতি দিয়ে কিছু সময় পর আবার বলে ওঠেন: “তবে হ্যাঁ আমি মুজাহিদীনের কিছু উলামায়ে কেরাম ও বড় হযরতের সঙ্গে মিলে জিহাদে যেতে চাই। কারণ বিভিন্ন বিষয়ে আমার আশ্বস্ত হতে হবে।” এরপর নিজেই বলতে লাগলেন: “আচ্ছা বন্ধু এই মুজাহিদীন কাফেরদেরকে হত্যা করে যতটা আনন্দিত হয়, কাফেরদের ইসলাম গ্রহণে কি অতটা আনন্দ পায়? আপনি দাওরা থেকে কি বুঝলেন?” আমি আবেগ তাড়িত হয়ে বললাম: “একদম! এমনকি কাফেরদেরকে হত্যা করার চেয়েও তাদের ইসলাম গ্রহণের দ্বারা তারা বেশি খুশি হয়। আজ যদি বুশও মুসলিম হয়ে মুসলিমদের সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়, তাহলে মুজাহিদীন তাকেও বুকে জড়িয়ে নিতে তৈরি।” এ কথা শুনে তিনি মুচকি হেসে বলেন: “এ কথাও মনে রেখেন, আমি যখন জিহাদে বের হবো, তখন একা যাবো না। বছরের পর বছর দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহে যত সাথি ও বন্ধু তৈরি হয়েছে, তাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।” সাক্ষাৎ শেষে আমরা এ বিষয়ে হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে একমত হই।

হাফেজ সাহেবের সঙ্গে ফারুক ভাইয়ের সাক্ষাৎ যদিও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, “আমাকে বিরক্ত না করে পরীক্ষার

[134]

প্রস্তুতি নিতে দিন” কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ভেতরে ভেতরে ‘বিরক্ত’ হয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চায়ের আড্ডায় আমাদের তিনজনের সাক্ষাৎ ঘটে। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে মুজাহিদীনের সর্বশেষ অবস্থা এবং সাধারণ দীনি ও ঈমানি বিষয়ে আলাপ হয়। হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে পরীক্ষা শেষে লাহোরে তাদের বাড়িতে দাওয়াত করেন। তিনি দাওয়াত কবুল করেন।

হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লাহোর সফর
পরীক্ষা শেষ করার পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ লাহোর সফরের জন্য অস্থির ছিলেন। আমরা দুজনেই লাহোর গমন করি এবং হাফেজ তৈয়ব ভাই রহিমাহুল্লাহর অতিথি হই। তার মহব্বত, ভালোবাসা, মেহমানদারী, আতিথিয়তা ও নিষ্ঠা আমাদেরকে সীমাহীন প্রভাবিত করে। খুব সম্ভব আমারও এই প্রথমবার হাফেজ সাহেবের ঘরে আসা। লাহোরে হাফেজ সাহেব আমাদেরকে উর্দু বাজার ঘুরে দেখান এবং উলামায়ে কেরামের অনেক কিতাবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিছু কিছু কিতাব তিনি আমাদেরকে হাদিয়া দেন। লাহোরে অবস্থানকালে কয়েকজন আলেম ও মুজাহিদীনের আনসার ব্যক্তির কাছে আমাদেরকে নিয়ে যান। জিহাদী বিষয়ে তাদের সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আলাপ আলোচনা করেন। এখানে একজন দায়িত্বশীল মুজাহিদ সাথি জিহাদের মাসায়েল সম্পর্কিত শায়খ ঈসা রহিমাহুল্লাহর একটি পুস্তিকা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে অনুবাদ করার জন্য দেন। পরবর্তীতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ অনেক পরিশ্রম করে গুরুত্ব সহকারে পুস্তিকাটি অনুবাদ করেন।

[135]

যেন আমার অন্তর প্রশান্তি পায়
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ লাহোর থেকে ফেরার
পর জিহাদ ও মুজাহিদীনের ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন, এমন কারও সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হোক, যিনি তাকে মুজাহিদীন — বিশেষত শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত বোঝাবেন। তিনি এমন কারও সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলেন, যিনি আরব মুজাহিদীনের লেখালেখি ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত এবং তাদেরকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ যার হয়েছে। তিনি এমন কারও সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলেন, যিনি মুজাহিদীনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অবস্থান যাচাই-বাছাই করতে পারেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাদের ওপর আপত্তি উঠিয়ে সেগুলোর জবাব দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন।

জিহাদের দাঈ ইঞ্জিনিয়ার শায়খ আহসান আজিীজ রহিমাহুল্লাহর খেদমতে
ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচিতি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের তালিকায় সামনে আলোচনা করা হবে। তিনি আযাদ কাশ্মীরের মিরপুর শহরের সন্তান। ইঞ্জিনিয়ার রহিমাহুল্লাহ ২০০৪ সালে গোপন এজেন্সির কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন। আইএসআই তাকে আরব মুজাহিদীনের সাহায্যের অপবাদে গ্রেপ্তার করেছিল। তার গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে আয়োজিত মিটিং মিছিলের

[136]

কারণে তার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির অঙ্গনে তার নামও বেশ পরিচিত ছিল। মুক্তি লাভের পরপরই মুরি শহরের এক জামে মসজিদে তিনি সূরাতুল কাহাফ-এর আলোকে দাজ্জালের ফিতনার মোকাবেলা শীর্ষক একটি আলোচনা করেছিলেন। তাতে আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়। এর কিছুদিন পর ইসলামাবাদের এক জামে মসজিদে তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামাবাদের শিক্ষার্থীদের জন্য ‘আখেরি জমানার ফিতনা সমূহ এবং ইহুদীদের কূটচাল সম্পর্কে সচেতনতা’ বিষয়ে ডক্টর সফর আল-হাওয়ালি রচিত ‘পরিশেষে কি হবে’ গ্রন্থের আলোকে আলোচনা করেন। এই আয়োজনের সভাপতিত্ব করেন হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ ভাই রহিমাহুল্লাহ, যিনি কিছুকাল যাবৎ শায়খ আহসান আজীজ সাহেব রহিমাহুল্লাহর বন্ধুবর্গের একজন। এই উভয় দরসের সংক্ষিপ্তসার ও নির্যাস ছিল: পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে ঘৃণা, আখিরাতের ফিকির, ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি এবং সুন্নাহ্ অনুসরণ। আহসান আজীজ শহীদ রহিমাহুল্লাহর আকর্ষণীয় আলোচনা ভঙ্গিতে তার ভালোবাসা অন্তরে স্থান করে নেয় এবং তার দীর্ঘ সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত হয়।

জামিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য Mangla Dam-এ একটা শিক্ষা সফরের সিদ্ধান্ত হয়। আমি এমনিতে এ ধরনের সফর থেকে দূরে থাকতাম কিন্তু মংলা
- মিরপুর শহরের পাশে হওয়ায় মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগে, কে জানে এই সুযোগে শায়খ হাসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় কিনা। মংলা বাঁধ সফর শেষ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের একজন প্রিয় বন্ধু রশিদ খান —যিনি মিরপুরেই বসবাস করতেন— পীড়াপীড়ি করেন তার সঙ্গে তার বাড়ি যাওয়ার জন্য। আমরা এই শর্তে তার বাড়ি যেতে রাজি হই যে, তিনি

[137]

ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর
সঙ্গে আমাদেরকে
সাক্ষাৎ করিয়ে
দেবেন। একই এলাকার
হওয়ার কারণে আহসান
আজীজ সাহেবের সঙ্গে
তার কিছুটা পরিচয় ছিল। তিনি রাজি হন এবং নৈশভোজের আয়োজনে আহসান আজীজ সাহেবকে দাওয়াত করেন।

এটা ওই সময়কার কথা, যখন ভানা ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি ফৌজ অন্যায় অপারেশন শুরু করেছিল। গোত্রীয় অঞ্চলের ঘরবাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হচ্ছিলো। আগুন ও বারুদের বৃষ্টি বর্ষণ করে গোত্রগুলোকে ধর্মীয় আত্মমর্যাদা বোধের শাস্তি দেওয়া হচ্ছিলো। ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে গোত্রগুলোর ইজ্জত সম্মান পদদলিত করা হচ্ছিলো। ভানার হাজার হাজার শরণার্থী কাফেলা হিজরত করে সীমান্তবর্তী প্রদেশের সংলগ্ন জেলাগুলোতে এক দরজা থেকে অন্য দরজায় গিয়ে একটুখানি আশ্রয় খুঁজছিল। পাঞ্জাবের বিভিন্ন ছাউনি থেকে প্রতিদিন সেনাবাহিনীর উদ্যমী বাহিনীকে ট্রাকে বসে ডেরা ইসমাইল খান অভিমুখে যেতে দেখা যাচ্ছিলো। শুধু সেনাবাহিনী নয়; বিমান বাহিনীর বিমান দিয়ে বোমা বর্ষণের ঘটনাও কানে আসতে আরম্ভ করেছিল। ভানার.((((পিডিএফ ফাইলে ৮১ নম্বর পৃষ্ঠার শুরুর দিক থেকে তৃতীয় লাইন))))....... মুসলিমদের একটাই অপরাধের কথা শোনা যাচ্ছিলো যে তারা আরব ও অন্যান্য মুজাহিদকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। নিজেদের দীনের প্রতিরক্ষার জন্য আরব ভূখণ্ড থেকে আসা মুজাহিদীনের মুহব্বত প্রত্যেক সংবেদনশীল অন্তরের পরিচয় ছিল। অবস্থার এই প্রতিকূলতার কারণে আমাদের হৃদয়

[138]

ক্ষতবিক্ষত ছিল। এই অবস্থায় শুধু একটি নির্ভীক গর্জন ও বিরোচিত ভূমিকা রেখেছিলেন কমান্ডার নেক মুহাম্মদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ। তার গর্জন পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুসলিমের হৃদয়ের কথা ছিল।

তিনি ভাঙ্গা বন্দুক এবং ডজনসংখ্যক সাথি-সঙ্গী নিয়ে দুনিয়ার সুসংগঠিত আর্মির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতরণ করেন এবং সেনাবাহিনীর জুলুম-অত্যাচারের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করেন। শহীদ নেক মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানের শির উন্নত করেন। অন্যথায় সেনাবাহিনীর ভূমিকার কারণে পরবর্তীতে নিজেদেরকে পাকিস্তানি পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জিত হতে হতো।

রাতে খাবারের দাওয়াতে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ আসেন, তখন তার চোখ অশ্রু সজল এবং আওয়াজ ভারী ছিল। অধিক দুশ্চিন্তার কারণে তিনি ঠিকভাবে কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি বলতে আরম্ভ করেন যে, গোত্রীয় এলাকায় বোমাবর্ষণ হচ্ছে। দীনের প্রতি মুহব্বতের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কি অপরাধ রয়েছে তাদের? শুধু কি এটাই নয় যে, তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বন্ধনের কারণে মুহাজিরিনকে আশ্রয় দিয়েছে? কেমন করে আমরা গোত্রীয় অঞ্চলের ভাইদেরকে এবং সেখানে অবস্থানরত মুহাজির মুজাহিদীনকে সাহায্য করতে পারি? কেমন করে আমরা নিজেদের ঈমানী মর্যাদা বোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবো? ভোজ অনুষ্ঠানে ভানার অপারেশন নিয়েই আমাদের বেশিরভাগ আলাপ-আলোচনা হয়।

রাতে যখন তিনি নিজ ঘরে যেতে নেন, তখন ওঠার সময় আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, “হযরত আমি আপনার সঙ্গে আবার কিভাবে সাক্ষাৎ করতে পারি?” তিনি বলেন: “আমি [139]

নিজেই আপনার কাছে আসবো আপনি ঘরে আমার অপেক্ষা করুন!”

আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ আমার কাছে আসতে বিলম্ব করেন। ওই সময় পর্যন্ত হাফেজ তৈয়ব রহিমাহুল্লাহ অন্য মুজাহিদীনের মাধ্যমে আমার ভানায় যাওয়ার পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর ওয়াদা মোতাবেক আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ আমার এখানে আগমন করেন। ইঞ্জিনিয়ার রহিমাহুল্লাহ আমাকে বলেন, বর্তমান সময়ে জিহাদে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দাওয়াতের। দুশমনের কাছে সব ধরনের প্রচার মাধ্যম রয়েছে; কিন্তু মুজাহিদীনের নিকট সেই তুলনায় মিডিয়া খুব দুর্বল। এই সময়ে মিডিয়া ব্যবহার করে আমরা শত্রু পক্ষের প্রোপাগান্ডার জবাব দিতে পারি এবং নিজেদের দাওয়াত প্রচার করতে পারি। তিনি বলতে লাগলেন যে, দেখুন শত্রুর শত শত টিভি চ্যানেল এবং রেডিও স্টেশন ২৪ ঘন্টা ইসলাম ও মুজাহিদীনের ব্যাপারে বিষোদগার করে যাচ্ছে। অথচ সেগুলোর জবাব দেয়ার জন্য আমাদের নিকট কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই যেখান থেকে আমরা স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে তাদের সংশয়-সন্দেহের জবাব দিতে পারবো। এ অবস্থায় জিহাদী দরস, ভিডিও, তারানা তথা কবিতা এবং এজাতীয় অন্যান্য মিডিয়া কন্টেন্ট আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা নিজেদের বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দিতে পারি এবং শত্রুর প্রোপাগান্ডা নস্যাৎ করতে পারি; এরপর দেখুন যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য অনেকেই তৈরি কিন্তু মিডিয়ার কাজে মুজাহিদীনের সংখ্যা খুবই কম। শায়খ হাসিন আজীজ রহিমাহুল্লাহ তার আলোচনা শেষ করার পর আমি বলতে লাগলাম, “কিন্তু হযরত আমার ইচ্ছা এখনই ভানায় গিয়ে মুজাহিদীনের সাহায্যে কাজ করবো” তখন তিনি বলেন, আপনার আবেগ অবশ্যই ঠিক আছে, কিন্তু একে তো রাস্তা বন্ধ, অপরদিকে সেখানে বোম্বিং হচ্ছে। এই

[140]

অবস্থায় সেখানে গিয়ে আপনি কি করবেন? তাছাড়া এখনও আপনার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়নি। এই অবস্থায় আপনি ভানায় মুজাহিদীনের কেমন করেই বা সাহায্য করবেন?” শায়খ রহিমাহুল্লাহ আমাকে বোঝাতে থাকেন কিন্তু আমার মাথায় ভানায় যাবার চিন্তাই ঘুরতে থাকে। শায়খ রহিমাহুল্লাহ আমাকে বলেন, “আপনি এ বিষয়ে চিন্তা করুন এবং ইস্তেখারা করে নিন!” আমি বললাম, “যতক্ষণে আমি চিন্তা ও ইস্তেখারা করবো ততক্ষণে আপনি আমার দুজন ঘনিষ্ঠ সাথির সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, তারাও জিহাদ অনেক ভালোবাসেন এবং দাওয়াতি ও শুদ্ধিমূলক কাজে তাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে”। শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ বললেন, “যদি তারা গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেন তাহলে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবো।” এভাবেই শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরি রহিমাহুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সাক্ষাতে মিলিত হন। এদিকে ভানায় যাওয়ার জন্য আমি চেঁচাতে থাকি এর ওদিকে তারা দুইজন নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।

যে প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সন্তোষজনক জবাব আশা করছিলেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল মুসলিমদের সমাজে শুদ্ধিমূলক কার্যক্রম বেশি জরুরি নাকি জিহাদে বেরিয়ে পড়া? এই উভয়টা একসঙ্গে কি চলতে পারে না? এরপর কথা হলো কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের দ্বারা আমাদের সমাজে পরিবর্তন কিভাবে আসবে? শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ বিস্তারিত ভাবে এই বিষয়গুলো ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং সন্তোষজনক জবাব দেন। পরবর্তীতে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেমে

[141]

রাব্বানী, দৃষ্টান্তহীন দাঈ শায়খ আব্দুর রহমান আখন্দযাদা হাফিযাহুল্লাহর সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সাক্ষাৎ করান। এই দুই হযরত মিলে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে বোঝান যে, সমাজ সংস্কার জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ একটি অপরটির বিপরীত নয় বরং সম্পূরক। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ যে সমাজে চর্চা হয় সেখানে কল্যাণ বৃদ্ধি পায় এবং অকল্যাণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কথা হচ্ছে, অকল্যাণের বিস্তার এবং সামাজিক অধঃপতনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো কুফরী শক্তির প্রাধান্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরী শক্তিকে পরাজিত অথবা দুর্বল করা না যাবে, কেমন করে সমাজ সংস্কারের কাজ করবো? এই অবস্থায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহের মাধ্যমে কুফরকে দুর্বল করা হয় এবং আল্লাহর বাণী সমুন্নত হয়। ফলে সমাজে শুদ্ধিমূলক কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করা যায়। এরপর কথা হচ্ছে, এই উভয় কাজ একই সঙ্গে করা সম্ভব। যেমনিভাবে মদীনার সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে জিহাদও চলতো এবং আত্মশুদ্ধি সংশোধন ও সংস্কারের কাজও চলতো। শুধু তাই নয় বরং নৈতিক প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির কিছু স্তর তো জিহাদের পরিবেশেই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে দিয়ে অতিক্রম করিয়েছেন। এক কথায় ইলমী দলীল প্রমাণ এবং চিত্তাকর্ষক পন্থায় শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আব্দুর রহমান আখন্দযাদা হাফিযাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সংশয়গুলো দূর করেন। এরপর তিনি পুরোপুরি একাগ্রতা ও আশ্বস্তি সহকারে মুজাহিদীনের সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে যান।

[142]

পঞ্চম অধ্যায়: জিহাদী
কাফেলায় অংশগ্রহণ

আনসারুল মুজাহিদীন হলেন যখন…
২০০৪ সালে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ রীতিমতো বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনে যুক্ত হন। ভাইয়ের দাওয়াতী কার্যক্রম আগের মতোই চলতে থাকে এবং তিনি বন্ধুদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার কাজ আরও বেগবান করেন। সেই সঙ্গে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর তত্ত্বাবধানে মুজাহিদীনের সাহায্য সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন। মুজাহিদীনের আশ্রয় তৈরি, তাদের জন্য রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা, আহতদের চিকিৎসা করানো এবং মিডিয়ার কিছু কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা তার ব্যস্ততা হয়ে ওঠে। ওই সময়ে সারা দেশে সফর করে জিহাদী দাওয়াত আরও অধিক প্রচারের সুযোগ তিনি পান। তিনি আইন শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠানেও ভর্তি হন কিন্তু তা ছিল শুধু সমাজে টিকে থাকার একটি উপায় মাত্র; নয় তো তিনি ওই সময় থেকেই ফুল টাইমার মুজাহিদ হিসেবে নিজের ঘরে থাকতেন।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রথম বিবাহ
ওই বছর অর্থাৎ ২০০৪ সালেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ প্রথম বিবাহ করেন। তার ভদ্রতা সংক্রান্ততা সম্ভ্রান্ততা, দীনদারী ও উন্নত নৈতিকতার কারণে তার স্ত্রীর পিতা-মাতার অতি আগ্রহে এই বিবাহ হয়। শোনা গেছে তার স্ত্রীর পরিবারের কিছু আত্মীয়-স্বজনের সেনাবাহিনী ও গুপ্ত সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যখন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে অংশগ্রহণ এবং নিজের সর্বস্ব আল্লাহর দীনের জন্য

[143]

قُـلْ إِن كَـانَ آبَـاؤُكُمْ وَأَبْنَـاؤُكُمْ وَإِخْـوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِـيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَـارَةٌ تَخْشَـوْنَ كَسَـادَهَا وَمَسَـاكِنُ تَرْضَـوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَـأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين

তোমাদের বাসস্থান -যাকে তোমরা পছন্দ কর -আল্লাহ , তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় , তবে অপেক্ষা কর , আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত , আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। ” [সূরা তওবা ০৯ :২৪]

এ কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। তিনি দীনের উপর আমল করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করে জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন।

মরুভূমিতে তৈরি হয় ফারুকী ও সালমানী [16]

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ একটা সময় পর্যন্ত শহরে থেকে জিহাদের দাওয়াত ও সাহায্য -সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু তার অন্তরে কার্যতভাবে কিতাল ফী সাবীলিল্লাহে অংশগ্রহণের অস্থিরতা সীমাহীন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ কারণে তিনি অধিকাংশ সময়ে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর কাছে দাবি জানাতেন তাকে কিতাল ফী সাবীলিল্লাহে কার্যতভাবে অংশগ্রহণের জন্য ওয়াজিরিস্তান অথবা আফগানিস্তানে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। অবশেষে যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিদের দাওয়াতী কার্যক্রম প্রচার পেতে আরম্ভ করলে তিনি গ্রেফতার হবার আশঙ্কা তৈরি হয় , তখন আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ ওয়াজিরিস্তানে হিজরতের সিদ্ধান্ত

---

[16] ইকবালের কবিতার পুরো লাইন কিছুটা এরকম :

ا□ شیخ ب□ت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی

অর্থ : হে শাইখ ! শহুরে বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনেক ভালো কিন্তু মরুভূমিতেই ফারুকী ও সালমানীরা তৈরি হয়।

প্রদান করেন। ওই সময় পর্যন্ত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেও এমন সাথিদের টিম তৈরি করে নিয়েছিলেন, যারা হিজরত ও জিহাদের সফরে তার সঙ্গী হবেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর টিম চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও পুরোপুরি পরিপক্কতা অর্জন করেছিল। ২০০৬ সালে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সাথিদেরকে নিয়ে ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন।

• আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ

এর আগে ২০০৫ সালের শুরুর দিকে তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মির আলী এলাকায় গমন করেছিলেন। ওখানে আরব মুজাহিদীনের মেহমান খানায় তিনি অবস্থান করেন। সেখানে তাদের কিছু নেতার সঙ্গে তার বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়। তাদের মাঝে রয়েছেন আল-কায়েদার খোরাসান ভূমির প্রধান দায়িত্বশীল শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহ এবং দুজন প্রধান সামরিক দায়িত্বশীল শায়খ হামজা রবিয়া রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ খালেদ হাবিব রহিমাহুল্লাহ। এই সাক্ষাৎগুলোতে ফারুক ভাই তার শায়খ ও প্রশিক্ষক আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনেক আনন্দিত হন এবং তার মাঝে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশেষভাবে সংগঠনের মুরুব্বী স্নেহশীল আমীর জনাব শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহর গাম্ভীর্য নৈতিকতা শিষ্টাচার বুদ্ধিমত্তা ও দীনী দাঈ সুলভ ব্যক্তিত্ব দ্বারা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ খুবই প্রভাবিত হন। পরবর্তীতে আল-কায়েদার কর্ম পন্থা

[146]

অনুযায়ী তাকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রথমে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের লোয়ারায় তারপর দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাকতোই এলাকায় অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে
যেহেতু আগেই তিনি কাশ্মীরি জিহাদী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, এ কারণে আরব প্রশিক্ষকদের এখানে প্রশিক্ষণের সর্বস্তরে তিনি সবার চেয়ে এগিয়ে থাকেন। সে সঙ্গে তার নীতি নৈতিকতা ও আখলাকের কারণেও সকলেই প্রভাবিত হয়। আল-কায়েদার দক্ষ প্রশিক্ষক শায়খ এহসানুল্লাহ আলমাসরী রহিমাহুল্লাহ, শায়খ আব্দুর রহমান মাদানী রহিমাহুল্লাহ থেকে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ওই ক্লাস চলাকালে আরবী থেকে উর্দু অনুবাদের দায়িত্বও তিনি সামলান। তিনি দৈহিকভাবে সুগঠিত হবার পাশাপাশি লক্ষ্যভেদ করার কাজেও দক্ষ ছিলেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে ভারী অস্ত্র কামান এবং বারুদের বিস্তারিত ক্লাস করেন এবং এসব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। প্রশিক্ষণ চলাকালেই ফিলিস্তিনের প্রসিদ্ধ মুজাহিদ আলিমে দীন, মুজাহিদীনের মুরুব্বী শায়খ আবু ওয়ালিদ আনসারী হাফিযাহুল্লাহর কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন কিছু শেখার সুযোগ পান। জিহাদী সাধারণ মাসায়েল এবং বিশেষ শরীয়াহ রাজনীতি সম্পর্কিত মাসায়েল বোঝার ক্ষেত্রেও শায়খ আবু ওয়ালিদ আনসারী হাফিযাহুল্লাহর কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শেখেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তার সীমাহীন আস্থা ও মুহব্বতের সম্পর্ক ছিল।

[147]

তিনি যেখানেই গিয়েছেন, কোথাও আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের কাজে পিছপা হননি। প্রশিক্ষণকালে এক ইরাকি আরব যুবক তার মুখোমুখি হয়। সে তার মাসলাক বা ঘরানাগত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতো। তিনি নতুন হওয়া সত্ত্বেও তার সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই যুবক যখন জিদ ধরে, তখন তিনি তার চিন্তাধারার খারাবি ও ঘরানা প্রীতির ব্যাপারে আলকায়েদার খোরাসান অঞ্চলের আমীর শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহকে বিস্তারিত অবগত করেন। এতে সংগঠনের নেতৃত্ব ওই যুবককে সতর্ক করে এবং সংশোধনে কাজ না হওয়ায় তাকে দল থেকে বের করে নিজের দেশে পাঠিয়ে দেয়। এছাড়াও আরও একটি ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। ট্রেনিং চলাকালে এক প্রশিক্ষককে কোনো একটা প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য এক জায়গায় যেতে হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে অপর একজনকে আনা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়াজিরিস্তানের দূর দূরান্তে গ্রামেগঞ্জে জুমআর নামায পড়ানোর সময় স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক এবং স্থানীয় আলেমদেরকে সমালোচনা করতে শুরু করেন। শাখাগত ইজতিহাদী মাসায়েলকে বাড়িয়ে ফিতনা তৈরি করা অথবা স্থানীয় উলামায়ে কেরামের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ ফিকহী রায়কে প্রাধান্য দেয়া কখনোই আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ ও আলেমদের কর্মপন্থা ছিল না। উক্ত প্রশিক্ষকের এই কর্মপন্থা তাঁর কাছে দীনী কল্যাণের বিপরীত মনে হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে তিনি এ সম্পর্কে পরিবেশ উত্তপ্ত করতে চাননি। কিন্তু যখন তিনি খোরাসানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রশিক্ষকের এমন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তিনি অভিযোগ করেন। এতে সংগঠনের নেতৃত্ব তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রশিক্ষককে বরখাস্ত করে তদস্থলে অন্য

[148]

কাউকে নিযুক্ত করে। এটা ওই সময়কার কথা যখন তিনি আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দারুল হিজরতে যাবার পর এক বছরও পার হয়নি। কিন্তু তথাপি যখনই তিনি সংশোধন-সংস্কারের সুযোগ পেয়েছেন এবং কোথাও বিকৃতি ও বিচ্যুতি বন্ধ করার সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে তিনি ভূমিকা রাখতে ছাড়েননি।

প্রথম সারিতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ প্রশিক্ষণ শেষে প্রথম সারি তথা ফ্রন্টলাইনে তাকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি পাকিস্তান-আফগানিস্তান বর্ডারের যৌথ এলাকা লোয়ারার পাহাড় ও বনে চলে যান এবং সেখানে আমেরিকান সেনাবাহিনী ও আমেরিকার গোলাম আফগান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সরলতা সাদাসিধে জীবন বীরত্ব ও সাহসিকতার জীবন্ত প্রতীক এবেটোবাদের শহীদ

[149]

কমান্ডার আলেম জেব (আবু তোরাব পাকিস্তানি

17)

রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বের ছায়ায় ছিলেন।

• পাকিস্তানি মুজাহিদীনের একটি নতুন মাজমুআ গঠন

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার এবং যুদ্ধ ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসার পর আল-কায়েদার নেতৃত্ব শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহকে পাকিস্তানি মুসলিমদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়ার জন্য এবং এমন একটি গ্রুপ গঠন করার জন্য দায়িত্ব দেয়, যারা পরবর্তীতে পাকিস্তান জিহাদের মূল ভিত্তি হবে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সহকারী নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর তিনি ভানা অভিমুখে চলে যান। এরপর ভানা, দক্ষিণ

17 হাজারা ভূখণ্ডের অধিবাসী আলেম জেব। পরবর্তীতে তিনি আবু তোরাব পাকিস্তানি নামে মুজাহিদীনের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি উচ্চমনোবলসম্পন্ন উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী একজন পাকিস্তানি মুজাহিদ ছিলেন। কাশ্মীর জিহাদে অংশগ্রহণের পর ইমারতে ইসলামিয়ার সময়কালেই রণাঙ্গনের প্রথম সারিতেই মরণপণ যোদ্ধা ছিলেন। ইসলামী শরীয়তের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারী তালেবান পশ্চিমাদের মিত্র শক্তি উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে যখন লড়াই করে তখন তিনি বাগরাম এবং তার আশপাশের বিভিন্ন ফ্রন্টে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তখনই তিনি আরব মুজাহিদীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। বাগরাম ফ্রন্টে আরব অনারব মুজাহিদীনের একটি গ্রুপের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে মুহাজিরিনের আশ্রয় এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাকার্যে তিনি রত থাকেন। ওয়াজিরিস্তান যখন হিজরত ও জিহাদ ভূমি হয়ে ওঠে, তখন আমির আবু তোরাবও তার দায়িত্বশীলদের নির্দেশে সেখানে গমন করেন। তথায় আলকায়দার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পর অবশেষে পাক আফগান সীমান্তে লেওয়ারা নামক বর্ডারের ফ্রন্টে আলকায়দার প্রধান হন। দায়িত্ব পালনকালে যেকোনো এক বিষয়ে পরামর্শের জন্য আলকায়দার সামরিক দায়িত্বশীল শাইখ আবু আব্দুল্লাহ ইব্রাহিম মুহাজির মাসরীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মীরান শাহের নগর কলি গ্রামে শাইখ ইব্রাহিমের ঘরে গমন করেন। হতভাগা কাপুরুষ আমেরিকানরা ওই রাতে শাইখ ইব্রাহিমের ঘরে ড্রোন হামলা চালায়। এতে শাইখ ইব্রাহিম মাসরী, নাঈম/নুআইম ইরাকী, আরও এক আরব ভাই, আবু তোরাব ভাই, (Khoshab County) খুশাবের মালিক আতিফ আওয়ান —এই পাঁচজন শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্থান দান করুন আমীন!!

[150]

ওয়াজিরিস্তানকেই জিহাদী মারকাজ বানিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। এই দুই নেতা (রহিমাহুল্লাহ) সুশৃঙ্খলভাবে জিহাদ পরিচালনার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং একটি জিহাদী জামাত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয় বিবাহ
হিজরতের প্রথম দিকেই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি নিজ শহরের একজন দীনদার পুণ্যবতী নারীকে বিবাহ করেন, যিনি জিহাদ ভালোবাসেন। হিজরত ও রিবাতের অতি কঠিন পরিস্থিতিতে তার সম্মানিতা স্ত্রী ধৈর্য ও মনোবল সহকারে তার শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত তার পাশে থাকেন। তিনি অন্য নারীদের জন্য ছিলেন দৃষ্টান্ত। তিনি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কিছু উত্তম গুণাবলি এবং তার জীবনের কিছু উজ্জ্বল দিক তুলে ধরার জন্য ‘আমরা আখিরাতের পথিক’ শিরোনামে একটি মূল্যবান পুস্তিকা রচনা করেন। ইদারায়ে হিত্তিন থেকে তা প্রকাশিত হয়।

শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ও অবদান
শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ এবং ফারুক
ভাই রহিমাহুল্লাহ দুজনে মিলে গোটা পাকিস্তানে তাদের যোগাযোগ ও প্রভাব বলয় ব্যবহার করে জিহাদী দাওয়াত বেগবান করেন। সাথিদের ধর্মীয় দীক্ষা নৈতিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে দেয়া হয়। ওই সময়ে সমাজ ও জীবনের সর্বস্তরের শত শত যুবক তাদের কর্ম প্রচেষ্টায় জিহাদে অংশ নেয়। এই হযরতগণের কিছু

[151]

উল্লেখযোগ্য কর্ম ও অবদান পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো:

০১. ওই সময় শহীদ ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ করাচি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। মুজাহিদীনের চিকিৎসার অভিযোগে করাচি জেলে তিনি বন্দী জীবনের কঠিন অবস্থা সহ্য করেন। তিনি সাহসিকতা ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক অগ্নিঝরা বক্তা এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রবাদ পুরুষ ছিলেন। মুক্তি লাভ করা মাত্রই তিনি শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর দাওয়াত পান এবং এই ডাকে সাড়া দিয়ে ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন। শহীদ ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ হিজরত করা মাত্রই দাওয়াতী কার্যক্রম আরও বেগবান হয় এবং কয়েকটা শহরের বেশ কিছু সেক্টরের সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।

০২. ওই সময় তিনি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন এবং নিজের সাথিদেরকে কিছু বড় মাপের দক্ষ শাস্ত্রবিদকে দিয়ে সমর শাস্ত্রের দাওরা (প্রশিক্ষণ কর্মশালা) করান। তন্মধ্যে উস্তাদুল মুজাহিদীন শায়খ আবু খাববাব আলমাসরী রহিমাহুল্লাহর বারুদ বিষয়ক বিস্তারিত ক্লাস সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এভাবেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে একদিকে যেমন পাকিস্তানি মুজাহিদীনের জন্য সামরিক ক্লাসের ব্যবস্থা করেন, অপরদিকে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীনের জন্যও কয়েকটি দাওরার ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে তালেবান মুজাহিদীনের জন্য বড় সংখ্যায় মাইন ও রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস তৈরির জন্য ওয়ার্কশপও চালু করা হয়।

[152]

০৩. এর পাশাপাশি মুজাহিদীনের নৈতিক প্রশিক্ষণ ও জিহাদী দাওয়াত বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কিতাবের অনুবাদ এবং মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। অনুবাদের দায়িত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে দেওয়া হয় এবং এই সময়ে তিনি শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর অনবদ্য গ্রন্থ ‘মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয’ অনুবাদ করেন। ‘ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন’ শিরোনামে উক্ত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জিহাদের দাওয়াত বিস্তারে এই গ্রন্থ যে ভূমিকা পালন করে তা আর বলার প্রয়োজন নেই।

০৪. এ সময়ে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে ‘হিত্তিন’ পত্রিকা প্রকাশ করা হয় যা এই বিষয়ের অনন্য একটি প্রকাশনা। সহজ সরল উপস্থাপনা এবং দলীল প্রমাণ নির্ভরতা প্রথম দিন থেকেই এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল। পত্রিকাটি পাকিস্তানের সহজ-সরল ইলমী অঙ্গনে দাওয়াত পৌঁছানো, জিহাদের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা এবং উত্থাপিত অভিযোগ আপত্তি ও সংশয়-সন্দেহ নিরসন করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। শুরু থেকেই হিত্তিন পত্রিকার অধিকাংশ কাজ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দায়িত্বে ছিল এবং তিনি কারী ‘আব্দুল হাদী’ ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন।

০৫. ওই সময়টাতে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ মিডিয়ার কাজের জন্য ‘ইদারা আস-সাহাব’ উর্দু প্রতিষ্ঠা করেন। মিডিয়ার কাজের জন্য উপায় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয় এবং পুরো গ্রুপের মধ্যে উত্তম ও যোগ্যতা সম্পন্ন সাথিদেরকে বাছাই করে মিডিয়া বিভাগ গঠন করা হয়। এই বিভাগ গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই করাচিতে মার্কিন দূতাবাসে ফিদায়ী হামলাকারী [153]

পাঞ্জাবের মুজাহিদ কারী উসমান শহীদ

রহিমাহুল্লাহর জীবনের ওপর একটি ডকুমেন্টারি

ফিল্ম তৈরি করে।

ওই ভিডিওতে

একদিকে যেমন

একজন মুসলিমের

মাঝে জিহাদ ও

শাহাদাতের

ভালোবাসা

সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়, অপরদিকে শরীয়াহ ও ইলমী

দৃষ্টিকোণ থেকে ফিদায়ী তথা আত্নউৎসর্গকারী

হামলার বৈধতা এবং মুসলিমদের দেশে কাফেরদের

দূতাবাসের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই

ফিল্ম তৈরির কাজেও শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ

প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

০৬. আফগানিস্তানের ফ্রন্ট এ ২০০৭ সালে সাথিদেরকে

প্রেরণ করা শুরু হয়। সর্বপ্রথম ২০০৭ সালে

মাজমুআর দুজন গুরুত্বপূর্ণ দুঃসাহসী সাথি

দিয়ার জেলার আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ

18 এবং

18 রাশিয়ার জিহাদ, আফগানিস্তানের জিহাদ এবং গোত্রীয় অঞ্চলের জিহাদ—তিন ফ্রন্টেই গাজী শহীদ মাওলানা হামিদুল্লাহ আবু সাঈদ রহমতুল্লাহি আলাইহি সক্রিয় ছিলেন। দিয়ার জেলার সন্তান তিনি। ফারুক ভাইয়ের পুরানো বন্ধু মাওলানা সাঈদুল্লাহ শহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। শৈশবকালেই তার গোত্র রাশিয়ার বোমা হামলার কারণে আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশ থেকে হিজরত করে দিয়ার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তিনি যুবক বয়সে রুশ বিরোধী জিহাদের আহ্বান শুনতে পান। তাই যৌবন বয়সের শুরুতেই জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। রুশ জিহাদে যখন কমিউনিস্ট ব্যবস্থার পরাজয় ঘটে, তখন সাধারণ বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বিশেষ করে গারদেজ (Gardez) প্রদেশ বিজয়ের গাজী ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে আমেরিকা আসার পর যখন জিহাদ আরম্ভ হয়, তখন মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির দাওয়াতে লাব্বাইক বলে ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন এবং নিজেকে জিহাদের জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি তাকওয়া লিল্লাহিয়াত, একনিষ্ঠতা, বীরত্ব, সাহসিকতা, নৈতিক উৎকর্ষ, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও সরল জীবন যাপনে একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ২০১০ সালে ফারুক ভাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে কুনার প্রদেশে সেনা বিন্যাসে অংশগ্রহণ ও জিহাদী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সাহসিকতা ও সচেতনতা সহকারে দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ২০১১ সালে হতভাগা আমেরিকানদের এক ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন!! আমীন

[154]

করাচীর শাহেদ খান (ফয়েজ)

19 রহিমাহুল্লাহকে
অরুজগান (Oruzgan) প্রদেশে তাশকিলের জন্য পরিকল্পনা বুঝে আসার জন্য প্রেরণ করেন। এই দুই ভাই সফলতার সাথে তাশকিল সম্পন্ন করে ফিরে আসেন। অতঃপর ২০০৭ সালে আরও ভাইদেরকে যাবুল অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। তারা যুদ্ধ ফ্রন্টে আরব মুজাহিদীনের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই তাশকিলের সকল সাথি গঠন প্রক্রিয়া চলাকালে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

• দুঃখের বছর ২০০৭ সাল: লাল মসজিদ এবং জামিয়া হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহার ট্রাজেডি

২০০৭ সাল গোটা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত বেদনা ও দুঃখের একটি বছর ছিল। এই বছর ইসলামী ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়। জুলুম-অত্যাচার ও দাম্ভিকতায় ডুবে থাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইসলামাবাদের প্রাণকেন্দ্রে লাল মসজিদ নামের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রীয় মসজিদে এবং বালিকাদের জামিয়া সাইয়েদা হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহার ওপর আগ্নেয়াস্ত্র সহ

19 করাচির শাহেদ খান যিনি মুজাহিদীনের মাঝে ফায়েজ ভাই নামে পরিচিত ছিলেন। ফারুক ভাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজমুয়ার সামরিক দায়িত্বশীলদের একজন ছিলেন। আফগানিস্তানের ফ্রন্টে সামরিক দায়িত্ব পালনের পর তিনি ওয়াজিরিস্তানে অপরাধী সেনাবাহিনীর অপারেশন চলাকালে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। পরবর্তীতে তার যোগ্যতা ও প্রতিভা দেখে পাকিস্তানের শহরগুলোতে দ্বীনের শত্রু সিকিউরিটি এজেন্সির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রমের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সফলভাবে কয়েকটি মিশন পরিচালনা করেন। অবশেষে ২০১২ সালে করাচিতে অন্যায় অনাচারের প্রবাদ পাকিস্তানি গুপ্ত সংস্থার কারাগারে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! তিনি খোদাভীতি সাহসিকতা বাহাদুরি শক্ত স্নায়ু ও হাসিখুশি মানুষ হিসেবে অনন্য ছিলেন।

[155]

হামলা চালায়। মসজিদ ও মাদরাসাকে ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এক হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রীকে শহীদ করে দেয়া হয়। আহতদের সংখ্যাও এর চেয়ে কম নয়। গ্রেফতারদের সংখ্যা তো কয়েক হাজারে পৌঁছে যায়।

লাল মসজিদের এই মর্মান্তিক শাহাদাতের কারণ ছিল, মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে নাহী আনিল মুনকারের আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা। রাজধানী ইসলামাবাদের বাজারগুলোতে মসজিদ ও মাদরাসার ছাত্ররা সিডি সেন্টারগুলোতে তাবলীগের জন্য যেতেন এবং অশ্লীল ফিল্মের দোকানদারদেরকে এই ব্যবসা ছেড়ে কোন হালাল রিযিকের পন্থা অনুসন্ধানের নসীহত করতেন। তাদের তাবলীগের কারণে কিছু দোকানদার তওবা করে এবং নিজেদের ইচ্ছায় অশ্লীল ফিল্মের সিডিগুলো পুড়িয়ে দেয়। লাল মসজিদ থেকে একটু দূরে এক নারী নির্লজ্জ আড্ডাখানা খুলে বসেছিল। মসজিদের ছাত্ররা তাকে ধরে এ কাজ থেকে তওবা করতে উৎসাহিত করে। তখন ওই নারী তওবা করার ঘোষণা দেয়। একইভাবে ইসলামাবাদের কিছু এলাকায় চায়না মেসেজ সেন্টার নামে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা চলতো। সেগুলো বন্ধ করার জন্য লাল মসজিদের ছাত্ররা পদক্ষেপ নেয়। নিরস্ত্রভাবে শুধু নসীহতের উপর জোর দিয়ে এ সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়। অতঃপর যখন পাকিস্তানি তাগুতি শাসক জেনারেল পারভেজ মোশারফ বিশেষ নিরাপত্তার দিক বিবেচনায় রাওয়ালপিন্ডি ইসলামাবাদের শতাধিক মসজিদকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়, তখন লাল মসজিদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে। তখন তারা মসজিদ অপসারণের সিদ্ধান্ত বাতিলের পাশাপাশি শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানায়। কিন্তু এই সবকিছু নিরস্ত্রভাবে শুধু তাবলীগী পন্থা হিসেবে করা হয়।

[156]

কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য ইসলামাবাদের প্রাণকেন্দ্রে আমর বিল মারূফের কাজ জারি হওয়া এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দাবি ঘোষিত হওয়াটা কিছুতেই মেনে নেয়ার মতো ছিল না। দম্ভ অহঙ্কারে ডুবে থাকা সেনাবাহিনীর প্রধান সর্বপ্রকার আলোচনা বন্ধ করে হুঁশিয়ারি দেয়, ‘সারেন্ডার হয়ে যাও নয়তো মারা যাবে’। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের নেতা শহীদে ইসলাম মাওলানা আব্দুর রশিদ গাযী রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে শেষ সময় পর্যন্ত মসজিদ ও মাদরাসায় নিজেদের দাবির ওপর অটল থাকে। তারা একে একে জীবন উৎসর্গ করতে থাকে এবং কুরআন পাকের মুসহাফ তাদের রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে। সেনাবাহিনী এক সপ্তাহ যাবৎ কুখ্যাত অপারেশন করে সকলকে শেষ করে দেয়। অপারেশনের নাম রাখা হয় সাইলেন্স বা নীরব অপারেশন। বাস্তবেই লাল মসজিদ ধ্বংস হয়ে মসজিদের মিম্বার নীরব হয়ে যায় এবং জামিয়া হাফসা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু জ্বলন্ত কয়লা থেকে এক নতুন আন্দোলনের জন্ম হয়। পাকিস্তানে ‘শরীয়ত অথবা শাহাদাত’ স্লোগান রীতিমতো জিহাদের রূপ ধারণ করে।

সাধারণভাবে পাকিস্তানের মুসলিমদের সামনে এবং বিশেষভাবে মুজাহিদীনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনী কাফেরদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সৈনিক মাত্র। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কখনোই এমন সরল প্রচেষ্টা সহজে মেনে নেবে না, যার দ্বারা প্রিয় মাতৃভূমিতে ইসলামের সর্বজনীন শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করা যায়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোনো প্রচেষ্টা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিকৃষ্ট বৃক্ষের শিকড় উপড়ে ফেলা না হবে। অপরদিকে গোত্রীয় অঞ্চলের আত্মমর্যাদাশীল যে সমস্ত মুসলিম যেকোনো কঠিন অবস্থায় উপমহাদেশের

[157]

মুসলিমদের জন্য প্রতিরক্ষাকারী নিরাপত্তা প্রাচীরের ভূমিকা পালন করে, তারাও বেদনাদায়ক এই ঘটনায় পানিহীন মাছের মতো ছটফট করতে থাকে এবং অত্যাচারী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে নিষ্পাপ প্রাণের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রহর গুণতে থাকে। সে সময় সকলের রায় এ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয় যে, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষার জন্য এবং দীন ধর্ম, ইজ্জত সম্মান ও অর্থ-সম্পদ সুরক্ষার জন্য এখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রীতিমতো রণাঙ্গনে অবতরণের সময় এসেছে।

অপরদিকে পাকিস্তানের সাধারণ মুসলিমদের মাঝেও সেনাবাহিনীর ব্যাপারে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরি হয়। তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, এই সেনাবাহিনী পাকিস্তানের অথবা ইসলামের নয় বরং এরা আমেরিকা ও ইহুদী সেনাবাহিনীর একটা সহায়ক দল। এমনকি স্বয়ং ক্রুসেডার এবং ইহুদীরাও এমন হিংস্রতা ও পাশবিকতা দেখাতে পারে না, যেমনটা এই সেনাবাহিনী পারে। সে সময় সেনাবাহিনীর প্রতি জনসাধারণের সমবেদনা ও সহমর্মিতা শেষ হয়ে যায় এবং পাক ফৌজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মনোভাব দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

মুহসিনে উম্মাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক পাকিস্তান জিহাদের ঘোষণা
এমন পরিস্থিতিতে গোত্রীয় অঞ্চলের আত্মমর্যাদাশীল মুজাহিদীনের সঙ্গে সঙ্গে কায়েদে জিহাদ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ তার ঐতিহাসিক বিবৃতিতে পারভেজ মোশাররফ এবং তার আর্মির বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ ঘোষণা করে বলেন যে, লাল মসজিদের এই ট্রাজেডির পর এখন আমেরিকার পাশাপাশি

[158]

আমেরিকার সবচেয়ে বড় মিত্র পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধেও জিহাদে অবতরণের সময় এসেছে। তিনি বলেন:

“পারভেজ, তার সরকার, তার সেনাবাহিনী এবং তাদের সহায়ক সকল সংস্থাকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে জিহাদ ও সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য উঠে দাঁড়ানো পাকিস্তানের মুসলিমদের উপর ওয়াজিব।

20

”

শায়খ রহিমাহুল্লাহ বলেন: “আমরা অর্থাৎ আল-কায়েদার সাথিরা আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়ে বলছি, আমরা মাওলানা আব্দুর রশিদ গাযী রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিদের খুনের বদলা নেবো পারভেজ এবং তার সহযোগিদের কাছ থেকে। আমরা ঐ সমস্ত পবিত্র রক্তের প্রতিশোধ অবশ্যই নেবো, জালিম গোষ্ঠী যা প্রবাহিত করেছে। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ইসলামের বীর বাহাদুরদের ওই রক্তধারা, যা ওয়াজিরিস্তানে বইয়ে দেয়া হয়েছে —উত্তর ওয়াজিরিস্তানে হোক অথবা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে।”

21

যাই হোক লাল মসজিদের ঘটনা হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দেয়। লাল মসজিদ এবং জামিয়া হাফসার শুহাদায়ে কেরাম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিপীড়িত ছিলেন এ বিষয়ে সকলেই একমত হয়ে যায়। অপরদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা নৃশংস ও জুলুম অত্যাচারকারী এ বিষয়েও কারও কোনো মতপার্থক্য থাকে না। এই ঘটনায় পাকিস্তানের মুসলিমদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল। তাদের হৃদয় অস্থির হয়েছিল যে, কেমন করে এই এই ঘটনার অপরাধীদেরকে প্রকৃত শাস্তি

20 লাল মসজিদের ঘটনার পর শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়ান

21 ঐ
[159]

দেওয়া যায়! সে কারণে লাল মসজিদ ট্রাজেডির কয়েক সপ্তাহ পরেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও সিকিউরিটি সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে সারাদেশে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ভানা থেকে নিয়ে বাজুয়ার এজেন্সি এবং পুনরায় মালাকান্দ ডিভিশন পর্যন্ত সিকিউরিটি ফোর্সের কাফেলা ও কেন্দ্রগুলোতে হামলা আরম্ভ হয়। মুজাহিদীন পুনরায় শহরে মনোযোগী হন এবং সেনাবাহিনীর বড় বড় কেন্দ্রে হামলা করতে আরম্ভ করেন। গোটা দেশে জিহাদী পরিবেশ তৈরি হয় এবং সারাদেশে সেনাবাহিনী ও সিকিউরিটির সংস্থাগুলোর জন্য জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

পাকিস্তান জিহাদের কার্যকরী পদক্ষেপ
অন্য মুজাহিদীন যখন লাল মসজিদ ট্রাজেডির পর পাকিস্তানে জিহাদের প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ বেগবান করেন, তখন শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত সাথিরা এ কাজের জন্য সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যান। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ এই পর্যায়ে তার কিছু দায়িত্বশীল সাথিকে শহরে পাঠিয়ে দেন। পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক, দীন ও মিল্লাতের গাদ্দার আইএসআই'র দপ্তর সহ আরও কিছু নির্দিষ্ট টার্গেট পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়। তাদের রিপোর্টের উপর হামলার পরিকল্পনা তৈরি হবে।

পাকিস্তান জিহাদে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর অবস্থান শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর অবস্থান
ছিল: আমরা পাকিস্তান জিহাদে অংশগ্রহণ করবো

[160]

কিন্তু গোটা শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াবো না; বরং নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যে আমরা আঘাত হানবো। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরাধীদের প্রধানদেরকে হামলা করবো। যেমন লাল মসজিদে আগ্রাসন পরিচালনাকারী হতভাগা অফিসারবৃন্দ, পারভেজ মোশারফ এবং তাদের সহায়ক সকল সংস্থা। আমাদের টার্গেটে থাকবে আইএসআই'র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং পাকিস্তানে উপস্থিত ক্রুসডারদের প্রতিনিধিরা। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর রায়কে নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্টে বর্ণনা করা যেতে পারে:

** আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিত আফগানিস্তানের ময়দানে। ঐ জিহাদকেই আমাদের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু বানানো উচিত। কারণ ইসলাম এবং ক্রুসেডারদের আসল যুদ্ধ আফগানিস্তানেই সংঘটিত হচ্ছে।

** পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে জিহাদের ঘোষণা করে নফিরে আম তথা জনসাধারণকে অবাধে অংশগ্রহণের জন্য না বলা উচিত। পাকিস্তানের সর্বত্র সামরিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা না করা চাই। শুধু আইএসআই এবং সেনাবাহিনীর এমন অপরাধীদেরকে খোঁজ করে টার্গেট করা উচিত, যারা সরাসরি আমেরিকার নির্দেশ পালন করায় প্রিয় মাতৃভূমিতে সকল অত্যাচার-অনাচারের জন্য প্রকৃত অর্থে দায়ী।

** পাকিস্তানি মুজাহিদীন বিশেষভাবে গোত্রীয় অঞ্চলের জিহাদী গ্রুপগুলো প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধতার এমন মাপকাঠিতে নেই যে, তারা পুরোপুরিভাবে শরীয়ত অনুসরণ করবে; আর না পাকিস্তানি সমাজ সরকারের বিরুদ্ধে এই জিহাদে অংশগ্রহণের অবস্থায় রয়েছে।

** পাকিস্তানের সরকার ও শাসন ব্যবস্থা শরীয়াহ বহির্ভূত এবং তাদেরকে জিহাদের মাধ্যমে [161]

ক্ষমতাচ্যুত করার ফরয সম্পর্কে শায়খ আহসান আজীজ একমত ছিলেন কিন্তু লাল মসজিদের ঘটনার তাৎক্ষণিক পর পূর্ব-প্রস্তুতি, জনসাধারণের মনস্তাত্ত্বিক গঠন এবং সবার আগে মুজাহিদীনের শরীয়াহ, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ সুসম্পন্ন করা ছাড়া এই যুদ্ধে জড়াতে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ প্রস্তুত ছিলেন না।

** আল-কায়দা এবং তার নেতা শায়খ উসামা রহিমাহুল্লার সঙ্গে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে অসামান্য আস্থার সম্পর্ক সত্ত্বেও আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, পাকিস্তানে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের জন্য সংগঠন থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে সামরিক কাজ করা উচিত।

পাকিস্তান জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে শায়খ হাসান আজীজ শহীদ রহিমাহুল্লাহর চিন্তা নির্ভর উপর্যুক্ত পয়েন্ট আলোচনার পর আমরা দেখবো, এগুলোর বিপরীতে শহীদ ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ এবং শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর রায় কি ছিল? তারা উভয়ে মনে করতেন, বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের ছায়াতলে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর দিকনির্দেশনায় জিহাদী যাত্রা অব্যাহত রাখা উচিত। এই দুই হযরতের রায়ের সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে আমরা তুলে ধরতে পারি:

** পাকিস্তান জিহাদের ব্যাপারে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর আশঙ্কাগুলোর সঙ্গে ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ একমত ছিলেন। কিন্তু তাদের রায় ছিল, এই যুদ্ধ আমরা শুরু করিনি; পাকিস্তান সেনাবাহিনী শুরু করেছে। অতএব এখন আমরা আমাদের

[162]

ভাইদেরকে প্রতিরক্ষা করতে শরীয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট এবং বাস্তবে যুক্তির বিচারেও আমরা বাধ্য।

** ফারুক ভাই এবং ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ বলতেন, মুজাহিদীনের কথা হচ্ছেঃ এই যুদ্ধ আল-কায়েদা শুরু করেনি বরং গোত্রীয় অঞ্চলের প্রতিরক্ষা, শরীয়ত বাস্তবায়নের চিন্তা থেকে শুরু হয়েছে। আল-কায়েদা তো ইহুদী ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে চলমান বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যে আশ্রয় হিসেবে পাকিস্তানের এলাকাগুলোতে এসেছে। এই অবস্থায় যখন খাইবার থেকে করাচি পর্যন্ত পাকিস্তানবাসীর সামনে সেনাবাহিনীর অত্যাচারী হওয়া এবং আমেরিকার এজেন্ট হওয়াটা স্পষ্ট; জনসাধারণের ক্ষোভও যেহেতু তীব্র, তাই বিদ্যমান অবস্থা কাজে লাগিয়ে আমরাও ভূমিকা পালন করতে চাই।

** শরীয়াহ ও নৈতিক প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা দুর্বলতা এবং প্রতিশোধ-স্পৃহায় শরীয়ত-বিরোধিতার সম্ভাবনার ব্যাপারে এই দুই হযরতের রায় ছিল: যদি আমরা এই জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে যাই তখন মুজাহিদীনের সংশোধন, নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং শরীয়াহ বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে বাঁচাবার কোনো পথ থাকবে না। কারণ যখনই কোথাও জিহাদী কার্যক্রম আরম্ভ হয়, তখন পরিস্থিতির চাপ এবং অত্যাচারীদের জুলুমের প্রতিক্রিয়াতেই জিহাদ শুরু হয়। এই অবস্থায় প্রথম প্রথম কিছু ভুলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এখন আমরা যদি গোত্রীয় অঞ্চল এবং পাকিস্তানি ভাইদের সঙ্গে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করি, তাহলে তাদের জিহাদে সাহায্য করা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার কারণে আল-কায়েদার উলামায়ে কেরাম ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ মুজাহিদীনের মাঝে সংশোধন প্রয়াস অব্যাহত রাখতে পারবেন। কিন্তু যদি আমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তাহলে অন্যরা এই জায়গা [163]

দখল করবে এবং আমরা সংস্কার সংশোধনের কোনো সুযোগ পাবো না।

** এই দুই হযরত আরও মনে করতেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথমবার পাকিস্তানি জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে দীনদার শ্রেণি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও স্ট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে ভারী পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে। সারাদেশে আমেরিকার এজেন্ট সেনাবাহিনীর প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। শরীয়ত বাস্তবায়ন লক্ষ লক্ষ মুসলমানের হৃদয়ের আওয়াজ। অপরদিকে শত শত মাইল বিস্তৃত গোত্রীয় অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা মুজাহিদীনের নিয়ন্ত্রণে। অতএব এটাই পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ আরম্ভ করার উপযুক্ত সময়।

** মূল রণাঙ্গন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানেই হওয়া উচিত এ বিষয়ে তারা দুজনও একমত ছিলেন। কিন্তু একে তো ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীনের শক্তি সামর্থ্য বিবেচনায় তাদের ভূখণ্ডে লড়াইয়ের দায়িত্ব প্রথমত তাদের, অপরদিকে ইমারতে ইসলামিয়ার পিছন থেকে ছুরিকাঘাতকারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করে ইমারতকে শক্তিশালী করাই তাদের প্রতি বিশ্বস্ততার পরিচায়ক।

** ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ আরও মনে করতেন, আমরা যেহেতু আল-কায়েদার আমীর হযরতদের কাছে বায়আত বদ্ধ, তাদের নির্দেশে যেহেতু আমরা এই গ্রুপ গঠন করেছি, এই জন্য শাখাগত মতপার্থক্যের কারণে আমীরের আনুগত্য পরিহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সমীচীন হবে না। এই দুই হযরত বলতেন, যেহেতু আমরা আমাদের সকল সাথিকে আল-কায়েদার নামে দাওয়াত দিয়ে এসেছি এবং তাদের মাঝে অধিকাংশই শায়খ উসামা

[164]

বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে জিহাদ করার জন্যই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এ কারণে এখন আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই সাথিদের সঙ্গে প্রতারণার নামান্তর —যা কিছুতেই সমীচীন নয়।

** তারা মনে করতেন, মুজাহিদীনকে ঐক্যবদ্ধ রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি কাজ। পক্ষান্তরে মতপার্থক্য ও বিভক্তি অপছন্দনীয় বিষয়। এখন যদি সারা বিশ্বের মুজাহিদীন আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত থাকে, মুজাহিদীনের যদি বৈশ্বিক ঐক্য অটুট থাকে, তাহলে একসময় আমরা যুক্ত থাকার পরও কোন শরীয়তী কার্যকারণ ছাড়া তা থেকে পিছিয়ে আসার কি অর্থ? বর্তমান সময়ে যখন গোটা বিশ্বে মুসলিমদের শত্রু ঐক্যবদ্ধ, এ অবস্থায় আমাদেরও শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলা উচিত।

** তারা আরও মনে করতেন, আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ — উদাহরণস্বরূপ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ এবং তাদের মতো অন্যরা— মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলে জিহাদের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে তাদের জীবন কেটেছে। এ কারণে জিহাদী কল্যাণ অনুধাবনে নিঃসন্দেহে তাদের মূল্যায়ন, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সুবিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তা আমাদের চেয়ে বেশি হবে।

** এই দুই হযরত আরও মনে করতেন: বর্তমান সময়ে ইসলামের রাহবার ও পথপ্রদর্শক আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে জিহাদ করা মুজাহিদীনের জন্য জরুরি। আল-কায়েদা - মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের আনুগত্য মেনে নিয়ে কাজ করে, এ কথাও স্পষ্ট। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহ নিজে শায়খ [165]

উসামা রহিমাহুল্লাহকে গোটা বিশ্বে আমেরিকা এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি ও নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর বাহিনীতে শামিল হয়ে আমরা সরাসরি আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহর পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো।

** এই আলোচনার সারসংক্ষেপ সুস্পষ্ট। এটা কোনো আকীদা-বিশ্বাস কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির মতপার্থক্য নয়। এটাতো কোনো অঞ্চলে সামরিক কার্যক্রম শুরু করার পন্থা নিয়ে শাখাগত মতপার্থক্য। এই তিন হযরত নিজেদের রায়ের পক্ষে শক্তিশালী দলীল প্রমাণ উপস্থিত করেন। পাকিস্তান জিহাদ সম্পর্কে যে আশঙ্কাগুলো শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কিছু কিছু সত্যি হয়েছে। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর মতো মহান সংস্কারক ও দাঈ পাকিস্তান জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দ্বারা একদিকে যেমন মুজাহিদীনের সংশোধনের একটা সুযোগ নষ্ট হয়েছে, অপরদিকে আল-কায়েদার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টা প্রচেষ্টার দ্বারা জিহাদের গতিপথ ঠিক থাকা, মুজাহিদীনের শরীয়াহ ও মনস্তাত্ত্বিক গঠন, শরীয়তের দৃষ্টিতে ভুল-ভ্রান্তিগুলো সংশোধন করার কাজ সন্তোষজনক হারে হয়েছে। তবে আরেকটা কথা হচ্ছে, পরবর্তীতে মার্কিন ড্রোন হামলায় আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ একের পর এক শাহাদাত বরণের কারণে সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টা অবশ্যই ব্যাহত হয়েছে।

কল্যাণময় প্রথম ৩ শতাব্দীতে এবং আমাদের ইমাম সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সময়কালেও কখনও কোনো বিশেষ অঞ্চল বা বিশেষ যোদ্ধা দল পাঠানো অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। এগুলো ছিল টেকনিক কৌশল ও যুদ্ধ পন্থা নিয়ে মতপার্থক্য। মানহাজ দৃষ্টিভঙ্গি আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সকলের একই ছিল। [166]

তাছাড়া মতপার্থক্য সত্ত্বেও এই আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণ নিজেদের মাঝে সুসম্পর্ক রেখেছেন। কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তারা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিলেন। শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শায়খ আহসান আজীজকে নিজের শায়খ প্রশিক্ষক মুরুব্বী অভিভাবক এবং অনুগ্রহকারী বলে এসেছেন। তার সকল অনুগ্রহ তিনি প্রকাশ্যে স্মরণ করতেন।

শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর হাতে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জিহাদের বায়আত
উক্ত মতপার্থক্যে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর
যে রায় ছিল, সেটা তাদের জামাতের প্রায় সকল পুরানো ও জিম্মাদার সাথির রায় ছিল। তিনি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহকে নিজের আমীর মনে করতেন। এ কারণে তার নিযুক্ত ব্যক্তিদের আনুগত্য ওয়াজিব মনে করতেন। এ অবস্থায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শুধু নিজের সাথিদের সঙ্গেই পরামর্শ করেননি, বরং ওয়াজিরিস্তানে উপস্থিত মুজাহিদীনের যাদেরকে কাছে পেয়েছেন সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এরপর পাকিস্তানের শহরগুলোতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি গোপনে শহরে চলে যান। এরপর তিনি কিছু উলামায়ে কেরাম, তার অধিকাংশ আনসার ও সাহায্যকারীর সঙ্গে পরামর্শ করেন যে, এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? সেই সঙ্গে তিনি আলাদাভাবে ইস্তেখারা করেন।

এটা সম্ভবত তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার সময় ছিল। একদিকে শরীয়তের দায়িত্ব, সময়ের দাবি এবং হৃদয়ের ডাক আর অপরদিকে নিজের প্রিয় শিক্ষক অভিভাবক ও শায়খের বিচ্ছেদ। তাঁর জন্য শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহকে ছেড়ে আসা খুবই কষ্টকর ছিল। যারা

[167]

ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিল, তারাই কেবল তার কষ্ট অনুমান করতে পারে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ও দুজনকে অনুগ্রহের বিস্ময়কর ঈমানী দৃশ্য ঘিরে নিয়েছিল। তারা নিজেদের মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিস কোন ঝগড়া বিবাদ ছাড়াই একে অন্যের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে বন্টন করে দেন। পরবর্তীতেও যখন যেখানে সুযোগ হয়, একে অপরের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ও আন্তরিক আচরণ করেন। এ সময়ে একবার না জেনে কিছু লোক শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলে দেয়। তিনি এ কথা জানতে পেরে খুবই ব্যথিত হন। তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। তিনি বলেন: “ এই সাথিরা শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর আখলাক সম্পর্কে সম্ভবত জানেন না; যদি জানতেন, তাহলে কখনোই এমনটা বলতে পারতেন না।”

আল-কায়েদার সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ পুরোপুরি আশ্বস্ত হবার আগে পুনরায় সকল বিষয় বোঝার জন্য এবং মনের সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কয়েকটি বৈঠক করেন। এই বৈঠকগুলো আল-কায়েদার আমীর শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ মাসরি রহিমাহুল্লাহ এবং তার সহকারী শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লিবি রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার মনের সকল প্রশ্ন এই দুই হযরতের সামনে উপস্থাপন করেন। উভয়ে খুবই ধৈর্য সহকারে আস্তে ধীরে সেগুলোর জবাব দেন। এই সময় তিনি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে তাদের অবস্থান জানেন। চার মাযহাব, তাকলীদের শরীয়াহ মূল্যায়নের পাশাপাশি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাঝে মাযহাব ও আকীদা-

[168]

দর্শনগত মতপার্থক্য, অন্যান্য মাযহাব ও রাজনৈতিক বিষয়ে আল-কায়েদার হযরতগণের রায় ও মতামত তিনি জানার চেষ্টা করেন। জিহাদী কর্ম কৌশল সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তিনি আশ্বস্ত হন। সবকিছু জেনে আশ্বস্ত হওয়াতে তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন এ কারণে যে, আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের রায় ও মতামত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সাধারণ আকীদা- বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পুরোপুরি অনুকূল; সেই সঙ্গে উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের অধিকাংশ রায়ের প্রতিও তাদের আনুকূল্য ও পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা রয়েছে।

বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার এই বৈঠক কয়েকদিন যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আন্তরিকভাবে পুরোপুরি আশ্বস্ত হওয়ার পরে হাত অগ্রসর করেন এবং শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহর মধ্যস্থতায় শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহকে রীতিমতো জিহাদী বায়আত প্রদান করেন। আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য গোটা জীবন জিহাদ করা, ভালো বিষয়াদিতে যথাসাধ্য আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় আমীর এবং তার সহকারীদেরকে শ্রবণ ও মান্য করার অঙ্গীকার করেন এবং শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত এই অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। এটা ২০০৭ সালের শেষ দিকের কথা। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

বায়আতবদ্ধ হবার দিন সন্ধ্যায় আমি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কয়েক মাস ব্যাপী পেরেশানি ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার পর আজ তিনি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করি, “আপনার পরামর্শগুলো কতদূর পৌঁছল?” মুচকি হেসে তিনি জবাব দেন: “আমি বায়আত করে নিয়েছি” আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি: “আপনার পুরোপুরি আস্থা এসে গেল? এই কিছুদিন আগেও তো আপনি কিছুটা [169]

দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার ছিলেন?” বললেন: “হ্যাঁ ছিলাম, কিন্তু আমি সব বিষয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করে নিয়েছি। দেখুন মানুষের জামাতে কোনো না কোনো ত্রুটি অবশ্যই থাকে। তাই আমাদের এখানেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, আল-কায়েদা এ সময় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত জামাত। এ কারণে আমি বায়আতবদ্ধ হয়েছি। তবে হ্যাঁ, আগামীকাল যদি অন্য কোথাও আমি সত্যের দেখা পাই, তাহলে অবশ্যই সেদিকে চলে যাবো।”

ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বের ছায়ায়

বায়আতবদ্ধ হবার পর সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিদেরকে একটি নতুন গ্রুপের আদলে সংগঠিত করে। এই নতুন গ্রুপের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহকে। তিনি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কিছুদিন আগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বায়আতবদ্ধ হয়েছিলেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে উপপ্রধান বা নায়েবে আমীর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এরপর নব উদ্যমে আবারও আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার সংগ্রামে সকলেই লিপ্ত হয়ে পড়েন।

শহীদ ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ উচ্চতর নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির পাশাপাশি বীরত্ব ও সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। সিন্ধু জেলার শহর সখরের প্রসিদ্ধ দাঈ ব্যক্তিত্ব উস্তাদ মুহতারাম হাফিজ ওয়াহিদুল্লাহ খান সাহেবের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-মাতা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দীন ইসলামের ভালোবাসা তার মাঝে গেঁথে দেন। যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীকে [170]

জয় করা এবং পাকিস্তানের সমাজ থেকে অনৈতিকতা ও অন্যায় অপসারণ করাই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। রুশ হামলার সময় আফগানিস্তানের জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি কাশ্মীর জিহাদের আহ্বায়ক এবং অগ্রসৈনিক ছিলেন। পাঞ্জাব মেডিকেল কলেজ ফয়সালাবাদ থেকে তিনি এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। ডাক্তার হওয়ার পর তার জীবনের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে জাগতিক স্ট্যাটাস বৃদ্ধির পরিবর্তে দীন ইসলামের দাওয়াত এবং সমাজ সংশোধন প্রচেষ্টা। সৎকর্মে অগ্রসর ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তানে আমেরিকার নৃশংস ন্যাক্কারজনক বর্বর হামলার সময় চিকিৎসা ও সহায়তা সরঞ্জামাদি নিয়ে একেবারে আক্রমণের মুখে কাবুলে গিয়ে পৌঁছান এবং মুজাহিদীনের সাহায্য সহায়তা ও চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। কাবুল যখন দীনের শত্রুদের হাতে চলে যায় তখন পুনরায় তিনি দক্ষিণ দিক দিয়ে চামান বর্ডারে মেডিকেল ক্যাম্প বানিয়ে বসেন। তিনি কান্দাহারের ফ্রন্টে মুজাহিদীন ও মুহাজিরদের চিকিৎসার কাজে গোটা পাঁচ মাস ব্যস্ত থাকেন। ক্রুসেডাররা খোরাসান দখল করার পর গোটা বিশ্ব থেকে দীনের তরে উৎসর্গিত হবার লক্ষ্যে জড়ো হওয়া অধিকাংশ মুহাজির ইসলামের ভূখণ্ড পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতিহাসের এই নাজুক গতিপথ অতিক্রমকালে পারভেজের সেনাবাহিনী এবং সরকার মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে যে বিরাট খেয়ানত করেছে, তুচ্ছ ডলারের বিনিময়ে এই উম্মাহর সন্তানদেরকে যেভাবে তারা ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিয়েছে, সেই দাস্তান সকলেরই জানা আছে। কিন্তু অপরদিকে পাকিস্তানবাসীর মধ্য থেকে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান যে সমস্ত ব্যক্তি নিজেদের জান-মালকে ঝুঁকিতে ফেলে ইসলামের মুহাজিরদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন, নিজেদের ঘর-বাড়িকে

[171]

তাদের জন্য উজাড় করে দিয়েছেন, নিজেদের দুনিয়াবি ক্যারিয়ার কুরবান করে দিয়েছেন ইসলামের সাহায্যের জন্য—তাওহীদের এমন সৈনিকদের মাঝে উল্লেখযোগ্য একটি নাম হচ্ছে ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ। ওই সময় করাচির কিছু মুজাহিদকে চিকিৎসা করার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ক্রুসেডারদের মিত্র নৃশংসতাকারী গোপন এজেন্সিগুলোর টর্চার সেলে তিনি নির্মম নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হন। কিন্তু এসবের ফলে তাঁর দৃঢ় অবিচল পদ বিন্দুমাত্র টলে যায়নি। বরং কারাপ্রকোষ্ঠের শাস্তি ও নির্যাতন-নিপীড়ন যেন তার ইশক ও ভালোবাসার আগুন আরও জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ একজন দৃষ্টান্তহীন আল্লাহর দীনের দাঈ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যৌবনের শুরু থেকেই কুরআনের ক্লাস ও প্রোগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর দীনের ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসার বীজ সমাজে বপন করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তার কণ্ঠস্বরে ছিল উত্তাপ। তার আওয়াজ ছিল বেদনা মাখা। কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা মাত্রই তার অন্তর ভরে যেত। চোখ হতে অশ্রুরধারা নেমে আসতো। যত পাষাণ হৃদয় হোক না কেন, তা বিগলিত হয়ে যেত। দীন ইসলামের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠতো। কুরআনের দাওয়াত প্রদান করা হবে এবং তাতে জিহাদের আলোচনা থাকবে না তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে, যখন কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াত জিহাদের মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করেছে? করাচি সেন্টার জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি কুরআনের ক্লাস ও প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে পাকিস্তানের যুবকদের মাঝে জিহাদ হিজরত ও শাহাদাতের তীব্র বাসনা তৈরির লক্ষ্যে পুনরায় দরসের ওই ধারা চালু করলেন। তার কথাগুলো হাজার হাজার অন্তরকে নাড়া দিয়ে গেল এবং শত শত জীবন

[172]

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সঙ্গে এসে মিলিত হলো। পাকিস্তানের একজন প্রসিদ্ধ আলেমে দীন পীরে কামেল হযরত মাওলানা কারী নূর মোহাম্মদ নকশেবন্দী হাফিযাহুল্লাহকে যখন কোনো একজন সাথি ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর তার একটি দরস শোনালেন, তখন তিনি খুবই প্রভাবান্বিত হলেন, তাকে দোয়া দিলেন এবং বললেন যে, এই যুবকের অন্তরে অনেক উত্তাপ রয়েছে। ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহ অন্যান্য দাওয়াতী গুণাবলির পাশাপাশি ইবাদত বন্দেগিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং রাত্রি জাগরণকারী আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। রাতের শেষ প্রহরে তিনি আপন রবের সামনে মোনাজাতে মশগুল হয়ে যেতেন। তার আখলাক ও চরিত্র এমন ছিল, যে তাকে দেখতো, তার ভক্ত হয়ে যেত এবং প্রত্যেকেই মনে করত, আমার সঙ্গেই বুঝি তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দৌড়ে দৌড়ে তিনি অন্যদের কাজ এবং প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। সাথি ভাইদের আনন্দে তিনি সীমাহীন আনন্দিত হতেন। তাদের জন্য তিনি একজন স্নেহশীল বড় ভাইয়ের মতোই ছিলেন। আমার মনে আছে, ২০০৭ সালে প্রথম প্রথম যখন ওয়াজিরিস্তানের দিকে হিজরত আরম্ভ হল, হিজরতের ভূমিতে ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহর একজন ঘনিষ্ঠ সাথি মালদ্বীপের আবু হামজা নাবিল রহিমাহুল্লাহর ঘরে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। সে সময় নিজের মুহাজির মালদ্বীপি ভাইয়ের আনন্দে ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহর উৎফুল্লতা দেখার মতো ছিল। তিনি আকীকার সময় ভাইদেরকে একত্রিত করলেন এবং ভালোবাসা সৌহার্দ্য সম্প্রীতির এমন এক পরিবেশ তৈরি করলেন যে, নতুন নতুন ঘর থেকে বের হওয়া মুহাজির যোদ্ধাদের অন্তর সীমাহীন আনন্দে ভরে গেল। এক কথায় ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ প্রশংসনীয় গুণাবলি ও চরিত্রের এক সুশোভিত বাগান ছিলেন। তার দৃষ্টান্ত বর্তমান সময়ে খুব কমই চোখে পড়ে।

[173]

তার এই সমস্ত উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল তার বীরত্ব ও সাহসিকতা। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন এবং সর্বক্ষণ জিহাদী বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য অস্থির থাকতেন। তার কাছে অবসর বা অবকাশ যাপনের সুযোগ একেবারেই ছিল না। বরং আপন রবের পয়গাম ও ঐশী বার্তা গোটা পৃথিবীতে পৌঁছে দেয়ার অস্থিরতা তাকে ব্যাকুল করে রাখতো। আরশাদ ভাই রহিমাহুল্লাহ সর্বক্ষণ যে অবস্থার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতেন তা কবির ভাষায়—

সময় সুযোগ কোথায় কাজ এখনও বাকি

নূরে তাওহীদের পূর্ণতা দান এখনও বাকি

কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বিপদ-আপদের মুখোমুখি হয়ে যাওয়া তার উল্লেখযোগ্য একটি গুণ ছিল। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানের জিহাদে অগ্রগতি আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেগুলোর মধ্যে কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো:

• শহীদ আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ নিজে পাকিস্তানের শহরগুলোতে চলে গেলেন এবং হিংস্র আর্মির বিরুদ্ধে অপারেশনের পরিকল্পনা তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। তিনি সফলতার সাথে নিষ্পাপ শিশু ও নারীদের হত্যাকারী আর্মি এবং সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আইএসআই'র বিরুদ্ধে ফিদায়ী কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন। তিনি নিজে অপারেশনের জন্য সরঞ্জাম পৌঁছানো এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্ব প্রদানে অংশ নেন।

[174]

• তিনি ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদীনের পাকিস্তানি যুদ্ধ এবং বিশেষ করে শহুরে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রতি মনোযোগী হন। এরই ধারাবাহিকতায় হঠাৎ তিনি পুরনো সাথিদেরকে শহুরে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি বড় প্রশিক্ষণ কর্মশালার ব্যবস্থা করেন। সৌভাগ্যক্রমে কাশ্মীর জিহাদে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুজাহিদীনের প্রশিক্ষক হিসেবে অবস্থানকারী ফয়সালাবাদের শহীদ উস্তাদ মুহাম্মাদ আফজাল জাকির রহিমাহুল্লাহকে ডক্টর সাহেব সহজেই পেয়ে যান, যিনি লাল মসজিদের ঘটনার পর অত্যাচারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নিয়ত করে শহীদ আরশাদ রহিমাহুল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি কর্মশালা আরম্ভ করে দেন। ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ নিজেও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণের কষ্টসাধ্য ট্রেনিং, কঠোর পরিশ্রম দৌড় প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সবকিছুই খুব গুরুত্বের সাথে করে দেখান। ড. সাহেবের মাঝে ছিল পাকিস্তানের জিহাদ আরও শক্তিশালী ও বেগবান করার, নৃশংসতাকারী অত্যাচারী নিপীড়ক আর্মিকে উচিত শিক্ষা দেয়ার এবং প্রিয় মাতৃভূমিতে শরীয়ত বাস্তবায়নের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত শহুরে যুদ্ধের প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা চলাকালেই ড্রোন বিমান ভানার (ওয়ানার) আকাশপথে টহল দিতে আরম্ভ করে। তখন কিছুদিনের জন্য কর্মশালা মুলতবি ঘোষণা করা হয় এবং স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাথিদের ধারণা ছিল, কর্মশালা চালিয়ে নেয়ার জন্য নতুন যে জায়গা নির্ধারিত হবে, সেই স্থানের খবর শত্রুরা

[175]

জানতে পারবে না। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষিত গুপ্তচরেরা দ্বিতীয় জায়গারও সন্ধান পেয়ে যায়। তখন ওই জায়গার আশপাশে আকাশে ড্রোন বিমান টহল দিতে আরম্ভ করে। সাথিদের কয়েকটি সামরিক প্রশিক্ষণ বাকি ছিল। অন্যান্য ভাইয়ের পরামর্শ এবং অবস্থার ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহও রায় ছিল আগামীকাল থেকে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা বন্ধ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইসলামের এই সিংহের জন্য অন্য কিছু লিখে রেখেছিলাম। তার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। যেই তামান্না বুকে নিয়ে তিনি পাহাড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন; জীবনের যেই অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন, সেই তামান্না পুরা হবার সময় নিকটে চলে এসেছিল। তার শুভ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল।

হিজরতের পথিকদের সাহায্যের এই সফর

যেই সন্ধ্যার জন্য আমি এই সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম

সেই সন্ধ্যা যখন চলে এসেছে, এখন অপেক্ষা কিসের?

অপেক্ষা যদি হয় জান্নাতের, তবে এই সফর থেকে কেমন করে পলায়ন করা যেতে পারে?

উড়ে যাওয়ার জন্য আমার হৃদয় ও ডানা প্রস্তুত

আল্লাহর রাহে আমার গর্দান প্রস্তুত

১৬ ই মার্চ ২০০৮ সালে যখন তিনি শহুরে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন মার্কিন ড্রোন লেজার গাইডেড মিসাইলের মাধ্যমে তার ওপর হামলা করে। তিনি আরও ১৩ সাথিসহ শাহাদাতের [176]

মর্যাদা লাভ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শহীদ আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহর কর্মব্যস্ততার সময় ছিল খুবই সীমিত। কাজ করার জন্য তিনি খুব অল্প সময়ই পেয়েছিলেন। তিনি অল্প কয়েক মাস মুজাহিদীনের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তার কাজের মাঝে বৈচিত্র্য, বহুমুখিতা ও গতিবেগ ছিল। দেখতে দেখতে বিভিন্ন প্রকল্প আরম্ভ করে সম্পন্ন করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। যে কাজের ইচ্ছা করতেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে তা বাস্তবায়নের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। তার অভিধানে যেন ভয় বা বিচলতা বলে কিছু ছিল না। সাথিদেরকে মুহাব্বত করা এবং সকল সাথির খেয়াল রাখা তার বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতেন। তাকওয়া ও খোদাভীতির চেতনা সাথিদের মাঝে জাগ্রত করা তার আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিরলসভাবে উদ্যমের সাথে জিহাদী কাজগুলো সম্পন্ন করতেন। তেমনি নিরলস উদ্যমে তিনি আপন রবের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। জগত স্রষ্টার ইচ্ছা ছিল এই, তার যেই বান্দা বিশেষ মর্যাদা অর্জনের জন্য দোয়া করতেন, তাকে দ্রুতই সে মর্যাদায় পৌঁছে দেবেন। ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহ রাতের শেষ প্রহরে কেঁদে কেঁদে আপন রবের কাছে সেই মর্যাদা কামনা করতেন। তাই দ্রুতই তিনি আপন রবের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন আমীন।

মরদে মুসলমান
শহীদ আমীরে জিহাদ ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ একজন আদর্শ মুসলিম ছিলেন। ঈমান, মানবিকতা, উন্নত চারিত্রিকতার দিক থেকে এতটা [177]

[illegible]

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن
گفتار میں، کردار میں، اللہ کی برہان

قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

ہمسایۂ جبریلِ امیں، بندۂ خاکی
ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن!

قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے
دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان

جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں، وہ طوفان

فطرت کا سرودِ ازلی اس کے شب و روز
آہنگ میں یکتا، صفتِ سورۂ رحمٰن

بنتے ہیں مری کارگہِ فکر میں انجم
لے اپنے مقدّر کے ستارے کو تو پہچان

অর্থ : প্রতিটি মুহূর্ত নতুন গৌরব , মুমিনের নতুন মহিমা
কথায় , চরিত্রে সে আল্লাহর প্রমাণ !

পরাক্রম দয়া মমতা পবিত্রতা ও মহান শান
এই চারটি উপাদান থাকলে তবেই হয় মুসলমান

মাটির তৈরি হয়েও যার প্রতিবেশী জিবরিল -ই-আমীন,
তার বিশ্রামাগার না বুখারা না বাদাখশান

এ রহস্য মুমিন ছাড়া আর কেউ জানে না

পাঠক দৃশ্যমান, বাস্তবে কুরআন!

প্রকৃতির উদ্দেশ্য তার উদ্দেশ্য

এই পৃথিবীতে মীজান তথা (ইনসাফ) কিয়ামতেও মীজান

এমন শিশির যা হৃদয় মন শীতল করে,

সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ করে দেবার মতো তুফান

দিনরাত প্রকৃতির চিরন্তন সঙ্গীত

সামঞ্জস্যের মধ্যে ঐক্য, সূরা রহমানের বৈশিষ্ট্য

যুদ্ধের পতাকা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সামনে নেন
ইসলামের উজ্জ্বল পতাকা ঘিরে রয়েছে ত্যাগ-তিতিক্ষা কুরবানী ও শাহাদাত। আল্লাহর দীনের রাস্তায় একজন যদি জীবন ত্যাগ করে, তবে অপর জন মাথা পেতে অগ্রসর হয়ে ইসলামের পতাকা সামলে নেয়। এ পতাকা কখনোই মাটিতে পড়ে যেতে দেয়া হয় না। মুতার যুদ্ধে সাইয়েদেনা যায়েদ বিন হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তখন হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে পতাকা সামলে নেন। তিনিও যখন শহীদ হয়ে যান তখন সাইয়েদেনা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হন। তিনিও যখন আপন ভূমিকা সম্পন্ন করে আল্লাহর দীনের জন্য কুরবান হয়ে যান তখন সাইয়েদুনা খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাওহীদের পতাকা সামনে নেন।

[180]

এভাবেই আল্লাহর দীনের পতাকাবাহী এক বাহু কেটে

গেলে অন্য বাহু এবং একজন নিহত হলে অন্যজন এই

পতাকা সামলে নেয়ার আখ্যান যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

এভাবেই ইসলামের মশাল আমাদের পর্যন্ত এসে

পৌঁছেছে।

শহীদদেরকে দাফন করার পর এবং আহতদের চিকিৎসার

ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর ফারুক ভাই

রহিমাহুল্লাহকে ওই জামাআতের নিয়মতান্ত্রিক

আমীর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ড্রোন হামলায়

শহীদ ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহর সাথে

তার একজন অল্প বয়সি যুবক ভাতিজা আহলামও

22 শহীদ

হয়ে গিয়েছিলেন। ডক্টর রহিমাহুল্লাহর একজন

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তার দুজন নিকট আত্মীয়ের

শাহাদাতে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করেন এবং সকল

সাথিকে একত্রিত করে খাবারের ব্যবস্থা করেন।

খাবারের এই দাওয়াতেই তিনি যুদ্ধের

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শায়খ মোস্তফা আবুল

ইয়াজীদ রহিমাহুল্লাহর (খোরাসানে আল-কায়েদার

22 শহীদ ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির অল্প বয়সী ভাতিজা আহলাম শাহাদাতের ব্যাকুলতা ও ঈমানী গুণাবলীতে এই যুগে আল্লাহর নিদর্শন ছিলেন। তার আলোচনা করতে গিয়ে উস্তায উসামা মাহমুদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আহলামের শাহাদাতের আগে ওখানে ভানায় একটা ড্রোন হামলা হয়। নেক মোহাম্মদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর পরিচালিত ড্রোন হামলার পর সেটাই প্রথম হামলা ছিল। আমি শহীদদেরকে দেখার পর ফিরে আসলে আহলাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শহীদানের কি অবস্থা? আমি বললাম: তাদের দেহ টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে এবং খুবই সুগন্ধ আসছিল। তিনি বললেন: আমার জন্য দুআ করুন, আমার দেহ যেন মিজাইলের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমি বললাম: শহুরে যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছো কেন? প্রথমে শত্রুর ক্ষতি করো এরপর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা। তিনি তখন বললেন: ভাইজান আল্লাহ চাইলে এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগের মাঝেই আমেরিকাকে ধ্বংস করতে পারেন। আল্লাহর জন্য এটা কঠিন বিষয় নয়; কিন্তু আল্লাহ যদি আমার মাধ্যমে গোটা কুফরি বিশ্বকে পরাজিত করেন; আমি যদি আমেরিকাতে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করি কিন্তু পরবর্তীতে আমি ক্ষমা না পাই, তাহলে এই বিজয় দিয়ে আমার কি হবে? এ কারণে আমি শাহাদাত কামনা করছি, যে শাহাদাতে আমার পুরো দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বাস্তবেই বোমা হামলার পর যখন শহীদানের মধ্যে প্রত্যেকের কোন না কোন অঙ্গ অক্ষত পাওয়া গেল, তখন আহলাম পুরোপুরি টুকরো টুকরো হয়ে গেলেন এবং তার শরীরের একটিও অঙ্গ অক্ষত পাওয়া যায়নি। বাস্তবে তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন তাই তার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ সত্য করে দেখালেন।”

[181]

আমীর) চিঠি পাঠ করে শোনান। ওই চিঠিতে হামলার ঘটনায় সাথিদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়, শহীদদের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।

শাহাদাত এবং সবর ওই দাওয়াতের মাঝেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজের প্রসিদ্ধ দরস প্রদান করেন যা পরবর্তীতে 'শাহাদাত এবং সবর' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আমীর সহ ১৩ জন সাথির শাহাদাতে অন্য সাথিরা খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। সকলের চক্ষু অশ্রু সজল এবং হৃদয় আকুল ছিল। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ উহুদের আলোচনা শুরু করলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওই সময়ের মানসিক অবস্থা ও দুঃখ বেদনার বর্ণনা দিলেন। এরপর ওই সমস্ত আয়াত নিয়ে আলোচনা করলেন যেগুলো জগত স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈনের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ দরসে বিভিন্নভাবে তিনি ভাইদেরকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। তাদেরকে সমবেদনা জানাতে থাকেন। আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে থাকেন।

তার সান্ত্বনা বাণীগুলো এমন ছিল:

দুঃখ-বেদনা কিসের? কোন বিষয়ের জন্য আমাদের হৃদয় ব্যথিত? সেটা কি এই, কাফেররা আঘাত করেছে আমাদেরকে? আমাদের ১৪ জন সাথি শহীদ হয়েছে; কিন্তু প্রতিনিয়ত তাদের সৈন্য তো এর চেয়ে বেশি মারা যাচ্ছে ((((বিশ জন এদিকে ইরাকে, ১০ জন খোরাসানে পাঁচজন পাকিস্তানে)){{পিডিএফ ফাইল এর 107 নম্বর পৃষ্ঠার সুযোগ দিক থেকে ১০ নম্বর লাইন}}})))))

[182]

((((بیس ادھر عراق میں ، دس افغانستان میں ،پانچ پاکستان میں

উর্দু টা এরকম কিন্তু কি বুঝিয়েছে অস্পষ্ট এবং সন্দেহ আছে))))

এটাতো রোজ তাদের আঘাতপ্রাপ্তদের সংখ্যা। সেই তুলনায় আমাদের ক্ষয়ক্ষতি দেখুন, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহে সেটা খুবই কম।

আমরা যখন ঘর থেকে বের হই, তখন একটি দোয়া রয়েছে, যা সকাল-সন্ধ্যায় আমরা পাঠ করি। দোয়াটি হচ্ছে :- اللهم ارزقني شهادة في سبيلك অর্থ : “ হে আল্লাহ আপনি আপনার রাস্তায় শাহাদাত আমাকে দান করুন ”। আমাদের মধ্যে কারও যখন এই মর্যাদা অর্জিত হয়ে যায়, তখন তো এটা আমাদের জন্য খুশির সংবাদ। কারণ আল্লাহ আমাদের সাথি ভাইকে নির্বাচিত করেছেন। এ কথা ঠিক, আমাদের সাথি ভাইয়েরা আমাদের আগে চলে যাওয়াটা অবশ্যই আমাদের জন্য বেদনার; এই বেদনা বিচ্ছেদের; কিন্তু এই কারণে তো অবশ্যই আনন্দিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তাআলা (ইনশাআল্লাহ) শহীদ হিসেবে তাকে আমাদের আগে বাছাই করে নিয়েছেন। যাই হোক আল্লাহ তাদের সকলের শাহাদাতকে কবুল করুন।

ব্যথিত হওয়া উচিত একথা ভেবে যে, তিনি আমাদের আগে চলে গিয়েছেন। এই বেদনা অবশ্যই যৌক্তিক। এর জন্য ব্যথিত হওয়াই উচিত। বিচ্ছেদের ব্যথা বেদনা তো স্বভাবজাত একটি বিষয়। এটি আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরত। কিন্তু এই ব্যথা বেদনার দাবি কি এই নয় যে, আমরা নব উদ্যমে আরও বেশি শক্তি সাহস যুগিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে এই পথে অগ্রসর হব, যেই পথে আমাদের সাথি ভাইয়েরা অগ্রসর হয়ে আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছেন?”

=========

তিনি সূরা আলে ইমরানের কিছু আয়াত পাঠ করতে থাকেন। তখন আমাদের মনে হতে থাকে , এই আয়াত যেন আজই এবং আজকের দিনের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জান্নাতে শহীদদের আনন্দ উৎসব এবং নেয়ামতরাজির আলোচনা করেন। তখন আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। আজও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ভরাট কন্ঠের হাদীসের বাণীগুলো আমার কানে যেন অনুরণিত হচ্ছে —

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং পবিত্র জিনিস ছাড়া তিনি অন্য কোনো কিছু কবুল করেন না।"[23]

সেদিন সকলের অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আমি কেন শহীদ হলাম না ? আমার বদলে আমার ভাই কেন শহীদ হয়ে গেলেন ?" ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শহীদদের ফযীলত , মর্যাদা , সবর ও ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব এবং ধৈর্যের পুরস্কার সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। তিনি আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন এবং এমন সকল কাজ পরিহার করতে বলেন, যা ধৈর্য ধারণের বিপরীত। তার আলোচনা আমাদের অন্তরকে প্রশান্তি এনে দেয় এবং নতুন উদ্যম , শক্তি সাহস ও সান্ত্বনা নিয়ে আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার প্রত্যয় আমাদের মাঝে জেগে ওঠে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : দলের (মাজমুআর) নেতৃত্ব প্রদানের সময়কাল

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ২০০৮ সালে ডক্টরের আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর থেকে ২০১৪ সালে জামাআত আল-কায়েদা উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছরের

[23] সহীহ মুসলিম

অধিক কাল যাবৎ একটি সুশৃঙ্খল কার্যকরী জিহাদী মাজমুআর নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি মাজমুআর দায়িত্ব হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই শৃঙ্খলা নীতিমালা ও নিয়মতান্ত্রিকতার অধীনে সকল কাজ বিন্যস্ত হয়ে যায়। তিনি নিজের এই মাজমুআকে বিভিন্ন শুবায় (বিভাগে) বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটা শুবা আবার জিহাদী শিল্পশাস্ত্র ও জ্ঞান গবেষণায় সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। নেতৃত্বভার গ্রহণের পর ইতিমধ্যেই ওয়াজিরিস্তান ও পাকিস্তান জিহাদে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতী ও সামরিক কার্যক্রমে তিনি এবং তার সাথিরা সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন।

উত্তম ও যোগ্যতা সম্পন্ন সাথিদের সঙ্গ আল্লাহ তাআলার অনেক বড় অনুগ্রহ ছিল তার
ওপর যে, তিনি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র পথে অনেক মূল্যবান যোগ্যতা সম্পন্ন সাথির সঙ্গ তাকে দান করেছিলেন। প্রিয়ভাজন ঐ লোকগুলো তাঁর নির্দেশনার আলোকে নিজেদের শাখার কাজ অগ্রসর ও বেগবান করেছেন। শুধু এতোটুকুই নয়, বরং তারা নিজেদের পক্ষ থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে পুরো মাজমুআকে আরও অগ্রসর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন। উম্মাহর এই সন্তানেরা নিজেদের ইখলাস, খোদাভীতি এবং আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা সহকারে নিঃস্বার্থভাবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উচ্চতর যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। উম্মাহর এই সন্তানদের সংখ্যা ও অবদান অল্প কয়েকটি লাইনে সীমাবদ্ধ করে নেয়ার জন্য কখনোই নয়; বরং শুধু উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন শাখার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন অতুলনীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করছি— [185]

** শরীয়তী বিষয়াবলী তত্ত্বাবধানের জন্য অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বিদগ্ধ আলেমে দীন, পূর্বসূরিদের স্মৃতিচিহ্ন, হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান রহিমাহুল্লাহ প্রথম দিন থেকেই তার সহযোগিতায় থাকেন। তিনি শুধু শরীয়তের বিধানাবলীর আলোকে মাজমুআর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেই ক্ষান্ত হতেন না; বরং সেই সঙ্গে উলামায়ে কেরামের প্রস্তুতি পরিকল্পনার খসড়া তৈরিতেও কাজ করেছেন। যার ফলে উলামায়ে কেরাম সেই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী মুজাহিদীনের দিকনির্দেশনার কাজ খুব সহজেই করতে পেরেছেন।

** বারুদ এবং জিহাদী সামরিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক করাচির ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আদিল উস্তাদ সুহাইল

24 রহিমাহুল্লাহর মতো শাস্ত্রবিদ ও

শিল্পদক্ষতার অধিকারী গবেষক অধ্যাপকের উপস্থিতির কারণে ওই শাখায়ও তার সাথিরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন।

24 করাচীর সন্তান উস্তায সুহাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফারুক ভাইয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং বারুদ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রশিক্ষক ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উন্নত জীবন যাপনের সুযোগকে পিছনে ফেলে ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির দাওয়াতে লাব্বাইক বলে ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন। আরব অনারব অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে বারুদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তিনি ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে বারুদ প্রস্তুতকরণ এবং মুজাহিদীনকে বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান খোলেন। এই শাস্ত্রে টেকনিক্যাল ভিত্তির উপর তিনি কিছু সংস্কার ও গবেষণা চালান। সারাক্ষণই কোন গবেষণায় রত থাকতেন। আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের ওপর হামলায় অংশগ্রহণ করেন। কুরআন কারীমের সঙ্গে আশ্চর্য ধরনের গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তার শিষ্যদের প্রশিক্ষণে ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে খুবই মনোযোগী ছিলেন। খুবই সাদাসিধে মেজাজের ইবাদতগুজার দুনিয়াবিমুখ লোক ছিলেন। সত্য উচ্চারণ ছিল তার পরিচয়। কোথাও মন্দ বিষয় দেখলে সংশোধনের জন্য কোমর বেঁধে নেমে যেতেন। ফিতনা-ফাসাদ ও গীবত পরনিন্দা থেকে দূরে থাকতেন। তার ওপর ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির সীমাহীন আস্থা ছিল। ফারুক ভাই এক আলোচনায় উস্তায সুহাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। 'জর্বে ওজব' অপারেশনের সময় আলকায়দা উপমহাদেশের প্রথম সারির এক কেন্দ্রে থাকা অবস্থায় ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাতের উচ্চস্থান অর্জন করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন! আমীন!!

[186]

** চিকিৎসা শাখায় এবং পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ

25

বিভাগের প্রাণ ভোমরা ডক্টর সারবুলন্দ জুবায়ের খান রহিমাহুল্লাহ। তিনি একদিকে দক্ষ ডাক্তার ও সার্জন ছিলেন। অপরদিকে প্ল্যানিং ও এনালাইসিসেও পারদর্শী ছিলেন। তার তত্ত্বাবধানে এই উভয় শাখায় আল্লাহর দীন বুলন্দ ও সমুন্নত করার ক্ষেত্রে অনেক বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে।

মিডিয়া ফ্রন্টে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গী হিসেবে তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপন ইখলাস, লিল্লাহিয়াত, মেধা-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, মিডিয়া ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং মনোযোগ পূর্ণ কাজের মাধ্যমে এই শাখাকে বর্তমানকালে জিহাদের দাওয়াতকে উর্দু ভাষার সবচেয়ে বড় ও নির্ভরযোগ্য ‘তরজুমান’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

** পুরো মাজমুআর ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য ম্যানেজমেন্ট বিভাগের উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী, অক্লান্ত পরিশ্রমে অভ্যস্ত, কাশ্মীর জিহাদের গাযী খরম কায়ানী

26 (হাজী কাশেম) রহিমাহুল্লাহ

25 Planning and Analysis
26 রাওয়ালপিন্ডির সন্তান কমান্ডার খুররম কায়ানি আফগানিস্তান জিহাদে হাজী কাশেম রহমতুল্লাহি আলাইহি নামে পরিচিত ছিলেন। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির পরামর্শক পরিষদের সদস্য এবং গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদার সাথি ছিলেন। কাশ্মীর জিহাদে তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার মাধ্যমে কয়েকটি ময়দান জয় করেন। শ্রীনগরের ভেতরে ঢুকে মুশরিক হিন্দু সেনাবাহিনীর উপর হামলার প্ল্যান করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাশ্মীর উপত্যকায় অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে অবস্থান করেন। লাল মসজিদের দুঃখজনক ঘটনার পর ফারুক ভাই রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে শামিল হয়ে যান। আঙ্গুর আদার কারারগাহ্ থেকে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে ক্রুসেডারদের উপর পরিচালিত কয়েকটি হামলার নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে গাজনি ও জাবুল প্রদেশের প্রাণকেন্দ্রে জিহাদী কার্যক্রমের প্রধান দায়িত্বশীল থাকেন। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা সুনিপুণভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। আলকায়দা উপমহাদেশ গঠিত হবার পর আফগানিস্তানে সামরিক বিষয়ের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চারিত্রিক উৎকর্ষের অধিকারী, ইবাদত গুজার, দুনিয়া বিমুখ, মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ

[187]

ছিলেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জন্য ওয়ানা থেকে মিরান শাহ পর্যন্ত বিস্তৃত সাথিদের সঙ্গে কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক ও সংযোগ রক্ষার অগ্র সৈনিক।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক মাজমুআর ইমারত বা নেতৃত্ব দানের সময়কালের কৃতিত্বের গণনা খুবই কঠিন একটা বিষয়। সাফল্য ও কৃতিত্বের এই তালিকা অনেক দীর্ঘ। এই সংক্ষিপ্ত কিতাব সেই আলোচনার জন্য যথেষ্ট নয়। এরপর কথা হলো আমার চেয়ে বেশি গোছালোভাবে খুব সুন্দর করে এই আলোচনা সম্ভবত ওই সমস্ত ভাই করতে পারবেন, যারা ওই সময়টাতে সরাসরি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দিকনির্দেশনায় পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু আমি কার্যত দূরে থাকা সত্ত্বেও আন্তরিক নৈকটের কারণে ওই সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর যে সমস্ত অবদান ও কীর্তিকলাপ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে তার অংশগ্রহণের যে নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করেছি, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরছি—

মাজমুআর নেতৃত্ব দানকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি

এই শিরোনামের অধীনে আমি ওই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও অবদানের কথা তুলে ধরেছি, যেগুলোর ফায়দা কোনো মাজমুআ বা জামাত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং শ্রেণি ও জামাত নির্বিশেষে সকল মুজাহিদীন এগুলো দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন; অথবা

ছিলেন। জিহাদের ময়দানে অনেক বড় বড় পরীক্ষার মাঝেও তিনি সবুর ও ধৈর্য ধারণ করেন। ২০১৪ সালে ‘জর্বে ওজব’ অপারেশনে ড্রোন হামলায় তিনি মারাত্মক আহত হন। চিকিৎসা সত্ত্বেও তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে কিন্তু তবুও তিনি অবিচলভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ২০১৭ সালে আল্লাহর এই সিংহ কমান্ডার খাত্তাব মনসুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে জাবুল প্রদেশে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমীন!!

[188]

এমনও হতে পারে যে, এই সমস্ত কার্যক্রম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ওই সমস্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই পরিচালনা করা হয়েছিল, যেগুলো কল্যাণ ব্যাপক হয়ে থাকে।

ভানায় দাওয়াতী কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি মাজমুআর নেতৃত্ব হাতে নেয়ার পর পরই তিনি ওয়ানায় জিহাদী দাওয়াতের সুযোগ তৈরি এবং মুজাহিদীনের ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। ওয়ানা/ভানা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের প্রাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলটি বর্তমান সময়ে সর্বপ্রথম মুজাহিদীনের মারকাজ ও কেন্দ্র হবার সৌভাগ্য অর্জন করে। এই এলাকাটাই সর্বপ্রথম মুহাজিরদের আশ্রয় কেন্দ্র হয় এবং এখান থেকেই সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকে অপারেশনের সূচনা হয়।

ওয়াজির গোত্র সমূহের সঙ্গে উজবেকদের যুদ্ধ কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উজবেকিস্তান থেকে
আগত কতক মুজাহিদের সংগঠন হরকতে ইসলামী উজবেকিস্তান কর্তৃক অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ি মূলক অবস্থানের কারণে এবং তাদের হাতে কাবায়েলি (গোত্রীয়) এলাকার কতক মুসলমানের অন্যায়ভাবে নিহত হবার ঘটনায় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। স্থানীয় গোত্রগুলো উজবেকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এদিকে উজবেক যোদ্ধারাও নিজেদের অবস্থানের উপর অটল থাকে। তারা ওয়ানার আহমদযাঈ

27 ওয়াজির
গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে অন্য মুজাহিদীন— 27 দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ওয়াজির গোত্র আহমদ যাঈ ওয়াজির গোত্র। [189]

যেমন ইমারতে ইসলামিয়া এবং তানজীম আল-কায়েদার মুজাহিদীন— উভয় গ্রুপের মাঝে সন্ধিস্থাপন এবং যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু উজবেক যোদ্ধাদের একরোখা অবস্থান এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্রের কারণে তাদের চেষ্টা সফল হতে পারে না। পাক বাহিনী সেসময় নিজেদের চক্রান্তমূলক রাজনীতির খেলা চালিয়ে যেতে থাকে এবং ওয়াজির গোত্রগুলোকে উজবেকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শুধু উদ্বুদ্ধই করে না; রীতিমতো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ, তোপখানার বম্বিং এবং আকাশ পথেও সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। ফলে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উজবেক যোদ্ধারা ওয়ানা ছেড়ে উত্তর দিকে সরে পড়তে বাধ্য হয়। সেনাবাহিনী সে সময় ওয়াজির গোত্রগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করে। পাক বাহিনীর এই চক্রান্ত ও দুর্গন্ধময় রাজনীতির কারণে ওয়াজির গোত্রগুলোর কতক মুজাহিদের মাঝে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সখ্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তাদের অন্তরে সফট কর্নার তৈরির লক্ষণ দেখা যেতে শুরু করে। অসচেতন এই মানুষগুলো একথাও ভুলে যায় যে, এই সেই পাকবাহিনী যারা গতকাল পর্যন্ত তাদের মান-সম্মান ও রীতি-নীতির উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিলো এবং ইহুদী খ্রিস্টানদের এজেন্ডা গোত্রীয় এলাকাগুলোতে বাস্তবায়ন করছিল।

ওয়াজির মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ
এমন পরিস্থিতিতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ
নিজ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে সামলে নেন। তিনি জানতেন যে, যেকোনো জিহাদী আন্দোলনের জন্য ওই সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তাদের মারকাজ ও

[190]

কেন্দ্র। এ কারণে ওই সমাজে দাওয়াতের প্রচার-প্রসার ঘটানো সীমাহীন জরুরি। এ কারণে তিনি নিজের উভয়ের সঙ্গী হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান রহিমাহুল্লাহ এবং ডক্টর সারবুলন্দ খান যুবায়ের রহিমাহুল্লাহকে নিয়ে ওয়ানার মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন। তাদেরকে সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্র চক্রান্ত এবং আইএসআই'র কার্যক্রম ও মিশন সম্পর্কে সতর্ক করেন। তাদেরকে এ কথা বলেন যে, এই সেনাবাহিনী কখনোই নিষ্ঠাবান ছিল না। তারা জনগণকে এবং গোত্রীয় এলাকার মানুষদেরকে নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে। এরপর তারা তাদেরকে নিরুপায় অবস্থায় রেখে চলে যায়। এই সেই পাকবাহিনী যারা বাঙালি নারীদের ধর্ষণ করতো। এই সেনাবাহিনী আপনাদের সাথিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। অতঃপর তাদেরকে নিজেদের গোপন এজেন্ডার জন্য ব্যবহার করবে। তিনি মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দের কাছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব পাকিস্তান ও বেলুচিস্তানে এই সেনাবাহিনীর কীর্তিকলাপের কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাদেরকে বলেন যে, এই সেনাবাহিনী ওই নৃশংসতাকারী বাহিনীর উত্তরসূরি, যারা হাজার হাজার বাঙালি নারীর সম্ভ্রমহানি করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। তাদেরকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, এরাই ঐ বাহিনী যারা লাল মসজিদে হাজার হাজার লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে শুধু আমর বিল মারূফ তথা সৎকাজের আদেশের বিধান পুনর্জীবিত করার এবং শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবি উত্থাপনের কারণে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। আর তিনি এ কথাও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে, আমেরিকার সাথে মিলে আফগানিস্তানে হামলা করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধ-ফ্রন্টে ইহুদী-খ্রিস্টানদের জোটে অংশ নেয়া এই সেনাবাহিনীর রেকর্ড। এই সেনাবাহিনীকে কাফের সেনাবাহিনীর তালিকা ও নিবন্ধনকারী সংস্থাগুলো

[191]

নিজেদের ভেতর গণ্য করে। এদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই সমীচীন নয়।

ইসলাহ, আত্ম সংশোধন ও দাওয়াতের জন্য সর্বব্যাপী পরিকল্পনা
ওয়ানায় ওই সময় মুজাহিদীনের আমীর মোল্লা নাজির শহীদ রহিমাহুল্লাহ উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। মোল্লা সাহেব নিজের আশপাশে তাকিয়ে লক্ষ করেন, তার কিছু সাথি পাকবাহিনীর ক্যাম্পে যাতায়াত করছে। এসব দেখে তিনি সীমাহীন পেরেশান হয়ে যান এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন যে, এই সমস্যা থেকে আমরা কেমন করে মুক্তি লাভ করবো?' পারস্পরিক পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে,

** সর্ব প্রথম ওয়াজির মুজাহিদীনের শুরা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা শরীয়াহ বিষয়ক প্রশিক্ষণের একটি আয়োজন করবেন। সেখানে পাক বাহিনীর প্রকৃত চেহারা, কাফেরদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার কাছে এবং কাফেরদের সঙ্গে মিলে তাদের ষড়যন্ত্র চক্রান্তের কথা স্পষ্ট করা হবে। পাশাপাশি কাফেরদের সহযোগী এই বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও ফর্মালিটি বজায় রাখার শরীয়াহ হুকুমও স্পষ্ট করে দেয়া হবে।

** ওয়ানা এবং এ জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার উলামায়ে কেরাম যেহেতু সামাজিকভাবে জন মানুষের মানস গঠনে মৌলিকভাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম, তাই তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন মজলিস ও বৈঠকের আয়োজন করা হবে এবং নিজেদের দাওয়াতী কার্যক্রমে তাদেরকেও অংশ নিতে বলা হবে।

[192]

মাঠ পর্যায়ে এই কাজের জন্য হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ শহীদ রহিমাহুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন যিনি একদিকে যেমন আলেমে দীন ছিলেন, অপরদিকে পশতু হওয়ার কারণে স্থানীয় ভাষায় দাওয়াতী কাজ করার অনেক সুযোগ তার সামনে উন্মুক্ত ছিল। অপরদিকে ডক্টর সারবুলন্দ যুবায়ের খান রহিমাহুল্লাহ ডাক্তার হবার কারণেও সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার কথাও সমাজে মনোযোগ দিয়ে শোনা হতো। এ কারণে তিনিও উক্ত দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। অতএব মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এ কাজে তাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম মুজাহিদীনের সঙ্গে কিছু দরসের আয়োজন করেন এবং তাদেরকে পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাসায়েল স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন। মুজাহিদীন তার আলোচনা দ্বারা বেশ প্রভাবান্বিত হন এবং অধিকাংশই তওবা করে পূর্বের ভুলের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) হিসেবে ইসলামের সঙ্গে পাক বাহিনীর শত্রুতার কারণে তাদের সঙ্গে শত্রুতা স্থাপনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন। অপরদিকে তিনি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে কিছু বৈঠকের আয়োজন করেন। ভানা (ওয়ানা), আজম ভার্সাক, আঙ্গুয়ার আদা এই জায়গাগুলোতে উলামায়ে কেরামকে একত্রিত করে তাদেরকে অবস্থার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেন। উলামায়ে কেরাম মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করেন এবং উক্ত বিষয়ে যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে নেবার অঙ্গীকার প্রদান করেন।

[193]

শত্রুপক্ষের দিক থেকে প্রতিক্রিয়া দাওয়াতী কার্যক্রম বেশ বেগবান ছিল। এর দ্বারা পাকিস্তানি চক্রান্তকারী সেনাবাহিনীর মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাচ্ছিলো। সেনাবাহিনীর পক্ষে এটা মেনে নেয়া কষ্টকর ছিল। এ কারণে তারা মার্কিন জোটের সাথে মিলে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং তার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে ড্রোন বিমানের নিশানা বানাবার ফয়সালা গ্রহণ করে। ২০০৮ সালের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে ২০০৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সাত আট স্থানে ড্রোন হামলা করা হয়। এই সমস্ত হামলায় দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আরও কিছু সাথি শাহাদাত বরণ করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অবস্থান স্থলেও ড্রোন হামলা হয়; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সে সময় আপন ঠিকানায় উপস্থিত ছিলেন না, যার ফলে আলহামদুলিল্লাহ তিনি সুরক্ষিত থাকেন।

শত্রুপক্ষের দিক থেকে এত শক্ত জবাব ও ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য এবং একমাত্র লক্ষ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহই ছিল, এটা স্পষ্ট। শুধু তাই নয় বরং এই সমস্ত ঘটনার পর দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের অন্তরে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। তিনিও কিছুদিনের জন্য অবস্থার ভয়াবহতার কারণে ভানা থেকে নীরবতা ত্যাগ করে মেহসুদ গোত্রগুলোর কাছে চলে যান। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে খুবই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তারা শত্রুপক্ষের যে জায়গায় আঘাত করেছে, তা শত্রুর জন্য খুবই স্পর্শকাতর স্থান। এই আঘাতে শত্রুপক্ষের ক্ষিপ্ত হওয়াটা স্বাভাবিক। এই দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে নাপাক আর্মির বছরের পর বছরের নিকৃষ্ট নিফাকী, কপটতাপূর্ণ কার্যকলাপ ও

[194]

ষড়যন্ত্রগুলোর মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। এমন ক্ষতি পাকবাহিনী কেমন করে মেনে নেবে?

পাঞ্জাবি যোদ্ধাদের নিষ্ঠার প্রতি আস্থা শুরুতে ওয়াজিরিস্তানে সাধারণত পাঞ্জাব এলাকার সঙ্গে যে সমস্ত যোদ্ধার সম্পর্ক রয়েছে, তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেহেতু সেনাবাহিনীতে অধিকাংশই পাঞ্জাব এলাকার লোক ছিল, এ কারণে গোত্রীয় এলাকার সরল মনের কিছু হযরত পাঞ্জাবি যোদ্ধাদেরকে কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এজেন্ট বলে মনে করতো। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সেনাবাহিনীর অহমিকামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যায় পলিসির কারণে পাঞ্জাববাসীর সঙ্গে কখনও কখনও স্বজন প্রীতির উদাহরণও দেখা যেত। মজার বিষয় হল, পশতু ভাষা জানে না এমন সকল পাকিস্তানি হিন্দুস্তানি ব্যক্তিকেই পাঞ্জাবি বলে ডাকা হতো।

এমন সময়ে যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিরা পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র ও কুৎসিত ইতিহাস স্পষ্ট করতে শুরু করলেন; ফলে যখন তাদের ওপর নৃশংস বোমা হামলা হতে আরম্ভ করলো, তখন গোত্রীয় এলাকার মুসলমানদের অন্তরে পাঞ্জাব থেকে হিজরতকারী মুজাহিদীনের মুহব্বত ও ভালোবাসাই শুধু স্থান পায়নি, বরং তারা নিজেদের পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে লজ্জিতও হয়েছিল। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট আদিবাসী তথা গোত্রীয় নেতা এ কথার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, এই কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকারের পূর্বে আমরা এই সমস্ত পাঞ্জাবি যোদ্ধাদেরকে সেনাবাহিনীর এজেন্ট মনে করতাম। কিন্তু তাদের শাহাদাত ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পর আমাদের চক্ষু খুলে যায়।
[195]

আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
ক্রমান্বয়ে চলমান ড্রোন হামলা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে শুধু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা করতে বাধ্য করে। যেখানে ড্রোন বিমানের মোকাবেলার জন্য নিত্য নতুন অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করতে কিছু মুজাহিদ ব্যস্ত ছিলেন, সেখানে পুরনো ধাঁচের ও আগেকার দিনের হাতিয়ার ব্যবহার করে তিনি ড্রোন বিমানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানাবার চিন্তা করতে থাকেন। কেমন যেন এই পদক্ষেপের মাঝে অনেক ঝুঁকি ছিল কিন্তু কথা হচ্ছে, বীরত্ব ও সাহসিকতাই যদি দেখাতে হয়, তাহলে পরিণতির কথা ভেবে ভয় কিসের? তিনি এই ব্যাপারে পিছু হটার নয়; বরং অগ্রসর হবার জন্য প্রত্যয়ী হন। তার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং বুযুর্গ ব্যক্তি জনাব ডক্টর সারবুলন্দ যুবায়ের রহিমাহুল্লাহও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির পক্ষপাতী ছিলেন। অতঃপর এই পরিকল্পনার তত্ত্বাবধায়ক অপর এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হচ্ছে।

কেনিয়ার দুই সিংহ: আজ-মরায়ে রহিমাহুল্লাহ এবং ইয়াকুব রহিমাহুল্লাহ
ওই সময় ভানা এবং উক্ত জেলায় আল-কায়েদার
দিক থেকে কেনিয়া থেকে আগত মুজাহিদ শায়খ উসামা আজ-মরায়ে

28 রহিমাহুল্লাহকে সামরিক দায়- দায়িত্ব অর্পণ করেন। তার প্রকৃত নাম ফাহাদ মোসালেম ছিল। তিনি আদিবাসী এলাকার অধিকাংশ মুজাহিদীনের উপদেষ্টা, দিকনির্দেশক ও বন্ধুভাজন

28 ‘আজমরায়ে’- পশতু ভাষায় সিংহকে বলা হয়।
[196]

ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পিতার দিক থেকে তিনি কেনিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলেন আর তার নানা বাড়ি ছিল ইয়ামেনের কোনো এক গোত্রে। তার সঙ্গে তার অধিকাংশ কাজেই সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন শায়খ ইয়াকুব কেনী রহিমাহুল্লাহ। তার আসল নাম আহমদ সালেম সুয়াইদান ছিল। ইসলামের এই দুই রাহবার নিজেদের প্রশংসনীয় উচ্চ গুণাবলির কারণে মুসলমানদের প্রথম তিন শতাব্দীর বুযুর্গ ও স্মরণীয় ব্যক্তিদের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতেন। হাবশী রঙ ও দেহাকৃতি, কোঁকড়ানো লম্বা চুল, গাট্টাগোট্টা শরীর ছিল তাদের। এই দুই হাস্তি ওয়াজির মুজাহিদীনের হৃদস্পন্দন ছিলেন। তারা যেমন নিজেদের সরল অকৃত্রিম ও সাদাসিধে জীবন যাপনের কারণে গোত্রীয় এলাকার লোকজনের প্রিয়, তেমনি বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রেও প্রবাদ তুল্য ছিলেন। শায়খ আজ-মরায়ে রহিমাহুল্লাহ যেমনিভাবে বিনয়, নম্রতা ও উত্তম চারিত্রিক গুণের কারণে প্রবাদ পুরুষ ছিলেন, তেমনি সামরিক অঙ্গনে যোগ্যতার ক্ষেত্রেও জাঁদরেল কমান্ডার ছিলেন। কেনিয়া ও ইয়েমেনের গোত্রীয় এলাকার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে গোত্রীয় রীতি-নীতি ও রুচি প্রকৃতি সম্পর্কে উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি অবগত ছিলেন। গোত্রগুলোকে কোন বিশেষ কাজের জন্য একত্রিত করা, কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা, তাদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসা করা, তাদের সুখে-দুঃখে শরীক থাকা এবং গোত্রগুলোর মাঝে নতুন নতুন সম্পর্কের দ্বার উন্মোচন করার যোগ্যতা তার মাঝে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

ইসলামের এই উভয় সিংহ ১৯৯৮ সালে কেনিয়া এবং তাঞ্জানিয়ার মার্কিন এম্বাসিতে পরিচালিত হামলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের পরিচালিত ওই অপারেশনে বিশ্ব সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতিকারী আমেরিকান এবং তাদের মিত্র বাহিনীর

[197]

দুইশতের অধিক সদস্য নিহত হয়। এই উভয় বন্ধু আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু এরপরেও তারা জীবন হাতে নিয়ে সর্বদাই কোনো না কোনো জিহাদী দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য ব্যস্ত থাকতেন। শায়খ আজ-মরায়ে রহিমাহুল্লাহ উল্লেখযোগ্য একটা সময় পর্যন্ত ভানা এবং এই জেলার এলাকাগুলোতে আল-কায়েদার সামরিক দায়িত্বশীল ছিলেন। এদিকে শায়খ ইয়াকুব কেনী রহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উত্তর ওয়াজিরস্তানে আল-কায়েদার ইলেকট্রনিক্স বিভাগের একটি ওয়ার্কশপে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আফগানিস্তান এবং গোত্রীয় এলাকার মুজাহিদীনের জন্য তৈরি করতেন। পরবর্তীতে যখন লাল মসজিদের ঘটনার পর তানজীম আল-কায়েদার পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সামরিক কার্যক্রম জোরদার করা হলো, তখন শায়খ আজমুরায়ে রহিমাহুল্লাহকে পাকিস্তানের সামরিক কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং শায়খ ইয়াকুব কেনী রহিমাহুল্লাহকে তার সহকারী বানানো হয়। এই দুই হযরত বেশ সাফল্যের সঙ্গে আল্লাহর দীনের শত্রু সেনাবাহিনী ও পুলিশের কাছ থেকে লাল মসজিদের শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ নেন।

নিজেদের আরও কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসলামের এই দুই সিংহ ড্রোন বিমানের বিরুদ্ধে এ্যান্টি ক্রাফ্ট মিসাইল বানানোর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেন। এ বিষয়ে তারা উভয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং গন্তব্য অভিমুখে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু জগত স্রষ্টার পক্ষ থেকে মুজাহিদীনের জন্য আরও কিছু পরীক্ষার ফয়সালা মঞ্জুর ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক গুপ্তচর তাদের পেছনে লাগে। সে আমেরিকাকে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য

[198]

করে। ফলে ২০০৯ সালের প্রথম সকালেই যখন মুসলিম উম্মাহর এই আফ্রিকান সাহসীরা মিসাইল চালানোর এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন তখন ড্রোন বিমান তাদের অবস্থান চিহ্নিত করে এবং এই দুজনসহ আরও এক মালদ্বীপি মুজাহিদ, একজন করাচির মুজাহিদ —মোট চারজনকে এই হামলায় শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, আমীন।

কিছুতো করা উচিত?
শায়খ আজমিরায়ে রহিমাহুল্লাহও এমন চিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছেন যে, মার্কিন ড্রোন বিমানের হাত থেকে আকাশ পথের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কিছু করা উচিত। এভাবে খালি হাতে বসে থাকলে তো শুধু নিরাশাই সৃষ্টি হবে। ফলে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে উপস্থিত উপায় উপকরণ ও সরঞ্জামাদি নিয়ে কিছু কাজ করা উচিত। স্বয়ং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহরও এই ইচ্ছা ছিল যে, ড্রোন থেকে প্রতিরক্ষার জন্য কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা উচিত। তাই তিনি এবং শায়খ আজ-মরায়ে একত্রে মিলে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। অতঃপর তারা মনে প্রাণে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য লেগে পড়েন।

শায়খ আজমুরায়ে রহিমাহুল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শায়খ ইয়াকুব কেনী রহিমাহুল্লাহ ইমারতে ইসলামিয়ার প্রথম সরকারের সময়কালে আফগানিস্তানে অ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্ট সরঞ্জামাদি সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তার মাঝে যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। টেকনিক্যাল সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেছিলেন। রুশ আমলের পুরনো যন্ত্রপাতি, যেগুলোর অধিকাংশই বিকল ও অকেজো হয়ে গিয়েছিল, অনেকগুলোতেই মরিচা পড়ে গিয়েছিল, সেগুলোকেই [199]

গোত্রগুলোর কাছ থেকে কিনে নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দেয়া হয়। এগুলো খোঁজ করার জন্য শায়খ আজমরায়ে রহিমাহুল্লাহ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর যন্ত্রপাতিগুলোকে কাজের উপযুক্ত করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, নষ্ট হয়ে যাওয়া যন্ত্রগুলো মেরামত করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা এই যন্ত্রগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি সাথিদেরকে বোঝানোর দায়িত্ব পালন করেন শায়খ ইয়াকুব কেনী। অপরদিকে সাথি সংগ্রহ করা, গাড়িসহ অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ। এরপর বীরত্ব ও সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক শহীদ কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মিরী রহিমাহুল্লাহ এবং শহীদ কমান্ডার আব্দুল হাদী ফয়সাল রহিমাহুল্লাহর সাথিরাও এই বরকতময় প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করেন।

তাই এয়ার মেশিনগান শিলকা ক্রয় করা হয়। ভূমি থেকে নিক্ষেপণযোগ্য রাশিয়ার বানানো মেশিনগানগুলোর মধ্যে এটি অনেক বড় এবং দূরপাল্লার হাতিয়ার। এর গুলি হচ্ছে 23 mm, যা বাস্তবে ছোট আকারের। বাতাসে নিক্ষিপ্ত হবার পর তা ফেটে যায়। ফেটে যাওয়ার পর তা আশপাশে সব কিছু জ্বালিয়ে দেয়। এই গান আকাশের ৭ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত এবং সাড়ে চার কিলোমিটার উচ্চতায় লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানার শক্তি সম্পন্ন। এই অস্ত্রগুলো খোঁজ করে বের করার জন্য দূর-দূরান্তের গোত্রীয় অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সেবা গ্রহণ করা হয় এবং অনেক দৌড়ঝাঁপের পর মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে একটা সন্তোষজনক পরিমাণ শিলকা বন্দুকে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। শায়খ ইয়াকুব কেনী রহিমাহুল্লাহ সেগুলোর জন্য লোহার স্ট্যান্ড তৈরি করার এবং অস্ত্রগুলোকে ব্যবহারের উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন।

[200]

ساتھ ساتھ درمیانی فاصل□ پر وار کرن□ والی فضائی دفاع کی زیکویک گاز□ مختلف مقامات پر مقامی امریکان ک□ حوال□ کر ک□ نصب کی گئی

সাথিদের প্রশিক্ষণের পর শিলকা বন্দুক এবং দুই ব্যারেলের[29] গানগুলোকে মাজদা ট্রাক এবং ড্যাটসুন পিকআপে <(((((১১৮ নম্বর পৃষ্ঠার একেবারে শুরুর দিকে >))))) বসানো হয়েছিল।

একই সময়ে, মাঝারি পাল্লার বিমান প্রতিরক্ষার জিকওয়াক গানগুলি স্থানীয় তালেবানের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামরিক দায়িত্ব দেয়া হয় ফারুক ভাই **রহিমাহুল্লাহর একজন দায়িত্বশীল সাথি আম্মার আব্দুস শহীদ রহিমাহুল্লাহকে। তিনি ছিলেন দক্ষিণ** পাঞ্জাবের জেলা রাজনপুরের অধিবাসী। কাশ্মীর জিহাদে তিনি দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেন। নিজের ইখলাস, নিষ্ঠা, লিল্লাহিয়াত, মুহাব্বত এবং কাজের মাঝে মনোযোগ ও অধ্যাবসায়ের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য ছিলেন। তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে ওই দায়িত্ব পালন করেন এবং অন্য অনেক সাথিকে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট অস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এরপর তিনি আল্লাহর দীনের শত্রু জাতির শত্রু ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, আইএসআই'র লাহোরস্থ জেলা হেডকোয়ার্টারে আত্মোৎসর্গমূলক আক্রমণের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এভাবেই তিনি শাহাদাতের পেয়ালা মুখে তুলে নেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং জান্নাতের উচ্চস্থানে তাকে অধিষ্ঠিত করুন আমীন।

---

[29] এই অস্ত্রগুলো দুই ব্যারেল বিশিষ্ট। (পিডিএফ ফাইলের ১১৮ নম্বর পৃষ্ঠা) দুই ব্যারেল দিয়ে একসঙ্গে এগুলো ফায়ারিং করে। <((((ফুট নোট পূর্ণ করতে হবে >)))

• হে সিংহদল তাদেরকে ঘিরে নাও; এরা যেন পালাতে না পারে

কাজের পদ্ধতি এমন ছিল যে, যখনই কোনো ড্রোন বিমান আকাশে দেখা যেত, তখনই গান ব্যবহারের দায়িত্ব ন্যস্ত সাথিরা নিজেদের ট্র্যাক বের করে কোনো বাগানে স্থাপন করতেন। এরপর ড্রোনের ওপর গুলি বর্ষণ করতেন। অপরদিকে দুই ব্যারেল বিশিষ্ট অস্ত্র ও জিকওয়াক গানগুলো যাদের দায়িত্বে ছিল তারা নিজেদের অস্ত্র ব্যবহার করে ড্রোন বিমান লক্ষ্য করে আঘাত হানার চেষ্টা করতেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় তালেবান মুজাহিদীন নিজেদের স্থাপিত জিকওয়াক গান থেকে মার্কিন বিমানগুলোকে লক্ষ্য করে অগ্নি নিক্ষেপণ করতে আরম্ভ করতেন। শত্রুপক্ষের জন্য এই হামলা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। শুরুতে কিছুদিন লক্ষ্যভেদ করতে সাথিদের সময় লেগেছিল। ওই সময়টাতে ড্রোন বিমান সাধারণত আকাশে তিন কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থান করতো। সেই সঙ্গে যখন ড্রোন বিমানগুলো আক্রমণ করতে চাইতো, অথবা কোন নির্দিষ্ট টার্গেট বস্তু সুস্পষ্টভাবে দেখতে চাইতো, তখন আরও অনেক নিচ দিয়ে উড়ে যেত।

যখনই ড্রোনের আওয়াজ শোনা যেত, তখনই ভানার আকাশে শিলকা মেশিন গান থেকে গোলা বর্ষণের বিকট আওয়াজ আরম্ভ হয়ে যেত। অত্যাধুনিক টেকনোলজির সঙ্গে অনুন্নত বিশ্বের পুরানো ও মরিচা পড়া অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবেলার এই দৃশ্য ছিল ঈমান তাজা করে দেয়ার মতো। একদিকে ড্রোন বিমানগুলো গুলি থেকে বাঁচার চেষ্টা করতো অপরদিকে মুজাহিদীনের তাকবীর গর্জনের সঙ্গে মেশিনগানের আওয়াজ একাকার হয়ে যেত। গোত্রের যুবক বৃদ্ধ সকলেই ক্ষেতের কাজকর্ম ছেড়ে এবং নারীরা ঘরের

[202]

উঠোনে কাজ বন্ধ রেখে এই ঈমান দীপ্ত দৃশ্য অবলোকন করতে আরম্ভ করতো। সকালের ঠোঁটেই দোয়া উচ্চারিত হতো: হে আল্লাহ্ ! আপনি মুজাহিদীনকে সাহায্য করুন ! হে আল্লাহ আপনি কাফেরদের বিমানগুলো ধ্বংস করে দিন , হে আল্লাহ আপনি মুজাহিদীনকে হেফাযত করুন। ”

- আল্লাহর বাণী —

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

- অর্থ : “সেদিন ঈমানদাররা আনন্দিত হবে ”

এই লুকোচুরির মধ্যেই কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহর সিংহরা মনোবল হারাননি। অতঃপর হঠাৎ একদিন শেষ প্রহরে ঈমান ও কুফরীর এই যুদ্ধ চলমান অবস্থায় অকস্মাৎ ড্রোন বিমানের গায়ে একটি আগুনের গোলা গিয়ে লেগে যায়। একটি গুলি বিমানের দেহ টুকরো করে দেয়। বিমানে তখন আগুন লেগে যায়। তাল হারিয়ে বিমানটি আফগানিস্তানের বর্ডার অভিমুখী হয়ে Angur Ada-এর পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে একেবারেই ভূপাতিত হয়ে যায়। সেদিন ঈমানদারদের আনন্দের কোনো শেষ ছিল না। লোকেরা সিজদায় পড়ে যায়। সকল মুজাহিদ এবং সাধারণ লোকজন একে অপরকে মোবারকবাদ দিতে থাকে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার নসীহত করতে থাকে। সন্ধ্যায় বিবিসি সংবাদ পরিবেশন করে যে , আজ মার্কিন ড্রোন বিমান প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে Angur Ada-এর পাহাড়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। এই সাফল্যের পর অল্প একটা সময়ের ভেতর বেশ কিছু ড্রোন বিমান প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিধ্বস্ত হয়। মুজাহিদীনের মনোবল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার শোকর ধারা অধিক মাত্রায় আদায় করতে থাকে।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিদের এমন বিরোচিত সাফল্য অন্যান্য মুজাহিদকে অনুপ্রাণিত করে। তখন বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ, গুলি ক্রয়, বাহনের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য অন্যান্য জিহাদী দলের পক্ষ থেকে সাহায্য-সহায়তা আসতে থাকে। এছাড়া অন্য মুজাহিদীন তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সহযোদ্ধাদের পাঠাতে শুরু করে। মুজাহিদীন আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং মনোবল বৃদ্ধি করে এমন সাফল্য অর্জনের কারণে প্রথমে প্রথমে তো ড্রোন বিমানগুলো দিনের বেলা উড়াই বন্ধ করে দেয়। তখন শুধু রাতের বেলা এগুলো প্রদক্ষিণ করতো। কারণ রাতে মুজাহিদীনের যুদ্ধ করার সক্ষমতা ও সামর্থ্য ছিল না। অপরদিকে শুধু রাতে প্রদক্ষিণ করার কারণে শত্রুপক্ষের জন্য লক্ষ্য স্থির করা আর সম্ভবপর হয় না। এ কারণে একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য মুজাহিদীন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কখনও কখনও ড্রোন বিমানগুলো দিনের বেলা প্রদক্ষিণ করার জন্য আকাশ পথে চলে আসতো কিন্তু সেগুলো এত উঁচুতে থাকতো যে, সেখানে থেকে কাজ করা সম্ভব হতো না।

নাপাক আর্মির আরও এক বিশ্বাসঘাতকতা
যেখানে সেনাবাহিনী মার্কিন সৈন্যদেরকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছিল, সেখানে গোত্রীয় এলাকার ভেতর মার্কিন সৈন্যদের জন্য গুপ্তচর বৃত্তির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আর্মির ক্যাম্পগুলো রীতিমতো ব্যবহৃত হতো। ভানা, মিরান শাহ, মীর আলী, বানু, ডেরা ইসমাইল খান, পেশাওয়ার প্রভৃতি স্থানের ফৌজি ছাউনিগুলোতে রীতিমতো এমন সেল বিদ্যমান ছিল, যেখানে ফৌজি অফিসাররা জোরপূর্বক বিভিন্ন জায়গা থেকে আদিবাসী যুবকদেরকে নিয়ে আসতো, এরপর তাদেরকে বিভিন্ন লোভ

[204]

দেখিয়ে অথবা কোনোভাবে ব্ল্যাকমেইলিং করে গুপ্তচরবৃত্তি করতে বাধ্য করতো। নিত্যদিনের নানা প্রয়োজনে সামরিক ক্যাম্পে জনসাধারণের যাতায়াত চালু ছিল। পরিচয় পত্র অথবা পাসপোর্ট হাতে পাওয়া, পরীক্ষার পরচা, বিল পরিশোধ, ব্যবসার পারমিট, এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন ফান্ড সংগ্রহ এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজের জন্য ফৌজি ছাউনিতে আসা যাওয়া করতেই হত। এমন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যাতায়াতকারীদেরকে বাধ্য করা হতো মার্কিনীদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য। এছাড়াও ওই পথে ভ্রমণকারীদের মধ্যে যারা জনসাধারণ, তাদেরকেও বিভিন্ন বাহানায় গ্রেফতার করে এই শর্তে মুক্তি দেয়া হতো যে, তোমরা আমাদের জন্য গোয়েন্দাগিরি করবে। সেনাবাহিনী সেখানে বিদ্যমান ছিল। সেনাবাহিনীর এমন নিকৃষ্ট কার্যকলাপের কারণে তাদের হাতে এমন কিছু লোক এসে যায়, যারা নিজেদের দীন ও ঈমান বিক্রি করে কাফেরদের সহায়তাকারীতে পরিণত হয়। অবশ্য তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এমন লোকগুলোকেই তারা পেয়ে যেত, যারা নেশাগ্রস্ত অথবা অন্যান্য পাপাচার ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতো।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গাড়িগুলোকে মেরামতের জন্য বাজারে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বাধ্যবাধকতার এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুর্ভাগা ও বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানি আর্মির গুপ্তচররা ইনফ্রারেড ডিভাইসের (Infrared Device) মাধ্যমে মার্কিন সৈন্যদেরকে গাড়ির অবস্থান চিহ্নিত করে দেয়। এই কারণে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দুই জায়গায় দাঁড়ানো দুটি গাড়িকে ড্রোন বিমানের মাধ্যমে টার্গেট করে আঘাত হানা হয়। এতে আল্লাহর সিংহ, সবচেয়ে বড় তাগুত আমেরিকার চোখে চোখ রেখে মোকাবেলাকারী বাহাদুর আপন জীবন উৎসর্গ করে দেন [205]

জীবন দানকারীর তরে। কিছুদিন পর এই গোয়েন্দাগিরির কারণেই তৃতীয় আরও একটি গাড়ির স্থান চিহ্নিত করে টার্গেট হামলা করা হয়। এভাবেই মুজাহিদীনের এই ব্যবস্থা ক্রমাগত হামলার কারণে বন্ধ করতে হয়। তবে এই অভিজ্ঞতা থেকে তাদের অনেক ফায়দা ও উপকার অর্জিত হয়। সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

** মুজাহিদীনের মনোবল বৃদ্ধি পায়, প্রত্যয় দৃঢ় হয় এবং এই ইয়াকীন তৈরি হয় যে, আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে যদি হিম্মত নিয়ে কেউ অগ্রসর হয়, তাহলে সকল মুশকিল আসান হয়ে যায়। এই ব্যবস্থার কারণে পূর্বের এমন দৃষ্টিভঙ্গি ভুল প্রমাণিত হয় যে, ড্রোন বিমান ভূপতিত করা সম্ভব নয়।

** আকাশপথে প্রতিরক্ষার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। বড় বড় অস্ত্রের ব্যাপারে পারদর্শী কিছু সাথি তৈরি হয়।

** স্থানীয় লোকদের অন্তরে হিজরতকারী মুজাহিদীনের মুহব্বত বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘৃণ্যতম বিশ্বাসঘাতকতাও স্পষ্ট হয়।

** গুপ্তচরদের পথ বন্ধ করার জন্য মুজাহিদীনের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়

** মুজাহিদীনের বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয়।

পরিখা খননের সুন্নাহ পুনর্জীবিত করা
ডক্টর সারবুলন্দ যুবায়ের রহিমাহুল্লাহ
এবং মাওলানা সাইদুল্লাহ শহীদ রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে জোর দিচ্ছিলেন যে, ড্রোন বিমান থেকে আকাশ

[206]

সীমা প্রতিরক্ষার জন্য বোম্বিং প্রতিরক্ষার ট্রেডিশনাল নিয়মগুলো পরিহার করা উচিত নয়। আমাদের পক্ষে যে সমস্ত উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করার সামর্থ্য রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে উদাসীনতা কখনোই সমীচীন নয়। এই চিন্তা থেকে তারা পরিখা খননের ব্যাপারে মনোযোগী হন। রুশ অগ্রাসন মোকাবেলার সময়ও মুজাহিদীনের জন্য নৃশংস বোমা হামলা থেকে বাঁচতে এই কৌশল বেশ কাজে এসেছিল। সেই সঙ্গে হাবিবে কিবরিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণের নিয়তও পরিখা খননে অনুপ্রাণিত করেছিল। খন্দক যুদ্ধের সময় সাইয়েদুনা সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুপক্ষের হামলা থেকে মদীনার প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ পরিখা খনন করেছিলেন। ৪০ দিন পর্যন্ত খন্দক খননের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। খনন কার্যে সকল সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনকি খোদ হাবিবের কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালা ক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা অনুযায়ী কার্যত নমুনা (মাঠ পর্যায়ের বাস্তব নমুনা) হিসেবে ভানাতেই মুজাহিদীনের একটি কেন্দ্রে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়। তা ছিল একটি ছোট্ট পরিখা। মাওলানা রহিমাহুল্লাহ শাহাদাতের পর ডক্টর সারবুলান্দ যুবায়ের রহিমাহুল্লাহর অবস্থান স্থল হয়ে যায় ওই জায়গাটি। তিনি ওই খন্দক আরও বড় করেন। এটা ছিল পরিখা খননের সূচনা। এ যাত্রায় কিছু প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কাজ করেনি। কিন্তু মুজাহিদীন মনোবল হারাননি। পর্যায়ক্রমে আধুনিকতা ও সহজ লভ্যতা আসতে থাকে। এরপর উস্তাদ

[207]

সুহাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহ টেকনিক্যাল ভিত্তির উপর ভিত্তি করে এমন পরিখা ডিজাইন করেন, যা ড্রোন হামলা মোকাবেলায় ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিতকরণে বেশ কার্যকর।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এই প্রজেক্টে বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। তিনি শক্তিশালী গোছের শক্ত-সামর্থ্য সহযোদ্ধাদেরকে পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। বানু'র দরবেশ গুণাবলির আল্লাহর সিংহ আব্দুল নাসের কুরাইশী শহীদ

30 রহিমাহুল্লাহ এবং

গোত্রের উচ্চ মনোবল সম্পন্ন যুবক আব্দুল আহাদ

31

শহীদ তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিত সাধারণ সাথিদেরকেও পালাক্রমে পরিখা খনন কার্যের সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সাথিদেরকে শুধু এই পরিখার সামরিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলেই উৎসাহিত করতেন না, বরং সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণের কথাও সাথিদের মাঝে তিনি আলোচনা করতেন।

30 বাননু শহরের সিংহ পুরুষ কমান্ডার আব্দুল নাসের কুরাইশী মুজাহিদীনের মাঝে ‘দরবেশ’ ও ‘জানান’ নামে পরিচিত ছিলেন। উচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতায় তিনি অনন্য ছিলেন। ক্রুসেডার ও তাদের তাবেদারদের উপর আল্লাহর গজব হয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বেশ কয়েকটি ময়দান জয় করেন। কাফেরদের স্থাপিত ডুরান্ড লাইনের উভয় পারে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কয়েদ ও আটক অবস্থায় বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করেন কিন্তু তবুও তার দৃঢ়তার পা দুর্বল হয়নি। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি কঠিন সময়ে সমাধান নিয়ে আসতেন এবং প্রতিকূল অবস্থায় সান্ত্বনা দিতেন। জিহাদী পরিকল্পনা তৈরি, সহযোদ্ধাদেরকে আনন্দ দেয়া, জিহাদী সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করা ও সুরক্ষা দেয়ার কাজেই দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন, আর রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে রবের দরবারে ক্রন্দন করতেন। পরিখা ও সুরঙ্গ তৈরিতে তার বেশ অভিজ্ঞতা ও চিত্তাকর্ষণ ছিল। উচ্চ মনোবল, সংকল্প ও শারীরিক সুগঠনের বদৌলতে কোদালের সাহায্যে পাথর পর্যন্ত টুকরো করে ফেলতেন। রণাঙ্গনের প্রাণপুরুষ আল্লাহর এই সিংহ ২০১৭ সালে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমীন!!

31 দিয়ার জেলার যুবক আব্দুল আহাদ নিজ মামা মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির দাওয়াতে খুব অল্প বয়সে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য ওয়াজিরিস্তানে পৌঁছে যান। সুগঠিত শরীর, উচ্চ মনোবল ও গোপনীয়তা রক্ষাকারী মুজাহিদ ছিলেন। শুরুর দিকে পরিখা খননের কাজে তার দৃঢ় সংকল্প ও মনোবল অন্যদের জন্য উৎসাহের কারণ হয়েছিল। তার ওপর ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনেক আস্থা ছিল। এ কারণে অনেক স্পর্শকাতর বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ জিহাদী নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার দায়িত্ব ফারুক ভাই তাকে প্রদান করেন। তিনিও সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করে দেখান। ২০১৫ সালে কান্দাহারের শাহ অলি কোট জেলায় আমেরিকার এক বিশেষ আকাশ পথের হামলায় উম্মাহর এই সন্তান বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

[208]

এই দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য কাজে এমন অনুপ্রেরণাগুলো তাদেরকে আরও অগ্রসর করেছিল। এর সঙ্গে তিনি এই দীর্ঘ ও কষ্ট সাধ্য কাজের জন্য উপায় উপকরণ সরঞ্জামাদি ও সর্বোত্তম খোরাকের বন্দোবস্ত করে যাচ্ছিলেন, যেন এই কষ্টসাধ্য কাজ সহযোদ্ধাদের দৈহিক দুর্বলতার কারণ না হয়ে যায়।

শুরুতে সামরিক ক্যাম্প ও আঙ্গুর আদাতে (Angur Ada) যুদ্ধফ্রন্টের কেন্দ্রগুলোতে এই কাজের এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়েছিল। সবকটা এক্সপেরিমেন্ট সফলভাবে শেষ করা গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এই কাজ বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন এবং টেকনিক্যাল ভিত্তির উপর এই কাজকে মজবুত করে দাঁড় করালেন। খরচের কথা চিন্তা না করে সর্বোত্তম সরঞ্জাম সরবরাহ করে সাথিদের উপর থাকা কাজের বোঝা হালকা করতে চেষ্টা করেছেন। এই কারণে যদি কোনো সাথির আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে এটা আমাদের জন্য বড় কামিয়াবী। তিনি খন্দক খননের এই কৌশল ভানা থেকে মেহসুদ কাবায়েল এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করতে মনস্থ করেছেন।

অন্য মুজাহিদীনকে উৎসাহ প্রদান
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর একটি মৌলিক গুণ
ছিল কল্যাণকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আগ্রহ। যখন তিনি প্রতিরক্ষার এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী মনে করলেন তখন অন্য মুজাহিদীনকেও এ কাজের আহ্বান করতে আরম্ভ করলেন। প্রথম প্রথম অনেকেই হতাশা ব্যক্ত করেছে এবং এ বিষয়টা নিয়ে মজা করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি যখন উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়ে এবং কাজের খসড়া তাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যখন বিষয়টা আরও

[209]

সুন্দরভাবে তাদের সামনে তুলে ধরলেন, তখন সকলেই এ বিষয়টা মেনে নিতে বাধ্য হলো। অতঃপর যখন তিনি কার্যতভাবে তাদেরকে তৈরিকৃত পরিখা প্রত্যক্ষ করালেন তখন প্রত্যক্ষকারী আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। তারা কল্পনাই করতে পারেনি, এমন পরিখা খনন করা সম্ভব। এ যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তিনি স্বতন্ত্র এক প্রকল্প হিসেবে সহযোদ্ধাদেরকে পরিখা প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। যেখানে তিনি কার্যকরী পরামর্শ দিতেন সেখানে তিনি এই কার্যকরী উপায় অবলম্বনে উদাসীনতার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টির কথাও স্মরণ করিয়ে দিতেন। এরপর যদি কেউ উপায় ও সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতার কথা বলে বাহানা দেখাতো, তাহলে তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে উপায় সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমেও সাহায্যের জন্য রাজি হয়ে যেতেন।

অন্য মুজাহিদীন দলের কাজের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনার জন্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নির্দেশে উস্তাদ সুহাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহ পরিখা খনন সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা রচনা করেন। সেখানে তিনি পরিখা খননের সরঞ্জামাদি থেকে আরম্ভ করে পরিখার বিভিন্ন ডিজাইন, কাজের মাঝে সম্ভাব্য সমস্যাবলীর সমাধান এবং খনন ও নির্মাণের ব্যাপারে কার্যকরী বিভিন্ন নির্দেশনা ও উপদেশ সন্নিবেশিত করেন। এই নির্দেশিকার সঙ্গে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কাজের বিভিন্ন ফটো যুক্ত করে দেয়া হয়, যাতে সাধারণ মানুষের জন্য এটা দেখে বোঝাটা আরও সহজ হয়ে যায়। ওই নির্দেশিকা আরব দুনিয়ার অন্যান্য ফ্রন্টে থাকা মুজাহিদীনকেও পাঠিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা নিজেরাও আকাশ পথের হামলা থেকে প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করে।

[210]

সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা পরিখা খননের গুরুত্ব ও লাভ স্পষ্ট করতে আরম্ভ করেন। বেশ কিছু বোমা হামলায় আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত খানাখন্দগুলোকেই যোদ্ধাদের আত্মরক্ষার মাধ্যম বানান। এমনিভাবে পরিখা কৌশল অবলম্বনের বদৌলতে মুজাহিদীন এতটাই নিশ্চিন্ত থাকেন যে, পুরো একটা ড্রোন বিমান তাদের মাথার উপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করা সত্ত্বেও তারা হেলান দিয়ে বসে থাকেন এবং এতটাই আশ্বস্ত থাকেন যে, তারা ওই পরিখার ভিতরে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ এবং তাৎপর্যপূর্ণ পারস্পরিক পরামর্শের বৈঠকগুলো সম্পন্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

২০১৪ সালে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি আর্মি অন্যায় ও নৃশংস অপারেশন আরম্ভ করে। এই হামলার ফলে মুজাহিদীন গেরিলা যুদ্ধের মূলনীতি আমলে নিয়ে কৌশল হিসেবে ওই এলাকা থেকে পিছু হটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুজাহিদীনের এলাকাগুলোতে প্রবেশ করার পর যখন সেনাবাহিনী ওই সমস্ত পরিখার মধ্য থেকে কিছু প্রত্যক্ষ করে, তখন বিস্ময়ে তাদের মুখ হা হয়ে যায়। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, মুজাহিদীন এতটা সুশৃঙ্খলভাবে এবং এমন আপডেট ডিজাইনে এত বড় কাজ সম্পন্ন করতে পারে। মিডিয়াতেও বিস্ময়কর এই সমস্ত পরিখা একটা সময় পর্যন্ত মানুষের মনোরঞ্জনের কারণ হয়।

ঈমানদার বান্দার হাত হলো আল্লাহর হাত

***

এই হাত বিজয়ী এবং সফল; দক্ষ এবং কর্ম কুশলী

[211]

কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ
জিহাদ ফী-সাবী লিল্লাহ'র শরীয়াহগত অর্থ ইসলামের ফুকাহায়ে কেরামের নিকট সর্ব সম্মতিক্রমে এই: "ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অথবা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা করা।" দীন ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র সর্বোচ্চ পর্যায়ে হচ্ছে কিতাল তথা রীতিমত যুদ্ধ করা। এই যুদ্ধের অঙ্গনই হলো ওই বরকতময় স্থান, যেখানে এক মুহূর্ত অবস্থান করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম। এই অঙ্গনে তরবারি এবং নিক্ষিপ্ত বোমা ও গোলার ছায়ায় কিছু সময় অবস্থান করার দ্বারা জগত স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা জান্নাত ওয়াজিব করে দেন।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শুরু থেকেই ওই অঞ্চলে সকল জিহাদী অঙ্গনে কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ'র মাঝে আপন সাথিদেরকে অগ্রসর করে দিয়েছেন। অন্যান্য গ্রুপের বদলে নিজের গ্রুপকেই আগে আগে রেখেছেন। তিনি নিজেও সামরিক কাজ-কর্মের তত্ত্বাবধান করতেন। যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাতেন। একেবারে মূল ফ্রন্টে যুদ্ধে গিয়ে সাথিদেরকে দিকনির্দেশনা দিতেন এবং কমান্ড করতেন। সহযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের শরীয়াহগত আদব শিষ্টাচার ও মাসায়েল শেখাতেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র মাঝে তিনি যে সমস্ত দিক থেকে কাজ করেছেন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, সেগুলো তিনটি শিরোনামের অধীনে আমি উল্লেখ করবো:

০১. আফগানিস্তানের ফ্রন্ট

ক্রুসেডার জায়নবাদী যৌথ শক্তি আমেরিকান নেতৃত্বে ২০০১ সালে আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে অন্যায় ও আগ্রাসন মূলক হামলা পরিচালনা করে। [212]

তারা তালেবানের শরীয়াহ সরকারের পতন ঘটায় এবং নিজেদের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে কাঠের পুতুল সরকার বসায়। ওয়াশিংটনের ইহুদী পলিসি- মেকারদের দিকনির্দেশনায় ওই সরকারের জন্য একটি আইন সাজিয়ে দেয়া হয় এবং নিজেদের সেবা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য লুটেরা ও অত্যাচারীদের এক বাহিনী গঠন করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

উলামায়ে কেরাম তখন শুধু এই আগ্রাসী আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেননি বরং আমেরিকার সহযোগী এবং মার্কিন এজেন্ডা আফগানিস্তানে বাস্তবায়নকারী সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও জিহাদ ফরযে আইন হিসেবে সাব্যস্ত করেন। তালেবান নিজেদের কাতার সুবিন্যস্ত করে একতা ও ঐক্যবদ্ধতা নিশ্চিত করে এবং অংশীদার বিহীন এক আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে আফগানিস্তানে রীতিমত সুশৃঙ্খল গেরিল জিহাদ আরম্ভ করে দেয়। আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ গোটা মুসলিম উম্মাহর কাছে এই জিহাদের দামামা বাজিয়ে দেন। সেই আওয়াজে লাব্বাইক বলে বিরাট সংখ্যক মানুষ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসে। ছুটে আসা এই ঈমানদার ব্যক্তিরা আফগানিস্তানে নিজেদের লৌহ প্রমাণ শক্তি সামর্থ্যের মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করে।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নেতৃত্ব ভার হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম আফগানিস্তানের বর্ডারে কেন্দ্র স্থাপন করেন। ওখানে থেকে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে তিনি কার্যক্রম আরম্ভ করে দেন। পাকতিকার বিরমল জেলায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আঙ্গুর আদা থেকে নিয়ে 'রাখখা' পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করে পাকতিকার মার্কিন ও আফগান সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে অপারেশন আরম্ভ করে দেন। সাধারণত এগুলো হতো মর্টার এবং অন্যান্য [213]

রকেট হামলা। পরবর্তীতে সেখানে মাইন অপারেশন এবং ওত পেতে আক্রমণ করার কৌশল অবলম্বন করা হয়। সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু অপারেশনে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেই অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্ব দান করেন।

এমনিভাবে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন প্রদেশে তিনি আপন সাথিদেরকে রওনা করিয়ে দেন। তারা তালেবানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই জিহাদে আগ্রাসী ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা ও অবদান রাখে। এই সময়ে আফগানিস্তানের জাবুল, গজনী পাকতিকা, লোগার এবং কান্তার ফ্রন্টে গ্রীষ্মকালীন গঠনে মুজাহিদ হিসেবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

০২. কাবায়েলি ফ্রন্ট

উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে আদিবাসী (কাবায়েলি বা গোত্রীয়) অঞ্চল। ফিরিঙ্গি শাসনের সময় থেকে এই অঞ্চল সর্বদাই আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের জন্য ভয়ের জায়গা ছিল। ইসলামের অগ্রসৈনিক দল এই উপজাতিরা কখনোই ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। তারা নিজেদের স্বতন্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ফিরিঙ্গি এবং তাদের অনুচরদেরকে বিতাড়িত করেছে। পাকিস্তান গঠিত হবার পর ফিরিঙ্গি আর্মির ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করেছে পাকিস্তান আর্মি। ওই সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পাক আর্মি গোত্রীয় অঞ্চলে আগুন ও রক্ত বৃষ্টি বর্ষণ করে যাচ্ছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরপরই আল্লাহর দীন বাস্তবায়নের দাবি উত্থাপনের অপরাধে মিরান শাহ এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতে পাকিস্তানি বিমান বাহিনী নৃশংস বোমা হামলা পরিচালনা করে। এই হামলায় গোত্রীয় এলাকার মুসলমানদের লাশের [214]

স্তূপ তারা তৈরি করে। শুরু থেকেই গোত্রীয় অঞ্চলে সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর জুলুম - নির্যাতন এতটাই বেড়ে গিয়েছিল, যা কিছুটা অনুমান করা যায় পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা এয়ার মার্শাল জুলফিকার আলী খানের বক্তব্য থেকে:

“পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাক বিমান বাহিনীর কাছে শুধু চারটি স্কোয়াড্রন ছিল। তন্মধ্যে একটা রাখা ছিল উত্তর ওয়াজিরিস্তানের প্রাণকেন্দ্র মিরান শাহ এলাকায়। উদ্দেশ্য ছিল গোত্রীয় অঞ্চলে কোন অস্থিতিশীলতা দেখায় দিলে যেন সরকারকে সাহায্য করা যায়।”[32]

২০০১ সালে আফগানিস্তানে নৃশংস মার্কিন হামলার পর আফগানিস্তান থেকে হিজরতকারীরা গোত্রীয় অঞ্চলে আসতে আরম্ভ করে। গোত্রীয় অঞ্চলের মুসলমানেরা নিজেদের ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ এবং সুউচ্চ গুণাবলির কারণে হিজরতকারীদেরকে আশ্রয় দিতে থাকেন।

এরই ধারাবাহিকতায় পাক সেনাবাহিনী মার্কিন মনিবদের পৃষ্ঠপোষকতায় গোত্রীয় অঞ্চলকে জুলুম - নির্যাতনের নরকে পরিণত করে। তারা গোত্রীয় অঞ্চলে চড়াও হয়। ভারী তোপ, ট্যাংক, হেলিকপ্টার এবং জেট বিমানের সাহায্যে গোত্রীয় অঞ্চলে ঘর - বাড়ির দেয়াল গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এই অঞ্চলের মুসলমানদের লাশের স্তূপ তৈরি করা হয়। ঘরে ঘরে অনুসন্ধানের নামে মা-বোন এবং পর্দার আড়ালে থাকা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সতী নারীদের সম্ভ্রম হরণ করে গোত্রীয় অঞ্চলের সামাজিক ঐতিহ্য পদদলিত করা হয়। সেনাবাহিনীর জুলুম -নির্যাতনের অনুমান এভাবেও আমরা করতে পারি যে, গোটা বছর জুড়ে কারফিউ

---

[32] জাভেদ চৌধুরীর “অতীত দিনের সূর্য” گئ□ دنوں کا سورج

জারি রেখে সেনাবাহিনীর কাফেলা ওয়াজিরিস্তান অভিমুখে আসতে থাকে। সেনাবাহিনীর দৃষ্টিসীমায় যদি কোনো সাহসী ব্যক্তি এসে ধরা দেয়, তাহলে নারী- পুরুষ এবং শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে ওই ব্যক্তিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়। কোনো মহল্লার কাছ থেকে যদি কোনো মুজাহিদ সেনাশিবিরে আক্রমণ করে, অথবা কোনো মহল্লার যাতায়াত পথে যদি বারুদ বিছানো পাওয়া যায়, তাহলে ইংরেজ মনিবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই নির্দয় নিষ্ঠুর সেনাবাহিনী গোটা মহল্লাকে শাস্তি স্বরূপ নিজেদের কামানের মুখে রেখে এবং নারী-শিশু নির্বিশেষে মহল্লার ঘর-বাড়ির উপর কয়েক ঘণ্টা যাবৎ নৃশংস বোমা হামলা চালাতে থাকে। সেনাবাহিনীর এই জাতীয় কার্যকলাপ এমনই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট বাস্তবতা, যা এমন ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবে, যে ঘটনা ক্রমে গোত্রীয় অঞ্চলে গিয়েছে। সেনাবাহিনীর জুলুম-নির্যাতন ও পাশবিকতার মুখে অবশেষে গোত্রীয় এলাকার নওজোয়ানরা অস্ত্র ধারণ করে এবং জালেমদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য উঠে দাঁড়ায়। তখন সেনা কাফেলাকে ওত পেতে হামলা করা হয়। তাদের যাতায়াত পথে বারুদ বিছিয়ে দেয়া হয়। সেনা ক্যাম্পে হালকা কামান দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। সেনা চৌকিগুলোতে হামলার ডাক দেওয়া হয় এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে ফিদায়ী হামলা পরিচালনা করা হয়। এই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনায় হিজরতকারীরা নিজেদের আনসার তথা গোত্রীয় এলাকার মুজাহিদীনের সঙ্গে শুধু কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই অংশগ্রহণ করেনি; বরং তাদের তরবিয়ত ও নৈতিক গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুজাহিদীনের এই হামলা এতটাই তীব্র ও উপর্যুপরি হতে আরম্ভ করে যে, সহ্য করতে না পেরে সর্বদাই সেনাবাহিনী পিছু হটে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে বাধ্য হয়। এরই ফলে গোত্রীয়

[216]

এলাকায় নিরাপত্তা স্থিতিশীল হয় এবং মুজাহিদীন নিজেদের জিহাদী কাজের জন্য সময় সুযোগ লাভ করে। কিন্তু সেনাবাহিনী কোন বাহানায় কিছুদিন পর পরই নিরাপত্তা লঙ্ঘন করে ফেলত আর পুনরায় গোত্রীয় এলাকায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তো।

ভানার সামরিক দায়িত্ব
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যেহেতু ভানাকেই নিজের জিহাদী কার্যক্রমের কেন্দ্র বানিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তাই ভানা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতেই প্রথমে তিনি গোত্রীয় এলাকার নওজোয়ানদের সাথে মিলে জালিম সেনাবাহিনী থেকে গোত্রীয় এলাকার ভূখণ্ড প্রতিরক্ষার যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শায়খ উসামা আজমরায়ে কেনী রহিমাহুল্লাহ ২০০৯ সালে শাহাদাত বরণ করার পর তানজীম আল-কায়েদার পক্ষ থেকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাজমুআর একজন সামরিক দায়িত্বশীল সাথিকে ভানা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সামরিক দায়িত্বভার প্রদান করা হয়। ওই সময়ে সেনাবাহিনীর উপর পরিচালিত কয়েকটি হামলার পরিকল্পনা তৈরি এবং সেগুলো বাস্তবায়নে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শামিল থাকেন। তিনি সরাসরি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহে স্থানীয় মুজাহিদীনকে সাহায্য করেন। ২০০৮ সালে মেহসুদ ও ওয়াজির এলাকার সঙ্গমস্থলে একটি ফৌজি পোস্টে হামলা করার সময় তিনি আহতও হন।

মেহসুদ গোত্রের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এমনিভাবে যখন মেহসুদ এলাকায় আমেরিকার ইশারায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চড়াও হতে আরম্ভ [217]

করলো, তখন শুরু থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মেহসুদ এলাকার মুজাহিদীনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজের সাথিদেরকে ওই প্রতিরক্ষা জিহাদে অংশগ্রহণ করান। মেহসুদ পার্বত্য অঞ্চলের উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকের ফ্রন্টগুলোতে তাঁর সাথিরা সাধ্য মতো গোত্রীয় এলাকার ভাই ও সহযোদ্ধাদের সঙ্গ দেন। তার কিছু সাথি ও সহযোদ্ধা ওই ফ্রন্টে শাহাদাতের পেয়ালা মুখে তুলে নেন। তিনি নিজেও সময়ে সময়ে রণাঙ্গন ও ফ্রন্টে যাতায়াত করতেন এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আপন সাথি ও সহযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করতেন।

সোয়াতের পালা
২০০৯ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সোয়াত উপত্যকা এবং মালাকান্দ ডিভিশনে ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বর নৃশংস অন্যায় অপারেশন আরম্ভ করে। এমন পরিস্থিতিতে তানজীম আল-কায়েদার পক্ষ থেকে সোয়াতের মুজাহিদীনের সাহায্য ও দিক নির্দেশনার জন্য তিনজন দায়িত্বশীলের একটি প্রতিনিধি দল সোয়াত অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। ওই তিনজন দায়িত্বশীল হলেন সংগঠনের পাকিস্তান শাখার সামরিক দায়িত্বশীল শায়খ ফাতেহ শাহরী রহিমাহুল্লাহ, কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ এবং উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ। তার সঙ্গে তানজীম আল-কায়েদার সামরিক বিভাগের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও পাঠানো হয়।

এই হযরতগণ ওয়াজিরিস্তান থেকে সোয়াত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর সম্পন্ন করেন। সফরের একটা অংশ এভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, তারা আকাশচুম্বী পাহাড়ের ওপর পদব্রজে সফর করেছিলেন। এই হযরতগণ যুদ্ধ চলাকালেই সোয়াত এলাকায় পৌঁছে যান। সোয়াতের প্রতিরক্ষা যোদ্ধাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তারা [218]

সাক্ষাৎ করেন, তাদেরকে সাধ্য মতো সাহায্য-সহযোগিতা করেন এবং সংগঠনের সামরিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে সোয়াতের প্রতিরক্ষা যোদ্ধাদের তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের জন্য সেখানে তারা অবস্থান করেন।

০৩. পাকিস্তানের শহুরে ফ্রন্ট

লাল মসজিদ ট্রাজেডির পর যখন মুসলিম যোদ্ধারা সেনাবাহিনী এবং সিকিউরিটি এজেন্সির বিরুদ্ধে পুরোপুরিভাবে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন এই যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট তথা শহরগুলোর অভ্যন্তরে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে টার্গেট বানাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শহরের অভ্যন্তরে সাধারণত শত্রুপক্ষ কিছুটা উদাসীন থাকে। এ কারণে সেখানে তাদেরকে টার্গেট বানানো তুলনামূলক সহজ হয়। অপরদিকে শত্রুপক্ষের উচ্চতর নেতৃত্ব এবং বড় বড় পদধারী ব্যক্তিরাও শহরে উপস্থিত থাকেন। সেই সঙ্গে যদি উপযুক্ত টার্গেট বেছে শহরের অভ্যন্তরে আল্লাহর দীন ও স্বদেশের শত্রুদের ওপর অপারেশন চালানো হয়, তাহলে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সারাদেশে জিহাদ ও প্রতিরক্ষা যুদ্ধের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ারও সুযোগ তৈরি হয়। অবশ্য শহরে ঘনবসতি থাকার কারণে জনসাধারণের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য প্রতিরক্ষা যোদ্ধাদেরকে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সাথি ও সহযোদ্ধাদের বড় অংশ যেহেতু পাকিস্তানের বড় বড় শহরগুলো থেকে এসেছেন, এই কারণে তাঁর জন্য শহরগুলোতে সামরিক কার্যক্রম সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনা করা সহজেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে। তিনি কিছু মেধাবী সহযোদ্ধাকে শহরে অবস্থানকারী শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ [219]

কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করেন। তথ্য সন্নিবেশিত রিপোর্টগুলো তিনি নিজেই দেখতেন, সেগুলোর মাঝে কোনো ত্রুটি থাকলে তিনি ওই রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কাছে পাঠিয়ে সংশোধন করাতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অপারেশন শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয, বৈধ ও উপকারী বলে মনে না হতো এবং এ বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত না হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অপারেশন পরিচালনার অনুমতি তিনি প্রদান করতেন না। অপারেশনের প্রতিটি দিক নিয়ে চিন্তা করে এমনভাবে তিনি পরিকল্পনা সাজাতেন যে, জনসাধারণের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা একদমই থাকতো না। এই কারণে অপারেশনের পরিকল্পনা তিনি নিজেই করতেন অথবা কখনও মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি ওই অপারেশনে পরিষ্কারভাবে তার অস্বীকৃতির কথা জানিয়ে দিতেন। অতঃপর বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনগুলোর অনুমতি তিনি নিজে প্রদান করতেন না, বরং তার জন্য সংগঠনের দুইজন বড় আলেম নেতা শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লিবি এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া লিবি রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুই হযরত কর্তৃক ওই অপারেশন শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও উপকারী হওয়ার সিদ্ধান্ত না আসতো, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অপারেশনের জন্য অগ্রসর হতেন না।

অপরদিকে এই ফ্রন্টে অন্যান্য প্রতিরক্ষা মুজাহিদীনের সঙ্গে সহযোগিতা ও সাহায্য সহায়তা আদান-প্রদানের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রাখতেন। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা যুদ্ধে নিয়োজিত গোত্রীয় এলাকার আনসার এবং হিজরতকারী মুজাহিদীনের সঙ্গে শহরের অভ্যন্তরে কাজের জন্য সহযোদ্ধাদের তরবিয়ত-প্রশিক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, নাম্বারিং, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের সরবরাহ, গোপন কৌশল ও টেকনিক তৈরি সহ বাস্তব ক্ষেত্রে

[220]

অপারেশন পরিচালনার সকল দিকে তিনি পুরোপুরিভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

এমনিভাবে পাকিস্তান ভূখণ্ডে আল্লাহর দীন ও জাতির শত্রু সম্প্রদায়গুলার উপর পরিচালিত প্রায় অধিকাংশ হামলায় তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সাহায্য-সহায়তা দিয়ে শামিল থাকেন। বিশ্ব জাহানের আনন্দের দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবি ও ধৃষ্টতাকে সহায়তা দানকারী নিকৃষ্ট ডেনমার্ক রাষ্ট্রের ইসলামাবাদস্থ রাষ্ট্রীয় দূতাবাসে ফিদায়ী হামলা, বর্বর নির্দয় সংস্থা আইএসআই'র লাহোরস্থ হেডকোয়ার্টারের ঐতিহাসিক হামলা, করাচিতে ক্রুসেডারদের নিরাপত্তা দানকারী নেভির মেহরান বেসে হামলা, জাতির শত্রু জেনারেল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদেরকে টার্গেট কিলিং কিংবা অন্যায় অনাচারের মাইল ফলক পুলিশ প্রশাসনের ওপর হামলা, ন্যাটো জোটের সিপাহি লাইনের উপর হামলা কিংবা আল্লাহর দীনের শত্রু কাদিয়ানি গ্রুপের যে সমস্ত নেতারা সেনাবাহিনীতে রয়েছে তাদের ওপর হামলা—এক কথায় গুরুত্বপূর্ণ যত হামলা পরিচালিত হয়েছে সবগুলোতেই তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এই অপারেশন অন্যদের মাঝে, সাধারণত মেহসুদ পার্বত্য অঞ্চলের মুজাহিদীন, কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ এবং উস্তাদ ফয়েজ মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতো।

বাংলা ভূখণ্ডে জিহাদী তানজীম
২০০৯ সালে বাংলাদেশের কিছু সাথি তানজীম আল-কায়েদার দাওয়াতে লাব্বাইক বলে ওয়াজিরিস্তান তাশরীফ আনেন। তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন [221]

করার পর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক দাওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্য এবং বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের দাওয়াত বাংলার মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাই বাংলাদেশের ভাইয়েরা একটি আলাদা ডিভিশন হিসেবে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাজমুআয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ওই ভাইদের মাঝে কমান্ডার তারেক খালেদ বাঙালি রহিমাহুল্লাহ শামিল ছিলেন। তার আসল নাম ছিল সুহাইল। তিনি ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। যুবক বয়সে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং আল্লাহর দীনের প্রচার প্রসারে কাজ করতে থাকেন। সেই সঙ্গে তিনি জিহাদী প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নিয়তে দৈহিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও মনোযোগী হন এবং মার্শাল আর্ট শিখে ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশেই একটি জিহাদী দলের অন্তর্ভুক্ত হন কিন্তু সেখানে চিন্তা গত সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি দেখে তিনি আলাদা হয়ে যান। অতঃপর তিনি হিজরত ও দেশত্যাগের ইচ্ছা করেন। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ভানা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পৌঁছেন এবং এখানে স্থানীয় তালেবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এখানে কয়েক মাস অতিবাহিত করার পর ২০০৮ সালে জিহাদের সুশৃঙ্খল ও নিয়ম তান্ত্রিক দাওয়াত পরিচালনার জন্য তিনি ফিরে যান। অতঃপর ২০০৮ সালেই তিনি স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি সহ ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন ২০০৯ সালে তিনি আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত হন। অতঃপর শায়খ মোস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর নির্দেশনা ক্রমে বাংলাদেশে জিহাদী ও দাওয়াতী কার্যক্রম

[222]

পরিচালনার জন্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।

ইসলামের এই সন্তান অনেক উচ্চ গুণাবলি ও প্রতিভা সম্পন্ন এক অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। একদিকে আপন ঈমানী সাহসিকতার কারণে আপন সাথিদেরকে নিয়ে আফগানিস্তানে তিনি ক্রুসেডারদের ওপর হামলা পরিচালনা করতেন, অপরদিকে যখন গোত্রীয় এলাকায় বর্বর পাকিস্তানি আর্মি চড়াও হত, তখনও মুসলমানদের প্রতিরোধ যুদ্ধে তাকে সামনের কাতারে দেখা যেত। সামরিক কার্যক্রম থেকে অবসর পেলেই তিনি মিডিয়া শাখার প্রতি মনোযোগী হয়ে বাংলার মুসলমানদেরকে জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এবং বাংলাদেশে ধর্মহীনদেরকে নির্মূল করার দাওয়াত দিতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এই ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াত ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার বরকতে কিছু সাথি ও সহযোদ্ধা খোরাসান ভূখণ্ডে হিজরত করেন এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা মুখে তুলে নেন। ভাই তারেক রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য মুজাহিদ ভাই নিজেদের নৈতিকতা, চারিত্রিক উৎকর্ষ, তাকওয়া, খোদাভীরুতা, লিল্লাহিয়াত, নিষ্ঠা, বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে গোত্রীয় এলাকার মুজাহিদীনের কাছেও প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং স্থানীয় মুজাহিদীনের সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠতা সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই গোত্রীয় এলাকার মুজাহিদীনের সঙ্গে অধিকাংশ সময় আফগানিস্তানে অথবা গোত্রীয় অঞ্চলেই জিহাদী সামরিক কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকার সুযোগ তাদের হয়েছিল। যখন 'জরবে আযব' নামক পাক মার্কিন যৌথ অপারেশন চলাকালে একদিকে আমেরিকা ক্রমাগত আল-কায়েদার রণাঙ্গন ও ফ্রন্টের কেন্দ্রগুলোতে টার্গেট করে ড্রোন হামলা আরম্ভ করে দিয়েছিল এবং অপরদিকে কিছু স্থানীয় গোত্রের

[223]

পক্ষ থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আসতে আরম্ভ করেছিল, তখন আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা আসেম উমর রহিমাহুল্লাহ আপন সহযোদ্ধাদেরকে খোরাসান ভূখণ্ডে ছড়িয়ে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ জারি রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তে সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক বাংলাদেশের ভাইদেরকে রাজি করানো একটা কঠিন কাজ ছিল। সিদ্ধান্ত তো তাদেরকে মেনে নিতেই হত কিন্তু তবুও তারেক খালেদ বাঙালি রহিমাহুল্লাহ এবং তার সহযোদ্ধা পীড়াপীড়ি করে শেষ সময় পর্যন্ত পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর ওপর তীব্র হামলা পরিচালনা করতে থাকেন। তাই যুদ্ধ ফ্রন্ট থেকে তারা সরে আসেন সবার শেষে। এক কথায় বাংলাদেশে জিহাদী দাওয়াত এবং কার্যকরী ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা তারেক ভাই রহিমাহুল্লাহর আকৃতিতে নিজের বিশেষ সাহায্য অবতীর্ণ করেন।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তারেক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্য বাংলাদেশি ভাইয়ের প্রতি অনেক মনোযোগ দেন। তিনি প্রায় সময় তাদের কেন্দ্রে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং তাদের সঙ্গে সময় পার করতেন। কখনও কখনও বাংলাদেশি ভাইদের সঙ্গে থেকে যেতেন এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে খুবই খেয়াল রাখতেন। তেমনই একটি মজলিসের অডিও রেকর্ড আস-সাহাব মিডিয়া প্রকাশ করেছে। ওই রেকর্ডে দেখা গেছে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ স্বভাব ও অভ্যাসের বাইরে খুব বেশি ইংরেজি ভাষার শব্দ ব্যবহার করছিলেন, কারণ অনেক বাঙালি ভাইয়ের উর্দু বুঝতে সমস্যা হচ্ছিলো।

কেমন যেন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্ন থেকেই ওখানকার ভারতপুষ্ট স্টাবলিশমেন্ট আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলমানদের বাঙলা [224]

ভূখণ্ডে ধর্মহীনতার বীজ বপন করে দিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর দীনের শত্রু এবং কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী হাসিনা ওয়াজেদের সরকার আসার পর ধর্মহীনতা ও ইসলাম বিদ্বেষের এক তুফান বাংলাদেশে আরম্ভ হয়ে যায়। যেখানে একদিকে উলামায়ে কেরাম এবং দীনদারদেরকে কোণঠাসা করা হয়, অপরদিকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি- স্বাধীনতার নামে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা ছড়ানো হয় এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঠাট্টা- বিদ্রূপ করা হয়। সরকারি আশীর্বাদ বই সমস্ত বেহুদা অর্থহীন সেকুলার লবিগুলোকে এতটাই সাহস দিয়ে দেয় যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ব্লগে দুজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সম্মানে আঘাত করতে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। বাঙলা ভূখণ্ড তো ইসলামের আত্মমর্যাদাশীল সিংহদের বাসস্থান ছিল। সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর জিহাদ হোক কিংবা ১৮৫৭ সালের আযাদি জিহাদ, সর্বদাই আল্লাহর দীন ও শরীয়তের তরে নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করে দেয়ার জন্য বাংলার মুসলমানেরা উপমহাদেশের মানচিত্রে অনন্য অবস্থানে ছিল। তাহলে এটা কেমন করে হতে পারে যে, ইসলামের দুই গাযী হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং তিতুমীর রহিমাহুল্লাহর ভূখণ্ডে রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে বেয়াদবি করা হবে এবং আত্মমর্যাদাশীল মুসলমানেরা নীরব হয়ে বসে থাকবে? তাই তো বাংলার মুসলমানেরা দ্বিধা-সংশয় ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বেয়াদব ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীকে চরম শিক্ষা দিয়েছে এবং নাস্তিকতার পৃষ্ঠপোষকতা দানকারীদেরকে স্পষ্ট এই বার্তা জানিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের মা আমাদের উপর ক্রন্দন করুক, যদি আমরা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[225]

সাল্লামের সম্মানের প্রতিশোধ নিতে না পারি।” এক কথায় যেখানে বাংলাদেশের দীন-বিদ্বেষী সেকুলার গোষ্ঠী নিজেদের নিকৃষ্ট কার্যক্রম আরম্ভ করেছে, সেখানেই বাংলাদেশের মুসলমানেরা আল্লাহর দীন ও শরীয়তের তরে জিহাদ ও কিতালের দাওয়াত উচ্চকিত করেছেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশের আনসারে বাংলা জিহাদী নেটওয়ার্ক। এই আনসার বাংলাকে সুশৃঙ্খল করার কাজেও প্রধানত ভূমিকা পালন করেছেন কমান্ডার তারেক খালেদ ভাই রহিমাহুল্লাহ, যিনি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দিকনির্দেশনায় নিজের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বাংলাদেশে জিহাদের দাওয়াত বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরির প্রচেষ্টার পাশাপাশি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এই দিকেও মনোযোগ দেন যে, জিহাদী দাওয়াতের শুরু থেকেই যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয় এবং সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে জামাতের সাথিদেরকে এবং বিশেষভাবে দাওয়াত প্রদানকারীদেরকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি সাথিদেরকে বিস্তারিত নসীহত করতেন, জিহাদী অঙ্গনের উলামায়ে কেরামের কিতাবাদী পাঠ করাতেন এবং সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি মূলক চিন্তা-ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। তার চেষ্টা- প্রচেষ্টার ফল এই ছিল যে, বাংলাদেশে যখন দায়েশের খারেজীরা আত্মপ্রকাশ করলো, তখন আনসার বাংলার খারেজীদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থি মানহাজের সঙ্গে জুড়ে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আনসার বাংলার ভাইদের নামে বার্তা প্রেরণ করতেন, তাদেরকে দিকনির্দেশনা [226]

প্রদান করতেন, আল্লাহর দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বাংলাদেশী মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং মুজাহিদীন ও গাযীদের মনোবল বৃদ্ধি করতেন। তিনি এমনই এক বার্তায় কটুক্তিকারী রাজিব হায়দার নিহত হবার পর বাংলাদেশের মুসলমানদের নামে প্রেরিত পত্রে বাংলাদেশি সরকারের ইসলাম বিদ্বেষী কার্যক্রম তুলে ধরে ভরাট কন্ঠে বলেন:

“অবস্থা এতদূর গড়িয়ে যায় যে, তা কল্পনা করতে গেলেও লোম দাঁড়িয়ে যায়। এমন অবস্থা মুখে আনতেও চিন্তা করে নিতে হয়। মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারণকারী কোটি কোটি প্রেমিকের এই দেশে এক নিকৃষ্ট মালাউন হতভাগা নরাধম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে, হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র সম্মানে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র সম্মানে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সম্মানে এমন কঠোর ঘৃণ্য অশ্লীল ও দৃষ্টতা পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছে, যা কল্পনারও বাইরে।

ইন্টারনেট ব্লগার এই মালাউন লেখক আমাদের হৃদস্পন্দন ও চক্ষু শীতলকারী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সম্মানের চাদর নিয়ে টানা হিঁচড়া করেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ লেখালেখির মূল চরিত্র বানিয়ে উপস্থাপন করেছে। এই নরাধম আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক চরিত্র স্বভাব ও নৈতিকতার ওপর অপবাদ আরোপ করেছে। নিজের সমস্ত পাশবিকতা ও জান্তব প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দিয়ে লাজ-লজ্জা ও মানবিক মর্যাদাবোধ থেকে মুক্ত হয়ে নবী [227]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কলম ধরেছে। তাই আল্লাহর লানত তার ওপর এবং আল্লাহর রহমত ওই সমস্ত নওজোয়ানের ওপর, যারা এই মালাউন নরাধমকে মৃত্যুমুখে পতিত করে ঈমানদারদের হৃদয় শীতল করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে বসবাসরত আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহর কসম এটা কোন রাজনৈতিক ঝগড়া ফ্যাসাদ নয়; এটাতো কুফর ও ইসলামের যুদ্ধ। এখনও মালাউন আহমদ রাজিব হায়দারের মতো আরও অনেক হতভাগা জীবিত ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের জবান ও কলম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার আনীত শরীয়তের বিরুদ্ধে বিষবাষ্প ছড়িয়ে যাচ্ছে। জন্তু- জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট এই অস্তিত্বগুলোর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। তাদেরকে বেছে বেছে টার্গেট বানানো এবং পথে ঘাটে ঘিরে মৃত্যু দুয়ারে পাঠিয়ে দেয়া এক শরীয়তী দায়িত্ব।”

এক কথায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দিকনির্দেশনা এবং কমান্ডার তারেক খালেদ রহিমাহুল্লাহর সঞ্চালনায় আনসার বাংলা নামে শুরুতেই পরিচিতি লাভকারী মুজাহিদীনের গ্রুপ একটি সাংগঠনিক অস্তিত্ব ও সুশৃঙ্খল আন্দোলনের কাঠামোয় আত্মপ্রকাশ করে। আল-কায়েদা উপমহাদেশ গঠনের পর আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা আসেম উমর রহিমাহুল্লাহ কমান্ডার তারেক খালেদ বাঙালি ভাইকে বাংলাদেশের সার্বিক বিষয়াদির ব্যাপারে দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং ২০১৫ সালে জামাআতের কেন্দ্রীয় শুরার সদস্য হিসেবেও নির্বাচিত করেন। ‘আনসার বাংলা’ আল-কায়েদা উপমহাদেশের অগ্র সেনাদল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। উপমহাদেশের জিহাদ এমনকি বৈশ্বিক জিহাদের বিভিন্ন অঙ্গ, শাখা ও ফ্রন্টে বাঙালি মুজাহিদীন এমন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী পেশ করেন যা ভোলার মতো নয়। দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের পাহাড় কমান্ডার [228]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"[illegible]" [33]

---

[33] [illegible]

এই আয়াতের আলোকে উলামায়ে কেরামের রায় হল, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জ্ঞান ও পারদর্শিতা অর্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে জাগতিক উন্নতি অগ্রগতির জন্য সমসাময়িক বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্প সামনে এসে থাকে। মুজাহিদীনের জন্য ঐ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক শিল্পে দক্ষতা অর্জনের জন্য এজাতীয় বিভিন্ন গবেষণামূলক মজলিস এবং নোট তৈরি করা মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে খুবই অগ্রগণ্য একটি বিষয়।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর তত্ত্বাবধানে তার সহযোদ্ধারা ইদাদ প্রতিষ্ঠান চালু করেন এবং তার অধীনে মুজাহিদীনের সাধারণ শিক্ষা নোটিশ তৈরি সহ আরও কিছু শিল্প যোগ্যতা ও পারদর্শিতার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেন। এই শাখার প্রাণভোমরা ছিলেন উস্তাদুল মুজাহিদীন ইঞ্জিনিয়ার সুহাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহ। সুহাইল রহিমাহুল্লাহর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, ব্যাপক অধ্যয়ন এবং অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার সারনির্যাস হিসেবে ঐ সমস্ত নোটগুলো সামনে আসে। এই শাখার অধীনে পরিচালিত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হিসেবে সামনের কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করা হচ্ছে:

** উস্তাদ সুহাইল রহিমাহুল্লাহ বারুদ বানানোর টেকনিক সংক্রান্ত বিস্তারিত শিক্ষা লাভ করেন শায়খুল জিহাদ আবু খাব্বাব মাসরি শহীদ রহিমাহুল্লাহ থেকে। এরপর তিনি শহীদ উস্তাদ ফয়েজ মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে বারুদকে বিভিন্ন পন্থায় ঢেলে ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় উস্তাদ সুহাইল রহিমাহুল্লাহ বারুদের একটা বড় ওয়ার্কশপ খোলেন। ওই [230]

ওয়ার্কশপের নাম দেয়া হয় আবু খাব্বাব শহীদ ওয়ার্কশপ। উক্ত ওয়ার্কশপে ১২ টন বারুদ প্রস্তুতের কাজ করা হয়। হাজার হাজার মুজাহিদকে বারুদ শিল্পের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। বারুদ প্রস্তুত করার নতুন নতুন সহজ পন্থার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয়। মুজাহিদীনের জন্য এই শিল্পে পারদর্শিতা ও যোগ্যতা তৈরির উদ্দেশ্যে উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় 'দাওরায়ে মুতাফাজ্জিরাত' নামে বিস্তারিত সহজবোধ্য এবং নির্ভরযোগ্য একটি পুস্তক রচনা করা হয়। সেই সঙ্গে বারুদের প্রশিক্ষণমূলক মজলিসের বিভিন্ন দৃশ্য সংবলিত এই শিল্পের ওপর অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করা হয়, যেগুলো দেখে বারুদ শিল্পের ব্যাপারে পারদর্শী মুজাহিদীন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে সুবিধা পাবেন।

** যুদ্ধের পরিচালনা পন্থা, মর্ম উদ্দেশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলো বোঝার জন্য সমর বিষয়ক জ্ঞানের উপর লিখিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ তৈরি করা হয়, যার নাম নেছাবে হারব বা সমর বিষয়ক পাঠ্যক্রম

** ড্রোন হামলা থেকে প্রতিরক্ষা বিষয়ের ওপর শহীদ ডক্টর সারবুলন্দ খান রহিমাহুল্লাহর নোট প্রকাশ করা হয়, যেখানে ড্রোন বিমান কিভাবে কাজ করে, ড্রোন হামলা থেকে বাঁচার কৌশল এবং এই বিষয়ে আরও অনেক তথ্য ও কৌশল ছিল। জিহাদের আমীর শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ ওই কিতাবটি এতটাই পছন্দ করেন যে, কিতাবটির আরবী অনুবাদ করিয়ে আরব বিশ্বের বিভিন্ন ফ্রন্টে জিহাদ রত মুজাহিদীনের কাছে পাঠিয়ে দেন।

** প্রাথমিক জিহাদী প্রশিক্ষণ, তোপ খানা, গেরিলা যুদ্ধ, শহুরে যুদ্ধ এবং অন্যান্য সামরিক জ্ঞানের অধ্যায় নিয়ে বিস্তারিত নোটিশ তৈরি করা হয়।

[231]

** পশতু ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষীর মুজাহিদীনের জন্য স্থানীয় সমাজকে বোঝা এবং ওই অঞ্চলের ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে পশতু ভাষা শিক্ষার ওপর একটি কিতাব তৈরি করা হয় এবং তার নাম রাখা হয় ‘পশতু পাকিস্তানি মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে’।

পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ বিভাগ
তাখতিত বলা হয় পরিকল্পনা করাকে এবং তাহলিল
বলা হয় বিশ্লেষণ তথা এনালাইজ করাকে। যেকোনো বিপ্লবী আন্দোলনের অবস্থা, পরিবেশ, উপায় মাধ্যম ও সরঞ্জাম সমূহ, শত্রুপক্ষের শক্তি এবং অন্যান্য উপকরণ বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা করা আন্দোলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তাই এ বিষয়ের জন্য আলাদা একটি বিভাগ থাকে। এখানেও তেমনি একটি বিভাগ ছিল এবং এই শাখার প্রাণভোমরা ছিলেন জিহাদী অঙ্গনের চিন্তাবিদ ডক্টর সার বুলন্দ খান রহিমাহুল্লাহ। বিশ্ব ইতিহাসের ব্যাপক অধ্যয়ন এবং বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলো নিয়ে পড়াশোনা করে যে সারনির্যাস বের করা হয়, তারই আলোকে ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের ওপর অনেকগুলো প্রবন্ধ রচনা করেন। ওই প্রবন্ধগুলো রচনার উদ্দেশ্য হলো, মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দের জন্য যেন সর্বোত্তম পরিকল্পনা করা সহজ হয়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং অন্য সাথিরা ডক্টর সাহেবের এই কাজে তার সঙ্গে প্রথমে দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক আলোচনা করতেন, অতঃপর ডক্টর সাহেব তার বিশ্লেষণের সারনির্যাস লিপিবদ্ধ করেন। রচনা শেষ হওয়ার পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তা পুনরায় দেখেন এবং বিভিন্ন মন্তব্য যুক্ত করেন। এরপর টীকা মন্তব্য সহকারে পুরো রচনা সুবিন্যস্ত করে মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপন করেন।

[232]

বিশ্লেষণী ওই লেখাগুলোতে প্রথমে সার্বিক অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ পেশ করা হতো। যেই অঞ্চলে আমরা জিহাদ করছি সেখানকার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হতো। বর্তমান সময়ের আগে এই অঞ্চলে যে সকল মুজাহিদ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, তাদের সেই আন্দোলনের ঐতিহাসিক সার নির্যাস সামনে রাখা হতো। এই অঞ্চলের রুচি প্রকৃতি বোঝার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হতো। সেই সঙ্গে নিজেদের ওই সমস্ত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে বলা হতো, যেগুলোর ওপর আমাদের আন্দোলন ভিত্তিশীল। ওই সমস্ত অবস্থান ও কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নসীহত করা হতো, যেগুলো আমাদের দাওয়াত বিস্তারের জন্য ক্ষতিকর। সেই সঙ্গে শত্রুর অবস্থান, যোগ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হতো। ওই বিশ্লেষণে শত্রুপক্ষের সামরিক কূটকৌশলগুলো বোঝার ব্যাপারেও ইঙ্গিত দেয়া হতো। এক কথায় এই বিভাগের তৈরি দস্তাবেজগুলো মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দের জন্য নির্দেশিকা ও নীতিমালা হিসেবে কাজ করতো।

এই শাখার অধীনে যে কাজগুলো হত সেগুলো আরবের ভেতরে ও বাইরের নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করা হতো। বিশেষভাবে কয়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর কাছে সেগুলোর কপি প্রেরণ করা হতো এবং তার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলো নোট করা হতো। এই কাজের ধারাবাহিকতায় শায়খদের সঙ্গে যে দেখা- সাক্ষাৎগুলো করতে হতো, সেগুলোতে সাধারণত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং ডক্টর সারবুলন্দ যুবায়ের খান রহিমাহুল্লাহ অংশগ্রহণ করতেন। আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ মাসরী শহীদ, আমীর বাইতুল্লাহ মেহসুদ শহীদ, আমীর মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ শহীদ, আমীর হাকিমুল্লাহ

[233]

মেহসুদ শহীদ, আমীর মোল্লা নাজির ওয়াজির শহীদ, আমীর মাওলানা ফজলুল্লাহ শহীদ, মাস্টার আজম তারেক শহীদ, শায়খ অতিয়াতুল্লাহ লীবী শহীদ, শায়খ আবু ইয়াহিয়া লীবী শহীদ, আমীর মাওলানা আসেম উমর শহীদ, উস্তাদ ফয়েজ মুহাম্মাদ শহীদ, উস্তাদ আসলাম শহীদ, কারী ইমরান শহীদ, হাজী অলিউল্লাহ শহীদ, কমান্ডার বদর মনসুর শহীদ রহিমাহুল্লাহ আজমাঈন সহ এই অঙ্গনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মাঝে এই শাখার বিভিন্ন গবেষণার আলোকে যেই বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা পর্যালোচনা এবং জ্ঞানগর্ভ আলাপচারিতা হতো, সেগুলোতে ডক্টর সারবুলন্দ যুবায়ের রহিমাহুল্লাহর অবস্থান হতো একজন অধ্যাপক ও শিক্ষকের মতো।

শিশুদের মক্তব বিভাগ হিজরতের ভূমি ওয়াজিরিস্তানে হিজরতকারীদের মাঝে যারা অল্পবয়সী, তাদের শিক্ষার জন্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিভাগ খোলা হয়, যার নাম শিশুদের মক্তব বিভাগ। শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে তিনি এবং তার বন্ধুদের দৃষ্টি এই দিকে ছিল যে, তারা চাচ্ছিলেন এই বিভাগকে এমন ভাবে সাজানো হোক, যেন একদিকে শিশুরা ধর্মীয় ও শরীয়াহগত জ্ঞান খুব ভালোভাবে লাভ করে এবং অপরদিকে জাগতিক বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প দক্ষতা তাদের তৈরি হয়ে যায়। অতঃপর এই বিভাগকে এমন ভাবে সাজানো হয় যে, তা বাস্তবায়নের ফলে পশ্চিমা শিক্ষা সংস্কৃতি এবং সে সংস্কৃতির ভিত্তিতে তৈরি গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সেবাদাস গোষ্ঠী যেন তৈরি না হয়; বরং ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামিক সমাজ বিনির্বাণ ও স্থায়িত্বের প্রয়োজন সামনে রেখে যেন এই

[234]

শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এই হযরতগণের সামনে শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল: প্রথমটি হল প্রাইমারি দ্বিতীয়টি সেকেন্ডারী এবং তৃতীয়টি হল উচ্চশিক্ষা। প্রাইমারি শিক্ষার জন্য তারা শিশুদের মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মুহাজিরদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যক্রম আরম্ভ হয়ে যায়। এরপর উক্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী স্তরগুলো বিন্যস্ত করা হয়। এই কাজের জন্য প্রচলিত সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং সেগুলো পরিমার্জন ও সংশোধন করে শিশুদের মক্তবে চালু করা হয়। এভাবেই শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে এমন কত মুহাজির শিশুসন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, যারা ‘যরবে আযব’ অপারেশনের কারণে এমনকি শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর তত্ত্বাবধানে এই ডিপার্টমেন্টের অধিকাংশ দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওলানা ডক্টর উবায়দুর রহমান মুরাবিত হাফিযাহুল্লাহ।

চিকিৎসা বিভাগ
ডক্টর সারবুলন্দ খান যুবায়ের রহিমাহুল্লাহ যখন থেকে ওয়াজিরিস্তানে রয়েছেন, তখন থেকেই তিনি মুজাহিদীন ও গোত্রের সাধারণ লোকদের চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ২০০৯ সালে মেহসুদ এলাকায় সেনাবাহিনীর অপারেশন চলাকালে মেহসুদ মুজাহিদীনের সাহায্যার্থে এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সহায়তায় নিয়মতান্ত্রিক হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ওই হসপিটাল সেনাবাহিনীর অপারেশন চলাকালে স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসার কাজ করে। মেডিকেল সাইন্স ও চিকিৎসার

[235]

ওপর পড়াশোনা সমাপনকারী কিছু মুজাহিদ ভাইকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেন। তাদেরকে তিনি ডক্টর সারবুলন্দ খান জুবায়ের রহিমাহুল্লাহর নিকট প্রেরণ করেন এবং এই বিভাগের জন্য রীতিমতো বাজেট নির্ধারণ করেন। সেই সঙ্গে মেহসুদ মুজাহিদীনও এই ব্যাপারে আলাদাভাবে ডক্টর সাহেবের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এভাবেই একই সময়ে বেশ কিছু জায়গায় ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহ প্রাথমিক চিকিৎসা মূলক সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ কেন্দ্রীয় হসপিটালে আরও বেশ কিছু মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে আহতদের বড় বড় সার্জারি করেন। অতঃপর এই ডিপার্টমেন্টের পরিধি বিস্তৃত করা হয় এবং আরব অঞ্চলের ভেতরে ও বাইরে চিকিৎসা বিষয়ক পড়াশোনা সমাপনকারী বেশ কিছু ব্যক্তিকে এই ডিপার্টমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর প্রচেষ্টায় আরও কিছু লোক মুজাহিদীনের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত হন। তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় এবং প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা শেখানো হয়। এই পুরো বিভাগের প্রাণভোমরা তো ছিলেন ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজে। তিনি শুরু থেকে শাহাদাত লাভ করার আগ পর্যন্ত সর্বাবস্থায় এ কাজে দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অবশ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সর্বদাই তার দিকে খেয়াল রাখতেন, সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, অর্থ স্বেচ্ছাসেবক ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন এবং এই ডিপার্টমেন্টকে পুরো দলের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহকে সাহায্য করেন।

[236]

মুজাহিদীনের গুদাম আরবীতে বলা হয় মুস্তাওদা, যাকে উর্দু ভাষায় বলা হয়: যখিরাগাহ বা গুদাম। মুজাহিদীনের জন্য যে সমস্ত সরঞ্জাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে হেফাযত করে কোথাও রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করার দ্বারা একদিকে তো মৌলিক জিনিস সবকিছু পাওয়া যায় না, অপরদিকে সেগুলোর মূল্য হয়ে থাকে অনেক বেশি। এই কারণে দেশের বড় পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে একসাথে অনেক বেশি সরঞ্জাম কিনে হেফাযত করে রাখতে হয়। এরপর প্রয়োজন অনুপাতে মুজাহিদীনের মাঝে সেগুলো বন্টন করে দেয়া হয়। সেই হিসেবে সম্পদ-দরিদ্র মুজাহিদীনকে বহু সংখ্যক পণ্য বাজার থেকে কিনতে বলা খুবই একটা দুষ্কর কাজ ছিল।

রুশ জিহাদের সময়কালে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ‘মাক্তাবে খিদমাত’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেছিলে। তারা মুহাজির ও আনসার মুজাহিদীনের এ জাতীয় অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলোর প্রয়োজন পুরো করার কাজ করতেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেও শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর এমন কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে মীরান শাহ এলাকায় এমনই একটি গুদাম ঘরের ব্যবস্থা করেন। তার এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাণভোমরা ছিলেন লাহোর থেকে আগত নিষ্ঠা ও ভালোবাসার প্রবাদপুরুষ শহীদ উমায়ের আফজাল হুসাইন

34রহিমাহুল্লাহ। মুজাহিদীনের ব্যবহার্য

34 শহীদ ওমায়ের এফজাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মুজাহিদীনের মাঝে তিনি হোসাইন ভাই নামে এবং উপমহাদেশের অন্যান্য জায়গায় শাইখ মুস্তফা আব্দুল করিম নামে পরিচিত ছিলেন। লাহোরের উচ্চশিক্ষিত, প্রতিভাধর একজন মুজাহিদ ছিলেন। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনী ইলমের মহব্বত তার মাঝে স্থান করে নেয়। ইলমের তৃষ্ণা মেটাতে তিনি জিহাদী অঙ্গনের ওলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনা ও সান্নিধ্যে মূল্যবান গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন ইলমী দরস শ্রবণ করার বদৌলতে ইলমী অঙ্গনের অনেকটা গভীরে পৌছে যান। আলকায়দার কেন্দ্রীয় আস-সাহাব মিডিয়ার প্রধান পরিচালক হিসেবে বছরের পর বছর দায়িত্ব পালন করেন। এর ফলে

[237]

কাপড়, জুতা, গরম জ্যাকেট, সফরের বিছানা, তৈরিকৃত গোশতের ডিব্বা, খেজুর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বন্টন করে দেয়া হতো। কোনো পার্থক্য ব্যতিরেকে সকল জিহাদী মাজমুআর প্রয়োজনের কথা সামনে রেখে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজে অগ্রগণ্যদের তালিকা তৈরি করতেন (অর্থাৎ এই তালিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখা থাকতো পণ্যগুলো পাওয়ার অধিক উপযুক্ত কারা) এবং তালিকা অনুযায়ী এ সকল পণ্য প্রয়োজনের সময় বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো।

• দাওয়াত ও প্রচার বিভাগ

দাওয়াত প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ যেহেতু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো ফুটিয়ে তুলেছে এবং তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, তাই আমরা স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ!

আলকায়দার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সালাফী ব্যাকগ্রাউন্ডের হবার পাশাপাশি হানাফী ওলামায়ে কেরামকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, তাদের কিতাব সমূহ থেকে উপকৃত হতেন এবং ঘরানাগত সংকীর্ণতা থেকে যথেষ্ট দূরে থাকতেন। দায়েশ নামক ফেতনা দেখা দেবার পর সালাফী ভাইদের কাছে দায়েশী পথভ্রষ্টতা ও খারেজী স্বভাব স্পষ্ট করার জন্য তিনি বেশ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। উন্নত স্বভাব চরিত্র, নম্র আচরণ, দানশীলতা, বীরত্ব ও এবাদতের ময়দানে তিনি অশ্বারোহী ছিলেন। আমিরুল মুজাহিদীন মাওলানা আসিম ওমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে সীমাহীন ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন এবং তার প্রতি আস্থা রাখতেন। বহিঃরাষ্ট্রের সঙ্গে আলকায়দা উপমহাদেশের যোগাযোগের দায়িত্ব তাকে দিয়ে রেখেছিলেন। শহীদ ওমায়ের আলকায়দা উপমহাদেশের কেন্দ্রীয় শুরা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ২০১৮ সালে হেলমান্দ মরুভূমিতে আমেরিকানদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে মরণপণ যুদ্ধ করে তিনি শাহাদাত বরণ করেন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমীন!!

[238]

সপ্তম অধ্যায়: মুজাহিদীনের
মাঝে ঐক্য প্রচেষ্টা

মুজাহিদীনের ঐক্য সাধনে প্রচেষ্টা করা, তাদের মাঝে নৈকট্য সখ্য সৌহার্দ্য সম্প্রীতি সৃষ্টি করা, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার পরিকল্পনা করা এবং এই সকল কাজের পাশাপাশি ব্যক্তি অহঙ্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের খুবই আলোকিত বাতায়ন ছিল। আমি যখনই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে জিহাদী জীবনে দেখেছি, তখন সর্বদাই মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সাধনের জন্য তাকে প্রচেষ্টাশীল পেয়েছি।

তালেবানের রাহবার এবং প্রসিদ্ধ আলেমে দীন উস্তাদ ইয়াসির শহীদ রহিমাহুল্লাহর নসীহত এটা খুব সম্ভব ২০০৮ সালের কথা, যখন ফারুক
ভাই রহিমাহুল্লাহ ওরাকজাই এজেন্সির পক্ষ থেকে গিয়ে প্রসিদ্ধ আলেমে রব্বানী, সাহসিকতা ও মহত্ত্বের পাহাড়, পূর্বসূরিদের স্মৃতিচিহ্ন হযরত আল্লামা উস্তাদ ইয়াসির আফগানি রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তার কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তার সেই সাক্ষাৎকারগুলো অনেকগুলো বৈঠক ও মজলিস সংবলিত। ওই মজলিসগুলোর মধ্যে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ উস্তাদ ইয়াসিরের ঐ ঐতিহাসিক ইন্টারভিউ নিয়েছেন, যা পরবর্তীতে ‘হিত্তিন' ম্যাগাজিনে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে।

উস্তাদ মুহাম্মাদ ইয়াসির রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেম-এ দীন, চিন্তাবিদ, দাঈ ও জিহাদী রাহবার ছিলেন। তিনি আফগানিস্তানে

[239]

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর মদীনা মুনাওয়ারার জামিয়া ইসলামিয়া থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি রুশ জিহাদের গাযী এবং দিকনির্দেশক ছিলেন। রুশ শত্রু পরাজিত হওয়ার পর তৈরি মুজাহিদীনের ছায়া সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরে তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ জিহাদী অভিজ্ঞতার অধিকারী হবার পাশাপাশি হৃদয় শীতলকারী আলোচনার কারণে তিনি মুজাহিদীনের খুবই প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কোনো পরিণতির কথা চিন্তা না করেই লাল মসজিদের ট্রাজেডি সংঘটিত হবার পর আল্লাহর দীনের শত্রু পাক আর্মির বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া দিয়েছেন এবং পাকিস্তান জিহাদের একজন সমর্থক ছিলেন। আল্লাহর দীনের শত্রু এবং স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী সংস্থা আইএসআই নিজেদের মার্কিন মনিবদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকে গ্রেফতার করে এবং নির্মম নির্যাতন করে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং পাকিস্তানবাসীকে ইসলামী বিশ্বের এই মহান চিন্তাবিদের হত্যাকাণ্ডের দাগ মুছে ফেলার তাওফীক দান করুন, আমীন।

উস্তাদ ইয়াসির রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে একটি পয়েন্টে খুবই জোর দিয়েছেন। তার বক্তব্য ছিল: « রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালে মুজাহিদীনের অনেক গ্রুপ ও দল ছিল। এই গ্রুপগুলো খুবই শক্তিশালী ছিল এবং প্রতিটি গ্রুপ নিজেদের সাধ্যমত জিহাদে ভূমিকা পালন করতো। অবশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয়ের সময় চলে আসে। শত্রুপক্ষ পলায়নের মাঝেই নিরাপত্তা খুঁজে পায় এবং রাশিয়ার ছেড়ে যাওয়া এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় বিভিন্ন

[240]

মুজাহিদ গ্রুপ। ফলে বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায় এবং বিশৃঙ্খলা এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, জিহাদ এবং আল্লাহর দীনের দুর্নাম হতে আরম্ভ করে। » উস্তাদ ইয়াসির রহিমাহুল্লাহর বিশ্লেষণ এমন ছিল যে, “মুজাহিদীন বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছার আগেই পরস্পরে যেন ঐক্য সাধন করে এক আমীরের নেতৃত্বে চলে আসে। যদি শুরু থেকেই বিভিন্ন জিহাদী গ্রুপ নিজেদের মাঝে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি তৈরি করার চেষ্টা না করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রচেষ্টাশীল না হয়, তাহলে তাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করাটা শয়তানের জন্য সহজ হয়ে যায়। তাই জিহাদী পুরো কাফেলার উচিত তাদের এই যাত্রা আরম্ভ করার সময় থেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে একতার সঙ্গে কাজ করা, যেন আগামীতে দূরত্ব ও মতবিরোধের কারণে ফিতনা-ফাসাদ তৈরি না হয় এবং পূর্বের সকল ত্যাগ-তিতিক্ষার ফসল নষ্ট না হয়ে যায়।

মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সাধন ও পারস্পরিক সংযুক্তি প্রকল্প ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মেজাজ এমন ছিল যে, তিনি কল্যাণমূলক উপদেশ গ্রহণে খুবই অগ্রসর ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারতেন অমুক কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে, তৎক্ষণাৎ তা করে নিতেন। উস্তাদ ইয়াসির রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে ফিরে এসে তিনি অন্যান্য জিহাদী কাফেলার সাথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আরম্ভ করেন। তিনি তাদেরকে একথা বোঝাতেন যে, আমাদের পারস্পরিক নৈকট্য বৃদ্ধি করা উচিত, সামরিক প্রশিক্ষণগুলোতে এবং ফ্রন্টের সৈন্যবিন্যাসেও আমাদের সমন্বয় সাধন করা উচিত এবং নিজেদের সমস্যাগুলো যৌথভাবে সমাধান করা উচিত। উস্তাদ ইয়াসির রহিমাহুল্লাহর

[241]

অভিজ্ঞতা লব্ধ সে পয়েন্টটি তিনি তাদের কাছে তুলে ধরতেন এবং মুজাহিদীনের পারস্পরিক ঐক্যের বরকত নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি সাইয়েদুনা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই প্রসিদ্ধ উক্তি বর্ণনা করতেন যে , تفقهوا قبل ان تسودوا -অর্থ : “তোমরা সুবিবেচনা বোধ তৈরি কর নেতা হবার পূর্বেই।” [সহীহ বুখারী]

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বলতেন , আমাদের জন্য জরুরি হলো বিজয়ের ধারা আরম্ভ হবার আগেই এক হয়ে যাওয়া। এই ব্যাপারে তিনি সর্বদাই এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতেন যে , হয়তোবা তার এই পরামর্শ প্রদানের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তিনি নিজে নেতৃত্ব ভার চাচ্ছেন। বরং এই বিষয়ে সর্বদা তিনি এমন ব্যক্তিদেরকে অগ্রগণ্য মনে করতেন যারা জিহাদে সকলের আগে এসেছেন।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর এই মিশনে আলেমে রব্বানী মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহও থাকতেন। তিনি বিভিন্ন জামাতের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে , আপনারা মুজাহিদীনের এই কাফেলা প্রতিষ্ঠা করেছেন শরীয়াহর কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে ? সাধারণত সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলগণ এমনটা বলতেন যে , যেহেতু শুরু থেকেই জিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো জামাতের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা ছিল না , অথবা প্রসিদ্ধ জিহাদী জামাতগুলো সঠিক জিহাদ পরিচালনা করছিল না , এজন্য আমরা বন্ধু -বান্ধবদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে আমীর নিযুক্ত করে জিহাদ আরম্ভ করে দিয়েছি আর এভাবেই আমাদের জিহাদী কাফেলা তৈরি হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই আমাদের এমন কাজের ব্যাপারে পবিত্র শরীয়তের পক্ষ থেকে বৈধতার ঘোষণা রয়েছে। তখন মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলতেন : আপনারা পুরোপুরি সঠিক কাজটি করেছেন। কিন্তু এখন যেহেতু আমাদের অন্য জিহাদী

কাফেলার সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে, তাদের খোঁজ পাওয়ার পর আমাদের মাঝে ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং এমনটাও জানা গিয়েছে যে, আমাদেরও অনেক আগে থেকেই বহু জিহাদী দল জিহাদ করে যাচ্ছে, ওই কাফেলাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থার ব্যাপারেও আমরা একমত, তাহলে এখন আমরা কেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি না? অতঃপর তিনি কুরআন ও হাদীসের দলীলাদি ও প্রমাণপঞ্জি উল্লেখ করে স্পষ্ট করে দিতেন যে, ঐক্য সাধন ও একতাবদ্ধ হওয়া কতটা জরুরি আর বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব বিবাদের পরিণতি কতটা মন্দ হয়!

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুজাহিদীনের ঐক্য সাধনের এই প্রচেষ্টাকে বিভিন্ন দায়িত্বশীল ও নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই করেছেন। তারা তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখতে চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার অধিকারী এবং একাত্মতা ও ঐক্য সাধনের পথে সবচেয়ে অগ্রসর হিসেবে কায়দে জিহাদ, ইসলামের বীর, কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ এবং উস্তাদুল মুজাহিদীন, বীরত্ব সাহসিকতা ও প্রত্যয়ের জীবন্ত প্রতীক উস্তাদ উমর আকন্দাস রহিমাহুল্লাহ

35 (ফয়েজ মুহাম্মদ) সামনে ছিলেন। এই
প্রোগ্রাম বেগবান করে সামরিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা, পাকিস্তানের সামরিক কার্যক্রমে যৌথ অংশগ্রহণ, শরীয়াহগত শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ক

35 উস্তায ফয়েজ মুহাম্মদ (ওমর আকদাস) পাকিস্তানি মুজাহিদীনকে বারুদ শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করাতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিভিন্নভাবে ঢেলে বারুদ ব্যবহারের বেশ কিছু নতুন পন্থা সাথীদেরকে শেখান। তিনি শহীদ আমজাদ ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকটতম সহযোদ্ধাদের একজন ছিলেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে ক্রুসেডার বাহিনী এবং তাদের মিত্রশক্তির ওপর পরিচালিত অধিকাংশ আত্মঘাতী হামলার প্রস্তুতি বা প্রশিক্ষণের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন তিনি। উন্নত আখলাক স্বভাব চরিত্র, চমৎকার মুচকি হাসি ও সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকার নববী সিফাত তার মাঝে ছিল। আলকায়দা পাকিস্তানের অধিকাংশ সামরিক পরিকল্পনায় তার অংশগ্রহণ ছিল। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সীমাহীন মহব্বত ও বন্ধুত্ব ছিল। ২০১০ সালে মিরানশাহ এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সাহায্যে মার্কিন ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

[243]

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ
أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ

كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَـةِ وَمَنْ سَـتَرَ مُسْـلِمًا سَـتَرَهُ اللـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ [36]

অর্থ : "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।" [37]

নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের সৎকর্মশীল সকল শ্রেণি ও মুজাহিদীন মুহাজিরদের এবং বিশেষ করে আরব মুহাজিরদের সাহায্য - সহযোগিতায় নিজেদের সব কিছু ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সৎকর্মশীল শ্রেণির মধ্যে কেউই পিছিয়ে নেই।

আরব মুজাহিদীনের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার এই আন্দোলন যেমনিভাবে অন্যান্য ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন উপকার বয়ে এনেছে, তেমনি আরব মুজাহিদীনের সঙ্গে এই সুসম্পর্ক পাকিস্তানি মুসলিমদেরকে দ্বিতীয়বারের মতো জিহাদের সাথে জুড়ে যাওয়ার এবং জিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি পাকাপোক্ত করার কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আরব মুজাহিদীনের বৈশ্বিক জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি, কাফেরদের সাহায্যকারী ও অনুচর তাগুত গোষ্ঠীর অসন্তুষ্টি এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র জন্য হিজরত করে মাতৃভূমি ত্যাগ

---

[36] সহীহ বুখারী
[37] মাআরেফুল হাদীস গ্রন্থ থেকে অনুবাদ সংগৃহীত

করার দৃষ্টিভঙ্গি, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর তত্ত্বাবধান ছাড়াই জিহাদ পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গিসহ এমনই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ধারা পাকিস্তানি মুজাহিদীনের মাঝে স্থান করে নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সামরিক শিল্প যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাহার তাদের কাছ থেকে অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছে। তারই ফলে পাকিস্তানি মুজাহিদীন এমন কিছু কাফেলা দাঁড় করিয়েছেন, যেগুলো কোনো না কোনো দিক থেকে আল-কায়েদার মুজাহিদীনের সঙ্গে যুক্ত। কেউ কেউ রীতিমতো জিহাদের বায়আত করে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে, আবার কেউ কেউ শ্রবণ ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। কোনো কোনো কাফেলা সাহায্য-সহযোগিতা এবং যৌথভাবে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেছে। এক কথায় পাকিস্তান ও খোরাসানের এই অঞ্চলের অধিকাংশ জিহাদী জামাতের কোনো না কোনোভাবে আল-কায়েদার শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি ছিল।

আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহর ঐক্য সাধন প্রচেষ্টা
তানজীম আল-কায়েদার খোরাসান শাখার দায়িত্বশীল শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াযিদ মাসরী রহিমাহুল্লাহ নিজের ঐকান্তিক বুযুর্গ সুলভ এবং ঈমানী গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের কারণে উক্ত অঞ্চলে উপস্থিত সকল মুজাহিদের কাছে একজন রাহবার, দিকনির্দেশক ও নেতার মর্যাদা রাখতেন। মুসলিমদের মাঝে ঐক্য সাধন এবং সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করার চিন্তা তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলোর ব্যাপারে তিনি খুবই জোর প্রদান করতেন। গোত্রীয় এলাকার মুজাহিদীনের পারস্পরিক ঐক্য এবং তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার জন্য সদা

[246]

সর্বদা তিনি ব্যস্ত থাকতেন। ২০০৮ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সকল মুজাহিদীন নিজেদের মাঝে থাকা দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসা করার অঙ্গীকার তারই হাতে করেছেন। এমনিভাবে তারই অবদানে ওয়াজির মুজাহিদীনের শুরা অস্তিত্বে এসেছে, যার নাম হলো ইত্তিহাদুল মুজাহিদীন।

শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহ আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের মধ্যে গণ্য হতেন। মুজাহিদীনের মধ্যে তাকে শায়খ সাঈদ মাসরী এবং হাফেজ সুলতান নামে ডাকা হতো। তানজীম আল-কায়েদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ভূমিকা পালন করেছেন। ওয়াজিরিস্তান যখন দারুল হিজরত বা হিজরতের ভূমিতে পরিণত হলো, তখন এখানকার আনসার ও মুহাজির দলের মাঝে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তারা একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে লাগলেন। ওই অবস্থায় তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়া এবং তাদের মাঝে সংশোধন ও সংস্কারের বাতাস বইয়ে দেয়ার খেদমত আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে করিয়েছেন। তিনি তিন দশক পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে সবর, ধৈর্যধারণ ও অবিচলতার সঙ্গে টিকে ছিলেন। শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত সাথিদের মাঝে তাকে গণ্য করা হতো। তিনি তাকে দেখেছেন, তার সঙ্গে সময় যাপন করেছেন এবং এই সাক্ষ্য দিতেন যে তাকওয়া লিল্লাহিয়ার দিয়েছেন: গভীর দৃষ্টি, বীরত্ব, সাহসিকতা, সবর, ধৈর্যধারণ, অবিচলতা, অল্প তুষ্টি, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং অন্যান্য উত্তম গুণাবলির এমন সমাহার তার মাঝে ছিল, যা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যেত। জ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি ও বিবেচনা বোধ এত বেশি ছিল যে, জিহাদী বিভিন্ন কল্যাণকর দিক ও প্রয়োজন বোঝার

[247]

জন্য জিহাদী অঙ্গনের বড় বড় উলামায়ে কেরাম তাকে জিজ্ঞাসা করতেন।

অতঃপর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন ছিল যে, তিনি তার প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন। তাদের মাঝে বেশ ভালোই সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ছিল। এমনকি যদি বলা হয়, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত করা, আল-কায়েদার চিন্তা-চেতনা ও মানহাজ তাকে বোঝানো, দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত ও পাকাপোক্ত করার মৌলিক ভূমিকা পালন করেছেন শায়খ হাফেজ সুলতান রহিমাহুল্লাহ, তাহলে ভুল হবে না। অনেক বছর ধরে তার সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝেই শায়খ সুলতান রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে একাকী থাকার এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন সফরে যাওয়ার সুযোগ তার ঘটেছে। শায়খ সুলতান রহিমাহুল্লাহ যেখানে একজন আমীর ও নেতা ছিলেন, সেখানেই তিনি একজন মুরুব্বী, প্রশিক্ষক ও আত্মশুদ্ধিকারী ছিলেন। মাহফিল হোক, সাধারণ আলাপচারিতা হোক কিংবা কোনো মজলিস; যদি তিনি চুপ করে বসে থাকতেন তাহলেও তার ভক্ত অনুরাগী ও ছাত্রদের আত্মশুদ্ধির সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যেতো। সালাত হোক কিংবা তাজবীদ শিক্ষার মজলিস, তিলাওয়াত হোক কিংবা যিকিরের অধ্যাবসায়, গীবত থেকে বেঁচে থাকা হোক কিংবা অহঙ্কার থেকে দূরে থাকা, দুনিয়া বিমুখতা ও অল্প তুষ্টি হোক কিংবা শাহাদাতের আগ্রহ—এক কথায় তার সান্নিধ্য ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে যে ব্যক্তি সময় যাপন করেছে, সে-ই আল্লাহর নৈকট্যের দরজা খুঁজে পেয়েছে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ভাষায় — “তিনি এমন ছিলেন যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যেত’। যদি বলা হয়, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বে দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া, ইবাদতের অধ্যাবসায়, নিয়ম-শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং

[248]

চারিত্রিক উৎকর্ষের যেই ঝলক দেখা যায়, তা শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যের সুফল, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। শায়খ মুস্তফা (হাফেজ সুলতান) রহিমাহুল্লাহ এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্পর্ক ছিল পীর মুরিদ সম্পর্কের মতো।

গোত্রীয় এলাকার মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি পাকিস্তানি শহর থেকে আগত মুজাহিদীনকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টাও শায়খ সুলতান রহিমাহুল্লাহর কাছে অগ্রগণ্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর এই কাজে তার অনুচর অনুগামী ও পদাঙ্ক অনুসারী ছিলেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ। শায়খ সুলতান রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে শায়খ রহিমাহুল্লাহ অন্যান্য পাকিস্তানি দলের কাছাকাছি আসার, তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানার এবং তাদের দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শায়খ সুলতান রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে লিখিত নিজের রচনায় এভাবে বলেছেনঃ

“শায়খ (মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহ) জীবনের শেষ দুই তিন বছর এমনই এক সূক্ষ্ম এজেন্ডা কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, এমনই এক বিষয়কে কেন্দ্র করে তার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলতে থাকে যে, কোনোভাবে যেন খোরাসানের সকল জিহাদী কাফেলার মাঝে ঐক্য সাধিত হয়ে যায়। তিনি এই চিন্তায় একাগ্র ছিলেন যে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানই হলো ওই প্ল্যাটফর্ম যার অধীনে একত্রিত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও কাম্য এবং যুক্তির বিচারেও আবশ্যক। কিন্তু কয়েক ডজন আরব ও অনারব জাতীয়তা থেকে এবং বিশটির মতো দেশ থেকে আগত লোকদেরকে একটি সুশৃঙ্খল আকারে এনে ইমারতের পতাকা তলে একত্রিত [249]

করা এতটাই দুষ্কর কঠিন এবং পাহাড়ের মতো ভারী কাজ ছিল, যা বাস্তবায়নের প্রত্যয় নিয়ে উঠে দাঁড়ানো এবং এর জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করা শায়খ রহিমাহুল্লাহর মতো ধৈর্যশীল সহনশীল, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল।

38

শায়খ সুলতান রহিমাহুল্লাহ এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সাধনের বিষয়টা মন মস্তিষ্ক ও চিন্তার এতটা গভীর থেকে গ্রহণ করেছিলেন যে, তার একটি সূক্ষ্ম ইশারা পাওয়া যায় শায়খ সুলতান রহিমাহুল্লাহর দেখা একটি স্বপ্নে। ওই স্বপ্নটি তিনি ফারুক ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করেছেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, একদিন শায়খ সুলতান রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন:

« আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, তুমি আমার পাশে বসে মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্যের অভাব নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছো এবং কথা বলতে বলতে প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ছো। » এ কথা বলে শায়খ রহিমাহুল্লাহ মুচকি হাসতে আরম্ভ করলেন এবং দোয়া দিলেন যে, আল্লাহ তোমার এই অস্থিরতা সত্য করে দিন এবং তা কবুল করে নিন।

39

এক কথায় শায়খ মুস্তফা রহিমাহুল্লাহ ২০০৯ সালে প্রায় ১০ টার মতো পাকিস্তানি জামাতের দায়িত্বশীলদেরকে মেহসুদ এলাকায় দুইবার একত্রিত করিয়েছেন। দ্বিতীয় মজলিসে তানজীমের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বড় বড় উলামায়ে কেরাম, শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লিবি, শায়খ আবু ইয়াহইয়াহ লিবি রহিমাহুল্লাহ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ, কমান্ডার কারী

38 উস্তায আহমদ ফারুক রহমতুল্লাহি আলাইহির— “যাদেরকে দেখে আল্লাহর

কথা স্মরণ হয়”

39 ঐ
[250]

উবায়দুল্লাহ ইমরান রহিমাহুল্লাহ, কমান্ডার উস্তাদ ফয়েজ মোহাম্মদ রহিমাহুল্লাহ এবং আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ নিজে এমনকি কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরি রহিমাহুল্লাহর প্রতিনিধিগণ সহকারে পাকিস্তানি জামাতগুলোর অধিকাংশ দায়িত্বশীল হযরতগণ ওই মজলিসগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। ওই মজলিসগুলোতে সব জামাতের মাঝে আপসে সামরিক, রাজনৈতিক ও মিডিয়া শাখা বিষয়ক যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে সকলেই একমত হয় এবং এমন মজলিসের বরকতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি হয়। ওই ঘটনার পর একইভাবে আরও একটি মজলিস উত্তর ওয়াজিরিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

একদিকে যেমন এই মজলিসগুলোতে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বৃদ্ধির এবং একে অপরের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিলো, অন্যদিকে এই মজলিসগুলোতে মুজাহিদীনের মধ্যকার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক ঐক্য সাধনের জন্যেও চেষ্টা করা হচ্ছিলো। এ বিষয়টা জিহাদী অঙ্গনের শায়খদের জ্ঞান গোচরে শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল যে, তানজীম অথবা জামাত কোনো চিন্তা ও মানহাজের আলোকেই অস্তিত্বে আসে। এ কারণে মুজাহিদিনের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে ঐক্য সাধন করার দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রেও ঐক্য সাধনের পথ প্রস্তুত হয়ে যায়। অপরদিকে বাস্তব ক্ষেত্রে ঐক্য থাকার পাশাপাশি যদি চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিক্ষিপ্ততা ও অনৈক্য থেকে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে এমন অনেক সমস্যা দেখা দেবার আশঙ্কা থাকে, যেগুলোর দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে ঐক্য সাধনের আগের অবস্থার চেয়েও ভয়াবহ ও শোচনীয় অবস্থা তৈরি হয়ে যেতে পারে। এই আকাবির হযরতগণ আলজেরিয়ার জিহাদকে খুব গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন,

[251]

যেখানে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাগত ঐক্যের পরিবর্তে শুধু একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার ফলে এমনই ঘৃণ্য অপরাধ মুজাহিদীন নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যার দ্বারা নিষ্ঠাবান মুজাহিদীনের মাথা লজ্জায় নত হয়ে গিয়েছে। খোদ আফগানিস্তানেই রুশ জিহাদের ব্যস্ততা থেকে অবসর পাওয়ার পর মুজাহিদীন বিভিন্ন গ্রুপের রাজনৈতিক বিভক্তি এবং এরপর বহু রকম ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা আলজেরিয়ার ঘটনা থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না।

এক কথায় এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওই সকল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদেরকে চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, মানহাজ ও কর্মপন্থার দিক থেকে এক লাইনে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য প্রথমে কোনো গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেম-এ-দীনের দরস করানো হতো এবং তারপর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাগত বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা পর্যালোচনা করানো হতো। প্রথম মজলিসে মৌরিতানিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলেমে দীন শায়খ ইউনুস মৌরিতানি (ফাক্কাল্লাহু আরাহু) এবং পরবর্তী মজলিসগুলোতে উলামায়ে রব্বানী শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লিবি এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়াহ লিবি রহিমাহুল্লাহ বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও সামরিক কর্মকৌশলে পারদর্শী ডক্টর আবুল খালেদ সারবুলন্দ যুবায়ের রহিমাহুল্লাহও বাস্তব কর্মকৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতেন।

আপন সত্তা মিটিয়ে দেয়া:

[252]

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আশ্চর্য বিনয় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহও খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে ওই অনুষ্ঠান ও বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। ঐক্য ও একতার জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ও অগ্রসর তাকেই দেখা যেত। যেখানে তিনি ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়ে কথা বলতেন সেখানে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশিত হওয়া ও চোখে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতেন। এর বাস্তব উদাহরণ সে সময় দেখা যায়, যখন দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের আগে তিনি আরবী থেকে উর্দু তরজমা করে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকৃতি জানান। তার বক্তব্য ছিল: একে তো আমি কখনোই চাই না, মজলিসে আমার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠুক; দ্বিতীয়ত কারণ হলো অন্য সাথিরা আমার চেয়ে ভালো তরজমা ও অনুবাদের কাজ করতে পারেন। তিনি আমার দিকে ইশারা করেন আর এভাবেই শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহর নির্দেশ আমার কাছে এসে পৌঁছে, যেন আমি ওই মজলিসে তরজুমান তথা দোভাষী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য শামিল হয়ে যাই। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজের বিনয়ের কারণে এবং আমার প্রতি তার সুধারণার কারণে যখন আমার নাম প্রস্তাব করেন, তখন আমার মাথা ঘুরে যায়। আমি বুঝি বয়ান তর্জমা করবো, তাও আবার এত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে? আমার অবস্থান তো শুধু এই ছিল যে, আমি আরবী ভাষার প্রাইমারি পর্যায়ের একজন তালেবুল ইলম। এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তো আমি কখনোই তরজমা করতে পারবো না। তাই আমি নিজের ভেতর গুটিয়ে গেলাম এবং তাঁর কাছে গিয়ে তার এমন কার্যকলাপের ব্যাপারে প্রতিবাদ করলাম; কিন্তু তিনি মুচকি হাসতে থাকেন এবং শায়খ মুস্তাফা রহিমাহুল্লাহর নির্দেশের সম্মানে আমাকে ওই মজলিসে শামিল হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন।

[253]

উপায়ান্তর না দেখে আমাকে ওই মজলিসে যেতে হয়। মজলিসের শুরুতে যখন শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে অন্যান্য দিনের মতো আজকেও বয়ান তরজমা

40 করতে
বললেন, তখন তিনি পুনরায় আমার দিকে ইশারা করে শায়খ আতিয়াতুল্লাহকে বললেন: হযরত এই ভাই আমার চেয়ে ভালো তরজমা করতে জানেন। এক কথায় আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা তরজমা আরম্ভ করে দিলাম, যা সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে দুশ্চিন্তাদায়ক কাজ ছিল। একদিকে গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহগত বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা, অপরদিকে রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা। আরব হযরতগণের আলোচনা উর্দু ভাষায় তরজমা করতে হতো এবং পুনরায় পাকিস্তানি জিম্মাদার ও দায়িত্বশীলদের কথাগুলো আরবীতে ভাষান্তর করতে হতো। আমার তো দাঁত পর্যন্ত ঘামতে শুরু করে। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে ওই সময় আমার মনোবল বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং যখন কোনো ভুল হতে নিতো, তখন তিনি কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে অথবা আস্তে আস্তে কানে আমাকে ভুল শুধরে দিতেন। ওই মজলিসে জিহাদী অঙ্গনের চিন্তাবিদ ডক্টর সারবুলন্দ খান যুবায়ের রহিমাহুল্লাহও শামিল ছিলেন। ওই আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়, ইতিহাস, সভ্যতার উত্থান পতন ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপরে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষণ তিনি প্রদান করেন। ডক্টর সাহেবের আলোচনার তরজমা করা যখন আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে গেল, তখন আমি একটা বিরতিতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে হাতজোড় করে দয়া চাওয়ার ভঙ্গিতে নিজের পেরেশানির কথা ব্যক্ত করলাম এবং আবেদন করলাম, যেন তিনি তরজমা করেন। কিন্তু তিনি

40 আমার মনে হয় না, সমকালীন মুজাহিদীনের মধ্যে কারো মাঝে ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়েও চমৎকার আরবি থেকে উর্দু ভাষান্তর অতঃপর উর্দু থেকে আরবি ভাষান্তরের যোগ্যতা রয়েছে

[254]

আমার কথা না শুনে বলতে লাগলেন যে, আপনার কথা আরবের শায়খগণ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন। এ কারণে আপনি তরজমা চালিয়ে যান। এর বাইরে ছোটোখাটো ভুল-ভ্রান্তিগুলো কার না হয়?»

বিরতি শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার মজলিস আরম্ভ হলো। তখন শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লিবি রহিমাহুল্লাহ কয়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর একটি আলোচনা মজলিসের সামনে উপস্থাপন করলেন, যেখানে পাকিস্তানি মুজাহিদীনকে উদ্দেশ্য করে পাকিস্তানের জিহাদে অবলম্বনীয় কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বিভিন্ন নসীহত ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ উক্ত আলোচনা তরজমা করে শ্রোতাদেরকে শোনানোর জন্য আমাকে দায়িত্ব দিলেন। আমি যখন আলোচনাতে পুনরায় নজর দিলাম, তখন আমার রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়ে গেল। শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর সাহিত্যপূর্ণ গভীর আরবী সংবলিত আলোচনা তাৎক্ষণিকভাবে তরজমা করা আমার জন্য একেবারেই অসম্ভব ছিল। বেশ ভালো। আমি প্রথমদিকে একটা পয়েন্টের উল্টোপাল্টা তরজমা শুরু করতেই শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আমার সমস্যা বুঝে ফেললেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে নির্দেশের স্বরে বললেন: এই আলোচনা আপনি-ই তরজমা করুন। তখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কোনো উপায় না দেখে তরজমা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ২-৪ পয়েন্ট যেতে না যেতেই তিনি শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর কাছে আবেদন করে বললেন, ‘শায়খ! এটাতো একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দস্তাবেজ। তবে কি এটাই উত্তম হয় না, পরবর্তীতে এটা তরজমা করিয়ে এবং ছাপিয়ে জিম্মাদার সাথিদের প্রত্যেকের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে?” তখন শায়খ আতিয়াতুল্লাহ

[255]

রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত মনে করে মেনে নিলেন এবং পুনরায় তরজমা করার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ দ্বিতীয়বারের মতো তরজমা করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

বাহ্যিকভাবে এটা একটা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক লুকিয়ে রয়েছে। তিনি চাইলে মজলিসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী হিসেবে সকলের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মেজাজ এমন ছিল না। এই ধরনের আলোচনা পর্যালোচনার অনুষ্ঠানগুলোতে যেহেতু তরজমাকারী ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি কথা বলতে হয় এবং অনিবার্যভাবেই সে ব্যক্তি সকলের দৃষ্টিতে পড়ে যায়, এই কারণে তিনি ইচ্ছাকৃতই এই দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে নেন; সেই সঙ্গে আমার মনোবল বৃদ্ধি করে এবং আমার মাঝে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে তিনি যে কাজটা করেছেন, সেটাও আমার জন্য খুবই মূল্যবান ছিল। তরজমা করার সময় বারবার যখন আমার ভুল হচ্ছিলো, তখন তিনি ফিসফিস করে বলতেন, কোনো সমস্যা নেই মূল মর্ম স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এটা একজন নেতার গুণ যে, তিনি সাথিদেরকে সান্ত্বনা দেবেন, তাদের মনোবল বৃদ্ধি করবেন এবং ছোটোখাটো ভুল ভ্রান্তি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখবেন।

এখানে একটা বিষয় আমি পুনরায় উল্লেখ করতে চাই। সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও আন্তরিক ভালোবাসা সত্ত্বেও ওই সময়টাতে আমার এবং তাঁর মাঝে অনেক বিস্তৃত সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাগত দূরত্ব বিদ্যমান ছিল।

এমনিভাবে একবার এক গ্রুপের দায়িত্বশীলের সঙ্গে তিনি সকল গ্রুপের মাঝে ঐক্য সাধনের

[256]

প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন ওই ব্যক্তির মনে হল, সম্ভবত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তাকে নিজের গ্রুপে সংযুক্ত হবার দাওয়াত দিচ্ছেন। তখন ওই ব্যক্তি কেমন যেন বিগড়ে যায় এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে তার কু ধারণা এসে পড়ে। তিনি যখন এ বিষয়ে অবগত হলেন, তখন খুবই পেরেশান হয়ে গেলেন। আমি তাকে এতটা চিন্তাক্লিষ্ট হতে এর আগে কখনও দেখিনি। পরবর্তীতে তিনি ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে চিঠি প্রেরণ করেছেন সেখানে তার নিজের অক্ষমতা, ব্যর্থতা, তুচ্ছতা তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং চিঠিতে যেন নিজেকে একেবারেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে ওই চিঠির মূল আলোচনা এখানে উল্লেখ করা ফায়দা মুক্ত হবে না বলে আশা করছি। তিনি তাতে লিখেছিলেন:

« সর্বপ্রথম আমি ক্ষমা চাচ্ছি এই কারণে যে, ওই দিন আমার আলোচনার কারণে আপনি কষ্ট পেয়েছেন। আল্লাহর কসম! কখনোই আমার উদ্দেশ্য এমনটা ছিল না। যাই হোক আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং দোয়া চাইছি। দ্বিতীয় বিষয়টি আমি ওজর হিসেবে আপনার কাছে উপস্থাপন করতে চাইবো। নিঃসন্দেহে আমি তো আত্মার রোগ ব্যাধি থেকে কখনোই পবিত্র নই এবং পবিত্র হওয়ার দাবিও করতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়টা সর্বাবস্থায় আমার চিন্তা ও কল্পনার বাইরে যে, আপনার অথবা আপনার সাথিদের মধ্যে থেকে কারোর চেয়ে আমি নিজেকে বেশি যোগ্য মনে করবো অথবা এমনটা চাইবো যে, আপনাদের মাঝে আমার এমন অবস্থান তৈরি হয়ে যাক, যা আপনারা সকলেই মেনে নেবেন। সম্ভবত আমার শব্দচয়নে কোনো ভুল হয়েছে, কিন্তু আলোচনার উদ্দেশ্য কখনোই এমনটা নয়। এটাই আমার তুচ্ছ ওজর যা আমি আপনার কাছে পেশ করছি। আর হৃদয়ের অবস্থার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে সবকিছু অর্পণ করছি। পরিশেষে আমি দ্বিতীয়বার এবং

[257]

তৃতীয়বার আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে আপনার হেফাযতের জন্য এবং ঈমান সহকারে মৃত্যু নসীব হওয়ার জন্য দোয়া করছি।”

আপন সত্তাকে পেছনে রাখা এবং অন্যদেরকে অগ্রসর করে দেয়া ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মন মস্তিষ্কের সাথে যেন মিশে গিয়েছিল। তার জীবনে এ বিষয়ের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে; কিন্তু আমাদের এই আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি আমাদের মূল বিষয়ে আবার ফিরে যাচ্ছি। আমাদের মূল আলোচনা ছিল: ইত্তেহাদ বাইনাল মুজাহিদীন তথা মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সাধন সম্পর্কিত।

এখানে আরও একটি বিষয় মনে রাখা উচিত। যেখানে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ একদিকে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পরিচিত হওয়া এবং প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির জায়গাগুলোতে নিজেকে প্রকাশিত করা থেকে খুব সতর্কভাবে বেঁচে থাকতেন; অপরদিকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত অগ্রসর করা এবং নিজের নানান যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযথ কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি কোনো ধরনের তাকাল্লুফ তথা লৌকিকতার আশ্রয় নিতেন না। বরং আমর বিল মারূফ নামক ফরয বিধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতেন এবং নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও সচেতন থাকবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের কথাবার্তা কানে না নিয়ে তিনি অগ্রসর হতে থাকতেন।

শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত এবং মেহসুদ অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণ

[258]

মেহসুদ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ওই মজলিসগুলোতে পরবর্তীতে অনুষ্ঠেও বিভিন্ন মজলিসের পরিকল্পনা করা হয় এবং কারা কারা সেগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও সকলেই একমত হয়। কিন্তু ওই মজলিসগুলোর কিছুকাল পরেই ২০০৯ সালের জুন মাসে পাকিস্তানি বাহিনী মেহসুদ এলাকা ঘেরাও করে নেয় এবং এই অঞ্চলের গোত্রগুলোর উপর আক্রমণ করে বসে। শুরুতে চার মাস পর্যন্ত পাকবাহিনী শুধু স্থল অবরোধ এবং আকাশ পথে বোম্বিং করে যাচ্ছিলো। মেহসুদ এলাকার বাজারগুলোকে বোম্বিং করে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়। এলাকার এমন কোনো বড় মসজিদ অথবা মাদরাসা সম্ভবত ছিল না, যা ক্রুসেডারদের তাবেদার পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর বোমা হামলার কারণে ধ্বংস হয়নি। যার ফলে মুজাহিদীন বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে এবং ফ্রন্টগুলোতে উপস্থিত বিশেষ সাথিরা ছাড়া মুজাহিদীনের অবশিষ্ট অংশের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উত্তর ওয়াজিরস্তানে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। গোত্রীয় এলাকায় পাকিস্তানি আর্মির পরিচালিত প্রতিটি অপারেশনে আমেরিকার অংশগ্রহণ শুধু সাহায্যের পর্যায়ে হতো না, বরং ওই অপারেশনগুলোতে পাক মার্কিন সেনাবাহিনী যৌথভাবে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে হামলায় অংশগ্রহণ করতো। সেনাবাহিনীর স্থল আক্রমণ এবং জেট বিমানের তীব্র নিষ্ঠুর বোম্বিংয়ের মাধ্যমে মুজাহিদীনকে নিরাপদ আশ্রয়গুলো থেকে বের হতে বাধ্য করা হতো এবং এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানি গুপ্তচরদের সাহায্যে মার্কিন কাফের গোষ্ঠী ড্রোন বিমানের মাধ্যমে মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দকে টার্গেট বানিয়ে হামলা পরিচালনা করতো।

মেহসুদ অপারেশনের কিছুকাল পরেই উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ড্রোন হামলা অধিক মাত্রায় হতে আরম্ভ করে। একুশে মে ২০১০ সালে শায়খুল জিহাদ শায়খ

[259]

মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহ তাঁর পরিবারের সাথে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বোয়ার কাছে একটি ড্রোন হামলায় জীবন দানকারীর তরে আপন জীবন অর্পণ করে দেন। তারপরে আলেমে রব্বানী শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ জিহাদের পতাকা সামলে নেন এবং তার পর ফকিহুল জিহাদ শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ওই সময়ে ড্রোন হামলা এত বেশি পরিমাণে হতে আরম্ভ করে যে, তানজীম আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের পক্ষে খোলাখুলি মজলিস অনুষ্ঠানের সুযোগ একেবারেই কমে আসতে থাকে। এই সময়ে ক্রমাগত কয়েকজন দায়িত্বশীল ড্রোন হামলায় শাহাদাৎ বরণ করেন। আরব নেতৃবৃন্দের শাহাদাতের আলোচনা হল। অবশ্য পাকিস্তানি দায়িত্বশীলদের মাঝে বীরত্ব ও সাহসিকতার পাহাড়পুরুষ জনাব কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরি রহিমাহুল্লাহ,

41কমান্ডার বদর মনসুর

41 সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রবাদ পুরুষ কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আজাদ কাশ্মীরের মিরপুর এলাকার সন্তান। রুশ বিরোধী জিহাদের সময়টাতে আফগানিস্তানের ময়দানগুলোতে তিনি বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এই সময় তার এক চোখ আল্লাহর পথে সাফল্য অর্জন করে। ৯০-এর দশকে তিনি রীতিমতো কাশ্মীর জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। জিহাদ সংগঠিত করার জন্য তিনি কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করেন। ওখানে একটা অপারেশনের পরিকল্পনাকালে পুঞ্চ জেলা থেকে গ্রেপ্তার হন। দুই বছর তিনি হিন্দু সেনাবাহিনীর কারাগারে কাটান। দুই বছর পর আল্লাহ তার জন্য কারাগার থেকে পালাবার সুযোগ করে দেন এবং তিনি জেল ভেঙে মুজাহিদীনের সঙ্গে মিলিত হন। জিহাদী কার্যক্রমের জন্য তিনি হরকতুল জিহাদ আল ইসলামী ৩১৩ ব্রিগেড নামে একটি সংগঠন খোলেন। মুজাহিদীনের একজন দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি। আরব অনারব শত শত মুজাহিদকে তিনি অস্ত্র চালনা এবং বিশেষ অপারেশনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পাশাপাশি সামরিক প্ল্যানিং ও জিহাদী বুঝ আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছিলেন। কাশ্মীরে হিন্দু মুশরিক সেনাবাহিনী এবং আফগানিস্তানে ক্রুসেডার জায়নিস্ট সেনাবাহিনীর উভয় ময়দানে তিনি এবং তার সহযোদ্ধাগণ মুসলিম উম্মাহর প্রতিরক্ষার জন্য ত্যাগ তিতিক্ষার অপূরণীয় ঋণ প্রদান করেছিলেন। ২০০৩ সালে উম্মাহর বিশ্বাসঘাতক পারভেজ মোশারফের সরকার তাকে গ্রেফতার করে এবং আই এস আই'র গোপন টর্চার সেলে পাঠিয়ে দেয়। কয়েদ থেকে রেহাই পাবার পর পুনরায় জিহাদী কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। লাল মসজিদ ট্রাজেডির পর তিনি ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন। সেখানে আলকায়দার সাথে রীতিমতো তিনি সংযুক্ত হয়ে যান এবং শাইখুল জিহাদ শাইখ মুস্তফা আবু ইয়াযিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যস্থতায় মুহসিনে উম্মাহ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহির হাতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বাইয়াত করেন। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো এবং ভারতবর্ষে ইহুদি গোষ্ঠী, তাদের মিত্রশক্তি, নবীগণের সঙ্গে বেয়াদবি কারী, মুসলিমদের জীবন দুর্বিষহকারী এবং অন্যান্য বড় অপরাধীদের উপর হামলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তার সহযোগিতা ও পরিকল্পনামতে উম্মাহর কিছু সিংহ পুরুষ ভারতের প্রাণকেন্দ্র মুম্বাইয়ে প্রবেশ করে শিরক ও কুফরের অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দেন। এছাড়াও ২০১০ সালে ভারতের দক্ষিণ শহর পুনায় ইহুদিদের কমিউনিটি সেন্টার চাবাদ হাউসের কাছে পরিচালিত হামলাও তারই পরিকল্পনা মাফিক ছিল। ডেনমার্কে কুখ্যাত ধৃষ্টতাকারী লেখককে হত্যার পরিকল্পনায়ও তিনি কাজ করেছেন। বৈশ্বিক কুফরি শক্তির মস্তক চূর্ণকারী এই বরকতময় অপারেশনের ধারাবাহিকতায়

[260]

রহিমাহুল্লাহ এবং তারপর তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কমান্ডার ফরমান শীনওয়ারী[42] রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের ঘটনাগুলো ওই সময়টাতে সংঘটিত হয়। এই অবস্থায় সাধারণভাবে চিঠিপত্রের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তি পর্যায়ে আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাতের মাধ্যমেই পাকিস্তানি মুজাহিদীনের পারস্পরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে যেই কর্মসূচি নির্ধারণ

তিনি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ২০০৪ সালের সূচনাকালে 'অন্যায় ও বর্বর অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্রুশ -তোষণকারী (ক্রুসেডারদের গোলাম) কমান্ডিং অফিসার ' জেনারেল ফয়সাল আলাবিকে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার ওপর ভরসা করে কুফরি বিশ্বের হেড বারাক ওবামাকে হামলার দায়িত্ব কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরীকে প্রদান করেন। ভারত থেকে ইসরাইল পর্যন্ত কুফরি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করে আঘাত হানা এবং এর কৌশল নির্ধারণে কমান্ডার সাহেবের অবদান সত্যিই অসাধারণ। শত্রুপক্ষ তার ওপর বেশ কয়েকবার কাপুরুষোচিত হামলা করে কিন্তু আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন। আলকায়দার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব তিনি পালনকালে ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় এবং ফারুক ভাই কমান্ডার সাহেবের কাছ থেকে অনেক উপকৃত হন। তবে কমান্ডার সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির জীবনের শেষ দিনগুলোতে ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে এই নৈকট্য অনেক বেড়ে যায়। ভানায় উভয় হযরতের দীর্ঘ বৈঠক ও আলাপচারিত হয়। খুব গভীরভাবে একে অপরকে বোঝার সুযোগ হয়। এরই মধ্যে কমান্ডার সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার জীবনের বেশ কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা ফারুক ভাই রহমতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে শেয়ার করেন। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার ব্যক্তিত্ব , মেধা , বুদ্ধি দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। কমান্ডার সাহেবের জীবনের শেষ দিনগুলোতে একসাথে সময় যাপন এবং তার কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করায় ফারুক ভাই গর্ব করতেন। অবশেষে ৩রা জুন ২০১১ সালে নিকৃষ্ট আমেরিকানরা ভানা ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সহায়তায় কমান্ডার সাহেবের কেন্দ্রে হামলা করে। এতে সাহসিকতা ও বীরত্বের জীবন্ত প্রতীক ৮ সহযোদ্ধা সহকারে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ আসন তাদেরকে দান করুন আমিন !!

[42] কমান্ডার ফরমান শিনওয়ারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি খাইবার এজেন্সির প্রাণকেন্দ্র লেন্ডি কোটালের সন্তান। তিনি খুবই বিচক্ষণ , বাস্তববাদী , প্রতিভাধর ও উন্নত -আখলাকের অধিকারী মুজাহিদ কমান্ডার ছিলেন। কাশ্মীর জিহাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নেন। সৌভাগ্যক্রমে তার মাতৃভূমি পাক আফগান বর্ডারের একেবারে বরাবর ছিল এবং প্রসিদ্ধ সীমান্তবর্তী তোরখাম শহর থেকে তার ঘর থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে ছিল। তাই বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলা করে , তখন একেবারে শুরু থেকেই তিনি এবং তার পরিবারের লোকেরা আফগানিস্তান জিহাদের সাহায্য সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করেন। লেন্ডি কোটাল ছিল ন্যাটো আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সাপ্লাই লাইন। তার গোত্র শিনওয়ারের অনেক সদস্য নিজেদের ঈমান বিক্রি করে জায়নবাদী ক্রুসেডারদেরকে তেলসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কমান্ডার ফরমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তার সহযোদ্ধাগণ নিজ গোত্রের লোকদেরকে এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে তিনি ন্যাটো সাপ্লাই লাইনে কয়েকটা হামলা করেন। এতে ক্রুসেডারদের বড় ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। লাল মসজিদ ট্রাজেডির পর ঈমানী দায়িত্বে লাব্বাইক বলে গোত্রের অন্যান্য আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলিমদের সঙ্গে তিনি এবং তার পরিবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ করেন। তাই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সুন্নত অনুযায়ী আমল করে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন। শুরুতে খাইবার এজেন্সির পরিত্যক্ত তিরাহ উপত্যকায় হিজরত করেন এবং পরবর্তীতে পরিবারসহ উত্তর ওয়াজিরিস্তানের প্রাণকেন্দ্র মিরান শাহ এলাকায় গমন করেন। আলকায়দার প্রতিষ্ঠিত আব্দুল্লাহ আযযাম ব্রিগেডের প্রধান ছিলেন কমান্ডার বদর মনসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনিও এই ব্রিগেডের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীতে কমান্ডার বদর মনসুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে স্থলাভিষিক্ত করেন।

করতে হবে, সেগুলো নিয়ে মাশোয়ারা হতে থাকে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয় না। ওই সময় অবশ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেই পারস্পরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে যে কর্মসূচিগুলো পালন হওয়ার কথা, সেগুলো এগিয়ে নেয়ার কাজ করেন, যার মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মার্কিন সেনাবাহিনীর তাবেদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক কাজে অন্যান্য গ্রুপের সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতা করা।

আলেমে রব্বানী পূর্বসূরিদের স্মৃতিচিহ্ন সাহেবুল কলামি ওয়াস সাইফ (অসি ও মসি উভয়টি সমানতালে ব্যবহারে পারদর্শী) হযরত মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর আগমন

২০১১ সালে প্রসিদ্ধ আলেমে দীন হযরত মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ হিজরত করে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের প্রাণকেন্দ্র মিরান শাহ এলাকায় তাশরীফ আনেন। মিরান শাহ এলাকায় দাওয়াত

গোটা পাকিস্তানের — বিশেষ করে গোত্রীয় অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থের জন্য লড়াইকারী সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য সিকিউরিটি এজেন্সির ওপর পরিচালিত কয়েকটি হামলার পরিকল্পনায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। গোত্রীয় অঞ্চলের দেয়ালে আগুন ও লোহা বর্ষণকারী বর্বর পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর কামরাহ অ্যায়ার বেসে পরিচালিত ঐতিহাসিক আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনায়ও তিনি শরিক ছিলেন। তিনি কমান্ডার বদর মনসুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির ২০১২ সালে শাহাদাত লাভ করার পর আব্দুল্লাহ আযযাম ব্রিগেডের দায়িত্ব লাভ করেন। পূর্ণ সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে জিহাদী কাজগুলো সুবিন্যস্ত করেন। কয়েকটি সামরিক মিশন সফলভাবে পরিচালনা করেন। আলকায়দার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার আলাদাভাবে যোগাযোগ ছিল এবং তাদেরকে তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। ইত্তেহাদ বাইনাল মুজাহিদীন বা ঐক্য গঠনের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টাশীল ছিলেন। উন্নত আখলাক এবং মুজাহিদীনের প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন। যখন তাকে গ্রুপের নেতৃত্ব ভার দেয়া হয় এবং আলকায়দার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কিছু পরামর্শ সভায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ হয়, তখন তার মেধা বুদ্ধি, উন্নত আখলাক এবং আনুগত্যের গুণ আলকায়দার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে সীমাহীন প্রভাবিত করে। ওই সময় ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে কমান্ডার সাহেবের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় এবং ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও তার বুদ্ধিমত্তা ও পরিপক্ক চিন্তা দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলেন। অবশেষে ২০১৩ সালের শুরুর দিকে আমেরিকানরা তার ঘরের উপর কাপুরুষের মতো ড্রোন হামলা চালালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমীন!!

[262]

পেয়ে তার আগমনের ব্যবস্থাপনা পরিচালনার সৌভাগ্যও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ লাভ করেন।

হযরত মাওলানা আসিম উমর সাহেব রহিমাহুল্লাহ উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত ইলমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার কিছু গ্রন্থ পাক ভারত উপমহাদেশের ধর্মীয় অঙ্গনে বেশ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল। তন্মধ্যে রয়েছে 'দুই জীবন ব্যবস্থার লড়াই', 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল' এবং 'ইমাম মাহদীর দোস্ত দুশমন'। এই গ্রন্থগুলো বহু সংখ্যক মুসলিমকে কিয়ামতের নিকটবর্তিতার ফিতনাগুলো সম্পর্কে পরিচয় করিয়েছে এবং দাজ্জালি নানা রকম ফিতনা থেকে বাঁচার ও প্রতিরোধ করার পথ দেখিয়েছে। অপরদিকে হযরত মাওলানা রহিমাহুল্লাহ ইমারতে ইসলামিয়া থেকে দূরে থেকেও মুজাহিদীনের মাঝে একজন অগ্নিঝরা বক্তা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার অধিকারী মুজাহিদ হিসেবে বেশ পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে তিনি আল-কায়েদা উপমহাদেশের আমীর নিযুক্ত হন এবং ২০১৯ সালে সৌভাগ্যপূর্ণ শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত সুচারুরূপে এ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শহীদ আমীর মুহতারাম মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ মুসলিম উম্মাহর একজন মহান নেতা, সাহসী মুজাহিদ, রাত্রি জাগরণকারী আবেদ, গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং দাওয়াত ও আযিমতের ইমাম ছিলেন। তার জীবনী সংরক্ষণ করা এবং মুসলিম উম্মাহ পর্যন্ত এই শহীদ নেতার রেখে যাওয়া অবদানগুলো পৌঁছে দেয়া মুজাহিদীনের দায়িত্ব। যে সময় পর্যন্ত আমাদের এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ তৈরি হয়েছে, তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। এই কারণে লেখকের পক্ষে তার জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। এখন যখন তিনি কুফরী ও ইসলামের এক বড় রণাঙ্গনে জীবন দানকারীর কাছে নিজের জীবন সোপর্দ করে দিয়েছেন এবং তার জীবনের

[263]

সৌরভময় স্মৃতিগুলো আমাদের অন্তরে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে, তাই আন্তরিক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, খুব বিস্তারিতভাবে তার জীবনী, গুণাবলি, কর্ম, অবদান, বৈশিষ্ট্য, পয়গাম এবং তার ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা গ্রন্থাকারে যেন আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে হযরতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়াদির আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু যেহেতু শহীদ মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সর্বশেষ সরাসরি আমিীর ছিলেন এবং মাওলানা রহিমাহুল্লাহর হাতে বায়আত ও আনুগত্যে থাকা অবস্থায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জীবন স্রষ্টার কাছে নিজের জীবন অর্পণ করে দিয়েছেন; সেই সঙ্গে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজেও যেহেতু এমন ব্যক্তি, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজের ১৭ বছরের দাওয়াত ও জিহাদের সকল সঙ্গী-সাথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যার হাতে অর্পণ করে গিয়েছেন... অন্যভাবে বললে: মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ যেহেতু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এই কারণে এমন প্রয়োজন অনুভূত হয় যে, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অন্য গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গি সাথিদের পাশাপাশি মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা যেন এই কিতাবে স্থান পায়। এ বিষয়টা আমাদের এই গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী বিষয় হবে এবং এই গ্রন্থের উপকারিতা আরও বাড়িয়ে দেয়ার কারণ হবে বলে আমরা আশাবাদী ইনশাআল্লাহ।

[264]

মাওলানা সাহেবের শৈশব

43

হযরত মাওলানা আসিম উমর সাহেব রহিমাহুল্লাহর আসল নাম শানুল হক সামভেলি ছিল। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের সাম্ভাল জেলা থেকে এসেছেন। এই জেলাটি মুসলিম ভারতের ঐতিহাসিক রাজ রোহিলাখণ্ডের মুরাদাবাদ শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ থানা ছিল। আজ পর্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ ইসলামিক ভাবধারা ও গৌরবের কারণে এই অঞ্চলকে মুসলমানদের ভূখণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৫ সালে তিনি সামভালের তুর্কি বংশধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষরা কয়েক শতাব্দী আগে সুলতান মুয়িজ্জুদ-দীন শিহাব উদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরী রহিমাহুল্লাহর ঘুর অঞ্চল থেকে হিজরত করে সাম্ভাল এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। দীনদার পরিবেশে লালিত পালিত হবার কারণে একদিকে যেমন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর মাঝে ধর্মীয় আচার-আচরণে পরিপক্কতার ছাপ শৈশব থেকেই দেখা যাচ্ছিলো, অপরদিকে তুর্কি ও আফগানি পূর্ব পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতে ইসলামের পতাকা উচ্চকিত করা এবং ভারতের মুসলমানদেরকে হিন্দুদের দাসত্ব থেকে বের করা মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর শৈশব কাল থেকেই আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ছিল। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, তার মনে আছে যখন তিনি ০৬ বছর বয়সী ছিলেন, তখন দিল্লির লালকেল্লায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। তিনি

43 এখান থেকে মাওলানা সাহেবের পরিচিতি এবং তার ব্যাপারে প্রদত্ত অনেকগুলো উদ্ধৃতি মাওলানা সাহেবের একটি লিখিত ইন্টারভিউ থেকে সংগৃহীত, যা ২০১৫ সালে নেয়া হয়েছে। ওই ইন্টারভিউর জন্য শহীদ উসামা ইব্রাহিম গৌরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রশ্নাবলী নির্ধারণ করেন এবং তারই ধারাবাহিক ও তীব্র পীড়াপীড়িতে মাওলানা সাহেব জবাব লিখতে আরম্ভ করেন। মাওলানা সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির শাহাদাতের আগ পর্যন্ত জবাব লেখার ধারাবাহিকতা পূর্ণতা পায়নি। ওই ইন্টারভিউতে একদিকে মাওলানা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের ব্যক্তিত্ব এবং প্রথমদিকের অনুভব অনুভূতি সম্পর্কে মূল্যবান কথা বলেছেন; অপরদিকে ভারতের সমাজ, সেখানকার মুসলিমদের দুর্দশা ও সমস্যাগুলোর সমাধান সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ কারণেই এই মূল্যবান ইন্টারভিউ থেকে কিছু বিস্তারিত উদ্ধৃতি এই কিতাবে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শহীদ নেতার জীবনী উত্তম পন্থায় উম্মাহর সামনে তুলে ধরার তৌফিক দান করুন! আমীন!!

[265]

বলেনঃ মুসলমানদের শান-শওকত এবং ইসলামী হুকুমতের স্মৃতিচারণ করে ওই সময়ও আমি অস্থির হয়ে উঠছিলাম এবং আমার অন্তর ব্যথিত হচ্ছিলো এই কারণে যে, এখানে মুসলিমদের জায়গায় কেন হিন্দু পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে? মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, লালকেল্লার দেওয়ালগুলোতে যেখানেই ইংরেজরা চুরি করার আগে কোথাও মূল্যবান পাথর অথবা জওহর জড়ানো ছিল, সেটার খালি জায়গায় হাত রেখেও আমি দুঃখ অনুভব করার কথা আমার মনে আছে। লাল কেল্লার ভিতরে একটি ছোট্ট দৃষ্টিনন্দন মসজিদ আছে, যা তদানীন্তন স্থাপত্য শিল্পে মুসলিম সৃজনশীলতার অনুপম প্রকাশ। যখন সেটাতে প্রবেশ করতে যাই, তখন সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত লোকটা পয়সা চায়। তখন এই ছোট্ট বয়সেই মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ প্রতিবাদ করে বলে ফেলেন: এ মসজিদ আমাদের; আমরা পয়সা দেব না। শৈশবকালের স্মৃতিগুলোর মাঝে তার ওই সময়টার কথাও স্মরণ ছিল, যখন ১৯৮৫ সালে তিনি দশ বছর বয়সি এক কিশোর ছিলেন। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বাবরি মসজিদে তালা খোলার অনুমতি দিয়ে মসজিদকে মন্দির বানাবার পথ প্রস্তুত করে দেয়। ফলে মুসলিমরা সারা দেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করে। তখন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ ঘরে নিজের মাকে বলেন: “আমিও জামে মসজিদে নামায পড়ার জন্য যাবো এবং হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে যাবো” তাই হিন্দুদের দাসত্ব থেকে মুসলিমদেরকে বের করা এবং মুসলিমদেরকে তাদের হারানো গৌরব ও সম্মান ফিরিয়ে দেয়ার অস্থিরতা শৈশব কাল থেকেই তার বুকে লালিত হচ্ছিলো। ইবনে কাসেম, ঘুরি, গজনবি, আওরঙ্গজেব ও টিপু সুলতান রহিমাহুল্লাহর ঘটনাগুলো তার মাঝে জিহাদী আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতো এবং শৈশব থেকেই মুসলিমদের উন্নতি অগ্রগতির লক্ষ্যে তিনি কিছু করতে চাইতেন।

[266]

ইলমী সফর
তখনও তিনি মেট্রিকে ছিলেন। এই অবস্থায় হঠাৎ কিতাবুল্লাহ'র ভালোবাসা তার অন্তরে স্থান করে নিলো। তিনি সবকিছু ছেড়ে কুরআন হিফজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অভিভাবকদের খুবই পীড়াপীড়ির কারণে একই সঙ্গে প্রাইভেটভাবে আধুনিক শিক্ষাও তিনি চালু রাখেন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলেন যে, ইন্টারে ইংরেজি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়েছি। কারণ এই আবেগ কাজ করেছিল, আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য ইংরেজি ভাষা আমার কাজে আসবে।

কুরআন হিফজ করার সৌভাগ্য লাভ করার পর সাম্ভাল এলাকার একটি স্থানীয় মাদরাসায় দরসে নেজামী ভর্তি হন। প্রথম দরসে নিজামীর প্রথম বছরের কিতাবগুলো তিনি পড়ে শেষ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় বছর থেকে নিয়ে দরসে নিজামীর শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলামী বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে সমাপন করেন। শিক্ষাজীবনে পড়াশোনার প্রতি তার সবচেয়ে বেশি মনোযোগ ছিল এবং খুবই চেষ্টা পরিশ্রম ও একাগ্রতা সহকারে ইলমে দীনের পথ পাড়ি দিতে থাকেন। দারুল উলুম দেওবন্দের বড় বড় উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে তিনি ইস্তিফাদা (উপকৃত হওয়া) করেন। উস্তাদদের সঙ্গে তার খুবই প্রেম-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি উলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে যাদের শিষ্যত্বের মর্যাদা লাভ করেন তাদের মাঝে রয়েছেন নিম্নোক্ত হযরতগণ:

হযরত মাওলানা হামিদ মিয়া সাহেব রহিমাহুল্লাহ, যিনি শায়খুল আদব মাওলানা ইজাজ সাহেব রহিমাহুল্লাহর সাহেবজাদা ছিলেন, মাওলানা মুজাম্মিল সাহেব আসামী, মাওলানা শাহিদ সাহেব [267]

দেওবন্দী রহিমাহুল্লাহ, মাওলানা বেলাল সাহেব দেওবন্দী রহিমাহুল্লাহ, মাওলানা জামশেদ সাহেব, মাওলানা শামীম সাহেব রহিমাহুল্লাহ, মাওলানা নাসিম সাহেব বারাহবানকী, মাওলানা সালমান সাহেব, মাওলানা খোরশেদ সাহেব, মুফতী রাশেদ সাহেব আজমী, মাওলানা শওকত সাহেব বাসতাবী, মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব সামভালী, কারী উসমান সাহেব, মাওলানা আব্দুল খালেক মাদ্রাজী সাহেব, মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব, মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ সাহেব আজমী, মুফতী সাঈদ সাহেব পালনপুরী, শায়খ নেয়ামতুল্লাহ সাহেব আজমী, শায়খ আব্দুল হক সাহেব আজমী এবং শায়খ নাসির খান সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই হযরতগণের মধ্যে যারা জীবিত রয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন এবং যারা আখিরাতের যাত্রা আরম্ভ করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহম করুন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন, আমীন।

যখন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি আপনার উস্তাদেরকে কোনো পয়গাম দিতে চান? তখন তিনি বলেন:

« একজন শিষ্য তার উস্তাদদের সঙ্গে কি আর কথা বলবে? আমাদের উস্তাদগণও এমন ছিলেন, যারা নিজেদের বাচ্চার মতোই আমাদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দান করেছেন, নেহায়েত মেহনত, কষ্ট-পরিশ্রম ও ভালোবাসা সহকারে আমাদেরকে পড়িয়েছেন, উস্তাদদেরকে তো আমরা সেই সবক শোনাতে চাই, যা তারা আমাদেরকে পড়িয়েছেন। কাফিয়া এবং শরহে জামী'র কঠিন সূক্ষ্ম প্যাঁচালো বাক্যাংশগুলো সমাধান করতে গিয়ে যেই চেষ্টা কসরত হয়েছে, শরহে তাহজিব সুল্লাম মাইবুজি কিতাবে প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আমাদের উস্তাদগণ আমাদেরকে এটাই শিখিয়েছেন যে, মুসলিমদের জীবন হলো ধারাবাহিক [268]

চেষ্টা পরিশ্রম, নেহায়েত মেহনত, প্রাণান্তকর প্রয়াস এবং উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক সকল কিছু ঈমানী প্রত্যয়ের দ্বারা দূরে সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নাম। আরবী সাহিত্যে উস্তাদগণ একথাই শিখিয়েছেন: বীরত্ব, দানশীলতা, যুদ্ধের গর্জন, তীর তলোয়ারের আঘাত পুরুষদের জন্য অলঙ্কার স্বরূপ। ফিকহের মাঝে সূক্ষ্ম মাসায়েলগুলোর উদাহরণ এমনভাবে খুলে তারা বর্ণনা করতেন, যা ছিল তাদের এক বিশেষ যোগ্যতা। তাই বাতিল শক্তি যতই শক্তভাবে বাতিল বিষয় প্রমাণিত করতে চেষ্টা করুক এবং সত্যকে অস্পষ্ট করে দিতে অপপ্রয়াস চালাক না কেন, উস্তাদদের মাসায়েল বর্ণনার ধরন প্রতিটি বিষয়কে আলাদা আলাদা ভাবে বের করে এমনভাবে স্পষ্ট করে দিতো এবং বাতিলের সঙ্গে হকের পার্থক্য এতটাই পরিষ্কার হয়ে যেতো, যেভাবে দুধ এবং পানির পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি। তাই ফিকহের অঙ্গনে আমরা যা কিছু শিখেছি সেগুলোর সারকথা হল: ইসলাম দাসত্ব, পরাজয় এবং দমে যাওয়া কখনোই পছন্দ করে না। ইসলামের স্বভাব হল অন্যের উপর বিজয়ী হওয়া, শাসন করা এবং সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই অবস্থা যতক্ষণ তৈরি করা না হবে, ততক্ষণ ইসলামের আসল সৌন্দর্য প্রকাশিত হতে পারবে না। সেই সঙ্গে গোটা ফিকহ এক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; আর তা হল: দার বা ভূমি সংক্রান্ত আলোচনা। আমরা যেই জায়গায় অবস্থান করছি, তা দারুল হারব নাকি দারুল ইসলাম- সেটাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উপরেই সকল বিধি-বিধানের ভিত্তি। আহাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদ ও কিতালের আলোচনায় ভরপুর; কারণ আল্লাহর কিতাবের দাবি ও উদ্দেশ্য হচ্ছে: তাওহীদ বা একত্ববাদ অর্থাৎ শুধু এক আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং আইন প্রণয়নকারী হিসেবেও শুধু তাকেই মেনে নিতে হবে ألا له الخلق و

الأمر –"সৃষ্টি করার অধিকারও একমাত্র তার , বিধান দেয়ার অধিকারও একমাত্র তার। " এই অধিকারে তার সঙ্গে কারও অংশীদারিত্ব নেই। এ সমস্ত সবক উস্তাদদের কাছ থেকেই আমরা শিখেছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাদেরকে নিজের নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (আমাদের উস্তাদগণ আয়াত ও হাদীসকে এমন বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করতেন , ঠিক যেমনটা আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ভারতের মতো দেশে বসে এই সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদেরকে শোনাতেন , যেখানে এমন এক ভয়ের রাজ্য তৈরি করা হয়েছে , যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। এখানেই আমার উস্তাদদের সফলতা ও পূর্ণাঙ্গতা। এমনিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষদের কুরবানী , বাতিলের সামনে মাথা নত না করার ঘটনাবলি গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করা — বিশেষ করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলাভি রহিমাহুল্লাহর শিক্ষা দীক্ষা , চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আমার এই উস্তাদদের চিন্তাধারার ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। »

অনেক বেশি সবক থাকার কারণে এবং সবকগুলো বারবার পড়ার কারণে ; আবার সেগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য মুতালাআ ও পাঠ বেশি পরিমাণে করার কারণে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ ওই সময় ২৪ ঘন্টার মধ্যে শুধু দুই তিন ঘণ্টাই বিশ্রামের জন্য পেতেন। এ কারণে তার স্বাস্থ্যের উপরেও এর প্রভাব পড়েছে। সিলেবাসভুক্ত নির্ধারিত কিতাবাদী ছাড়াও অন্য কিতাবাদী এবং বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন এবং যাচাই -বাছাইয়ের মেজাজ সে সময় থেকে তার মাঝে ছিল।

ভারতের মুসলিমদের সমস্যাবলী এবং সেগুলোর সমাধান?
ওই সময় ভারতের মুসলিমদের বিদ্যমান দুরবস্থা নিয়ে চিন্তিত থাকা এবং তাদের দুর্দশার নানা কারণ জানার জন্য মাওলানা সাহেব অনুসন্ধান চালান। মুসলিমদেরকে অধঃপতন থেকে তুলে এনে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করার প্ল্যান-প্রোগ্রাম ওই সময়ে অন্যান্য যত জামাত বা ব্যক্তির মাধ্যমে ইসলামপন্থিদের কাছে পেশ করা হয়েছে, মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ খুব কাছে থেকে সেগুলো দেখেছেন এবং সেগুলো নিয়ে গভীর গবেষণা করেছেন। অতঃপর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে তার শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলিমদেরকে দাসত্ব থেকে বের করার পথ হল দাওয়াত, জিহাদের প্রস্তুতি এবং এই দুই স্তর পার করার পর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ শিক্ষা জীবনের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতের মুসলিমদের চলমান অবস্থা নিয়ে ওই সময় তার মূল্যায়ন ও মন্তব্যগুলো কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

« তখন এই প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো যে, ভারতের মুসলিমদেরকে কেমন করে আবারও সম্মান ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করা যায়? এই অঞ্চলে ইসলাম কেমন করে বিজয়ী হতে পারে? এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে সময় যেই স্লোগানগুলো চালু ছিল, সবগুলো নিয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হয়েছে। কেউ কেউ বলতো: মুসলিমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, এজন্যই মুসলিমদের অধঃপতন; আবার কেউ বলতো: মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ দেয়া উচিত, যেন পুরো দেশে তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং তারা সম্মান লাভ করে; আবার কেউ বলতো: রাজনীতিতে তাদের আরও বেশি অংশগ্রহণ করা উচিত, যেন বেশি থেকে বেশি মুসলিম প্রার্থী [271]

পার্লামেন্টে পৌঁছে যেতে পারে এবং মুসলিমদের আওয়াজ সকলের কানে পৌঁছে যায়।

এই সকল দাবি ও চিন্তাধারা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করি এবং প্রতিটি চিন্তাকে আলাদাভাবে অধ্যয়ন করে অতঃপর এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি যে, এই সব কিছুর পরিণতি শুধু এটাই যে, মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবন এবং ইহজাগতিক জীবন যেন সুন্দর হয়ে যায়; কিন্তু যেই প্রশ্নগুলো আমার ঘুম কেড়ে নিতো, সেগুলো এই ছিল যে, ভারতবর্ষে ইসলাম কেমন করে বিজয়ী হবে?; সেই অতীতের মতো যখন দিল্লির লালকেল্লা আযাদ ছিল? এই প্রশ্নগুলো সামনে থাকার কারণেই উক্ত দাবি ও দলীলগুলো আমার তৃষ্ণা মেটাতে অক্ষম ছিল। কিন্তু তবুও সেই দাবিগুলো বাতিল প্রমাণিত করার জন্য সেগুলো নিয়ে গবেষণা ও গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজন ছিল। তাই এক একটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। সর্বপ্রথম রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করলাম। কারণ এই বিষয়টা শৈশবকাল থেকেই আমাদের এখানে আলাপ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের বিষয় ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংবাদ ও খবরাখবর বিস্তারিত ওই সময় থেকে পাঠ করতে হয় আরম্ভ করি, যখন সবে মাত্র উর্দু হিন্দি পড়তে শুরু করেছিলাম। সেটা খুব সম্ভব স্কুলের দ্বিতীয় তৃতীয় ক্লাসের কথা হবে। তাই রাজনীতি কি এবং কেমন হয়, তা পড়ে পড়েও বুঝেছি, দেখেও আবার শুনেও বুঝেছি। এমনকি ইলেকশনের সময় পুলিং স্টেশনের ভিতরের অবস্থাও ভেতরে থেকে দেখেছি।

এক কথায় গণতান্ত্রিক রাজনীতি কাঠের পুতুলের এক তামাশা, এই পুতুলের পেছনে বসে আসল লোক নিজের মর্জি মতো পরিকল্পনা করে, বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। এই তামাশার নামই হল গণতন্ত্র। তখনও মেধা মস্তিষ্ক ততটা পরিপক্কতা লাভ করেনি যে, আসল লোকদের কে চিনতে পারবো, তারা কারা। তারা কি [272]

জাতীয় পর্যায়ের কোনো লোক নাকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের? যাই হোক এতোটুকু বুঝে এসেছিল যে, এই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে হিন্দুস্তানের মুসলিমদের খুব বেশি এই হতে পারে: নিজেদের মহল্লার ড্রেন নালা এবং সড়ক মেরামত করা হবে, পুরানো বিদ্যুতের পোস্টের জায়গায় নতুন পোস্ট লাগানো হবে, কিন্তু মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা অথবা ইসলামের বিজয়!.... এগুলো অনেক দূরের কথা.. ভারত সরকারও কখনও বলেনি যে, ভারতের মুসলিমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে ভারতে বিজয়ী হতে পারবে। তাই এই পথ এমন পানীয়, যা কখনও তার পেছনে ছুটে চলা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না। ওই ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে মরে যাবে কিন্তু পানি পাবে না।

মুসলমানদের এই অধঃপতন থেকে উত্তরণের পন্থা হিসেবে দাবি করা দ্বিতীয় বিষয় ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি অগ্রগতি। বাহ্যিকভাবে এই দাবি অনেক মজবুত ছিল। এই অঙ্গনে সাফল্য আনার জন্য অনেক চেষ্টা কসরত করা হয়েছে। যদিও স্কুল কলেজের জীবন এবং ওই শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরগত অবস্থা দেখার পর আমার এই পথে তেমন চেষ্টা ব্যয় হয়নি; কিন্তু এরপরেও এই দাবি গভীর থেকে অধ্যয়ন করে দেখা জরুরি ছিল। তাই সর্বপ্রথম আমি ভারতের সবচেয়ে বড় ও উচ্চতর পরীক্ষাগুলো নিয়ে যাচাই-বাছাই আরম্ভ করলাম। পরীক্ষাটি হল আইএএস বা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস

44। এখানে
স্পষ্ট করে রাখা ভালো, তখনও আমি পড়াশোনায় হিফজ বিভাগে ছিলাম এবং আমার বয়স প্রায় ১৫ হয়ে গিয়েছিল। ওখানে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতো যা ছিল পরীক্ষার্থীদের ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটির নাম ছিল কম্পিটিশন সাকসেস

45। আমি নিয়মিত তা
পড়তে থাকি। যে বিষয়গুলো বুঝে না আসতো, সেগুলো

44 Indian Administrative Service
[273]

ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতে থাকি, যিনি নিজে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এছাড়া ভারতের মুসলিম অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের বিভিন্ন রিপোর্ট ও প্রবন্ধ অধ্যয়ন করতে থাকি, যেগুলো তারা বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার বিষয়কে সামনে রেখে লিখেছেন। এই শিক্ষাবিদদের মাঝে কেউ কেউ এমন ছিলেন যারা মুসলিমদের শিক্ষা উন্নত করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, ভারতে এই শিক্ষা মুসলিমদেরকে পিছিয়ে রাখেনি, বরং তাদেরকে শাসন ক্ষমতার মাধ্যমে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় তাদের জন্য শুধু একটা বিশেষ কোটা রয়েছে, যা ওখানকার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন মুসলিম ছেলেরা যতই চেষ্টা পরিশ্রম করুক, ওই এক কোটার ভেতরেই তাদেরকে ভর্তি করা হবে। স্মরণ রাখা চাই, এটা তো ওই পরীক্ষাগুলোর অবস্থা, যার ব্যাপারে ভারতে প্রসিদ্ধ যে, এই পরীক্ষা ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন এবং স্বজন প্রীতি সুপারিশ ও ঘুষ মুক্ত পরীক্ষা— এমনকি এই পরীক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশও কোনো কাজে আসে না। যখন সর্বোচ্চ পরীক্ষার এই অবস্থা, তাহলে এর চেয়ে নিম্ন স্তরের পরীক্ষাগুলোতে মুসলিমদের পিছিয়ে রাখার জন্য সরকারি মহল থেকে এবং ক্ষমতাধরদের পক্ষ থেকে কেমন হস্তক্ষেপ হতে পারে, তা অনুমান করা যায় সহজেই। এ ছাড়া শিক্ষাকে পিছিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আরও অনেক কৌশল রয়েছে।

যদি আমরা এই দাবি অল্প সময়ের জন্য মেনেও নিই যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি কোনোভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি হবে; তাহলে এই প্রশ্ন থেকে যায়, ভালো চাকরি এবং ভালো মানের

45 Competition Success
[274]

গাড়ি পেয়ে যাওয়ার দ্বারা কি মুসলিমদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে? মুসলিম হিসেবে তারা কি হিন্দুদের মতো মান সম্মান, সমান অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে? তারা কি নিজেদের কুরআন মোতাবেক দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলাগুলোর সমাধান করতে পারবে? তারা কি নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনা করতে পারবে? কখনোই নয়। এই বাস্তবতা ভারতের প্রত্যেক মুসলিম জানে ও বোঝে, ভারতে একজন সামান্য হিন্দুরও একটা বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে, সেখানে একজন উচ্চপদস্থ মুসলিম অফিসারের সময় কোথায়? এই কথার বাস্তব উদাহরণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অসংখ্য পাওয়া যায়। যেখানে শক্তি এবং সকল পলিসি আপনার শত্রুপক্ষের হাতে, সেখানে আপনি উচ্চশিক্ষা নিয়েও ইসলামের জন্য কি করতে পারবেন? এটম সাইন্টিস্ট হয়েও আপনি স্বজাতির জন্য এবং নিজের দীনের জন্য কি অবদান রাখতে পারবেন? তবে এটা ঠিক, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি করে আপনি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবেন এবং পৃথিবীবাসীকে দেখাতে পারবেন যে, তোমরা দেখো! ভারত একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র; এখানে মুসলমানরাও প্রধান হতে পারে.. এই তো? এখানে মুজাফফর নগরের ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা, গুজরাটে মুসলমানদেরকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া এবং উর্দু লিপি শৈলী মিটিয়ে দেয়া, মাদরাসাগুলোর উপর ক্রমাগত ত্রাস সৃষ্টি করা... আদালতে এই সমস্ত অপরাধের বিচার আল্লাহর কানুনের পরিবর্তে হিন্দুদের কানুন দিয়ে করা সম্ভব হবে কি? যদি না হয় তাহলে এই সমস্ত অপরাধের বিচার কোথায় হবে?

সর্বশেষ যে বিষয়টা মুসলমানদের উন্নতি অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল তা হল সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কিন্তু এই দাবি এতটাই অসার, যা মুসলিমদের ছোট্ট

[275]

বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, কেমন করে মুসলিমদের শিল্পশহর অল্প সময়ের মাঝে ছাইয়ের স্তূপে পরিণত করা হয়েছে। কোটিপতি মুসলিম সকালে ঘুম থেকে উঠে ভিখারী হয়ে গিয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ইতিহাস এ কথার সাক্ষী, যা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি কখনও মুসলিমদের সংখ্যাধিক হয়ে যায় অথবা বাণিজ্য মুসলিমদের হাতে এসে যায়, তখন সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সেই সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া হয়। মিরাঠে খেলার সামগ্রী মুসলিমদের হাতে ছিল। তখন ওখানে এমন বিশৃঙ্খলা তৈরি করানো হয়েছে যে, মুসলিমদের রক্তে আসমান পর্যন্ত কেঁদে উঠেছে। কাপড়ের টেক্সটাইল এবং চামড়ার বাণিজ্য মুসলিমদের হাতে ছিল তখন ওখানেও বিশৃঙ্খলা তৈরি করিয়ে সবকিছু লুট করে নেয়া হয়। মুরাদাবাদে মুসলিমরা অনেক ভালো অবস্থায় ছিল। আশি সালে ঈদের দিন ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায়রত অবস্থায় মুসলিমদের উপর সোজা গুলি চালানো হয় এবং ঈদের দিন সেকুলার সরকারের পক্ষ থেকে এটা ছিল মুসলিমদের জন্য মূল্যবান উপহার। এমনই ঘটনা ঘটেছে গুজরাট বিহার ও আসামের মতো অঞ্চলগুলোতে।

বিশৃঙ্খলা বিস্তারের আরও অনেক পন্থা রয়েছে, যেগুলো মুসলমানদের বাণিজ্য ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই একই আচরণ করা হয়েছে মুসলিম কৃষকদের সঙ্গে। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর মুসলিমদের থেকে ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর যেই এলাকাগুলোতে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেই এলাকায় যদি শুরু থেকে নদী থাকে, তাহলে ওই নদীগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ হিন্দুদের অনুর্বর ও বালুকাময় এলাকাগুলোতে নদী খননের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন মুসলিমদের ভূমিগুলো দখল করার নতুন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে এইভাবে যে, পুরো এলাকায় হামলা করে মুসলিমদেরকে ঘরবাড়ি

[276]

এবং ভূমি থেকে বের করে দিয়ে সবকিছু তারা দখল করে নেবে— যেমনটা মুজাফফর নগরে হয়েছে।

এখানে এ বিষয়টাও স্পষ্ট যে, এগুলো হঠাৎ করে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই করা হয়নি অর্থাৎ এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এসবের পেছনে সরকারি সংস্থাগুলোর প্ল্যান ও ষড়যন্ত্র ছিল। এগুলো তো উত্তরপ্রদেশের ঐ সমস্ত এলাকার ঘটনা, যেখানে মুসলিমদের মাঝে আল্লাহর দীনের ভালোবাসা ছিল। সব জায়গায় হাফেজ কারী এবং আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। মুসলিমদেরকে ধীরে ধীরে হিন্দুদের মাঝে মিলিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা জারি থেকেছে। তাদের সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা রূপান্তরিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন মহল থেকেই কাজ করা হয়েছে। এমনকি তাদেরকে তাদের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য স্কুলগুলো থেকে উর্দু উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, যার ফলে নতুন প্রজন্ম উর্দু লিপিশৈলী থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে।

আমি যখন হিফজ বিভাগে পড়তাম তখনই এই অবস্থা ছিল আর হিফজ বিভাগের পর বাবরি মসজিদের শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। এটা এতটাই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল, যা প্রত্যেক এমন মুসলমান যার অন্তরে কিছু মাত্র হলেও ঈমানী আত্মমর্যাদা বোধ রয়েছে, তাকেই ঘর থেকে বের করে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে জীবন কুরবানী করে দিতে বাধ্য করে দেয়। »

জিহাদ ই সমাধান!
দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা জীবনের সূচনাকাল থেকেই মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়েছিলেন। শুরুতে তো তিনি ছাত্রদের

[277]

সঙ্গে মিলে ছুরি চাকু এবং ঘরে থাকা পিস্তল ও রাইফেল দিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এই উপসংহার ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুলের পর একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। অতঃপর ওই কাজের জন্য সুন্নতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম অর্থাৎ হিজরত, ব্যাপক জিহাদী ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। যেকোনো দেশে জিহাদ পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত কাজ হচ্ছে এমন কোন ভূখণ্ডকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা যেখানে মুজাহিদীন প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো নিরাপদে পালন করতে সক্ষম হবেন। এই উপসংহারে পৌঁছার পরে ১৯৯৩ সালের কথা হবে, যখন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আফগানিস্তানে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং শ্রীনগর যাওয়ার জন্য গাড়ির টিকিটও সংগ্রহ করে নেন। এই সফরে কাশ্মীরে যাবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু রওনা হবার আগ মুহূর্তে তার যিনি রাহবার ছিলেন তিনি বললেন যে, কাশ্মীরের আকাশচুম্বি পাহাড়গুলোকে বরফ ঢেকে নিয়েছে এবং এবছর সফর করা সম্ভব নয়। তাই মাওলানা সাহেবকে দ্বিতীয়বার দারুল উলুম দেওবন্দে ফিরে এসে শিক্ষা দীক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতে হয়েছে। আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য অন্য পথ তিনি তখন থেকেই খোঁজ করতে থাকেন। দারুল উলুমে পড়াশোনা চলাকালেই ১৯৯৫ সালে একজন পাকিস্তানি মুজাহিদ ভারতে গিয়ে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শেখান। ওই প্রশিক্ষণ লাভের পর মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর চিন্তা-

[278]

ধারণা এ বিষয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায় যে, ভারতের মুসলমানদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তিদানের মৌলিক পথ হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। সেই সঙ্গে তিনি এই কথাও বুঝে যান, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এক দুই বছরের কোনো কাজ নয়; বরং এর জন্য গোটা জীবন নিঃশর্তভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে বিক্রি করে দিতে হবে। তাই তিনি সবকিছু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র জন্য ওয়াকফ করে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা রক্তের শেষ বিন্দু প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ চালিয়ে যাওয়ার নিয়ত ও সংকল্প করে বেরিয়ে পড়েন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর হিজরত সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন:

« এখন আপনি এই প্রশ্ন করেছেন যে, আমি জিহাদ ও হিজরতের পথ কেন নির্বাচন করেছি? আল্লাহ তাআলা দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াশোনা করার সময়ই বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থা বোঝার সুযোগ আমাকে করে দিয়েছেন। এই ব্যবস্থার গলি ঘুপচি, গোলক ধাঁধা, প্যাঁচালো পথ, সুসজ্জিত নানা ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও প্রতারণা আল্লাহ তাআলা আমার সামনে খুলে দিয়েছেন। তাই এই জটিল সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্ব কুফরী ব্যবস্থার অসুস্থ অঙ্গগুলোর মধ্য থেকে কোনোটাকেই নিজের কর্ম ক্ষেত্রে হিসেবে বাছাই করে আলাদা করা যায় না। কিতাল তথা সশস্ত্র লড়াইয়ের পন্থাই হলো ওই পথ, যা এই প্যাঁচালো, গোলকধাঁধা পূর্ণ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি মূলোৎপাঠন করতে পারে। আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তি এবং তার চিন্তাবিদ ও জাদুকরেরা এই ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَـةٌ- ("এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়"). এই আয়াত থেকেই বুঝে আসে আল্লাহর এমন নির্দেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এই আয়াত

থেকেই বুঝে আসে যে, ফিতনা (তথা কুফরী শক্তি) বিজয়ী হওয়াটাই সকল ফিতনার মূল। মুসলিম চিন্তাবিদগণ কিতাল এড়িয়ে গিয়ে মুসলমানদের বিজয়ের অন্য যত পন্থা খোঁজ করছেন, সেগুলোর ব্যাপারে কথা হল: নিঃসন্দেহে তাদের সে সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা তাদের ইখলাস ও একনিষ্ঠতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাদের পন্থা ভুল। আল্লাহ তাআলা প্রথমে কুফরী শক্তির বিজয় ঠেকাবার নির্দেশ দিয়েছেন আর সেটা হলেই পরিপূর্ণ দীন আল্লাহর জন্য সুনিশ্চিত হয়ে যাবে। »

হিজরতের পথে
১৯৯৮ সালে মাওলানা সাহেব মুজাহিদ ফখরুল ইসলাম আসামী (আসামের অধিবাসী)

46 শহীদ
রহিমাহুল্লাহর সফরসঙ্গী হয়ে হিজরত শুরু করেন। বাঙলা ভূমি হয়ে পাকিস্তান ভূখণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেন এবং কাশ্মীরে জিহাদ রত হরকতুল মুজাহিদীনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। পাকিস্তানের পৌছার পর মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ হরকতুল মুজাহিদীনের সংগঠনের প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্যাপক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি আল হাদিদ নামে পরিচিত স্পেশাল কমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি শহুরে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে সামরিক অন্যান্য শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ কিতালের প্রত্যক্ষ অঙ্গনে কাজ করার জন্য কাশ্মীর উপত্যকায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তার জিম্মাদার ও

46 গাজী ফখরুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি ভারতের আসাম প্রদেশের সন্তান। তিনি ছিলেন বর্তমান সময়ে ভারতে জিহাদের দাওয়াত বিস্তারকারী প্রধান সাথীদের একজন। কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের ময়দানে মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার সময় উত্তর আফগানিস্তানের ফারগানা (উজবেকিস্তান) ভূখণ্ডের সন্তান এবং আফগানিস্তানের মুহাজিরদের দায়িত্বশীল শহীদ ইসলামের বীর বাহাদুর মোল্লা জুম্আ নামাঙ্গানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে শাহাদাত বরণ করেন।

[280]

দায়িত্বশীলগণ তার সামরিক যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণকালীন বিভিন্ন প্রতিভা দেখে তাকে প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাই তিনি একটা সময় পর্যন্ত মুজাহিদীনের সামরিক প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

• দাঈ ইলাল্লাহ

শহীদ মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ একজন অগ্নিঝরা বক্তা এবং আল্লাহর দীনের দাঈ ছিলেন। যেই সময়টাতে তিনি কাশ্মীর জিহাদে কাজ করছিলেন তখন গোটা পাকিস্তানে জিহাদের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পান। শহীদদের জন্য শোক প্রকাশ মূলক মজলিস হোক অথবা অন্যান্য জিহাদী কনফারেন্স হোক না কেন, তার আবেগঘন আলোচনা জিহাদ ও শাহাদাত প্রেম এবং মুসলিম উম্মাহর উন্নতি অগ্রগতি ও পুনর্জাগরণের জন্য কিছু করার দাওয়াত ও বার্তা সংবলিত হতো। দাওয়াতের অঙ্গনে তার এই কর্মব্যস্ততা তার সার্বিক যোগ্যতা ও প্রতিভার জন্য অনেক ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছিল। দাওয়াত প্রদানমূলক চিন্তা তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। দাঈ ব্যক্তির মতো অস্থিরতা ও আকুলতা তার বয়ান বক্তৃতাগুলোতে সর্বদাই পাওয়া যেত এবং নিজের দাওয়াতের জন্য নববী সিফাতের মতোই জীবন প্রাণ উজাড় করে দেয়ার অনুপ্রেরণা তার মাঝে ছিল। কোন অঞ্চলে কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে, দাওয়াতের কোন পন্থা অধিক উপযুক্ত হবে, কোন গোত্রকে কিভাবে সম্বোধন করতে হবে, কোন জায়গায় কোন বিষয়ে জোর দিতে হবে এবং কোন জায়গায় কোন বিষয় এড়িয়ে যেতে হবে—এজাতীয় বিষয়গুলো নির্ধারণে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর মাঝে আল্লাহ তাআলা দাওয়াত বিষয়ক বিশেষ যোগ্যতা ও [281]

প্রতিভা দান করেছিলেন। দাওয়াতের উচ্চতর ও গভীর জ্ঞান বিষয়ে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর পরিপক্কতা কতটুকু ছিল তা বোঝা যায় ‘দাওয়াতে খেলাফত এবং মানহাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ শিরোনামের একটি গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করার দ্বারা। সেই সঙ্গে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সীরাত কতটা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাদের জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে তিনি কতটা গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছেন, সে বিষয়টিও ফুটে ওঠে তার লিখিত সেই গ্রন্থে। একবার ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে এই ধরনের একটি বিষয় জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করি যে, মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বেশ দীর্ঘ সময় পরে তানজীম-আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তানজীমের চিন্তাধারা, কর্ম পন্থা ও মানহাজ তিনি এমনভাবে বুঝতেন এবং পালন করতেন, এর দ্বারা বোঝা যায়, তিনি অনেক আগে থেকেই তানজীমের সফরসঙ্গী? কি কারণে এমনটা হল? ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তখন যা বলেছেন তা অনেকটা এমন যে, « মাওলানা সাহেব একজন দাঈ এবং তার অন্তরে দাওয়াতের অস্থিরতা রয়েছে। আর যে ব্যক্তির অন্তরেই আল্লাহর দীনের প্রতি দাওয়াতের অস্থিরতা থাকবে, এমন ব্যক্তি মাত্রই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে শিক্ষা অর্জন করে মানহাজ নির্ধারণ করতে বাধ্য হবে; যে মানহাজ অবলম্বন করেছেন তানজীমের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। » এমনিভাবে একবার আমি মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, « হযরত! আপনি তো জিহাদী দাঈ ছিলেন এবং জিহাদের ফরয বিধান ও দায়িত্ব পালনের আহ্বান উচ্চকিত করেছিলেন। তাহলে কি কারণে আপনি দাজ্জালি ফিতনা এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হবার অবস্থা শীর্ষক ইলমি

[282]

শাস্ত্রীয় বিষয় নির্বাচন করলেন এবং এ বিষয়ে লেখালেখি করতে আরম্ভ করলেন? » তখন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ যেই উত্তর দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হল: « এই কিতাবগুলো আমি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র দাওয়াত প্রদানের জন্যই লিখেছি; আপনি দেখুন যে, দাজ্জাল এবং তার অধীন বিশ্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুপ্রেরণা নিয়েই পাঠকরা এই কিতাবগুলো শেষ করছেন। কিন্তু যখন আমি এই যুগের যুবসমাজের মন-মানসিকতা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছি, তখন আমার বুঝে এসেছে যে, আজকালকার যুবকদের রুচি প্রকৃতি হলো: তারা যাচাই-বাছাই ও গবেষণা ভিত্তিক কিতাবাদী আগ্রহ নিয়ে পাঠ করে। পক্ষান্তরে নিরেট শরীয়তী বিষয়বস্তুর উপর লিখিত বই পুস্তকে তারা তেমন একটা হাতও দেয় না। এই কারণে আমি দাজ্জালের ফিতনা, বারমুডা ট্রি অ্যাঙ্গেল, দাজ্জালি ফ্লাইং সোসার্স এবং এ জাতীয় বিষয়গুলোকে শিরোনাম বানিয়েছি এবং তার অধীনে মুসলিম যুবকদেরকে চলমান পরিস্থিতির ওপর তাদের করণীয় ও ফরয দায়িত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছি » এক কথায় উক্ত রচনার পিছনেও মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী মেজাজ ও নবজাগরণমূলক চিন্তা-ভাবনা আমরা দেখতে পাই।

সারা পাকিস্তানে ঘুরে ঘুরে কাশ্মীর জিহাদের দাওয়াহ ছড়িয়ে দেয়া এবং মুসলিমদের অন্তরে জিহাদের প্রেম ভালোবাসাকে স্থান করে দেয়ার অভিজ্ঞতার কথা স্বয়ং মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ একটি লেখায় তুলে ধরেছেন এবং তার অনুভব অনুভূতিগুলোকে পাঠকদের সামনে পেশ করেছেন:

« কাশ্মীর জিহাদের ব্যাপারে পাকিস্তানে অবস্থানের মাঝেই জিহাদী দাওয়াতের পেছনে পাকিস্তানি মুসলমানদের সঙ্গে আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা আমার মতো বান্দার জন্য অনেক বেশি সন্তোষজনক; এমনকি বলতে গেলে— তা ছিল অত্যাশ্চর্যজনক। কারণ [283]

ভারতে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব নেতিবাচকভাবে ভারতের মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। অতঃপর সরকার মুসলিমদেরকে ভয় দেখিয়ে এমন এক পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল যে, মুসলিমরা চিন্তাও করতে পারতো না, এই সময়ে জিহাদের দাওয়াত উঠানো যেতে পারে! সেই সঙ্গে দাওয়াতী ময়দানে থেকে এ বিষয়টা আমার ভালোভাবে বুঝে এসে গিয়েছিল যে, এই বিক্ষিপ্ত, শতধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন উম্মাহ কেমন করে এক উম্মাহ হতে পারবে! এই উম্মাহর মাঝে এমন সকল যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে, যা এই পথে চলার জন্য দরকার হয়ে থাকে। পাকিস্তানি মুসলমানদের আল্লাহর দীনের সঙ্গে মুহব্বত এবং জিহাদের জন্য আত্মবিলীন হয়ে যাবার উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা খুবই আশ্চর্যের। পাকিস্তানি মুসলমানদের আল্লাহর দীনের সঙ্গে ভালোবাসা এবং জিহাদের জন্য নিজেদের জীবন ও অর্থ সম্পদ; এমনকি নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে জিহাদে প্রেরণের দৃষ্টান্ত এমন এক বিষয় ছিল, যা সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের স্মৃতি আমাদের মনে জাগ্রত করে দিতো »

তালেবানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে…

যেই সময়টাতে আমীর মুহতারাম মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ কাশ্মীর জিহাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সে সময় আফগানিস্তান ভূখণ্ডে পবিত্র শরীয়তের বসন্ত চলছিল। ফখরে উম্মত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে তালেবান আফগানিস্তানের ৯০% ভূমিতে কুরআনী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে রেখেছিল। অপরদিকে গোটা পৃথিবী থেকে ঈমান ও জিহাদের পিপাসা মেটানোর জন্য তাওহীদ ও [284]

একত্ববাদের হাজার হাজার সন্তান প্রদীপের চারিপাশে থাকা কীট পতঙ্গের মতোই আফগানিস্তানে ছুটে আসেন। অপরদিকে উত্তরাঞ্চলীয় জোট নামক কাফেরদের তাবেদারদের সঙ্গে চলমান যুদ্ধটাও জিহাদী অনুপ্রেরণা আরও জাগ্রত করে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাই মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহও ওই সময়ে কয়েকবার আফগানিস্তানে তাশরিফ নিয়ে যান এবং তালেবানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে অবস্থান করার কারণে তার অনুভব, অনুভূতি, উপলব্ধি এবং চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে যথেষ্ট পরিপক্কতা তৈরি হয়। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজেই এ বিষয়ে লিখেছেন যে, « আফগানিস্তানে অবস্থান করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা আমার অর্জন হয়েছে তা হল ইয়াকীন তথা দৃঢ় বিশ্বাস। এটা ছিল আল্লাহর দীন বিজয়ের ইয়াকীন এবং জিহাদের উন্নতি অগ্রগতির বদৌলতে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অর্থেই এক উম্মাহ হয়ে যাবার ইয়াকীন। বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থা ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবার ইয়াকীন এবং জিহাদের রাস্তাই সমস্ত অপশক্তিকে অপদস্থ করতে পারার ইয়াকীন। এটা ছিল এমন ইয়কীন যা দুই শতাব্দীর চেষ্টা- প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৈশ্বিক কুফরী শক্তির চিন্তাবিদরা মুসলিমদের অন্তর থেকে বের করে ছুঁড়ে মেরেছিল, এমনকি আল্লাহর দীনের অতন্দ্র প্রহরী উলামায়ে কেরাম ও দাঈগণকেও এই ইয়াকীন থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছিল। এরই ফলে মুসলিম উম্মাহর সরল শ্রেণি এরূপ অধঃপতনকে নিজেদের নিয়তি বলে ধরে নিয়েছিল। অত্যাচার মেনে নেয়াকে এবং কাফেরদের দাসত্বকে অপারগতা মনে করে তারা বসে গিয়েছিল। কিন্তু আফগানিস্তানের পাহাড়ের গুহায় শহীদদের রক্ত সেই অঞ্চলের নওজোয়ানদেরকে যেই ইয়াকীন ও দৃঢ় বিশ্বাস দিয়েছিল, তার একটি

[285]

ঝলক ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহান কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে গোটা পৃথিবী দেখেছিল ; শুধু খঞ্জর হাতে থাকা উম্মাহর কিছু সন্তান কেমন করে আমেরিকার অহঙ্কারের প্রাসাদ মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে।

আফগানিস্তানে গিয়ে উপলব্ধি ও অনুভবগুলো নতুন নতুন জগৎ , নতুন নতুন ময়দান এবং নতুন নতুন দিগন্তের সঙ্গে পরিচিত হয়। বিশেষ করে আরব সাথিদের সঙ্গে ফ্রন্টে কাটানো দিনগুলোর কথা ভোলার মতো নয়। আফগানিস্তান ছিল এমন এক প্রশিক্ষণ স্থল , যা গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের জন্য জিহাদী প্রশিক্ষণ , চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ইয়াকীনের অলঙ্কার যারা সুসজ্জিত করার ময়দান ছিল। কবির ভাষায় —

اس بار مضرابِ عجم نے دین حجاز کا ساز چِّھیرا تھا

((((কবিতার কোন অংশ কোথায় কি কিছুই বুঝতে পারিনি)))))

পূর্ব দিগন্ত থেকে একটি নতুন সূর্য উদিত হবার অপেক্ষায় ছিল। ইমারত ইসলামিয়ার অধীনে আফগানিস্তানে এমন এক প্রজন্ম প্রশিক্ষণ লাভ করছিল, যার ঈমানী উত্তাপে বৈশ্বিক কুফরী শক্তির সুসজ্জিত মূর্তিগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার অপেক্ষায় ছিল। ওই প্রজন্মের ঈমানী উৎসাহ , উদ্দীপনা ও উষ্ণতার সামনে বৈশ্বিক সুদখোরদের এঁকে দেয়া সাম্রাজ্যের সীমারেখা মুছে যাবার অপেক্ষায় ছিল। ওই অঞ্চলের পাহাড়ের গুহায় এমন এক জামাত তৈরি হচ্ছিলো , যাদের মাঝে মুসলিম উম্মাহকে পুনর্জীবিত ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করার জযবা , বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাহকে প্রকৃত অর্থে এক উম্মাহ বানাবার অস্থিরতা বুঝমান

ব্যক্তি মাত্রকেই একথা বোঝাবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, এই বার এই জিহাদী আন্দোলন কোনো একক রাষ্ট্র বা সীমারেখার ভিতরে আবদ্ধ হয়ে যাবার মতো নয়; বরং চেচনিয়া থেকে ফিলিপাইন, মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এই জিহাদ পৌঁছে যাবে। আফগানিস্তানে সৌদি আরব, ইয়ামেন, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, আলজেরিয়া, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং গোটা পৃথিবী থেকে আগত যুবক দল বিদ্যমান ছিল।
»

জিহাদে কাশ্মীর: আইএসআই'র বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাশ্মীরি জিহাদী সংগঠনগুলোর নিরুপায় অবস্থা
মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে জিহাদী দাওয়াত ও সামরিক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ওই অবস্থাতেই সত্য ও বাতিলের রণাঙ্গন এক নতুন দিকে মোড় নেয়। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ১৯ জন মুসলিম শাহবাজ বীর বাহাদুর নওজোয়ান পাইলটদেরকে জিম্মি বানিয়ে কুফরী ও ফ্যাসাদ বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে কুফরী বিশ্বের অহঙ্কারের প্রাসাদ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। ঐদিনকে মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে “ইয়াওমুত্তাফরিক তথা সত্য মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়ে যাবার দিন’ নাম দেয়া হয়েছে। ঐদিন ঈমান ও কুফরীর শিবিরের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে এই ঘটনার দ্বারা ভালো-মন্দ, সত্যবাদী মিথ্যাবাদী, সাহসী ভীতু, [287]

আত্মমর্যাদাশীল আত্মমর্যাদাহীন— এক কথায় আখলাক নৈতিক উৎকর্ষ ঈমানি মূল্যবোধ ও মানবতার অধিকাংশ গুণের সঙ্গে এগুলোর বিরোধী গুণের পার্থক্য সূচিত হয়ে গিয়েছিল।

১১ই সেপ্টেম্বরের পর একদিকে আমেরিকা ও ইউরোপ আফগানিস্তানে নৃশংস হামলা চালায়, অপরদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এবং তার বাহিনী নিজেদের সৈন্যবল, ভূমি, আকাশপথ ও ইন্টেলিজেন্স সাহায্যের মাধ্যমে ক্রুসেডার জায়নবাদী যৌথ শক্তির পাশে দাঁড়ায়। তৃতীয় আরেকটা বিষয় হল, সন্ত্রাসবাদ সংক্রমণের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশনে পাকিস্তানি ফ্রন্টে পারভেজ এবং তার বেঈমান বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী কাশ্মীর জিহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। যুদ্ধের মূল সময়ে কাশ্মীরি মুজাহিদীনের সাপ্লাই লাইন কেটে দেয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় অথবা সেগুলোকে অকার্যকর করে দেয়া হয়। এমনিভাবে সারাদেশে কাশ্মীর জিহাদের জন্য দাওয়াতের পথ ও ভর্তির সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর মতে কাশ্মীরে জিহাদ রত মুজাহিদীনের মাঝে অনেকের কাছে প্রথম দিন থেকেই এটাই স্পষ্ট ছিল যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী না ইসলামের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান আর না কাশ্মীর জিহাদের ব্যাপারে। কাশ্মীরে তাদের নিজেদের স্বার্থ রয়েছে এবং যেদিন এই স্বার্থ শেষ হবে অথবা এর চেয়ে বড় কোনো স্বার্থ তাদের সামনে চলে আসবে, সেদিনই তারা কাশ্মীর জিহাদের সঙ্গে যেকোনো রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করতে ছাড়বে না। কিন্তু কাশ্মীর জিহাদের মাঝে যে জামাতগুলো কাজ করে যাচ্ছিলো, তারা নিজেদের নেতৃবৃন্দের উপর খুব আস্থাশীল ছিল। একে তো তাদের ব্যাপারে এই সুধারণা ছিল যে, তারা কাশ্মীর জিহাদের ব্যাপারে

[288]

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীন আর দ্বিতীয় বিষয় হলো: এই দলগুলো স্বাধীনভাবে নিজেদের উদ্যোগে কাশ্মীরে জিহাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও সক্ষম। অতঃপর জিহাদী জামাতগুলোর নেতৃবৃন্দ সাধারণ সাথিদের সামনে এমন পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিলেন, যার দ্বারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং আইএসআই'র ব্যাপারে তাদের অন্তরে বিদ্বেষ ভাব জন্ম নেবে এবং তাদের অধীনে কাজ করাকে তারা অপছন্দ করবে। উদাহরণস্বরূপ, সেনাবাহিনীকে ভালো-মন্দ বলা অথবা কোনো সেনা সদস্যের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ না করা ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা এভাবে তুলে ধরেছেন:

« কাশ্মীর জিহাদে যতদিন শামিল ছিলাম, তাতে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আলহামদুলিল্লাহ কখনও এমন সুধারণা ছিল না: পাকিস্তানি এজেন্সিগুলো জিহাদের ব্যাপারে সহমর্মী অথবা কাশ্মীরি মুসলিমদের প্রতি তাদের কোনো সমবেদনা রয়েছে; আর তারই ভিত্তিতে তারা কাশ্মীর আযাদ হতে সাহায্য করবে। এমনটা কখনোই ছিল না। এটা শুধু আমার একার অবস্থাই নয়; বরং আলহামদুলিল্লাহ এই জিহাদে অংশগ্রহণকারী বিরাট সংখ্যক লোকের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই ছিল যে, এজেন্সিগুলো নিজেদের পলিসি অনুসরণ করে যাচ্ছে কিন্তু আমরা এই সময়কে গনীমত ও সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এই জিহাদ বেগবান ও শক্তিশালী করতে চাচ্ছি, যেন আগামী দিনে যদি এই এজেন্সিগুলো প্রতারণা করে, তাহলে যেন এই জিহাদ চালিয়ে যাবার সক্ষমতা আমাদের থাকে। পাকিস্তানি জিহাদী জামাআতগুলোর লিডারশিপ সাধারণ সাথিদের সামনে এমনই এক পাক সেনা বিদ্বেষী পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়; বরং তাদের সামনে নেতারা এজেন্সিগুলোর বিভিন্ন খারাপ দিক ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা বর্ণনা করতো। তাই এজেন্সির [289]

ব্যাপারে মুজাহিদীনের মাঝে সর্বদাই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যার কারণে আমাদের কেন্দ্রে যদি কোনো এজেন্সির লোক আসতো, তাহলে আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করতাম না। »

কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাশ্মীরি জিহাদী সংগঠনগুলোর ব্যাপারে যে অবস্থান গ্রহণ করেছে, তার দরুন মাওলানা শহীদ রহিমাহুল্লাহ সহ ঐ জিহাদী সংগঠনগুলোর অধিকাংশ মুজাহিদীনের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাশ্মীর জিহাদে পাকিস্তানি সংগঠনগুলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং আইএসআই'র পুরোপুরি তত্ত্বাবধানে এবং তাদেরই তৈরিকৃত এজেন্ডা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছিলো। জামাতগুলোর নেতৃবৃন্দ না পলিসি তৈরি করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিল, আর না কার্যক্ষেত্রের বাস্তব কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে। ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে এই বিষয় নিয়ে তো মতপার্থক্য রয়েছে যে, কোনো তাগুতি সংস্থা বা ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো কাফের বা তাগুত শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ হবে কিনা? কিন্তু এ বিষয়ে ইসলামের আইন শাস্ত্রবিদ সকলেই একমত, কোনো তাগুতি সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং তাদের এজেন্ডা ও উদ্দেশ্য পূরণ করে অন্য কোনো কাফের বা তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয নেই।

কাশ্মীর জিহাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও এজেন্সিগুলোর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রকৃত অবস্থা মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ এভাবে স্পষ্ট আকারে তুলে ধরেছেন:

« পাকিস্তানি এজেন্সিগুলোর ব্যাপারে কথা হলো: যেখানেই তারা ইসলাম কিংবা জিহাদের প্রতি মুহব্বত, ভালোবাসা দেখাবে, তাদের এই অবস্থা দেখে

[290]

তাদের প্রতি সুধারণা পোষণকারীর দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেমন নরেন্দ্র মোদী অথবা ওবামাকে ইসলামের প্রশংসা করতে দেখে কেউ ভেবে বসলো, তারা মুসলমানদের কল্যাণকামী। কারণ পাকিস্তানি এজেন্সি হোক অথবা ভারতীয়, সবই হল এক বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার অংশ। অর্থাৎ কতই না আশ্চর্যের বিষয়, আপনি একদিকে এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, গোটা পৃথিবীকে একটি বৈশ্বিক গ্রাম বানিয়ে দেয়া হয়েছে; অপরদিকে আপনি মনে করছেন, পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি— সেটাও আবার ধর্মীয় বিষয়ে—মুসলিম রাষ্ট্র নেতাদের নিজেদের তৈরি! এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। এমন ধারণা তো ঐ ব্যক্তি করতে পারে, বৈশ্বিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যার জ্ঞান বা বুঝ নেই। উদাহরণস্বরূপ হিন্দুদের বাবরী মসজিদ শহীদ করা শুধু কিছু দলান্ধ ও উগ্রবাদী সংগঠনের কাজ ছিল এমনটা কখনোই নয়; বরং ভারত সরকার পুরোপুরিভাবে এ কাজের পৃষ্ঠপোষক ছিল। যেহেতু ভারত সরকার এই কাজের পিছনে পুরোপুরি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল তবে কি আপনার মনে হয় যে, এই সরকার বিশ্ব দরবারে কোনো পরাশক্তির ওপর আস্থা পোষণ না করেই এ কাজ করেছে?

এখানেও যখন আপনি জিহাদকে সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক পলিসির অংশ বানাচ্ছেন তখন এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, এই বাহিনী শুধু নিজেদের পলিসি অনুযায়ী কাজ করছে; বরং তাদের সঙ্গে তো তাদের মনিব আমেরিকাও এই কাজে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছে। এই কারণেই কাশ্মীর জিহাদ এজেন্সিগুলোর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব রাখে। এখানে তো এমন প্রশ্নেরই কোনো যৌক্তিকতা নেই যে, তারা নিষ্ঠাবান কিনা? তারা তো নিজেদের পররাষ্ট্র নীতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে, আর তাদের পররাষ্ট্রনীতি কখনোই আমেরিকার ইচ্ছার বাহিরে হয় না। ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদে পাকিস্তানি এজেন্সিগুলোর সঙ্গে

[291]

সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে যে, তারা মুজাহিদীনকে তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী বানিয়ে রাখতে চায়, যেন তারা চাইলেই মুজাহিদীনকে কন্ট্রোল করতে পারে। তারা চায় না এই জিহাদ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। তারা চায়, যেন এটা তাদের হাতের মুঠোয় থাকে এবং যখনই তারা চাইবে, তখনই যেন তারা এই জিহাদকে বিশ্ব নিলামে বিক্রি করে ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারে। »

অতএব এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর জন্য এটা সম্ভব ছিল না যে, এমন কাজের মাঝে তিনি অংশগ্রহণ করবেন যে কাজে আল্লাহর দীন ও জাতির শত্রু বিশ্বাসঘাতক সংস্থা আইএসআই'র তত্ত্বাবধান মেনে নেয়া হয়। তাই মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ তখন সাথি ও সহযোদ্ধাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করার পর আইএসআই'র পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কাশ্মীরি জিহাদী সংগঠনগুলো থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যান। এটা ২০০২ সালের কথা। এই সময়ে জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন ও নৃশংসতাকারী আইএসআই মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে গ্রেফতার করে; কিন্তু আল্লাহর সাহায্য মাওলানা সাহেবের সঙ্গী হয়, যার ফলে কিছুদিন পরেই আইএসআই-এর টর্চার সেল থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

সীমান্ত অঞ্চলের ফ্রন্টগুলোতে…
মাওলানা সাহেব সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব মনে করে এবং দায়িত্ব পালনের ডাকে লাব্বাইক বলে আফগানিস্তানের জিহাদে সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে নেন। একদিকে তিনি রচনা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং নিজের কলমের মাধ্যমে আফগানিস্তানের [292]

জিহাদ সমর্থন করে বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থাকে পতনের তার প্রান্তে নিয়ে যাবার দাওয়াত প্রচার করতে আরম্ভ করেন, অপরদিকে পাকিস্তানের গোত্রগুলোতে উপস্থিত আরব মুজাহিদীনের সঙ্গে মিলে কার্যত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। বাজুয়ার এজেন্সিতে উপস্থিত আরব মুজাহিদীনের একজন পথপ্রদর্শক শায়খ আবু সুলাইমান আল জাযায়েরী রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মিলে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বাজুয়ার অঞ্চলে চলে যান। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি বিভিন্ন জিহাদী কাজে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানের ঐ সময়টাতেই ওই অঞ্চলের মুজাহিদীনের সঙ্গে তার অনেক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা পূর্ণ সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল— যা মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ শাহাদাত লাভের দিন পর্যন্ত স্মরণ করতেন, যথাসাধ্য ঐ সম্পর্ক ধরে রাখার এবং সম্পর্কের দাবি পূরণ করে যাবার চেষ্টা করতেন।

২০০৮ সালে শায়খ আবু সুলাইমান আল জাজায়েরি

47

রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় পরিচালিত মার্কিন হামলায় শাহাদাত বরণ করার পর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তানের বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি শহরগুলোতে অবস্থান করে জিহাদের দাওয়াত ও অন্যান্য জিহাদী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ওই সময়টাতে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ তার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বিষয়ক 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

47 আলজেরিয়ার সন্তান শাইখ আবু সুলাইমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরব মুজাহিদীনের মধ্যে একজন দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষক ও নেতা ছিলেন। বাজুয়ার এজেন্সিতে জিহাদ সংগঠিত করার কাজে তিনি বিরাট ভূমিকা পালন করেন। সেই সঙ্গে গোটা সীমান্তবর্তী এলাকায় আরব পরিবার, এতিম বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানের কাজেও তিনি অবদান রাখেন। আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর তালেবান মুজাহিদিনকে মাইন ও বারুদ শাস্ত্র শেখানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার। ২০০৮ সালের মে মাসে বাজুয়ার এজেন্সির ডামাডোলা গ্রামে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাহায্যে পরিচালিত আমেরিকানদের এক ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

[293]

এবং দাজ্জাল', ‘বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এবং দাজ্জাল' এবং ‘ইমাম মাহদীর শত্রু মিত্র' গ্রন্থগুলো রচনা করেন।

ওয়াজিরিস্তানে হিজরত

খুব সম্ভব ২০০৮ সালে মহান মুজাহিদে ইসলাম, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর আদেল আব্দুল কুদ্দুস

48 রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মাওলানা সাহেবের

সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মেজর সাহেব রহিমাহুল্লাহ ঐ সময়ে কোর্ট মার্শালের অধীনে ০৬ বছরের কারা জীবন পার করছিলেন। মেজর সাহেব রহিমাহুল্লাহ ২০০৯ সালে মুক্তি লাভের পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতে লাব্বাইক বলে ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করে চলে যান। মেজর সাহেবই (রহিমাহুল্লাহ) ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করেন। এভাবে এই দুই মহান হযরতের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর গ্রন্থাবলী 48 পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর আদিল আব্দুল কুদ্দুস মুজাহিদীনের মাঝে ইমরান ভাই নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পাক সেনাবাহিনীর ওই সকল অফিসারের একজন ছিলেন, যারা ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ ও দায়িত্বের কারণে আরব মুজাহিদীনকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। আল্লাহর সাহায্যে আমেরিকার অহংকার চূর্ণকারী ইসলামের বীর বাহাদুর খালেদ শাইখ মুহাম্মাদ হাফিজাহুল্লাহ (আল্লাহ তাকে কাফেরদের কয়েদ থেকে মুক্তি দান করুন আমিন!!)-এর নিকটতম আনসারদের মাঝে তিনি গণ্য হতেন। ২০০৩ সালে যখন রাওয়ালপিন্ডিতে মেজর সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির ঘর থেকে খালেদ শাইখ মুহাম্মাদ হাফিজাহুল্লাহ গ্রেফতার হন, তখন মেজর সাহেব এবং তার বন্ধু কিছু সেনা অফিসারের কোর্ট মার্শাল হয়। ২০০৯ সালে ৬ বছর বন্দি জীবনের দুঃখ কষ্ট সহ্য করার পর মুক্তি পাওয়া মাত্রই তিনি ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করে ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির জিহাদী কাতারে শামিল হয়ে যান। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে উপস্থিত দ্বীন ও মিল্লাতের মর্যাদাবোধসম্পন্ন সদস্যদেরকে খোঁজ করে মুজাহিদীনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি লিল্লাহিয়াত, একনিষ্ঠতা, তাকওয়া ও উন্নত আখলাকের মূর্ত প্রতীক এবং আল্লাহর দ্বীনের তরে উৎসর্গিত প্রাণ ছিলেন। ২০১৪ সালে জরবে ওজব নামক পাক মার্কিন যৌথ অপারেশন আরম্ভ হবার পর তিনি দ্বীনী ভাই মুজাহিদীনের চিকিৎসক আবু খালেদ সারবুলন্দ জুবায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহর সঙ্গে পাক আফগান বর্ডার সংলগ্ন আফগানিস্তানের...... (পৃষ্ঠা নাম্বার ১৬৯) এলাকায় চলে যান। সেখানে কাপুরুষ নিকৃষ্ট আমেরিকানরা রাতের অন্ধকারে তার ঘরে হামলা চালায়। ফলশ্রুতিতে তিনি, ডাক্তার সারবুলন্দ জুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ডাক্তার সাহেবের অল্প বয়সি দুই সন্তান সকলেই শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমীন

[294]

অধ্যয়ন করার দ্বারা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি এক অদেখা সম্পর্ক অবশ্যই আগে থেকে বিদ্যমান ছিল কিন্তু সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল মেজর সাহেব রহিমাহুল্লাহর মধ্যস্থতায়। চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে মুজাহিদীনের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান, অন্যান্য জিহাদী গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ এবং পাকিস্তানি শহরগুলোতে তার সিকিউরিটি ও নিরাপত্তার দুরবস্থা সম্পর্কিত তৎকালীন অবস্থার কারণে ওয়াজিরিস্তানে হিজরতের দাওয়াত দেন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ ওই দাওয়াতে লাব্বাইক বলেন এবং ২০১১ সালে ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন।

মুজাহিদীনের ইসলাহ ও আত্মিক সংশোধনের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা
হযরত মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ মিরান
শাহ এলাকায় মুজাহিদীনের মাঝে একজন সংশোধনকারী ও সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করেন। তিনি শুধু মুজাহিদীনের পারস্পরিক মতবিরোধগুলো মীমাংসা করার পেছনেই চেষ্টা ব্যয় করতেন এমন নয়; বরং সেই সঙ্গে তাদের ধর্মীয় ও শরীয়াহগত প্রশিক্ষণের দিকেও সজাগ দৃষ্টি দেন। একদিকে যেখানে মুজাহিদীনের জিম্মাদার ও দায়িত্বশীলগণ শরীয়াহর মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা লাভের জন্য মাওলানা সাহেবের কাছে যেতে আরম্ভ করলেন, অপরদিকে সাধারণ সাথিরাও নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের শরীয়াহর মাসআলা মাসায়েল ও বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের জন্য মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে লাগলেন। সেই সঙ্গে মাওলানা সাহেব

[295]

রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানি মুজাহিদীনের দায়িত্বশীলগণকে একত্রিত করে পারস্পরিক শলা- পরামর্শ, সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা মূলক অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মজলিসের আয়োজন করতে আরম্ভ করলেন। ওই মজলিসগুলোতে একদিকে যেমন বিভিন্ন শরীয়াহর বিষয়বস্তুর ওপর মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ দিকনির্দেশনা দিতেন, অপরদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বিত প্রচেষ্টা তৈরির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতেন। সাধারণভাবেই তার নিষ্ঠাপূর্ণ রায়ের উপর মুজাহিদীন আস্থা রাখতেন এবং তারা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণের আগে আবশ্যিকভাবে হযরত মাওলানা রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ করে নিতেন। এক কথায় ওয়াজিরিস্তানে মাওলানা সাহেবের আগমনের পর সাধারণভাবে এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় যে, প্রায় সকল মুজাহিদের মাঝে হযরত মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব অবিসংবাদিতভাবে সকলের প্রিয় অভিভাবক তুল্য আলেমে দীন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য মুজাহিদীনের অন্যান্য জিম্মাদার ও দায়িত্বশীলদের মতোই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহও মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর মেহনত ও চেষ্টা প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতেন। তিনি মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে খুবই গভীর সম্পর্ক রাখতেন এবং শরীয়াহর মাসআলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে পরামর্শ করে দিকনির্দেশনা লাভ করতেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ হযরত মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর

[296]

দাওয়াতী ও ইলমি যোগ্যতা -প্রতিভার ভিত্তিতে তাকে নিজের মিডিয়া অঙ্গনের কাজকর্ম ও পরামর্শগুলোতেও জুড়ে নেন। এছাড়াও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলোতে এবং মাজমুআর শুরা এজলাসগুলোতেও হযরত মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ অংশগ্রহণ করতেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সাধারণভাবেই নিজের অন্য সাথি ও সহযোদ্ধাদেরকে শরীয়াহর বিষয়াদিতে হযরত মাওলানা রহিমাহুল্লাহর শরণাপন্ন হবার পরামর্শ দিতেন। ওই সময়টাতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেই আমাকেও হযরত মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে বিস্তারিত পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকেও মাওলানা সাহেবের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে উপকৃত হবার উপদেশ দিয়েছেন। ২০১১ সালে ঈদুল ফিতরের সময় হযরত মাওলানা সাহেবের সঙ্গে প্রথমবার আমার নিয়মতান্ত্রিক সাক্ষাৎ ঘটে। তো ঈদুল ফিতরের দিন

گلپ□ خیل ((((((<((১৭১ নম্বর পৃষ্ঠার শুরুর দিক থেকে ৫ নম্বর লাইন)))>এখানে মসজিদের নামটা স্পষ্ট না , উর্দুতে এই নামটা দেওয়া))) মসজিদের সামনে অবস্থিত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মেহমানখানায় যখন আমি উপস্থিত হই , তখন দেখি যে , ১৫- ২০ জন মুজাহিদ সেখানে একসঙ্গে রয়েছেন এবং তারা ঈদের আনন্দ বিনিময় করছেন। ওই মজলিসে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বরাবর একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হযরতকে দেখতে পাই। ওই হযরতকে পুরো মজলিসের মধ্যে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আলাদাভাবে ভক্তি - শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন। তখনই আমার বুঝে এসে যায় , এই হযরত নিশ্চয়ই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নিকট খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। মজলিস শেষে যখন খাবারের জন্য আমন্ত্রণ করা শুরু হলো , তখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেই আমাকে ওই হযরতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে , ইনি হলেন মাওলানা আসিম

উমর সাহেব। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর আগমন ও হিজরতের কথা শুনে আমি সীমাহীন আনন্দিত হই। ঐদিন ঈদের খুশিতে মুজাহিদীন বিভিন্ন তারানা ও কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। যতদূর মনে পড়ে , ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কাসিদা বরদা শরীফ মাওলা ইইয়া সাল্লি ...

مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم

তার সুললিত কন্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন। অতঃপর মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহও খুব সম্ভব কবি ইকবালের কোনো কবিতা অথবা সম্ভবত জকী কাইফী মরহুমের

زمان� منقلب ہے انقلاب آیا �ی کرت� �یں

কবিতাটি সুর দিয়ে আবৃত্তি করে শোনান।

হযরত মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ এবং তানজীম আল-কায়েদার নেতৃত্ব

হযরত মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ সময় থেকেই বিভিন্ন খেদমতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আরব মুজাহিদীনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানের শহরগুলোতে তিনি অবস্থানের শেষ সময়টাতে সেখানে উপস্থিত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী সাথিদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক তৈরি হয়। অতঃপর মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ তানজীম আল -কায়েদা পাকিস্তানের দাওয়াতী দায়িত্বশীলদের (দাওয়াহ ডিপার্টমেন্টের) আমন্ত্রণের ভিত্তিতেই ওয়াজিরিস্তানে তাশরিফ নিয়ে যান। তিনি ওয়াজিরিস্তানে আগমনের পরে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেই তানজীম আল -কায়েদার আরব নেতৃবৃন্দকে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর

ব্যক্তিত্ব ও দুর্লভ গুণাবলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি আরব নেতৃবৃন্দকে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী, ইলমি, তাকওয়া তথা খোদাভীতি এবং সংস্কার মূলক মূল্যবান প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অপরদিকে ওয়াজিরিস্তানে উপস্থিত পাকিস্তানি মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর প্রতি আস্থা ভালোবাসা ও ঐকান্তিক সম্পর্কের কথাও অন্যান্য মাধ্যমে তানজীমের নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তানজীম আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ, শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ এবং তার নায়েব ও সহকারী বৃন্দসহ অন্যান্য হযরত দীর্ঘদিন যাবৎ এই আকাঙ্ক্ষা করে যাচ্ছিলেন যে, উপমহাদেশে বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি শক্তিশালী জামাত গঠন করা উচিত, যারা উপমহাদেশের এই অঞ্চলে শরীয়াহর মূলনীতি ও রূপরেখা অনুসরণ করে জিহাদ করবে, উপমহাদেশের মুসলমানদের সামনে যোগ্য নীতিবান নেতৃবৃন্দকে পেশ করবে এবং এই অঞ্চলে ইমাম মাহদি রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বাহিনীর ভিত্তি স্থাপন করবে। এটা বহুদিন থেকেই তাদের স্বপ্ন ছিল, যার কারণে কখনও তারা গোত্রীয় অঞ্চলের মুজাহিদীনের মাঝে সন্ধি স্থাপন, ঐক্য সাধন ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ নিরসনের চেষ্টা করতেন; আবার কখনও পাকিস্তানের শহর এলাকা ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মুজাহিদীনকে একত্রিত করে তাদেরকে পুরোপুরি সমন্বিত ও একমুখী করার চেষ্টা করতেন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর প্রশংসনীয় গুণাবলির কথা শুনে তানজীমের নেতৃবৃন্দের এই আশা তৈরি হয়, সম্ভবত মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের উপর মুজাহিদীনকে একত্রিত করা, তাদের অবস্থার সংশোধন করা, দ্বন্দ্ব বিবাদ নিরসন করা এবং অতঃপর নিজেদের মধ্যকার ছোটখাটো সকল

[299]

দ্বন্দ্ব বিবাদ এড়িয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমন্বিত ও একমুখী আন্দোলনের মাধ্যমে বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদেরকে শক্ত অবস্থানে দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

কেনান ভূমির হীরক মানব শায়খ আবু দুজানা পাশা রহিমাহুল্লাহ
তানজীমের শীর্ষ নেতৃত্ব ২০১২ সালের শেষ দিকে মিশরের আলেমে দীন শায়খ আবু দুজানা পাশা রহিমাহুল্লাহকে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের সার্বিক বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই সঙ্গে তাকে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের মাঝে একতা তৈরি, ঐক্য সাধন প্রচেষ্টা সফল করার এবং চিন্তা ক্ষেত্রে ও কার্যক্ষেত্রে সকল প্রকার দ্বন্দ্ব বিবাদ নিরসন করে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সফল করার দায়িত্বও প্রদান করা হয়। উত্তম গুণাবলির প্রতীক শায়খ আবু দুজানা পাশা রহিমাহুল্লাহকে আকাবির আরব (শীর্ষস্থানীয় আরব) মুজাহিদীনের মাঝে গণ্য করা হতো। তিনি মিশরে জিহাদের পতাকা সমুন্নতকারী আন্দোলন জামাআতুল জিহাদের একজন কার্যকরী সম্পাদক ও সক্রিয় যোদ্ধা ছিলেন। পরবর্তীতে রুশ জিহাদের শেষ সময়ে আফগানিস্তানে তিনি হিজরত করেন এবং মুজাহিদীনের সামরিক প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রুশ বাহিনীর পরাজয়ের পর মুজাহিদীন যখন তাজিকিস্তানে আল্লাহর দীনের শত্রু সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ করে, তখন তিনিও ওই বাহিনীর প্রথম সারিতে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে তালেবান আমলে বৈশ্বিক কুফরী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধেও তিনি তালেবানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন।

[300]

ওই সময়টাতেই যুদ্ধাবস্থায় এক গোলার আঘাতের তার এক পা কেটে ফেলতে হয় কিন্তু তবুও অটলতা ও অবিচলতার এই মূর্তপ্রতীক কিছু মাত্র পিছিয়ে পড়তে রাজি ছিলেন না; বরং পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে জিহাদী দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন। ওই সময়েই কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর একজন পুণ্যবতী কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ২০০১ সালে যখন বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালায় এবং ফখরে উম্মত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনকে পিছু হটে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের নকশা তৈরির হুকুম দেন, তখন অন্যান্য মুজাহিদের মতো তিনিও আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে পড়ে ইরানের দিকে চলে যান। ইরান তার ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার ধারাবাহিকতা স্বরূপ যখন আরব মুজাহিদীনকে কোণঠাসা করে ফেলে এবং শত শত আরবকে গ্রেফতার করে, তখন শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহ বন্দী ব্যক্তিদের মাঝে শামিল ছিলেন। প্রায় এক দশক সময়কাল পর্যন্ত ইরান সরকারের কাছে বন্দী থেকে ২০১১ সালে যখন তিনি মুক্তি লাভ করেন, তখন পেশোয়ারের ইরানি দূতাবাস টার্গেট করে সেখানকার কর্মকর্তাদেরকে জিম্মি করে মুক্তিপণ স্বরূপ আল-কায়েদার মুজাহিদীন ইরানে বন্দী শত শত সহযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারকে মুক্ত করে দেয়ার দাবি জানায়। বন্দী থাকা অবস্থায় শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহর ওপর আল্লাহ তাআলার এই বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি সেখানে উপস্থিত উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে রীতিমতো পাঠ পাঠ অধ্যায় অধ্যায় আলাদা করে একাডেমিক পন্থায় শরীয়তের ইলম অর্জন করেন। তার ইলমি অবস্থান ও গভীরতার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আলেমে দীন শায়খ আবু ইয়াহিয়া লীবী রহিমাহুল্লাহও স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং

[301]

শরীয়তের বিভিন্ন রায় ও ফাতওয়া দানের পূর্বে পরামর্শের জন্য তিনি শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহ -এর শরণাপন্ন হতেন। ইরান সরকারের কাছ থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি ওয়াজিরিস্তানে তাশরীফ নিয়ে যান। খোরাসানে উপস্থিত আল-কায়েদার দায়িত্বশীল হযরত শায়খ আবু ইয়াহিয়া লীবী রহিমাহুল্লাহ তাকে তানজীমের শুরা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি তানজীম আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বের কাউন্সিল লাজনাতু বুখারী'র সদস্য এবং পাকিস্তান বিষয়ক দায়িত্বশীল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে ‘জর্বে উজব’ নামক পাক মার্কিন যৌথ নৃশংস অপারেশনে মার্কিন ড্রোন বিমানের বোমাবর্ষণে তিনি প্রকৃত স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে মিলিত হন। আল্লাহ তাআলা কেনানভূমি তথা মিশরের এই হীরক তুল্য মানবের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, আমীন।

শায়খ আবু দুজানা পাশা রহিমাহুল্লাহ যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন পাকিস্তানি মুজাহিদীনের জিম্মাদার ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শুরু করেন। তাজিকিস্তানের জিহাদ এবং তালেবানের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে কাজ করার সুবাদে কিছু পাকিস্তানি মুজাহিদের সঙ্গে তার আগে থেকেই ভালো সম্পর্ক ছিল। ঐ মুজাহিদীনের মাঝেই মুলতানের অধিবাসী, অবিচলতা ও অটলতার প্রবাদ পুরুষ কমান্ডার কারী ইমরান উবায়দুল্লাহ

49শহীদ

49 ক্বারী ইমরান সাহেবের আসল নাম মাওলানা ওবায়দুল্লাহ। মুলতান জেলার একজন আলেমেদ্বীন তিনি। মুলতানের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা জামিয়া খাইরুল মাদারিস থেকে তিনি শিক্ষা সমাপন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে কাশ্মীর জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তালেবানের পতনের পর আরব মুজাহিদীনের সহযোগিতায় পাশে দাঁড়ানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময় আই এস আই'র লোকদের হাতে গ্রেফতার হন। কয়েদ অবস্থায় অনেক জুলুম অত্যাচারের মুখোমুখি হন কিন্তু ইসলামের মহত্বের ব্যাপারে কিছু মাত্র ছাড় দিতে রাজি হন না। কয়েদ থেকে মুক্ত হবার পর পাকিস্তান জিহাদ সংগঠিত করার জন্য সহযোদ্ধাদেরকে একত্রিত করেন। শত শত মুজাহিদকে তিনি শহুরে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। আফগানিস্তানেও তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দান করেন। আলকায়দা উপমহাদেশ গঠিত হবার পর তিনি আফগানিস্তান শাখার দায়িত্বশীল এবং শুরা পরিষদের সদস্য হন। “জরবে ওজব” অপারেশন চলাকালে মুজাহিদীনের সামরিক নেতৃত্ব দেন। তিনি

[302]

রহিমাহুল্লাহ এবং করাচির উস্তাদ মুহাম্মাদ হানিফ জেরার[50] শহীদ রহিমাহুল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই হযরত পাকিস্তানি গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের মাঝে গণ্য হতেন। তাই পূর্বপরিচয়ের কারণে শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে পাকিস্তানি সাথিদের খুব দ্রুতই সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এবং তাদের মাঝে

সাহসিকতা বীরত্ব ও পরিচালনা -যোগ্যতায় অতুলনীয় ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে ফারুক ভাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাহাদাতের কিছুদিন আগে ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকান ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন ! আমীন!!

[50] মুজাহিদীনের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক স্নেহশীল নেতা উস্তায মুহাম্মদ হানিফ "ভাই জেরার" নামে পরিচিত ছিলেন। আলকায়িদা উপমহাদেশের কেন্দ্রীয় শুরা পরিষদের সদস্য এবং একজন কেন্দ্রীয় সামরিক নেতা ছিলেন। করাচির অধিবাসী জেরার ভাই যুবক বয়সের শুরু থেকে নিজেকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেন। পাকিস্তানি জিহাদী সংগঠনের প্রশিক্ষণ শিবিরে ট্রেনিং নেয়ার পর তিনি তালেবানের ইসলামী সরকারের প্রথম সময়টাতে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। আরব মুজাহিদীনের প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষক শাইখ আবু আতা তিউনুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে তিনি সামরিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ওই প্রশিক্ষণের কারণে একদিকে তিনি যুদ্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক হয়ে ওঠেন অপরদিকে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের চিন্তা তার মাঝে ভালোভাবে স্থান করে নেয়। তালেবানের ইসলামী সরকারের আমলে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে উত্তর আফগানিস্তানের কয়েকটি রণাঙ্গনে তিনি প্রথম সারিতে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অপরদিকে কাশ্মীর জিহাদের মুজাহিদীনকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য আজাদ কাশ্মীরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতেও দীর্ঘ সময় ধরে শত শত মুজাহিদকে যুদ্ধের বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা দান করেন। তিনি সাহসিকতা ও ঈমানি আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মৃত্যুভয় ও কাপুরুষতা যেন তার অভিধানেই ছিল না। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহে যুক্ত হবার পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের জন্য আকাবীর উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতেন। হযরতে আকদাস মুফতি রশিদ আহমদ (নাওয়ারাল্লাহ মার্কাদাহু)'র হালকায়ে এরাদাতে তিনি শামিল ছিলেন। <<(((১৭৪ নম্বর পৃষ্ঠার শুরুর দিক থেকে ৮ নম্বর লাইন)))>>। হযরত ওয়ালা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে খুবই ভালবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা পর্যন্ত তিনি ইসলাম প্রতিরক্ষার জন্য কোমর বেঁধে কাবুলের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করেন। মার্কিন হামলার সময় আরব প্রশিক্ষক — বিশেষ করে দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয়ের মূর্ত প্রতীক শাইখ আবুল ফারাজ লিবি (আল্লাহ তাকে কয়েদ থেকে মুক্তি দান করুন)'র নির্দেশে করাচি চলে যাবার পর পাকিস্তানে আমেরিকা এবং তাদের তাবেদারদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ পান। তিনি আপন সহচর ও নেতা - ভাই ইমরান (হাজী অলিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র সঙ্গে মিলে করাচিতে আমেরিকান সেনাবাহিনী এবং তাদের ফ্রন্ট লাইন জোটের ওপর হামলার পরিকল্পনা করেন। "হরকাতুল মুজাহিদীন আল আলামি" নামে তিনি একটি গ্রুপ গঠন করেন। এভাবেই পাকিস্তান জিহাদের অগ্রসৈনিকদের মাঝে তার নাম চলে আসে। করাচিতে তিনি এবং তার সহযোদ্ধাগণ মার্কিন দূতাবাসে ২০০২ সালের জুন মাসে হামলা করেন। এরপর দ্বীন ও জাতির শত্রু আমেরিকার গোলাম পারভেজ মোশারফের ওপর হামলার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিকালে গ্রেফতার হন। তার ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মোকাদ্দমা চালানো হয়। তিনি আদালত কক্ষে প্রকাশ্যে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কারণে গর্ব প্রকাশ করেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমরা যা কিছু করেছি তা কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণে করেছি। এ কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনানো হয় এবং আদালত চলাকালে তিনি তাকবির ধ্বনি দেন, আর শাহাদাতের আনন্দে তার চেহারা ঝলমলিয়ে ওঠে। প্রায় এক দশক সিন্ধু প্রদেশের কারাগারে কাটানোর পর আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্তি দান করেন। মুক্তি লাভের পর করাচিতে তিনি সহযোদ্ধাদেরকে সংঘটিত করেন, দাওয়াতি প্রোগ্রাম করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সাথীদেরকে নিয়ে

আস্থা পূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। অতঃপর শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহ নিজের উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক উৎকর্ষের দিক থেকে এমন এক উচ্চ আবস্থানে ছিলেন যে, তার মজলিসে অংশগ্রহণকারী সকলেই তার প্রতি ভক্ত অনুরাগী হয়ে যেত। বড়দেরকে সম্মান করা এবং ছোটোদেরকে স্নেহ করার নববী গুণ বিশেষভাবে আমরা শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছি। জিহাদী জীবনে বহু আগেই অংশগ্রহণ করা, শরীয়তের ইলম, সামরিক পারদর্শিতা এবং নেতৃত্ব ও পরিচালনার যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি এতটাই বিনয় প্রদর্শন করতেন যে, তাকে দেখে সালফে সালেহীনের কথা মনে পড়ে যেত। এক কথায় খুব অল্প সময়ের ভেতরেই শায়খ আবু দুজানা পাশা রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানি জামাতগুলোর জিম্মাদার ও নেতৃবৃন্দের কাছে এমন একজন প্রিয়ভাজন নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন যে, তার নির্দেশগুলো পালন করাকে প্রত্যেকেই নিজের জন্য সৌভাগ্য বলে মনে করতো।

জামাতের ইমারত বা নেতৃত্ব
পাকিস্তানি জামাতগুলোর দায়িত্বশীলদের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমেও শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহ মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ-এর

ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন। হাজী অলিউল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে ওয়াজিরিস্তানে একটি জিহাদী গ্রুপ গঠন করা হয় এবং পুনরায় তিনি মুজাহিদীনের প্রশিক্ষণ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সে সময় করাচিতে তিনি বড় পরিসরে জিহাদের দাওয়াত দেন এবং শতশত লোককে ওয়াজিরিস্তানে ডেকে এনে সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ দেন। আলকায়দা উপমহাদেশ গঠিত হবার পর তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, পুনরায় পাকিস্তানের সামরিক কাজের সহকারী দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত হন। সেই সঙ্গে আমির মুহতারাম মাওলানা আসিম ওমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ সহযোগী হন। তিনি করাচি শহরে দ্বীনের শত্রু আমেরিকার গোলাম বিভিন্ন সামরিক সংস্থা এবং মুসলিমদের জান-মালের শত্রু দুষ্কৃতিকারী এম কিউ এম দলের নীতি নির্ধারকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি সফল হামলা করেন। আফগানিস্তানে এক সংঘর্ষে ক্রুসেডরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় তার যুবক পুত্র সাইফুল্লাহ জেরার শাহাদাত বরণ করেন। দক্ষিণ পশ্চিম আফগানিস্তানে তার উপরেও ক্রুসেডাররা ফাঁদ পেতে হামলা করে এবং রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তাকে ঘেরাও করে আত্মসমর্পণ করতে বলে। তিনি মার্কিন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে গর্জন ছাড়েন এবং উচ্চ আওয়াজে তাকবীর ও কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়তে পড়তে ক্রুসেডারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি গ্রেনেডের মাধ্যমে আমেরিকানদের উপর হামলা করেন। এর জবাবে শত্রুদের ফায়ারিংয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে প্রায় তিন দশক যাবত প্রতিকূলতা কাটিয়ে জিহাদ ও লড়াইয়ের ময়দানে অবিচল থাকার পর তিনি আপন রবের সঙ্গে মিলিত হন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

[304]

উন্নত গুণাবলি ও নৈতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে আরও অধিক অবগতি লাভ করেন। তাই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এই দুই হযরতের পারস্পরিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। এই সাক্ষাতের ফলে তারা একে অপরকে আরও ভালোভাবে চিনতে পারেন, জানতে পারেন এবং তাদের মধ্যে আস্থা-বিশ্বাসের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠ। এরপর শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর মাঝে আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় এবং বেশ কিছু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে কিছু কিছু বৈঠক এমন ছিল, যেগুলোর একেকটা শেষ হতেই কয়েকদিন লেগে যেত। ওই সাক্ষাৎগুলোতে ইলমি, ফিকহী বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভিন্ন বিষয়, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সহ চিত্তাকর্ষক আরও বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হতো। ওই বৈঠকগুলোতে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহর হাতে কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর আনুগত্য মেনে নিয়ে শরীয়াহর সীমারেখার ভিতরে থেকে যথাসাধ্য জিহাদ করার বায়আত প্রদান করেন।

যেমনটা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তানজীমের আকাবির ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ইচ্ছা ছিল, তাদের হাতে বায়আতকৃত উপমহাদেশের মুজাহিদীনকে একটি জামাতের আদলে সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠিত ও একতাবদ্ধ করে শরীয়ত অনুসরণের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক জিহাদের অংশ বানানো। শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহর চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে জিম্মাদার সাথি ও দায়িত্বশীলগণ এই কাজের জন্য প্রস্তুত থাকার, জীবন বিসর্জন দেয়ার এবং যেকোনো প্রকার ত্যাগ-তিতিক্ষার স্বীকার করার জন্য তৈরি হয়ে যান। ওই জামাআতের নেতৃত্ব ভার গ্রহণের জন্য সকলের দৃষ্টি মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর দিকে ফিরে যায়।

[305]

স্বয়ং শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহ দায়িত্বশীল সকলের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে পরামর্শ করেন এবং শায়খ আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহর নিজেরও রায় ছিল মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর দিকে। সেই মর্মে তিনি জামাতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে নিজের মত ব্যক্ত করেন। অতঃপর এই সকল পরামর্শের বিষয়গুলো কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। তাই ঐ সকল পরামর্শের আলোকে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ ২০১৪ সালের শুরুর দিকে জামাআত আল-কায়েদা উপমহাদেশের গোড়াপত্তন করেন এবং মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহকে এই জামাতের আমীর নিযুক্ত করেন।

আমীর নিযুক্ত হবার পর থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর সময়কালে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ ধৈর্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা, অটলতা, অবিচলতা, সাহসিকতা, বীরত্ব, ঈমান ইয়াকীন এবং সাথিদেরকে সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা দানের মাধ্যমে সুচারুভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ بلغت القلـوب الحنـاجر - তথা প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও আল-কায়েদা উপমহাদেশকে শক্ত হাতে ধরে রাখেন, টিকিয়ে রাখেন। তিনি জামাআতকে সুশৃঙ্খল রাখেন, শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ এবং সুস্থ রুচিবোধ অনুযায়ী জামাতের গতিপথ নির্ধারণ করতে থাকেন। বিভিন্ন অবস্থা, নানা সমস্যা, অনেক রকম পরীক্ষা মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথি -সহযোদ্ধাদের গতিরোধ করতে চেষ্টা করেছে। সমকালীন জিহাদে এত দুঃখ দুর্দশা ও কঠিন অবস্থা অন্য কোনো গ্রুপের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু উম্মাহর এই নেতা আপন বাহিনীকে সকল প্রকার অন্ধকার ও তুফানের মধ্যেও

অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন, তাদের হিম্মত উঁচু করেছেন, তাদের ঈমানকে বারংবার জাগ্রত করেছেন, পদস্খলন ও পিছলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন এবং জাগতিক ভোগ বিলাস ও তাগুতি প্রস্তাবনা ও অফারের কাছে হেরে যাওয়া থেকে দূরে রেখেছেন। অবশেষে ভারতের মুরাদাবাদ থেকে আগত উম্মাহর এই বীর বাহাদুর সন্তান দেশের গ্রামে গ্রামে আল্লাহর দীনের মশাল জ্বালিয়েছেন, ঈমানের পতাকা সমুন্নত করেছেন, আল্লাহর বাণীর ও রাসূলের বাণীর স্লোগান উচ্চকিত করেছেন, মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের কবিতা আবৃত্তি করেছেন, জিহাদ ও দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে নেতৃত্ব দান করেছেন, খোরাসানে নৃশংস মার্কিন হামলা প্রতিরোধে লড়াই করে নিজের দুইজন অল্পবয়সী পুত্র এবং আরো সাতজন সাথি সহকারে এই অস্থায়ী পৃথিবী ত্যাগ করে স্থায়ী জগতে চলে গিয়েছেন— আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের একজন সরদার হিসেবে তাকে কবুল করুন, আমীন।

শহীদ আমীরে মুহতারাম রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বকালের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের এই কিতাবের মৌলিক বিষয়বস্তু — উস্তাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর সীরাত তথা জীবন কর্ম— থেকে আলাদা স্বতন্ত্র এক বিষয়বস্তু বলে মনে হয়। অবশ্য শহীদ মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা এই কারণে জরুরি যে, মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ ছিলেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নির্বাচিত ও মনোনীত ব্যক্তিত্ব। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তাকে নিজের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের সামনেও তাকে নেতা হিসেবে রেখে গেছেন। তাই তো এমন নেতা ও সরদারের কিছু গুণ ও ভালো দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত

[307]

আলোচনা করা এই এই কিতাবে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আশা রাখছি।

কিছু এমন গুণ যা শুধু তার মাঝেই পাওয়া যায়

** আকাশচুম্বী চিন্তাধারা

মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ খুবই উচ্চ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। কোন অঞ্চল বা মাতৃভূমির সীমানার ভেতর থেকে সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা পোষণের বিরোধী ছিলেন তিনি। তার সঙ্গে মুহসিনে উম্মাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ-এর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিকোণের মাঝে বড় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বরং এভাবেও বলা যায়, সম্ভবত মাওলানা সাহেবের এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা ছিল বলেই তিনি তানজীম আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বৈশ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণে তার সঙ্গে আল-কায়েদার অন্য নেতৃবৃন্দের আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।

বিদ্যমান কুফরী ব্যবস্থা নিয়ে গভীর অধ্যয়ন এবং দাজ্জালের ফিতনার গোলক ধাঁধা ও প্যাঁচানো পথ জানার পর মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর কাছে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, গোটা পৃথিবীতে আমাদের শত্রু অভিন্ন এবং ওই শত্রুই প্রতিটি অঞ্চলে মুসলিম উম্মাহর ওপর চাপিয়ে দেয়া ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ এমনটা মনে করতেন যে, ইহুদী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা সহ জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধেই আমাদের আসল লড়াই। বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে চলমান যুদ্ধগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বৈশ্বিক [308]

জিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখবো; বিচার না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ফলাফল শূন্যই থেকে যাবে। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত সফলভাবে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা বিশ্বের মুজাহিদীনের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন না ঘটবে, তারা একতাবদ্ধ না হবে, তাদের মাঝে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও ভালোবাসা পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত না হবে। তাদের এই ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্য এমন হতে হবে যে, ইয়ামেনে থাকা আরব মুজাহিদ ইয়ামেনে বসে উপমহাদেশের জিহাদে সাহায্য-সহযোগিতা করবে; এমনিভাবে উপমহাদেশের মুজাহিদ উপমহাদেশে বসে সিরিয়ার জিহাদে শত্রুপক্ষের স্বার্থগুলোকে উপমহাদেশে বিনষ্ট করবে। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর পরিপক্ক চিন্তা এমন ছিল যে, গোটা বিশ্বে চলমান জিহাদী আন্দোলনগুলোকে সমন্বিত ও একমুখী বানিয়ে একক নেতৃত্বের অধীনে কাজ করানোর দ্বারা ইহুদী বিশ্ব, তাদের হাতে তৈরি পৃথিবীর নকশা এবং তাদের পরিকল্পিত বৈশ্বিক প্যাটার্ন মুছে যেতে আরম্ভ করবে। তখন ইহুদীরা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি তৈরির পরিকল্পনায় ব্যর্থ হবে এবং এমন এক নতুন ইসলামী জগৎ অস্তিত্ব লাভ করবে, যা ইহুদীদের বানানো রাষ্ট্রীয় সীমান্তের বাধা লংঘন করে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'

51 তথা আল্লাহর
জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদের সীমারেখা এঁকে দেবে। বাস্তবিক পক্ষে তার এই চিন্তা এমন এক অশ্রুত স্লোগান ছিল, ৯০ এর দশক থেকেই কায়েদে জিহাদ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ যা ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল আমেরিকা ও ইসরাইলের নেতৃত্বে

51 অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি, জাতি, স্বদেশ ইত্যাদির সঙ্গে আল্লাহর জন্যই সম্পর্ক স্থাপন করা এবং আল্লাহর জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করা

[309]

প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বিক জায়নবাদী ক্রুসেডার জোটের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীতে যুদ্ধের ঘোষণা। জায়নবাদী ও ক্রুসেডার চক্র গোটা উম্মাহর শত্রু এবং তাদের কুফরী ও দুষ্কৃতির ব্যাপারে গোটা উম্মাহ একমত। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হওয়ার বিধান সম্পর্কে সকলেই একমত। এখন তাদের স্বার্থ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই গোটা উম্মাহকে একত্রিত করে বৈশ্বিক কুফরী জোটের বিরুদ্ধে রণাঙ্গন প্রস্তুত করা উচিত। এটাই ছিল আল-কায়েদার সেই মানহাজ, যাকে আমরা কৌশল বলতে পারি, কর্মপন্থা বলতে পারি কিংবা অন্য যেকোনো কিছু বলতে পারি। তাদের এই মানহাজ আগেও ছিল এখনও রয়েছে। মাওলানা আমীরে মুহতারাম রহিমাহুল্লাহ নিজেও পুরোপুরি উপলব্ধি ও অনুভব সহকারে এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে তিনি অন্যদেরকে সচেতন করতেন এবং তারই ফলে তার রচিত গ্রন্থাবলিতে তিনি এই কর্মপন্থার দিকে ইশারা করতেন। সর্বোপরি এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তিনি তানজীম আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত হন।

নিশ্চয়ই এটা ছিল এক বিশ্বব্যাপী আকাশচুম্বী চিন্তার সারাংশ যা উপলব্ধি করার কারণে তিনি মুজাহিদীনকে অমুসলিম জনসাধারণ, ভ্রান্ত দল এবং বিভিন্ন এলাকা ও অঞ্চলের ছোটো ছোটো টার্গেট থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সাপের মাথা আমেরিকা ও ইহুদীদের সমস্ত স্থানীয় তাবেদার শ্রেণির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে চাইতেন। এ ব্যাপারেই মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ তার এক নসীহত বাণীতে বলেছেন:

« বর্তমান সময়ে যা প্রয়োজন তা হলো, এই বৈশ্বিক জিহাদী কাফেলাকে সঠিক মানহাজ ও কর্মপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা। এখানে প্রথম লক্ষ্য স্থল হচ্ছে কুফরী সরকার ব্যবস্থা এবং তার পক্ষে থাকা সকল শক্তি ও সংস্থা। যদিও বৈশ্বিক কুফরী শক্তি এই সময়ে এমন ষড়যন্ত্র করে রেখেছে যে, বৈশ্বিক [310]

জিহাদ যেন কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সেগুলোকে সুরক্ষা দানকারী শক্তি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যান্য লক্ষ্য স্থল ও টার্গেটের দিকে ফিরিয়ে দেয় ; যেন ইহুদী শক্তি এবং তাদেরকে সুরক্ষা দানকারী সেনাবাহিনী নিজ নিজ দেশে আরামে থাকে এবং মুজাহিদীন ছোটো ছোটো টার্গেটের উপর নিজেদের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে , যার দরুন সরকার ও কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থা দ্বিতীয়বার শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এই কারণে প্রত্যেক মুজাহিদের **উচিত কুরআনের এই মূলনীতি সামনে রাখা যেখানে** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন فَقَـاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْـرِ – "অতএব তোমরা কুফরীর সর্দারদের বিরুদ্ধে লড়াই করো"[52] **শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এই** লক্ষ্যস্থলকেই সাপের মাথা বলে ব্যক্ত করেছেন। তাই কুফরী ব্যবস্থা পরিচালনাকারী শক্তিগুলো এবং প্রত্যেক দেশে এই ব্যবস্থাকে সুরক্ষা দানকারী শক্তিগুলোই মুজাহিদীনের টার্গেট হওয়া উচিত। তবেই গিয়ে এ জিহাদ সফলভাবে আপনযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবে। বর্তমান সময়ে কুফরী শক্তির এই সামর্থ্য নেই যে , সে জিহাদের গতিরোধ করতে পারে। এ কারণেই কুফরী শক্তি চেষ্টা করে যাচ্ছে মুজাহিদীনের জিহাদের গতিপথ পরিবর্তন করে দিতে। »

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক

মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ সৎ কর্মের ব্যাপারে এমন অধ্যবসায়ী ছিলেন যে , তা খুবই আশ্চর্যের বিষয় ছিল। তিনি রাতের ইবাদতকারী এবং দিনের বেলা দুনিয়া বিমুখী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সম্ভবত খুব অল্প সংখ্যক মানুষকেই এমন অর্ধ রজনী জাগরণকারী পাওয়া যাবে , মাওলানা সাহেব

---

52 অতএব এখন কুফরের সর্দারদের বিরুদ্ধে লড়াই করো [সূরা তাওবা , আয়াত নং: ১২]

রহিমাহুল্লাহ যতটা ছিলেন। কখনও কখনও আলাপচারিতা ও কথাবার্তা বলতে বলতে অর্ধেক রাত পার হয়ে যেত এবং ফজরের এক ঘণ্টা আধঘণ্টা আগে ঘুমের সুযোগ মিলতো। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এমন হতো, মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ দোয়া মোনাজাতে কেঁদে কেঁদে সময় পার করতেন আর তার মোনাজাতের আওয়াজে চক্ষু খুলে গেলে আমরা বুঝতে পারতাম, মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাতে লিপ্ত রয়েছেন। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পরে নিজেই আযান দিতেন এবং হালকা আওয়াজে তিলাওয়াত আরম্ভ করে দিতেন। সে সময় আস্তে আস্তে আমাদেরকেও নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার জন্য অত্যন্ত স্নেহভরে ডেকে দিতে আরম্ভ করতেন। এটা তার একটা স্বতন্ত্র আমল ছিল এবং—শীতের দিন হোক কিংবা গরমের দিন; নিরাপত্তার অবস্থা হোক কিংবা যুদ্ধাবস্থা—তিনি এই আমল পালন করতে কখনও ত্রুটি করতেন না। মাওলানা সাহেব হাফেজ হওয়ার পাশাপাশি খুবই সুরেলা কন্ঠের অধিকারী কারী ছিলেন এবং তার তিলাওয়াতে এক বিশেষ উত্তাপ পাওয়া যেত। আপন সাথিদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন এবং নিজে বাস্তব নমুনা হবার পাশাপাশি অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে আপন সাথিদের দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা করতেন। মুজাহিদ ভাইদেরকে একবার নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন:

« আল্লাহর আদেশ সমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি অধিক পরিমাণে নফল আমল বিশেষ করে তাহাজ্জুদ... সুবাহানাল্লাহ এই তাহাজ্জুদ তো উম্মাহর জন্য অনেক বড় হাদিয়া; এই তাহাজ্জুদে রয়েছে শোকাহতদের দুঃখের নিরাময়, পোড়া ও তিক্ত হৃদয়ের জন্য আশা এবং স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার নতুন

[312]

ঠিকানা। অতঃপর জিহাদী রাত ... সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা কতটা প্রেম ভালোবাসা মেখে ইরশাদ করছেন :

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

অর্থ : "তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।"[53]
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

অর্থ : "তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত,"
** "রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করতো,[54]

এর সঙ্গে যদি চাশতের নামায থাকে তাহলে তো আরও বড় সৌভাগ্যের কথা (যারা এই আমল করতে পারবে তারা অনেক বড় সৌভাগ্যবান) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আল্লাহর যিকির, বিভিন্ন তাসবীহ আদায়, তিলাওয়াতে কুরআন ... কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই আমলগুলো সর্বদা চালিয়ে যাওয়া হলো মূল বিষয়। এর জন্য উলামায়ে কেরামের তাযকিয়া ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক সমস্ত ওয়াজ নসীহত শুনতে হবে, এই বিষয়ক কিতাবাদী পাঠ করতে হবে এবং নিজের আশপাশের পরিবেশকে ইবাদত ও যিকিরের অলঙ্কার দ্বারা সাজিয়ে তুলতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে এবং এ অঙ্গনে আরও অগ্রসর হওয়া যাবে »

[53] অর্থ : তারা নিজেদের পার্শ্বকে শয়নের বিছানা থেকে পৃথক রাখে (এই অবস্থায় যে,) তারা নিজেদের রবকে ডাকে .. [সূরা আলিফ লাম মিম সাজদা, আয়াত নং: ১৬]

[54] "তারা রাতে স্বল্পই নিদ্রা যাপন করে এবং দিবসে ইস্তেগফার করে" [সূরা যারিয়াত : আয়াত নং: ১৭ ও ১৮]

ইসলামী সভ্যতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের পুনর্জীবন দান
মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ একটা বিষয়ে খুবই উৎসাহী আহ্বায়ক ছিলেন এবং নিজেও সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে বলেন, যেখানেই তারা যাবেন সেখানে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করবেন, সুন্নত সমূহের প্রচলন ঘটাবেন এবং নিজেদেরকে উত্তম আখলাক ও উৎকৃষ্ট চারিত্রিক নমুনা তুলে ধরবেন। যেখানে তারা অন্যান্য সুন্নত ও উত্তম গুণাবলির অনুসরণের নসীহত করবেন সেখানে দানশীলতা ও মেহমানদারির ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেবেন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ অধিকাংশ নসীহতে এ কথা বলতেন যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে ওই সমস্ত লোকের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই যাদের মাঝে দানশীলতা ও মেহমানদারীর গুণ না থাকবে। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ সালফে সালেহীন-এর মেহমানদারী আতিথেয়তা ও দানশীলতার অত্যাশ্চর্যজনক বিভিন্ন ঘটনাবলী শোনাতেন এবং সাথিদেরকে বর্তমান পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক প্রবণতার আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থন্বেষী প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকার নসীহত করতেন। অতঃপর আসল নসীহত সেটাই হত যা তিনি নিজে পালন করে দেখাতেন। মেহমান ও অতিথিদের জুতা সোজা করা, তাদের হাত ধুয়ে দেয়া, তাদের সামনে গোশতের টুকরা সমেত খাবারের পাত্র রাখা,তাদেরকে আহার করার জন্য পীড়াপীড়ি করা মাওলানা সাহেবের বিশেষ গুণ ছিল। আমরা যখন বলতাম, আমীর সাহেব! হয়েছে তো, এতটা করবেন না, কেন আমাদেরকে লজ্জিত করছেন?” তখন তিনি বলতেন: « আমরা তো আমাদের উস্তাদদের কাছ থেকে এমনটাই শিখেছি। দারুল উলুম দেওবন্দে থাকতে যখন আমরা উস্তাদদের ঘরে যেতাম তখন আমাদের উস্তাদগণ ছাত্রদের জুতো সোজা করে দিতেন। » অতঃপর সালফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও খুবই

[314]

সাদাসিধে খাবার খেতেন এবং অল্প অল্প খেয়েই জীবন ধারণ করতেন। নিজের কাছে ভালো যা কিছু থাকতো তা অন্যদের জন্য নিয়ে আসতেন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর আহার্য দ্রব্যাদি ও পোশাক এতটাই সাদাসিধে ছিল এবং কখনও কখনও পোশাক এতটাই পুরাতন হতো যে, আমরাও লজ্জিত হয়ে যেতাম। বছরের পর বছর ব্যবহৃত পাগড়ী অথবা টুপি কিংবা কাপড় যা ঘষে ঘষে বিভিন্ন জায়গায় রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিমের পদাঙ্ক অনুসরণের আগ্রহে তিনি অন্যদেরকে উৎকৃষ্ট ও ভালো মানের জিনিসগুলো দিয়ে দিতেন কিন্তু নিজে এতটাই দরিদ্রের মতো জীবন-যাপন করতেন যে, কখনও কখনও আমরা চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে যেতাম কিন্তু এই সমস্যার সমাধান আমাদের কাছে থাকতো না। তাই একবার আমি হযরতকে বলে বসি: আমীর সাহেব আপনি তো সাইয়েদুনা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো আপনার পরবর্তী লোকদেরকে সমস্যার মাঝে ফেলে চলে যাবেন”

55

মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন: যেকোনো বিপ্লবের আহ্বায়ক ও আন্দোলনের কর্মীদের অন্তর থেকে দুনিয়ার মুহব্বত বের করে দেয়া অনেক জরুরি। যার অন্তর জাগতিক ভোগ-বিলাসের মাঝে বেড়ে ওঠে সে কুরবানী দেয়ার সময় নিজের জান বাঁচাবার কথা চিন্তা করতে থাকে। এই কারণে দুনিয়ার ভালোবাসা কমানোর কার্যকরী পন্থাগুলোর মধ্যে একটা পন্থা হলো দানশীলতা বাড়ানো, নিজে শুকনো অনুন্নত খাবার আহার করা সাদাসিধে পোশাক পরিধান করা এবং অন্যদেরকে উন্নত মানের খাবার খাওয়ানো, উন্নত পোশাক পরিধান করানো। এমনিভাবে সময়ের দাবি, ওয়াদা-অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি, ওঠাবসা এবং 55 মাওলানা রহমাতুল্লাহি আলাইহির এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো:
যেমনিভাবে সাইয়েদুনা ফারুক-এ-আজম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেসময়ের খলিফা হয়েও সাদাসিধে জীবনের এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা মেনে চলা পরবর্তী লোকদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; এমনিভাবে আপনার অভ্যাস ও জীবনাচারও পরবর্তী লোকদের জন্য মেনে চলা অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

[315]

নিদ্রা জাগরণ —সর্বাবস্থায় সুন্নত সমূহের অনুসরণ করা, মাকরুহাত তথা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় বিষয়াবলী পরিহার করার কথা সর্বদাই মাওলানা সাহেবের নসীহতের মাঝে থাকতো। তিনি বলতেন যে, এগুলো ছাড়া বরকত পাওয়া যেতে পারে না আর বরকত ছাড়া কোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়।

ঈমানী দূরদর্শিতা
মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর একটি বিশেষ
গুণ এই ছিল যে তিনি ঈমানী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সম্ভবত তার লিল্লাহিয়াত, নিষ্ঠা, ইলম, অতঃপর সারা দেশে আল্লাহর দীনের জন্য ঘোরাফেরা করার সৌভাগ্যের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে এই যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, তিনি কোনো এলাকা কোনো ব্যক্তি বা কোনোরূপ অবস্থার ব্যাপারে এমন রায় পেশ করতেন, যা বাহ্যিকভাবে কারও মাথায় ধরতো না এবং সহজে বুঝে আসতো না। কিন্তু বর্তমান সময় পার হয়ে যাবার পর এবং কখনও কখনও কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বুঝে আসতো যে, মাওলানা সাহেবের ওই কথা কতটা সঠিক ছিল। তার এই বিশেষ সিফাত ও গুণের ব্যাপারে কখনও কখনও এমন ধারণা হতো যে, সম্ভবত নৃতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোলের শাস্ত্রীয় জ্ঞান রাখার বদৌলতে তার বিশ্লেষণ এতটা সঠিক হয়ে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পারতাম যে, এটা শুধু তার ঈমানি বাসীরত ও দূরদর্শিতা, যা তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত। কতবার এমন হয়েছে যে, কাউকে আমরা কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়েছি কিন্তু মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ দায়সারা ভাবে দেখেই জানিয়ে দিয়েছেন, এই ব্যক্তি এ কাজ করতে পারবে না। তখন আমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে প্রমাণ চাইতাম। কিন্তু মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ কোনো দলীল প্রমাণ পেশ করতে পারতেন না; শুধু বলতেন এটা আমার

[316]

রায় বাকিটা আপনারা চাইলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখে নিতে পারেন। পরবর্তীতে বছরের পর বছর অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর আমাদের এই উপলব্ধি হতো যে, **আমীর সাহেব রহিমাহুল্লাহর রায় কতটা সঠিক** ছিল। এমনিভাবে কোনো অঞ্চল শহর অথবা গোত্রের ব্যাপারে তার বিশ্লেষণ এতটা সঠিক প্রমাণিত হতো যে, আমরা হতবাক হয়ে যেতাম। অমুক এলাকা সামরিক অঙ্গন হিসাবে অধিক উপযুক্ত, অমুক এলাকা দাওয়াতের জন্য বেশি উপযুক্ত, অমুক গোত্রকে আশ্রয় কেন্দ্র বানানো উচিত আর এই গোত্র ভবিষ্যতে বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদের ভূমি হবে—শুধু কয়েকবারের দেখা-সাক্ষাৎ অথবা কোনো এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার দ্বারাই সেখানকার এমনই অনেক অবস্থা আল্লাহ তাআলা হযরতের সামনে স্পষ্ট করে দিতেন। **আমীর সাহেব রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব নিয়ে যদি** চিন্তা-ভাবনা করা হয় তাহলে নিম্নোক্ত হাদীসের মর্ম আমাদের বুঝে আসে:

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى

অর্থ: "মুমিনের দূরদর্শিতার ব্যাপারে সতর্কিত থেকো নিশ্চয়ই মুমিন আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে।"[56]

আমরা সবাই আহলে সুন্নাহ: আমরা সবাই একতাবদ্ধ

মাওলানা সাহেব **রহিমাহুল্লাহ** যে সময় ওয়াজিরিস্তানে তাশরীফ নিয়ে যান সে সময়ে গোপন এজেন্সির গুপ্তচরদের এবং কিছু অজ্ঞ অথবা নিকৃষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে মাসলাকি ইখতেলাফ (শরীয়তের শাখাগত এমন বিষয়ের মাঝে মতপার্থক্য যেখানে উভয়পক্ষের ব্যাপারে নেকী লাভের ঘোষণা এসেছে কিংবা এমন বিষয়ে মতপার্থক্য যা শরীয়তের মৌলিক বিষয় না হবার কারণে জরুরি মুহূর্তে দৃষ্টি

[56] জামে তিরমিজি

আকর্ষণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।) জারি ছিল। আহলে সুন্নাহর মাঝে বিভিন্ন রকম বিভক্তি তৈরি করার মানসিকতা লালনকারী কিছু হযরত নিজেদের বিপরীত ধর্মীয় ঘরানাকে বিদআতী অথবা আহলে সুন্নত থেকে বহিষ্কৃত বলে আখ্যা দিতে আরম্ভ করে এবং তাদের সঙ্গে মিলে ইবাদত আদায় করা সহ অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক রাখা জায়েয নয় মর্মে ফাতওয়া প্রচার করতে আরম্ভ করে। হানাফী সালাফী হোক অথবা হায়াতি মামাতি—এজাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ককামী স্বভাবের কিছু ব্যক্তি জিহাদের ময়দানেও তাদের স্বভাবজাত বিতর্ক তৈরি করতে চাচ্ছিলো। মুসলিম উম্মাহর বেদনায় নিমজ্জিত মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ এই ফিতনার সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যান এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, এই বিষয়গুলো এখানে জিহাদের ময়দানে যারা ছড়াচ্ছে, এখানে যারা তর্ক বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করছে তারা শুধু জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গেই অপরিচিত নয়, বরং তারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর দীনের শত্রুদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন যে, উম্মাহর উলামায়ে কেরামের মাঝে ফিকহী ইখতেলাফ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রে বিভিন্ন মতপার্থক্য ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলো থেকেই চলে এসেছে। কিন্তু আমাদের আকাবিরীন ও পূর্বসূরিগণ কখনোই মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভেদ বিভক্তি তৈরির কারণ হননি। আহলে সুন্নাহ সর্বদাই এক থেকেছে। আমাদের ইমামগণ ও আকাবিরীন অন্যান্য মাসলাক ও ধর্মীয় ঘরানার ইমামগণকে এবং উলামায়ে কেরামের মতামতকে শ্রদ্ধা করতেন, তাদের সঙ্গে ইবাদত সহ সামাজিক বিষয়াদিতে শরীক থাকতেন, এক পতাকার নিচে সমবেত হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে তারা শক্তি পরীক্ষা করতেন। এর বিপরীতে আল্লাহর দীনের শত্রুরা সর্বদাই এই অপেক্ষায়

[318]

থাকতো, কখন কোনো মতপার্থক্যের বাহানায় তাদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করার সুযোগ পাবে আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের ঐক্য তারা বিনষ্ট করে দেবে। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ সর্বদাই এই ঘটনা শোনাতে যে, পাঞ্জাবের একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আলেমে দীন লাল মসজিদের ঘটনার পরে তার জীবনের সর্বশেষ বিতর্ক সভায় কিছু শাখাগত মতবিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতে উৎসাহ প্রদানকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা এ কথা বলে ছেড়ে দেন যে, এ সমস্ত তর্ক বিতর্কের দ্বারা কোনো কাজ হয় না বরং মুসলিম উম্মাহর মাঝে মতবিরোধ ও শত্রুতাই বৃদ্ধি পায়। অথচ আল্লাহর দীন রক্ষার জন্য অন্যান্য কাজ আরও বেশি জরুরি। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, উক্ত আলেম-এ-দীনের কাছে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী আইএসআ'র ব্রিগেডিয়ার ওই হযরতের সমমানা এবং ধর্মীয় ঘরানায় সহযাত্রী সেজে এসেছে এবং হযরতের কাছে বলেছে, আমাদের আকাবিরদের মাসলাক রক্ষা করার জন্য এই বিতর্কগুলো খুবই জরুরি। যদি আমরা এই বিতর্কে অংশগ্রহণ না করি তাহলে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদের পরাজয়ের কথা ঘোষণা করে দেবে। এমনই আরও বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ রয়েছে যে তারাই মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক কিভাবে উসকে দেয়। কিন্তু ওই মুহতারাম বুযুর্গ আলেম সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন যে, নিজের বাকি জীবন কুফর ও নাস্তিকতার মাথা চূর্ণ করার কাজে ব্যয় করবেন। তাই তিনি ওই ব্রিগেডিয়ারের প্রস্তাব সোজা তার মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করে দেন। তখন আইএসআই'র ব্রিগেডিয়ার কৌশল পরিবর্তন করে ধমকির সুরে বললো: যদি আপনি এমনটা না করেন তাহলে আপনার সাহায্যে যত ছাত্র ওয়াজিরিস্তানে গিয়েছে তাদেরকে সামনে রেখে আমরা আপনার মাদরাসার

[319]

বিস্তারিত তদন্ত ও অনুসন্ধান মিশন পরিচালনা করতে বাধ্য হব।

এক কথায় মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনকে বোঝাতেন যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা মুসলিম উম্মাহর প্রতিরোধ যুদ্ধ এগিয়ে নেয়ার জন্য একতাবদ্ধ হয়ে যান এবং এক লক্ষ-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিজেদের মতপার্থক্যগুলো ভুলে যেতে চেষ্টা করেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, ন্যাটো জোটে পঞ্চাশের বেশি দেশ ধর্ম-আদর্শ-সংস্কৃতির পার্থক্য সত্ত্বেও ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য জোটবদ্ধ হয়ে আফগানিস্তানে এসেছে। কতটা লজ্জাজনক বিষয় যে, আমরা এক রব এক কালিমা এক কুরআন এক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এক কাবা অনুসরণকারীরা ইসলাম রক্ষায় একতাবদ্ধ হতে পারছি না?

মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ মাযহাব ও ইসলামী আইনশাস্ত্রের দিক থেকে হানাফী ছিলেন এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় ঘরানার দিক থেকে উলামায়ে দেওবন্দের আকাবির রহিমাহুল্লাহদের মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় ঘরানার উলামায়ে কেরামের প্রতি তার মাঝে শ্রদ্ধাভাব বিদ্যমান ছিল এবং প্রয়োজনের সময় তাদের রচনাবলী ও লেখালেখি থেকেও তিনি উপকৃত হতেন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ কেন্দ্রগুলোতে ‹ সার বুলান্দ সার বুলন্দ, দেওবন্দ দেওবন্দ › (অর্থাৎ দেওবন্দের জয়জয়কার) এমন স্লোগানের ব্যাপারে সকলকে বলে দেন যে, আমি চাই না, মুজাহিদীনের জামাতে কোনো বিশেষ ধর্মীয় ঘরানার ছাপ থাকুক এবং অন্য ঘরানাকে অপছন্দনীয় বলে বিবেচনা করা হোক; বরং এমন হওয়া উচিত যে, আমরা গোটা উম্মাহর জন্যই সম্পদ। যদি কোনো বেরেলভী মাহবুব সরদারে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সঙ্গে [320]

আসতে চায়, তাহলে আমরা তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নেব। এমনিভাবে কতবার এমন হয়েছে যে, কোনো ভারসাম্যপূর্ণ রুচি প্রকৃতির অধিকারী এবং অন্য ঘরানার ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী কোনো সালাফী ভাইকে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ সালাতের ইমামতি করানোর জন্য সামনে এগিয়ে দিয়েছেন, তার ইমামতিতে নিজেও সালাত আদায় করেছেন এবং অন্যদেরকেও পড়তে বলেছেন। এমনিভাবে যখন কোনো সালাফী ভাই তার কাছে কোনো ফিকহী বিষয় জিজ্ঞেস করে তখন তাকে তাদের ঘরানার উলামায়ে কেরামের রায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। এমনিভাবে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ কখনই কোনো সালাফী ভাইকে তার ধর্মীয় ঘরানা পরিবর্তন করার এবং দেওবন্দের উলামায়ে কেরামেরপন্থা অনুসরণ করার দাওয়াত দেননি। অথচ তিনি নিজে দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের চিন্তাধারা ও অবস্থানকে হক ও সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি বলে মনে করতেন। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন যে, আমরা আমাদের আকাবিরদের কাছ থেকেই শিখেছি, আমরা নিজেদের ঘরানাকে হক বলে মনে করি, কিন্তু এখানে কোনো ভুলের সম্ভাবনাকে আমরা অস্বীকার করি না; একই সঙ্গে অন্য মাযহাবকে ভুল মনে করি, কিন্তু সেখানে সঠিক বিষয় থাকার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করি না। মাওলানা রহিমাহুল্লাহ বলতেন, সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন আমরা অন্য ঘরানার আকাবিরদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি এবং অন্যদেরকে ঘরানা পরিবর্তন করানোর চেষ্টা করি। যদি এই দুটো বিষয় পরিহার করা যায়, তাহলে না কোথাও ঝগড়া হবে আর না পারস্পরিক বিদ্বেষ তৈরি হবে। তখন সকল মুজাহিদ সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সহকারে আল্লাহর দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারবে।

[321]

ইলমী বিনয়
সালফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণকারী মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর আরও একটি বিশেষ সিফাত ছিল তিনি ইলমের অঙ্গনে খুবই বিনয়ের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ইলমে দীনের একটা বড় অংশ দান করেছিলেন কিন্তু তিনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এবং কখনও কখনও কোনো কোনো তালেবুল ইলমের সঙ্গেও পরামর্শ করে নিতেন। আমি তাকে এমন কিছু সাথির সঙ্গে বিশেষ আচরণ করতে দেখেছি যা আশ্চর্যের। ওই সাথিরা বাহ্যিকভাবেই ইলমী অবস্থানে মাওলানা সাহেবের চেয়ে নিচে ছিলেন; শুধু তাই নয় কেউ কেউ তো এমন ছিলেন, যারা ইলমে দীনের একেবারেই প্রাথমিক স্তরের তালিবুল ইলম। মাওলানা সাহেবকে আমি শুনেছি যে, তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন: যদি আমার লেখায় কোনো কথা আপনাদের অসমীচীন মনে হয় তাহলে তা কেটে দেবেন। এমনিভাবে কখনও কখনও তিনি তার চেয়ে ছোটো সাথিদের কাছে কোনো আয়াত অথবা হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন যে, আপনি এর তাফসীর সম্পর্কে কিছু শুনেছেন অথবা পড়েছেন? তাহলে আমাকে অবশ্যই একটু বলুন। যদি এমন কিছু ভবিষ্যতে আপনার সামনে আসে, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। বিনয়ের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রুজু তথা নিজের অবস্থান থেকে ফিরে আসা; অর্থাৎ যদি নিজের কোনো মতের ব্যাপারে পরবর্তীতে জানা যায়, তা সমীচীন ছিল না তাহলে তা থেকে ফিরে আসা এবং সত্য বলার ক্ষেত্রে নিজের দুর্বলতা প্রকাশের ভয়ে লজ্জিত না হওয়া। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর সাথে সাত বছর সময় যাপন করে সবচেয়ে বেশি যেদিন আমি মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছি এবং তার ভালোবাসা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি আমার হৃদয়ে বসে গিয়েছিল সেদিন মাওলানা সাহেবের

[322]

এই রুজু করার সিফাত ও বিনয়ের গুণ আমার সামনে প্রকাশিত হয়।

ঘটনা এরকম। ২০১২ সালের কথা। তখন লাহোরে ফ্যাসাদ হাঙ্গামা বিশৃঙ্খলা ও দুষ্কৃতীর শিকড় গোপন এজেন্সিগুলো এক মুজাহিদের ঘরকে কেন্দ্র করে অ্যাম্বুশ পাতে। সেখানে কিছু মুজাহিদ মোকাবেলা করেন এবং সাহসিকতার সঙ্গে শাহাদাতের পেয়ালা মুখে তুলে নেন। গোপন সংস্থার হতভাগারা এরপরে মুজাহিদীনের ঘরবাসীকে অসম্মান করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে টেনে নিজেদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এক ভাই যখন এই ঘটনা সম্পর্কে ওয়াজিরিস্তানে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে অবহিত করেন তখন তিনি দুঃখে ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে যান। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ তার বুকে গভীর অনুভূতি, তীব্র আবেগ ও প্রাণশক্তি পোষণ করতেন মুসলিম বোনদের সম্মানহানির ঘটনায় দুঃখিত পেরেশান ও ক্রোধান্বিত হওয়া স্বভাবজাত বিষয় এবং ঈমানী আত্মমর্যাদার দাবি ছিল। এই কারণেই মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদ প্রতিনিধিদেরকে ডেকে পাঠান এবং বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করেন। ওই বৈঠকে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ সকল মুজাহিদকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে এবং নিকৃষ্ট শত্রু বাহিনীকে এমন আঘাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, যার দ্বারা ভবিষ্যতে মা-বোনদের উপর হাত উঠাবার আগে তারা চিন্তা করে নেবে। নীতি-নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত গোপন সংস্থাগুলোর এমন কার্যকলাপের কারণে সকলের চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল এবং অধিকাংশ সাথি এই রায় পেশ করেন যে, আমাদেরও উচিত লাহোরে সেনাবাহিনীর কোনো বড় অফিসারের ঘরে হামলা করা এবং তার গৃহে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে সরকারকে এই বার্তা দেয়া যে, আমরা আমাদের বোনদের সম্মানের প্রতিশোধ নিতে জানি। এমন রায়ের ব্যাপারে এক ভাই

[323]

বললেন যে, কোনো সেনা অফিসারের গৃহে হামলা করার দ্বারা তো এমন আশঙ্কা রয়েছে যে, ঘরবাসী ও ওই হামলায় মারা যাবে” কিন্তু ওই সময় মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ সহ উপস্থিত অন্যান্য সাথি আবেগ ও জযবায় এতটাই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, ওই ভাইয়ের কথার জবাবে বলে উঠলেন, « যদি মারাও যায় তাহলেও ভালো। তারা যে জুলুম ও নৃশংসতা চালিয়েছে, মুজাহিদ ভাইদের গৃহবাসীদের সঙ্গে তারা যা করেছে, তার চেয়ে তো কম হবে।”

ওই মজলিসের কিছুদিন পরে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ আমাদের গরীব খানায় কুশল জিজ্ঞাসা করার জন্য আগমন করেন। রাতে খাবার পর যখন চলে যাবেন, তখন আমি আলাদাভাবে গিয়ে বলি, মাওলানা সাহেব! ঐদিন মজলিসে আপনি যা বলেছিলেন তার দ্বারা মুজাহিদীনের মাঝে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। যদি আমরা এভাবে আবেগের বশবর্তী হয়ে শত্রুদের গৃহেই তাদেরকে টার্গেট বানাই, তাহলে একে তো ইচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা আমাদের পবিত্র শরীয়তে নাজায়েয; অপরদিকে এভাবে প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপের ধারা যদি জারি হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে বিশৃঙ্খলার অনেক বড় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে—যা বন্ধ করা কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না। তখন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর মহানুভবতা এই ছিল যে, তিনি মাথা নত করে পুরোপুরি মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনছিলেন। আমার কথা শেষ হবার পর বলে উঠলেন: আল্লাহ ক্ষমা করুন! আমার দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছে। অতএব আমি সংশোধনের চেষ্টা করছি। তাই পরের দিন পাকিস্তানের জামাতগুলোর দায়িত্বশীলদেরকে জরুরি ভিত্তিতে তলব করেন। সকলকে দ্বিতীয়বার একত্রিত করে ভূমিকা মূলক আলোচনা শেষ করার পর এ বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং বলেন: “এক ভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমাদের ওই দিনের বৈঠকে যে আলোচনা হয়েছে তা

[324]

সমীচীন ছিল না। আমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু ভুল করে ফেলেছি। সঠিক বিষয় তো হলো যেখানে নারী শিশুদের মারা যাবার সম্ভাবনা থাকবে সেখানে কোনো অপারেশন পরিচালনা করা উচিত হবে না বরং তার বিপরীতে নৃশংসতাকারী জালেমদের থেকেই সরাসরি প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করা উচিত। তার একটা পন্থা এই হতে পারে যে , নির্যাতন নিপীড়নের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী আইএসআই 'র কোনো কেন্দ্রে আত্ম উৎসর্গমূলক আক্রমণ পরিচালনা করা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে এই বার্তা ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে যে, আমরা নিজেদের ওই সমস্ত বোনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই আক্রমণ করেছি , যাদেরকে আইএসআই এবং অন্য গোপন সংস্থাগুলোর সেলগুলোতে টর্চার করা হয়েছে এবং সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে ; কিন্তু এই উদ্দেশ্যের জন্য শত্রুদের নারী শিশুদেরকে কখনোই টার্গেট বানানো উচিত হবে না »

উপস্থিত সকলেই মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর এই নসীহত অন্তরের অন্তস্থল থেকে কবুল করে নেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর এই বিনয় এবং আমার মতো নাদান ব্যক্তির নসীহতের কারণে নিজের অবস্থান পরিবর্তনের সিফাত এমনই প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে , আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে এবং মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও ভালোবাসা আমার অন্তরে আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত সুন্দর করে ইরশাদ করেছেন :

«مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»

অর্থ : "কোনো ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নত হলে আল্লাহ অবশ্যই তার মর্যাদা উন্নীত করে দেন। "[57]

---

[57] সহীহ মুসলিম

রচনাকর্ম
মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ মৌলিকভাবে আল্লাহর দীনের একজন দাঈ ছিলেন। একদিকে বয়ান বক্তৃতা খুতবা আলোচনা, ইলমী বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করার দ্বারা তিনি আল্লাহর দীন ও জিহাদের কাজ করেছেন, অপরদিকে রচনা ও লেখালেখির অঙ্গনেও তিনি অনেক পুস্তিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করে আল্লাহর পথে দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব পালন করেছেন। মাওলানা সাহেবের সকল প্রকার দাওয়াতী কাজের আলোচনা সম্ভবত এখানে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না; কিন্তু তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নাম এখানে উল্লেখ করা আমাদের এই গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে বলে আশা রাখছি।

০১. তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল

০২. বারমুডা ট্রি অ্যাঙ্গেল এবং দাজ্জাল

০৩. ইমাম মাহদির দোস্ত দুশমন

০৪. দুই জীবন ব্যবস্থার সংঘাত: ইসলাম নাকি গণতন্ত্র

০৫. দাওয়াতে খেলাফত এবং মানহাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

০৬. পতনের দ্বারপ্রান্তে পশ্চিমা সভ্যতা: সূরাতুল আসরের আলোকে

০৭. দারুল হারব দারুল ইসলাম এবং সমকালীন রাষ্ট্রগুলো (অপ্রকাশিত)

০. মুওয়ালাতের বিষয়বস্তুর উপর রচিত একটি গ্রন্থ (অপ্রকাশিত)

০৯. কিতাল এবং মানহাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (অপ্রকাশিত)

[326]

মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর হাতে জিহাদের বায়আত
উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ দীর্ঘদিন
ধরে এমন কারও খোঁজ করে যাচ্ছিলেন, যার ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে মুজাহিদীন একতাবদ্ধ হবে এবং যিনি শরীয়তের অনুসরণের ভিত্তিতে মুজাহিদীনের ওই বাহিনীকে একতার সাথে পরিচালনা করতে পারবেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যখন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে পেয়ে গেলেন, তখন সেই অমূল্য রত্নের অভাব আর রইল না, যার খোঁজে তিনি জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কাঙ্ক্ষিত জিনিস পেয়ে যাবার পর তিনি বিলম্ব করলেন না বরং নিজেই অগ্রসর হয়ে হযরত মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর হাতে জিহাদের বায়আত করে নিজেকে পুরোপুরি তার কাছে সোপর্দ করে দিলেন। তিনি নিজের সকল সাথি ও সহযোদ্ধা, সরঞ্জামাদি, অস্ত্রশস্ত্র এবং জিহাদের যাবতীয় আসবাবপত্র মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর কাছে অর্পণ করে দেন এবং নিজের আমীরের দৃষ্টান্তমূলক আনুগত্যে অন্যদের জন্য বাস্তব উদাহরণ হয়ে যান। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ওই সময়কার প্রশান্তি নিশ্চিন্ত ভাব ও আনন্দ দেখার মতো ছিল। তার অবস্থা এমন ছিল, যেন কেউ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। নিঃসন্দেহে এই ঐক্য সাধনের জন্য অস্থিরতা আকুলতা এবং বাস্তব অঙ্গনে চেষ্টা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর চেয়ে বেশি অবদান অন্য কারও ছিল না। এই কারণে তার আনন্দ প্রশান্তি ও কুরবানীর জযবাও সবচেয়ে বেশি ছিল। ওই সময় আমি তাকে বলেছিলাম যে, অমুক ব্যক্তি মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে

[327]

নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত নয় বলে মনে হচ্ছে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমার কথা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। এরপর কিছুটা এভাবে বললেন: ভুল বলছেন। মাওলানা সাহেবের মতো আর কেউ থাকলে তার কথা আমাদের কাছে উপস্থাপন করুন না। মাওলানা সাহেবের মতো ইবাদাত নামায, তার মতো তাকওয়া, তার মতো ইলম, তার মতো কুরবানী অন্য কারও মাঝে একসঙ্গে থাকলে তবেই অন্য কারও ব্যাপারে ফায়সালা করা যাবে। আমার দৃষ্টিতে তো মাওলানার মতো অন্য কেউ নেই » এরপর একবার ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ অন্য এক ভাইকে বোঝাতে গিয়ে পূর্ণ বিনয় সহকারে এ সম্পর্কে কথা বলেন যে, « আমার মাঝে আল্লাহ তাআলা সাথিদেরকে একত্রিত করার যোগ্যতা দান করেছিলেন, তাই এই কাজ আল্লাহর অনুগ্রহে আমার দ্বারা হয়েছে। এখন এই সাথিদেরকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত করার যোগ্যতা মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর মাঝে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতএব আমি আমার সাথি ও সহযোদ্ধাদেরকে মাওলানা সাহেবের কাছে অর্পণ করে দিয়েছি »

উপমহাদেশে জামাত আল-কায়েদার দায়িত্বসমূহ আল-কায়েদা উপমহাদেশ গঠিত হবার পর তিনি নিজের সকল সাথি ও সরঞ্জাম সমূহ জামাতের আমীরের কাছে অর্পণ করেন এবং পুরোপুরি ভাবে তার নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জামাত গঠিত হবার পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জামাতের নায়েবে আমীর, অর্থ সম্পাদক এবং দাওয়াত ও প্রচার শাখার দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বের চেয়ে বেশি একাগ্রতা সহকারে নিজের দায়িত্বগুলো পালন করেন এবং নিজের সাধারণ নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থেকে জামাত আরও সুসংগঠিত করতে এবং জামাতের

[328]

প্রতিটি বিভাগকে আরও কার্যকরী করে গড়ে তুলতে মগ্ন হয়ে যান। নতুন জামাতের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে অপারেশন শুরু হওয়ার কঠিন সময় সকল সাথিদের জন্য জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ সরবরাহ এবং তাদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করার কঠিন কাজ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেন। অর্থবিভাগ এমন এক বিভাগ, যার দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে সাধারণ সাথিদের পক্ষ থেকে অভিযোগ এসেই থাকে। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সকল সমস্যা ও অভিযোগ হাসি মুখে শুনতেন এবং তাদের সকল সমস্যা যেকোনো হালাল পন্থায় সম্ভব সমাধান করার চেষ্টা করতেন। ওই সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কার্যনির্বাহ এবং দৌড়াদৌড়ি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তার মাঝে ক্লান্তির ছাপ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল বটে; কিন্তু প্রশান্তি উৎফুল্লতা ও আনন্দের চিহ্ন তার মাঝে হত অমলিন। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন এ মনে করে যে, আমি আমার দায়িত্ব পূরণ করেছি। মনে হতো যে, তিনি দুনিয়া থেকে নিজের সকল কিছু গুছিয়ে আখিরাতের উদ্দেশ্যে সফর করার প্রস্তুতিতে লেগে গিয়েছেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে তার সঙ্গী হিসেবে আমাদেরকে কবুল করুন, আমীন।

[329]

অষ্টম অধ্যায়: কিছু বিশিষ্ট সফর
সঙ্গী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু

কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ভালোভাবে জানার জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠজন ও কাছের মানুষদের সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। এমনটিও বলা হয়, মানুষকে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও কাছের মানুষদের দ্বারাই চেনা যায়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর এমন শত শত বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী রয়েছেন, যাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই নিজের কর্ম ও অবদানের কারণে নক্ষত্র তুল্য। অবশ্য তাদের মধ্যে কিছু প্রিয়ভাজন ব্যক্তি এমন রয়েছেন, যাদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দীনমুখী সংগ্রামী জীবন, ব্যক্তিত্ব ও সিদ্ধান্তগুলোর ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের মাঝে আমি শায়খ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ, হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান রহিমাহুল্লাহ, ডক্টর সারবুলন্দ যুবায়ের খান রহিমাহুল্লাহ ও ইঞ্জিনিয়ার উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহকে নির্বাচন করেছি। আমার দৃষ্টিতে এই মহান ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও জিহাদী জীবনের বিভিন্ন স্তরে এবং বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। পবিত্র আত্মার অধিকারী এই মানুষগুলোর আলোকিত জীবনী বর্ণনা করার জন্য এই গ্রন্থের অল্প কিছু পৃষ্ঠা যথেষ্ট নয়। তাই এই কিতাবে শুধু তাঁদের পরিচয় এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব ও সহযাত্রার কিছু বিষয় উল্লেখ করবো। পরিচিত মূলক এই সামান্য আলোচনা যারা পাঠ করবেন, তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যে ব্যক্তির সফর সঙ্গী ও কাছের মানুষগণ এমনই মহান তিনি নিজে কতটা মহান ও শ্রেষ্ঠ!
[330]

শায়েরে জিহাদ দৃষ্টান্তহীন দাঈ শহীদ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ শায়েরে জিহাদ মুবাল্লেগে দীন খতীবে কাদেরুল বয়ান, বক্তা, প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শিতার অধিকারী, উন্নত চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, নৈতিক উৎকর্ষের প্রতীক শহীদ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ এসেছিলেন কাশ্মীর উপত্যকা থেকে। মুজাহিদীনের মাঝে তাকে শায়খ সাদেক অথবা হাজী আব্দুল মান্নান নামে স্মরণ করা হতো। তার অভিভাবক সুলভ স্নেহ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের কারণে অধিকাংশ সাথি শুধু শায়খ বলেই তাকে স্মরণ করত। তার পরিবার ভারত বিভাজনের সময় হিজরত করে আযাদ কাশ্মীরের মিরপুর শহরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তার পিতা কাশ্মীর আযাদির জন্য ১৯৪৮ সালে সংঘটিত জিহাদে সশরীরে অংশগ্রহণ করেন এবং উক্ত যুদ্ধে বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

পারিবারিকভাবে দীনি পরিবেশ ছিল বিধায় সাধারণ দীনদারি শৈশবকাল থেকেই শহীদ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর মাঝে ছিল। তখনও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেষ বছরে তিনি পড়াশোনা করছিলেন; এমন সময় তিনি নিজেকে ইলমে দীনের জন্য পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিলেন। আরবী ভাষা এবং শারঈ ইলমের প্রাথমিক শিক্ষা তিনি অর্জন করে নেয়ার পরেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর দাওয়াত পান এবং আফগানিস্তান অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করে দেন। আফগানিস্তানে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং রুশ সমর্থক কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

ইলম অর্জনের সময় তিনি তালিবুল ইলমদের মাঝে দীনী জাগরণ এবং নিষিদ্ধ বিষয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ইসলামী জমিয়তে তলাবা সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণ [331]

করেন। তিনি জমিয়তের কাশ্মীর শাখার দায়িত্বশীল এবং কিছুদিন সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জমিয়তের তলাবা সংগঠনের সদস্য থাকাকালে একদিকে যেমন তিনি বিভিন্ন প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে অনন্য ছিলেন অপরদিকে তার মাঝে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেওয়ার অস্থিরতা, বক্তৃতা পাণ্ডিত্য এবং ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ওই সময় তিনি গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বের পৃষ্ঠপোষকতায় পাওয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির খারাপ দিকগুলো সে সময়ই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, সুস্পষ্ট শরীয়াহর বিধি-বিধান অথবা শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে রাজনৈতিক প্রয়োজনের কারণে এড়িয়ে যাওয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অপরগতা বলে ধরা হয়। প্রকাশ্য বিষয় হচ্ছে, এই অপারগতা মেনে নিয়ে এই অপারগতার কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয় জনসাধারণের সমর্থন সমবেদনা —যেটাকে অন্য ভাষায় বললে জনসাধারণের ভোট—অর্জনের জন্য; এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে নয়। এ কারণে ছাত্র বয়স থেকেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বিপ্লব ও পরিবর্তনের পন্থা হিসেবে দাওয়াত ও জিহাদকই অধিক উপযুক্ত বলে মনে করতেন।

শিক্ষা সমাপনের পর তিনি নিজেকে আল্লাহর দীনের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করে দেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অস্থিরতা বুকে নিয়ে তিনি কাশ্মীরের মুজাহিদীনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। তিনি তাদের প্রশিক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। বছরের পর বছর কাশ্মীর জিহাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে কুরআনের ক্লাস, হিফজ, তাজবীদ, নৈতিক ও শরীয়া মাসাআলা মাসায়েল

[332]

ক্লাসের দায়িত্বশীল শিক্ষক ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি আল্লাহর দীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠদানের কিছু মজলিস আয়োজন করেছিলেন।

কিন্তু সত্য অনুসন্ধানী আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর কাছে খুব দ্রুত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাশ্মীরি জিহাদী সংগঠনগুলো নিজেদের পলিসি তৈরিতে তাগুতি এজেন্সি আইএসআই এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অধীন। একারণে কাশ্মীর জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তো বটে কিন্তু ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করার দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে পাওয়া যায় না। সুস্পষ্ট বিষয় হল, যেই বাহিনী পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ইসলামী সরকার ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক শক্তি, ওই বাহিনী কেমন করে মেনে নেবে যে, তার অধীনে তারই পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে পরিচালিত আন্দোলনগুলো ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নকে নিজেদের মৌলিক লক্ষ্য বানিয়ে নেবে? এ কারণেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আফগানিস্তান থেকে পরিচালিত বৈশ্বিক জিহাদের আহ্বায়ক মুজাহিদীনের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা আরম্ভ করে দেন।

ওই সময় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহর হজের ফরয বিধান পালন করার তাওফীক দান করেছিলেন। তিনি বলতেন যে, হজের সময় তিনি আল্লাহর কাবার গিলাফের সঙ্গে জড়িয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতেন, এই সময়ে পৃথিবীতে যারা আহলে হক ও সত্যপন্থি রয়েছেন, আপনি আমাকে তাদের সঙ্গে মিলিত করে দিন। হজ থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর যখন তার সম্পর্ক হয়েছে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে, তখন তিনি এটিকে কাবার ছায়ায় তার দোয়াগুলো সত্যি হয়েছে বলে ঘোষণা করতেন।
[333]

মুহাজিরদের সাহায্যে এগিয়ে আসা…
১১ই সেপ্টেম্বরের পরে যখন আরব মুজাহিদীনের মধ্য থেকে বড় সংখ্যক ব্যক্তি মার্কিন বোমা হামলার মুখে জরুরি অবস্থায় পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ ওই সকল হযরতগণের অন্যতম ছিলেন যারা ব্যাপক পরিসরে মুহাজিরদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রহিমাহুল্লাহ করাচি থেকে নিয়ে পেশোয়ার পর্যন্ত করাচির বন্ধুবান্ধব ও ফ্রেন্ড সার্কেলকে কাজে লাগিয়ে আরব পরিবারগুলোর জন্য গৃহের ব্যবস্থা করেন। এটা তারই দাওয়াত এবং আন্তরিক উত্তাপের প্রতিক্রিয়া ছিল যে, পাকিস্তানি আর্মির কিছু ঈমানদার এবং ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বড় অফিসার ওই সময়ে আরব মুহাজিরদেরকে শুধু নিজেদের গৃহে জায়গা দিয়েছেন এতটুকুই নয়; বরং তাদের জন্য যাতায়াত ও পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থাও সহজ করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে ওই সেনা অফিসারদের কোর্ট মার্শাল হয় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বন্দী থাকার কষ্ট তাদের সহ্য করতে হয়। ওই সেনা অফিসারদের মধ্যেই একজন ছিলেন মেজর আদেল আব্দুল কুদ্দুস রহিমাহুল্লাহ, যিনি ৬ বছর বন্দী থাকার পর মুক্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন এবং পরবর্তীতে সম্পর্কে তার ভাই ডক্টর আবু খালেক সারবুলন্দ যুবায়ের খান রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মিলে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন ওই মেজর আদিল আব্দুল কুদ্দুস, যার গৃহ থেকে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর কাছের লোক এবং ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক, ইসলামের বীর বাহাদুর খালেদ শায়খ মুহাম্মাদ (আল্লাহ তাকে

[334]

কাফেরদের কারাগার থেকে মুক্তি দান করুন!) গ্রেফতার হয়েছিলেন। ওই গ্রেফতারির ধারাবাহিকতায় শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহও এফবিআই এবং আইএসআই-এর যৌথ অ্যাম্বুশে ২০০৩ সালে গ্রেফতার হন। তিনি গ্রেফতার হবার পর সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং সকল ফোরাম থেকে বেআইনিভাবে তাকে গুম করার প্রতি নিন্দা জানানো হয়। অপরদিকে তদন্ত চলাকালে আরবদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কের প্রমাণ মেলে না। তাকে অনেক নির্যাতন করা হয়েছে কিন্তু তিনি এমন কোন গোপনীয়তা প্রকাশ করেননি যার দ্বারা কোনো সাথির কোনরূপ ক্ষতি হতে পারে। তাই এক বছরের মধ্যেই তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

দাওয়াহ ইলাল্লাহ গ্রেফতার হবার কারণে সত্যের পথ থেকে তিনি একটুও বিচ্যুত হননি এবং অবিচলতা হারাননি। তিনি বরাবরের মতোই একাগ্রতা সহকারে মুজাহিদীনের সাহায্য সহযোগিতার কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। সেই সঙ্গে আল্লাহর দীনের দাওয়াত এবং জিহাদের দাওয়াত প্রসারে চেষ্টা শ্রম ব্যয় করতে থাকেন। তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদগুলোতে কুরআনে কারীমের উপলব্ধি, সীরাতের আলোকে শিক্ষা গ্রহণ এবং নতুন ফিতনা থেকে হেফাযত সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপর পাঠদানের ধারাবাহিক আয়োজন আরম্ভ করেন। তার এই ক্লাসের মাধ্যমেই আমরাও শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হই এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ওই ক্লাসের মাধ্যমেই জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

[335]

দৃষ্টান্তহীন শায়ের
শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ তাআলা একটি অনুভূতি প্রবণ হৃদয় দান করেছিলেন। তার অন্তর এমন ছিল যার মধ্যে একদিকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস এবং ঈমানী বিষয়গুলোর ভালোবাসা সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর বেদনায় তার অন্তর ব্যথিত ছিল। তিনি তার অন্তরের ব্যথা বেদনা ও অস্থিরতাগুলোকে শব্দ ও ভাষার মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলতেন এবং কবিতার মাধ্যমে সেগুলো প্রকাশ করতেন। তিনি এমন সব কবিতা রচনা করতেন যেগুলোর দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে উর্দু ভাষার সাহিত্যে তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের ভালোবাসা অন্তরে প্রবিষ্ট করা, বিজাতীয়দের অপসংস্কৃতির ব্যাপারে ঘৃণা ভাব তৈরি করা, মুসলিম উম্মাহর বেদনাকে নিজের বেদনা বলে মনে করা, মুজাহিদীনের নুসরত ও সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করা, সমাজে কল্যাণের বিস্তার ঘটানো ইত্যাকার বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে তিনি কবিতা রচনা করতেন। তার সাহিত্যিক রুচিবোধ ও কল্পনাশক্তি এতটা গভীর ছিল যে, যখন কবিতার মধ্যে কুরআনের কোনো আয়াত বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে ইঙ্গিত দিয়ে বর্ণনা করতেন, তখন শ্রোতারা ঈমানী উত্তাপের পাশাপাশি তার কল্পনা শক্তির গভীরতা ও রুচি-উৎকর্ষের অনুভবতলে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যেত। তার কবিতাগুলোর দুটো সংকলন ছেপে এসেছে; একটি হলো: ‘আমার সঙ্গে তোমাদের ওয়াদা ছিল’ এবং অপরটি হল ‘মুহব্বত ভালোবাসা সিদ্ধান্তকারী বিষয়’। দীনদার রুচিবোধ সম্পন্ন শ্রেণির মাঝে তার সংকলিত এই উভয় কাব্য সমগ্র খুবই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

[336]

হিজরত এবং শাহাদাত তিনি ২০০৬ সালে ওয়াজিরিস্তানে স্থানান্তরিত হন। ওখানকার অবস্থার কথাও পেছনের অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১০ সালে খাইবার এজেন্সির ওয়াদি থিরার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে তিনি চলে যান। এখানে তিনি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুজাহিদীননের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেন, যেখান থেকে শত শত আফগান মুজাহিদ দীনী, নৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে তিনি নিজেও নৈতিক ও সামরিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। অবশেষে রমযানুল মোবারক ১৪৩৩ হিজরীর এক সন্ধ্যায় যখন তিনি নিজগৃহে ইফতারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর জেট বিমান তার ঘর টার্গেট করে হামলা করে। ধৈর্য, দুনিয়া বিমুখতা ও উন্নত গুণাবলির অধিকারী আহলিয়া মুহতারাম সহ তিনি সেখানেই শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা তার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসকে তার ঠিকানা হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শায়খ ও মুরুব্বী নিজের শায়খ, উস্তাদ, মুরুব্বী শহীদ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অনেক গভীর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে যতটা শ্রদ্ধা ভালোবাসা সহকারে তাঁর সামনে বসতে দেখেছি, অন্য কারও সামনে এতটা আন্তরিকতার প্রকাশ দেখিনি। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সর্বদা খুব শ্রদ্ধা ভরে আন্তরিকতার সঙ্গে আবেগ সহকারে তার আলোচনা করেছেন। তিনি খোলাখুলিভাবে এ কথা স্বীকার করতেন যে, শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ আমার

[337]

প্রতি সদয় এবং আমার মুরুব্বী ছিলেন। তিনি শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত তাকে নিজের গুরুজন ও স্নেহকারী শিক্ষকের মর্যাদা দিয়ে চলতেন। এমনকি কিছু কিছু বিষয়ে এই দুই মহান হযরতের মাঝে বড় ধরনের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু আমি কখনও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুখ থেকে শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে নেতিবাচক কোনো কথা শুনিনি। এমনকি যখন শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন, তখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ খুব বেশি ব্যথিত হন। তার শাহাদাতে আবেগ ঘন শোক ভাব জানানোর জন্য বিস্তারিত বিবৃতি প্রচার করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজের শেষ অসিয়তে প্রিয় ব্যক্তিদের তালিকায় শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখেছেন: আমার শিক্ষক, মুরুব্বী শায়খ আহসান আজীজ।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর দীক্ষা ও সান্নিধ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর চেহারায় স্নিগ্ধ মুচকি হাসি যেন ছিল শহীদ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর হাসির প্রতিবিম্ব। তার চলা-ফেরা কথা-বার্তা লেখা-লেখি এক কথায় অধিকাংশ উচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর শিক্ষা-দীক্ষা ও সান্নিধ্যের লক্ষণ ঝলকে উঠতো। শায়খ রহিমাহুল্লাহর কথা- বার্তায় আলেম সুলভ গাম্ভীর্য থাকতো আবার দাঈ সুলভ মুহব্বত ও দরদও থাকতো। তার স্বভাব-চরিত্র ও ভাষার মিষ্টতা এমন ছিল যে, যখন তিনি কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত পাঠ করতেন অথবা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীস শোনাতেন, তখন শ্রবণকারীরা সেগুলোর মর্ম অর্থ না বুঝলেও এতোটুকু বিশ্বাস তাদের মাঝে এসে যেতো,

[338]

শায়খ ভুল কিছু বলেননি; যা বলেছেন সঠিকই বলেছে। শায়খ রহিমাহুল্লাহর আচার-ব্যবহার এবং সাথিদের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য সম্প্রীতি এত উচ্চ মাত্রার হতো যে, তাকে একবার দেখার দ্বারা তার ভালোবাসা অন্তরে জায়গা করে নিতো এবং বিভিন্ন প্রকার ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যেত। একবার এক সাথি করাচি থেকে ওয়াজিরিস্তান পর্যন্ত খুবই ক্লান্তিকর সফর শেষ করে যখন গন্তব্যে পৌঁছলেন, তখন ঘটনাক্রমে ২-৩ মিনিটের জন্য শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সাক্ষাৎ পেয়ে যান। শায়খের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ওই সাথি বলেন যে, তাকে দেখামাত্রই আমার সফরের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল।” অপর এক সাথির কথা, যিনি অনেক দিন পর নিজের ঘরে যান। তিনি বলেন, বাড়িতে থাকা অবস্থায় শায়খের ভালোবাসায় আমার মাঝে এমন অস্থিরতা তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের জন্য আমি এমনই অস্থির হয়ে উঠি যে, যতদিন আমার ঘরে থাকার অনুমতি হয়েছিল, তার আগেই আমি আবার শায়খের কাছে ফিরে আসি। এক সাথি ভাই আমাকে বলেন, “তিনি এমন ব্যক্তি যাকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যায়।” এমনই ভাবে একজন শ্রদ্ধেয় ভাই বলেছেন: আমি বছরের পর বছর শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে এভাবে থেকেছি যে, সফর অবস্থায় হোক কিংবা মুকিম অবস্থায় —আমি তার থেকে আলাদা হইনি। এত দীর্ঘ সময়ের ভেতর আমি কখনোই তাকে কোন মুসলিমের গীবত করতে শুনিনি। এক কথায় শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যার আখলাক উত্তম চরিত্র ও পূর্ণতার গুণাবলি দেখে তার বৈঠকে উপবেশনকারী ব্যক্তি নিজে থেকেই তার ভক্ত অনুরাগী হয়ে যেত। মুজাহিদীনের ইসলাহ ও আমল-আখলাকের সংশোধনের জন্য তার প্রচেষ্টার একটি পন্থা এই ছিল যে, যদি তিনি কোনো সাথি ভাইয়ের ভুল দেখতেন, তাহলে তাকে মুখে বলার পরিবর্তে দৃষ্টি নত করে নিতেন এবং

[339]

চুপ হয়ে যেতেন। তার চেহারার মাঝে ফুটে ওঠা অপছন্দনীয়তার চিহ্ন দেখেই সকলেই বুঝে যেত, কারও দ্বারা ভুল কিছু ঘটেছে। তাই তৎক্ষণাৎ তার ভক্ত অনুরাগীরা নিজেদের সংশোধনের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠতো। শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ যেহেতু প্রধানত একজন মুরুব্বী, অভিভাবক তুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন; তিনি যেহেতু মুজাহিদীনের চারিত্রিক নৈতিক ও রুচিবোধ গঠনে একজন প্রশিক্ষক ছিলেন, এ কারণে সামনের লাইনগুলোতে তার যত গুণাগুণের কথা বর্ণনা করা হবে, সেগুলো তার দীক্ষা প্রদানের ধরন এবং বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করবে।

উলামায়ে কিতাবে গ্রন্থাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন
শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ একটি বিষয়ে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি স্কুল কলেজের শিক্ষিত যুবকদেরকে উপমহাদেশের আকাবির উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরিচিত করতে চেষ্টা করতেন। এ কারণে তিনি সাথিদেরকে আকাবির উলামায়ে কেরামের গ্রন্থাবলী পাঠ করার এবং সে অনুযায়ী নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের নসিীহত করতেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর দিকনির্দেশনা ও পরামর্শেই হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহিমাহুল্লাহর গ্রন্থাবলী এবং বিশেষ করে তার মারেফত ও হেকমত সংবলিত ওয়াজ নসীহতগুলো পাঠ করতে আরম্ভ করেন। ওই ওয়াজ নসীহতগুলোর ব্যাপক ও সবিস্তার অধ্যয়ন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিবোধের ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং ইলম ও মারেফতের অমূল্য রত্নভাণ্ডার তার সামনে উন্মোচিত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়ব সাহেব রহিমাহুল্লাহর খুতুবাত এবং মুফাক্কেরে ইসলাম

[340]

(বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ) মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহিমাহুল্লাহর গ্রন্থাবলী পাঠ করার পরামর্শ তিনি পান শায়খ আহসানের কাছে। মাওলানা নদভী রহিমাহুল্লাহর ‘তারিখে দাওয়াত ও আজিমত’ (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) সিরিজ গ্রন্থগুলো তো রীতিমতো তার সিলেবাসভুক্ত ছিল। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ উপমহাদেশে এক মহান মুজাহিদ আন্দোলনের সালার (নেতা) হযরত আমীরুল মুমিনীন সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর প্রতি এমনই ভালোবাসা পোষণ করতেন, যা ইশকের পর্যায়ে পড়ে। তারই দিকনির্দেশনায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সীরাতে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ গ্রন্থটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন, অতঃপর সাথিদেরকে সাইয়েদ আহমেদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর সীরাত, তাহরিকে মুজাহিদীন-এর কার্যক্রম, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রভাব বোঝাবার জন্য বড় পরিসরে সু বিন্যস্ত ক্লাসের আয়োজন করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনের মারকাজ ও কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে হযরত সাইয়েদ সাহেব রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিদের ইতিহাস সবিস্তারে দাওরা (পাঠদানের ক্লাস, যা একাডেমিক ক্লাসের চেয়ে একটু ভিন্ন) করিয়ে আসতেন। এই ক্লাসগুলোর কারণে এক দিকে যেমন মুজাহিদীন নিজেদের কায়েদে আজম (প্রকৃত বড় নেতা) ও ইমাম সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর ইতিহাস সম্পর্কে অবগতি লাভ করে, সেই সঙ্গে উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম আল্লাহর দীনের বাণী উচ্চকিত করার জন্য কতটা ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন, সেই ইতিহাসও তাদের জ্ঞানগোচরে চলে আসে।

পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা মাঝে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং অর্থহীন দোষ-ত্রুটি [341]

খোঁজাখুঁজিকে নিজেদের একটা কাজ বানিয়ে নিয়েছিল। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ খুবই হিকমত ও প্রজ্ঞা সহকারে এই ব্যাধির চিকিৎসা বিধান করেন। কেন্দ্রগুলোতে এমন পরিবেশ তৈরি করেন, কারও মাঝে উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অন্যায় সমালোচনা বা আপত্তি তোলার চিন্তাই যেন তৈরি না হয়। ত্রুটি-অনুসন্ধানী কেউ কোনো আলেমে দীনের কিতাব থেকে কোনো বিষয়ের ব্যাপারে তার কাছে অভিযোগ নিয়ে এলে যদি তার ভালো না লাগতো, তখন প্রতি উত্তরে তিনি শুধু এতোটুকু বলতেন যে, “এ বিষয়টা আমার বুঝে আসেনি” এ কথা বলে উলামায়ে কেরামের গ্রন্থাবলীতে আপত্তিজনক বিষয় খোঁজার এই প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাথিদেরকে নসীহত করতেন।

তিনি উলামায়ে কেরামের ত্রুটি অনুসন্ধানে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজরা যখন উপমহাদেশ দখল করে নেয়, তখন সম্ভ্রান্ত শ্রেণি এবং আল্লাহর দীনের সত্যিকার রক্ষক অর্থাৎ উলামায়ে কেরামকে নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে, তোপের মুখে দাঁড় করিয়েছে এবং বন্দীশালায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আটকে রেখে তাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। তারা এমন পলিসি, শিক্ষানীতি ও সিলেবাস তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার সংস্কৃতি ও রেওয়াজ চালু করে দিয়েছে। ব্রিটিশবাদী এই প্রচলনে উলামায়ে কেরামের গ্রন্থাবলী নিয়ে হাসাহাসি করা এবং সমাজে তাদেরকে বেকার অলস অকর্মণ্য হিসেবে চিত্রিত করা একরকম ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিপরীতে শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, যে সমাজের বাগডোর উলামায়ে কেরামের হাতে থাকবে এবং তারাই সমাজের প্রকৃত রাহবার ও অনুসরণীয় বলে গণ্য হবেন। তাই আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অসন্তোষমূলক

[342]

চিন্তাভঙ্গি ও মেজাজ পরিবর্তন, আধুনিক শিক্ষিত মুজাহিদীনের অন্তরে উলামায়ে কেরামের প্রতি মুহব্বত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ স্থাপনের জন্য নিজের বিশেষ স্নেহপূর্ণ অভিভাবক সুলভ পন্থা প্রয়োগ করতেন।

শুধুই উলামায়ে কেরাম নয়; অন্যান্য দীনি জামাতের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং বৃথা সমালোচনা করার বিষয়টাও তিনি অপছন্দ করতেন। কোনো কোনো মুজাহিদের এমন দাবি তিনি অপনোদন করতে চেষ্টা করতেন যে, উম্মাহর সমস্ত হক ও সত্য বিষয় যেন শুধু তাদের কাছেই আছে; বাকি সবাই বাতিল বিষয় অনুসরণ করে যাচ্ছে। এই কারণে তাবলীগী জামাতের অনেক প্রশংসা করতেন, তাদের ভালো দিকগুলো অকুন্ঠিতভাবে বর্ণনা করতেন এবং তাদের গুণাবলি ও সুন্দর দিকগুলো গ্রহণের জন্য মুজাহিদীনকে নসীহত করতেন।

পশ্চিমাদেরকে বড় ভাবার ব্যাধি এবং তার চিকিৎসা
জনাব শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ অনুভব করেছিলেন যে, আমাদের এই সমাজ পশ্চিমা শক্তিগুলোর দ্বারা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বাস্তব অঙ্গন ও মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গনে শাসিত হয়ে এসেছে। এই দিক থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তাদের দাসত্বের শিকার। গোলাম ক্রীতদাসদের মন মানসিকতাও যখন মনিবদের দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা সহ পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা- বার্তা, চাল-চলন, ওঠা-বসা —সবকিছুতেই মনিবদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর ইচ্ছা ছিল, হিজরত ও জিহাদের সমাজে এমন এক প্রজন্ম গড়ে উঠুক, যা পশ্চিমা চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচি প্রকৃতির এতটাই [343]

বিরোধী হবে যে, তারা অতি প্রয়োজন ছাড়া ইংরেজি ভাষার শব্দও মুখে আনবে না। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এই পরিকল্পনায় শুধু তার সঙ্গে শরীক ছিলেন এতটুকুই নয় বরং মিশন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছিলেন। অপরদিকে শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ ইংরেজি শব্দ ছেড়ে আরবী শব্দের প্রচলন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা দাবি করতেন। তার দৃষ্টিতে ইংরেজিকে বড় ভাবার, একে আধুনিকতা ও প্রগতি মনে করে এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার এই ব্যাধি অপসারণ করা যেতে পারে আরবী ভাষার ভালোবাসা ও প্রচলন প্রতিস্থাপনের দ্বারা। জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, যেহেতু আরবী ভাষা কুরআনে কারীম এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা; এই ভাষায় যেহেতু আমাদের দীন ইসলামের ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান সবিস্তারে সংকলিত হয়ে আছে, এ কারণে ইসলামী সমাজে আরবী ভাষা এবং আরবী পরিভাষাগুলোর প্রচলন ঘটানো জরুরি। এ কারণে জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহ এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনের দৈনন্দিন ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোতে আরবী ভাষাকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করতেন। বিশিষ্ট যেই ব্যক্তিগণ কাশ্মীরি জিহাদী সংগঠনগুলো থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের পরিভাষাগুলোতে ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি শব্দ বেশ পাওয়া যেত। সম্ভবত তার বড় কারণ এই ছিল যে, কাশ্মীরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন স্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাছ থেকে শিখে নেয়া অনেক কিছু তাদেরকে রপ্ত করানো হতো। এক কথায় শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ ইংরেজি পরিভাষা খুবই কঠোরভাবে বর্জন করতেন এবং তার স্থলে আরবী উর্দু পরিভাষা প্রচলন করতে চেষ্টা করতেন। ওয়ারলেস, রেকি, ট্রেনিং, মার্চ, গ্রুপ, লঞ্চিং, ক্লাস ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে তিনি আরবী

[344]

সমার্থবোধক শব্দ যেমন মুখাবারা, তারাস্যুদ, মাসিরাহ, কাতীবাহ, ‘দাখেল কি তাশকিল’ এবং দাওরা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতেন।

শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে অনেক পাকিস্তানি ভাই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক ইংরেজি শব্দ পরিহার করে সেগুলোর সমার্থবোধক আরবী শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ রাতে যেই বাতি ব্যবহার হয় সেটাকে সাধারণত টর্চ বলা হয়— যা ইংরেজি ভাষার শব্দ। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ সাথিদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন যে, তারা যেন টর্চ শব্দ ব্যবহার না করে কাশ্যাফ ব্যবহার করে— যা আরবী ভাষার শব্দ। যদি কোনো সাথির পুরনো অভ্যস্ততার কারণে কথার মধ্যে বারবার ইংরেজি ভাষার শব্দ চলে আসতো, তাহলে জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহ স্নেহভরে মুচকি হেসে তার কথার মাঝখানেই ইংরেজি শব্দগুলোর উর্দু সমার্থবোধক শব্দ বলে দিতেন, যেন পরবর্তীতে ওই সাথি এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন। এক কথায় কুফফার গোষ্ঠীর প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ খুবই মনোযোগী ছিলেন।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, তিনি ঢালাওভাবে ইংরেজি ভাষার বিরোধী ছিলেন। এমনটা কখনোই ছিল না। তিনি তো শুধু ইংরেজ সংস্কৃতির প্রভাব বিনষ্ট করতে চাইতেন। ইংরেজি তো নিছক একটা ভাষা এবং এই ভাষা ব্যবহার করার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আল্লাহর দীনের দাওয়াতের জন্য কখনোও কখনও তা ব্যবহার করা জরুরি হয়ে যায়। এ কারণেই যখন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ রচিত জিহাদের দাওয়াত বিষয়ক গ্রন্থ 'মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা' ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দ্বারা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়েছেন, তখন সেই সঙ্গে এই কিতাবের ইংরেজি [345]

সংস্করণ বের করার জন্যও তিনি বলেছেন। কিন্তু সাথিদেরকে এই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, এই কিতাবে যেন এমনটা লেখা না হয় যে, "ইংরেজি ভাষা জানা লোকদের জন্য" ; বরং তার পরিবর্তে যেন লেখা হয় যে, "আরবী উর্দু ভাষা না জানা লোকদের জন্য"। তিনি বলতেন, ইংরেজি ভাষা জানা কোনো মর্যাদার বিষয় নয়। তার বিপরীতে আরবী ও উর্দু ভাষা না জানা লোকেরা এক বিরাট মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। এখানে আরও একটা বিষয় মনে রাখা উচিত। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ তার শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে নিজেই ইংরেজি ভাষায় ওপর বেশ পারদর্শী ছিলেন।

এমনিভাবে শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ বলতেন, সমাজের মধ্যে কিছু লোককে ধনাঢ্যতা ও অর্থ সম্পদের কারণে খুবই সম্মানিত মনে করা হয়। অথচ আমাদের দীন ইসলামে প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা হচ্ছে তাকওয়া ও ইলমে দীনের কারণে। তাই তিনি সাথিদেরকে বলে দিতেন, যেন তারা কোনো সাথিকে তার পেশার কারণে বিশেষ মর্যাদা না দেয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রশিক্ষণের প্রাথমিক অবস্থায় দুনিয়াবি উচ্চশিক্ষিত সাথিদেরকে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্যদের কাছ থেকে গোপন রাখার জন্য বলে দিতেন। কোনো সাথি যখন নতুন আসা কাউকে অথবা প্রশিক্ষণের স্তর অতিক্রমকারী কোনো ডাক্তার সাথিকে ডক্টর সাহেব বলে সম্বোধন করতো, তখন জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন, তাকে এই নামে ডাকা আমাদের এখানে সম্মান মর্যাদা প্রদানের মাপকাঠি নয়। যে বিষয় পশ্চিমা বিশ্বে সম্মানের বস্তু তা আমাদের এখানে সম্মানের বস্তু নয়।" এভাবে শুধরে দেয়ার দ্বারা যিনি ডেকেছেন এবং যাকে ডাকা হয়েছে উভয়েরই আত্ম সংশোধন হয়ে যেত। যদি কোনো সাথির মাঝে এমন ব্যাধি চোখে পড়তো যে, তিনি বিশেষ যোগ্যতা বা প্রতিভার কারণে নিজেকে

[346]

অন্যদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, তখন এমন ব্যাধির চিকিৎসার প্রতি তিনি তৎক্ষণাৎ মনোযোগী হয়ে যেতেন। এমন ব্যক্তিকে অন্য ভাইদের খেদমতে লাগিয়ে দিতেন। আর যদি তার আত্মশুদ্ধির সম্ভাবনা না থাকতো, তাহলে তাকে কাতার থেকে দূরে সরিয়ে দিতেন। এই সবকিছুর পাশাপাশি প্রশিক্ষণের সর্বস্তর সমাপন করার পর সৎকর্ম, যোগ্যতা, বয়স এবং দুনিয়াবি মর্যাদা হিসেবে তিনি প্রতিটি ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করতেন।

প্রকৃতপক্ষে জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহ একজন মুরুব্বী ও অভিভাবক ছিলেন। তিনি যখন সাথিদেরকে তাদের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন জিহাদী দায়িত্বে নিয়োজিত করতেন, তখন তাদেরকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত বানানো, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তর থেকে সম্পদের মোহ ও গর্ব অহঙ্কার পরিষ্কার করে দেয়ার ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকতেন। তিনি চাইতেন, জিহাদী কাজে দায়িত্ব পালনে কোনো সাথির মনে কমপক্ষে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তুচ্ছ কোনো কাজও যেন বোঝা বলে মনে না হয়। এটাই ছিল ওই পন্থা, যা প্রয়োগ করে মুজাদ্দিদে জিহাদ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ—যিনি রুশ আমলের মুজাহিদিনের উস্তাদ ও মুরুব্বী ছিলেন— মুজাহিদীনের সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি করতেন। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহপ্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন:

« “হে ভাইয়েরা! যদি আপনারা জিহাদ করতে চান অথবা এই আমল জারি রাখতে চান; যদি আপনারা চান, আল্লাহ আপনাদেরকে এই পথে অটল অবিচল রাখুন, তাহলে জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে যথাসম্ভব বেশি সময় অবস্থান করুন। এখানে আপনাদের মন-মেজাজ এবং অভ্যাসগুলো সৈনিক সুলভ বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে। [347]

আপনারা আমাদের কাছে আপনাদের ঘর থেকে অফিসার হয়ে এসেছেন। নিজেদের ঘরে অর্ডার চালাতেন এবং আপনাদের কথা মান্য করা হতো। "আমি এখন খেতে চাই" এ কথা বলতেই সবকিছু আপনার কাছে হাজির করা হতো। যখন ইচ্ছে ঘুমাতে যেতে পারতেন, যখন ইচ্ছে জাগ্রত হতে পারতেন। কিন্তু এখন আমরা চাচ্ছি, আপনারা একজন সৈন্য হিসেবে এখানে অবস্থান করুন। এটা কোনো অপরাধীর শাস্তি হিসেবে নয়। আমরা আপনাদের কাঁধে থাকা তারকা চিহ্নগুলো এবং পদ-পদবীর ফিতাগুলো খুলে ফেলবো এবং আপনাদেরকে একজন সৈন্যের স্তরে নামিয়ে আনবো, যেন আপনারা সম্মিলিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যান এবং একটি জিহাদী সংগঠনে সৈন্যের মতো জীবন যাপন করতে পারেন। যে ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে না, সে জিহাদও করতে পারে না। কারণ ওই ব্যক্তির সৈন্যসুলভ মন-মেজাজ তৈরি হয় না। কারণ সে শৃঙ্খলা, নিয়ম-কানুন এবং শ্রবণ-আনুগত্য সম্পর্কে দীক্ষা লাভ করেনি। »[58]

সুন্নাহর অনুসরণ এবং নিষিদ্ধ বিষয় প্রতিরোধ

শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর প্রশিক্ষণে সুন্নতের অনুসরণ, ইসলামিক সামাজিকতা ও শিষ্টাচার রক্ষা করার ব্যাপারে খুব জোর দেয়া হতো। তিনি পোশাক, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, রুচিবোধ, আতিথেয়তা, বড়দের আদব রক্ষা, ছোটোদেরকে স্নেহ, মাসনুন দোয়া সমূহের পাবন্দি এমনিভাবে অন্যান্য আদব-আখলাকের ব্যাপারে খুবই জোর দিতেন। পক্ষান্তরে সকল মাকরুহাত, মুনকারাত (অপছন্দনীয় বিষয় এবং নিষিদ্ধ বিষয়) থেকে বাঁচার জন্য জোর আরোপ করতেন। শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্য লাভকারী সাথিদের মুখ থেকে দোয়া দরূদ

---
58 التربية الجهادية للشيخ عبد الله عزام شهيد رحمه الله

শুনতে পাওয়া যেত। এক ভাই অপর ভাইকে আকরামাকা- ল্লাহু' তথা আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করুন' বলতেন; তখন জবাবে অপর ভাই "বারাকাল্লাহু ফিকা’ (আল্লাহ তোমার মাঝে বারাকাহ দান করুন!) বলতেন। এক কথায়, বায়তুল খালায় (টয়লেটে) প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া থেকে আরম্ভ করে হাঁচির জবাবের দোয়া পর্যন্ত, সমস্ত দোয়া এমন গুরুত্ব সহকারে পাঠ করা হতো যে, তা আমাদেরকে হতবাক করে দিতো। সুন্নত অনুসরণের আগ্রহ এত বেশি হতো, যদি কখনও মেসওয়াক কাছে না থাকতো, তাহলে নিজেই উঠে গাছের ডাল ভেঙে তা দিয়ে মেসওয়াকের কাজ করে নিতেন; কিন্তু মেসওয়াক ছাড়া অযু যথাসম্ভব তিনি এড়িয়ে যেতেন। যদি কারও কাছ থেকে কোনো কিছু নিতে হতো কিংবা দিতে হতো তাহলে সর্বদাই ডান হাত ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে কেউ উল্টোটা করলে তিনি নিজের হাত পেছনে নিয়ে নিতেন এবং মুচকি হাসি দিয়ে ‘বিলইয়ামিন’ তথা ‘ডান হাত দিয়ে’ বলে শুধরে দিতেন।

যে সমস্ত খারাপ বিষয় লোক সমাজে খারাপ হিসেবে পরিত্যাজ্য না হতো, তিনি সেগুলো বর্জনের ব্যাপারেও জোর দিতেন। এমনকি বছরের পর বছর ধরে চলে আসা অভ্যাস ও আচার প্রথা কয়েক সপ্তাহের ভেতরেই বিলুপ্ত হয়ে সঠিক বিষয়ের প্রচলন শুরু হয়ে যেত। রেডিওতে খবরের মাঝখানে যে মিউজিক বাজে, তা বন্ধ করার জন্য এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, মিউজিক আরম্ভ হওয়ার কিছু সময় আগে থেকেই বাটনে হাত দিয়ে বসে যেতেন, যেন মিউজিক আরম্ভ হওয়ার আগেই বাটন চেপে যন্ত্র বন্ধ করেন দিতে পারেন। পরবর্তীতে তো তিনি মিউজিক ও নারী কন্ঠের নিষিদ্ধতার কারণে রেডিওতে সংবাদ শোনার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে সচেতন থাকার স্বার্থে সংবাদ জানা জরুরি ছিল, এদিকে

[349]

রেডিও সংবাদ পরিবেশনের একটি মাধ্যম, এ কারণে আস্থাভাজন একজন সাথিকে দায়িত্ব দেয়া হতো যেন তিনি এ বিষয়ে নিজের যোগ্যতা ও সতর্কতার সহকারে সকল সাথি থেকে আলাদা হয়ে সংবাদ শোনেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো নিজের কাছে ডায়েরিতে নোট করেন। পরবর্তীতে সে সংবাদগুলো সাথিদেরকে শুনিয়ে দেন।

তার মাহফিল ও সান্নিধ্যে কুরআন হাদীস যিকির ও তিলাওয়াত সম্পর্কে এতটাই গুরুত্ব দেয়া হতো যে, এই সমস্ত আমল এবং জিহাদী দায়িত্বের ব্যস্ততা শেষ হবার পর অনর্থক কথা-বার্তা, বাজে আলাপচারিতা এবং গল্পগুজব করার প্রশ্নই উঠতো না। অতিরিক্ত ঠাট্টা করা, সাথিদেরকে বিভিন্ন খারাপ নাম দেয়া এবং টিপ্পনী কাটার অভ্যাস যদি কারও মাঝে থাকতো, তাহলে ওই ব্যক্তি জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে এসে একেবারে পরিশুদ্ধ হয়ে যেত। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শৈশবকালের অভ্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে একটা কথা এসেছে যে, এই সমস্ত উত্তম গুণের প্রায় অধিকাংশই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পারিবারিক সম্ভ্রান্ততার কারণে তার মাঝে আগে থেকেই ছিল; কিন্তু শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে সেগুলোতে আরও অধিক পরিপক্কতা এসে গিয়েছিল।

সুন্নত অনুসরণের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ব্যাপারে খুবই জোর দিতেন। তিনি বলতেন, পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা ও সুস্থ রুচিবোধ নববী আখলাকেরই অংশ। ২০০৮ সালে আঙ্গুরআদায় অবস্থিত একটি কেন্দ্রে মুজাহিদীনকে আদব শিষ্টাচার শেখাবার প্রোগ্রামে তিনি আগমন করেন। প্রথম দিনই অত্যন্ত স্নেহভরে বলেন, আমাদের দীনি ইলমের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে তাহারাত তথা পবিত্রতা। তাই চলুন আমরা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা দিয়েই শুরু করি। এরপর তিনি কোমর বেঁধে অন্যান্য সাথির সঙ্গে মিলে [350]

বায়তুল-খালা, লোটা এবং বাবুর্চি খানা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেন। বাইতুল খালার বদনা এবং অযুর বদনায় আলাদা আলাদা চিহ্ন বসান। পুরো কেন্দ্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে দেন। এরপরেই তিনি নিয়মতান্ত্রিক দাওরা আরম্ভ করেন।

হিজরতের প্রয়োজনীয়তা
শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর রায় ছিল, একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য হিজরত করা জরুরি। তিনি মনে করতেন, সমাজের সৎকর্মশীল ও যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যদেরকে বেছে বেছে কোনো হিজরতের ভূমিতে একত্রিত করা উচিত। তারা হিজরতের জীবনে দুনিয়াবি ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের যোগ্যতা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেবেন। তিনি মনে করতেন, পার্ট টাইম জিহাদের জন্য যারা আসেন তারা অবশ্যই এই আমলের বরকত ও সুফলগুলো লাভ করে থাকেন; কিন্তু সমষ্টিগত বিবেচনায় এর দ্বারা জিহাদ এবং আল্লাহর দীনের পতাকা সমুন্নত করার কাজ তেমন একটা অগ্রসর হতে পারে না। তার সামনে আরব মুজাহিদীনের দৃষ্টান্ত ছিল, যারা রুশ আমলে এবং পরবর্তীতে আফগানিস্তানে নিজেদের ঘর-বাড়ি সবকিছু ছেড়ে পুরোপুরি হিজরত করে এসেছিলেন। শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, এই হিজরতের বরকতেই আরব সাথিরা এই অঙ্গনসহ অন্যান্য বিভাগে এমন অবদান রেখেছিলেন, যা অন্য কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি। মুহাজির মুজাহিদীনের পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের বিবাহের ব্যবস্থা এবং আল্লাহর দীন ও জিহাদের পরিবেশে একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা পাকিস্তানি মুজাহিদীনের মাঝে আরম্ভ হয়েছিল, তার সূচনা হয়েছিল শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর হাত ধরেই। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর গুণাবলি আলোচনাকালে

[351]

আগেও আমরা একথা উল্লেখ করেছি যে, তিনি এমন একটি প্রজন্ম তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে যাদের প্রধান লক্ষ্য এবং এই লক্ষ বাস্তবায়নের জন্য যারা হিজরতের মাধ্যমে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে। ওই মুহাজিরদের কুরবানী ত্যাগ-তিতিক্ষা সহ অন্য সকল খেদমত, অবদান এবং জিহাদ সংক্রান্ত যোগ্যতা, প্রতিভা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা ও পারদর্শিতার মধ্য দিয়েই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বেগবান ও গতিশীল হবে। ঈমান ও জিহাদের সঙ্গে হিজরতের একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে, যা কুরআনে কারীমে বারবার সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। الَّذِينَ آمَنُوا - এবং - الَّذِينَ هَاجَرُوا এবং الَّذِينَ جَاهَدُوا এমন আয়াতগুলোতে যাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তাদের আরও একটি গুণের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, কুরআন শরীফের অধিকাংশ জায়গায় এভাবেই ঈমান ও জিহাদের সঙ্গে হিজরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাদীসে পাকেও হিজরতকে মক্কা বিজয়ের পর থেকে জিহাদের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

«لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

অর্থ: "(মক্কা) বিজয়ের পর কোনো হিজরত নেই কিন্তু রয়েছে জিহাদ ও নিয়ত; তাই যখন তোমাদেরকে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা বেরিয়ে পড়ো।" »[59]

এক কথায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর হিজরত এবং অন্যদেরকে হিজরত করার আন্দোলনে শামিল করার পেছনে যার অবদান খুব বেশি ক্রিয়াশীল ছিল, তিনি ছিলেন শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। এমন নয় যে, সকল সাথি ও দেশবাসীকে হিজরত করিয়ে গোত্রীয় অঞ্চলে

[59] সহীহ বুখারী

একত্রিত করা এই হযরতগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কখনোই এমনটা ছিল না। বরং কতিপয় যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি জিহাদী আন্দোলনের দায়িত্ব তুলে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, তাদেরকে একত্রিত করা উদ্দেশ্য ছিল। অন্যথায় কত সাথি হিজরত করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন! কিন্তু মুজাহিদীনের উমারা ও নেতৃবৃন্দ তাদেরকে নিজেদের এলাকাতেই দাওয়াত ও জিহাদের কাজে ব্যস্ত থাকার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এমনকি হিজরতের নিয়তে বেরিয়ে আসা কতক ব্যক্তিকেও জিহাদের নুসরতের উদ্দেশ্যে নিজ এলাকায় তারা পাঠিয়ে দিতেন।

মিকদার নয় মিইয়ার (পরিমাণ নয়; মাপকাঠিই মুখ্য)

শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ সকল কাজ সর্বোত্তম পন্থায় সম্পন্ন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তার রুচি ও মেজাজ এমনই ছিল। তিনি যে কাজ আরম্ভ করতেন, তা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটিগুলো অপসারণ না করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী শোনাতেন:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ»

অর্থ: "আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো কাজ করবে তখন যেন তা সঠিকভাবে পরিপক্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করে।" »[60]

---

60 ইমাম তাবারানী রচিত আল মুজামুল আওসাত

তাই এই মেজাজ তার ফিতরাতের অংশ হয়ে গিয়েছিল। এই একই মেজাজ তার সকল দাওয়াতী কাজ ও মিডিয়া অঙ্গনের অবদানগুলোতে ক্রিয়াশীল দেখা গেছে। স্ক্রিপ্ট হোক কিংবা অডিও , সেগুলো সাজাতে গিয়ে প্রুফের ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করা হোক কিংবা সাহিত্যগত কোনো অসঙ্গতি শুধরানো হোক , কোনো কিছুই শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সূক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচরে থাকতো না। প্রকাশিতব্য প্রতিটি ফাইল বারবার রিভিউ করতেন। তিনি এমন দ্রুততার পক্ষপাতী ছিলেন না , যার দ্বারা ভুল ত্রুটি সহকারে এবং বিশুদ্ধ মাপকাঠিতে উন্নীত না হয়েই কোনো কিছু প্রকাশিত হয়ে যায়। তার এমন স্বভাবের প্রভাব পড়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ওপর। তার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সকল দাওয়াতী ও মিডিয়া প্রকাশনা বেশ মানসম্মত হত। স্বয়ং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর লেখালেখির পরিপক্কতা , সম্পাদনার জন্য কাটাচেরার অভ্যাস এবং সাহিত্যিক রুচির উপর শাইখ আহসান রহিমাহুল্লাহর প্রশিক্ষণের সুস্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়ার মতো ছিল।

গোপনীয়তা রক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বন

সুন্নাহ অনুসরণ এবং সর্বোত্তম আদর্শ সীরাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবলম্বন বানিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পরিচালনা করা শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মনোযোগের দিক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجَاحِ الحَوائِجِ بِالكِتْمَانِ لَهَا؟

অর্থ : “নিজের কাজগুলো সফল করার জন্য গোপনীয়তার সাহায্য গ্রহণ করো। ” »[61]

এই নববী নির্দেশনা তিনি খুবই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কুরআনে কারীমে এবং সীরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে বিভিন্ন জায়গায় সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া , শত্রুর প্রতারণা থেকে সর্বদা সতর্ক থাকা এবং শত্রুপক্ষের ব্যাপারে গাফিল তথা উদাসীন না হবার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহনবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে পাওয়া এই শিক্ষাগুলো গোটা জিহাদী জীবনে মেনে চলতে খুবই সচেতন ছিলেন।

শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ 'র এই অঙ্গনে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে বলেন : গোপনীয়তা রক্ষার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই জিহাদী অঙ্গনে কোনো বড় কাজ করতে পারে। যার মাঝে গোপনীয়তা রক্ষার গুণ নেই সে কখনও কখনও নিজের এবং অন্যদেরও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি শুধু সাথিদেরকে খুশি করার জন্য জিহাদী গোপন বিষয় প্রকাশের বিরোধী ছিলেন। জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি অনেক বেশি বলতেন :

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»

অর্থ : “মানুষের ভালো মুসলমান হবার লক্ষণ হল অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা। ” »[62]

---

[61] ইমাম তাবারানী রচিত আল মুজামুস -সাগীর
[62] সুনানে ইবনে মাজাহ

এই হাদীসের আলোকে শায়খ একদিকে যেমন অনর্থক কথা-বার্তা ও অর্থহীন গল্প-গুজব করতে নিষেধ করতেন, অপরদিকে সঙ্গী-সাথিদের কাছে অপ্রয়োজনে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করতেও নিষেধ করতেন। একইভাবে কোনো প্রয়োজন ছাড়া শুধু বিনোদনের উদ্দেশ্যে বাজারে ঘোরাঘুরি করা, এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে যাতায়াত এবং হল্লা করে নিজেদের দিকে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তিনি জিহাদের সকল বিষয়ে ভারসাম্যের প্রবক্তা ছিলেন। সাথিদের নিরাপত্তাকে সীমাহীন গুরুত্ব দিতেন এবং এ বিষয়ে এক মুহূর্তের অবহেলাও মেনে নিতেন না। জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহর এই গুণ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকেও প্রভাবিত করে। তিনি গোপনীয়তা রক্ষায় বিখ্যাত ছিলেন। এই গুণের ভিত্তিতেই আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বড় কাজ তার দ্বারা করিয়েছেন। ভীষণ কঠিন অবস্থা এবং শত্রুর কড়া পাহারা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার সাহায্যের পর সতর্কতা অবলম্বন ও গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে নিজের দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

• শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ থেকে জিহাদ শিখুন!

শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যের কারণে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অন্তরে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর ভালোবাসা স্থান করে নেয়। শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ -এর অনুরাগী ছিলেন। তাকে যুগের ইমাম মনে করতেন এবং শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর ঘনিষ্ঠ শিষ্য

[356]

মুহসিনে উম্মাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা পোষণ করতেন। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, সমকালীন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র তাৎপর্য উপলব্ধি ও প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর রচনাবলী পাঠ করা জরুরি। তিনি শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহকে মুজাহিদীনের নেতা ও অভিভাবক মনে করতেন।

শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর রচনাবলী পাঠ করতে শুরু করেন। তার তত্ত্বাবধানে থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ রচিত কালজয়ী গ্রন্থ الـــدفاع عن أراضي المســـلمين من أهم فروض الأعيان - 'ঈমানের পরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন' শিরোনামে অনুবাদ করেছেন। এই গ্রন্থ ছাপার পর উর্দু ভাষা জানা কোনো লোকের জিহাদের ময়দানে আসার পেছনে এই গ্রন্থের মৌলিক ভূমিকা ছিল না বলে আমার মনে হয় না। গাযওয়ায়ে হিন্দ ও খোরাসান যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপনে এই বরকতপূর্ণ কিতাবের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারে? এই গ্রন্থ পাঠকারী যদি জিহাদে নাও বের হয় (কারণ জিহাদে বের হওয়া আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে চান, তাকে দান করেন) কিন্তু তবুও জিহাদ ও মুজাহিদীনের ভালোবাসা তার অন্তর স্থান করে নেয়। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহর চমৎকার প্রমাণ নির্ভর আলোচনা হোক, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আরবী উর্দু ভাষার দক্ষ লেখনী কিংবা হৃদয়ের উত্তাপ হোক, শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর দিকনির্দেশনা ও সাহিত্যিক রুচি হোক—সব কিছু মিলে উক্ত গ্রন্থ বরকতময় ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে পাঠকমুখ দেখতে পায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যতদিন পর্যন্ত উর্দু

ভাষাভাষী বিদ্যমান থাকবে, এই গ্রন্থ তাদের জন্য জিহাদের আগ্রহ জাগানিয়া ভূমিকা পালন করবে। এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্বদিক থেকে যারা ভূমিকা রেখেছেন, তাদের আমলনামায় এই অবদান সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে শামিল হবে ইনশাআল্লাহ।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেন।” [আল কুরআন]

শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ অনেক দৌড়ঝাঁপের পর শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর রচনাবলী ও বক্তব্য সমূহের এনসাইক্লোপিডিয়া ‘আয যাখায়েরুল ইযাম' সারা দেশের বিভিন্ন পাঠাগার থেকে সংগ্রহ করেন। দীর্ঘ কলেবরের চার খণ্ড ও কয়েক হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত ওই সংকলন নব্বইয়ের দশকে ছাপা হয়েছিল এবং দীর্ঘ সময় তা দৃষ্টির আড়ালে ছিল। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ ওই এনসাইক্লোপিডিয়া অধ্যয়ন এবং তা থেকে হেকমত প্রজ্ঞা জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির অমূল্য রত্ন অনুসন্ধানের প্রতি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ -এর মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

অতঃপর শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ রচিত শহীদদের স্মৃতিচারণমূলক হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ ‹উশশাকুল হুর›-র অনুবাদ প্রকাশ করেন "যারা জান্নাতের সন্ধানে' শিরোনামে। শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ ওই অনুবাদের সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি তাতে নিজের সাহিত্যিক রুচির মিষ্টতা ছড়িয়ে দেন।

এক কথায় শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর মনোযোগ ও পরামর্শের ফলে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সমকালীন জিহাদের ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর কিতাবসমূহ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন, তার চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা [358]

করেছেন, অতঃপর নিজের জীবন ওই চিন্তাধারা প্রচার প্রসারে উৎসর্গ করেছেন।

মতবিরোধ কিন্তু সাহাবা সুলভ চরিত্র
শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ অত্যধিক নম্র মেজাজ ও প্রেমপ্রসারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সে সঙ্গে তিনি একজন কবি ছিলেন। কবিদের মতো সংবেদনশীলতা তার মাঝে ছিল। এই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল হৃদয়ে যদি কারও অমনোযোগে, অসতর্কতায় অথবা ইজতিহাদী ভুলের কারণে চুল পরিমাণও আঁচড় লাগতো, সেটা মুছে দেয়া খুবই কঠিন বিষয় ছিল। কবিরা এই সংবেদনশীলতার কারণেই অধিকাংশ সিদ্ধান্ত মনে মনে গ্রহণ করে নেন। লাল মসজিদের ঘটনার পর পাকিস্তানের ভেতর জেনারেল পারভেজ এবং তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিস্তার সম্পর্কে শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে অন্য মুজাহিদীনের মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহর রায় এবং অন্যান্য গ্রুপের রায়ের কথা ইতিপূর্বে আমরা এই কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। কার্যক্ষেত্রের কর্মকৌশল নিয়ে সৃষ্ট এই মতবিরোধে অধিকাংশ বিষয়ে উভয়পক্ষ সহমত থাকা সত্ত্বেও শাখাগত কিছু বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাচ্ছিলো না। ওই সময়ে আরব মুজাহিদীনের একজন দায়িত্বশীলের প্রতি শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর মাঝে ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ আরব নেতৃবৃন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আলাদা হয়ে যান। তখন শরীয়তের নীতিমালার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মেজাজ তার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে মতপার্থক্য করতে বাধ্য করে। মূলনীতির ব্যাপারে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ

[359]

অনমনীয় ছিলেন এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র এক একটি নীতি তিনি পুরোপুরি বুঝে গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন, শরীয়তের আলোকে আমাদের মন-মেজাজ ও অভ্যাসের বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার আমীরের রয়েছে। তিনি আরও বলতেন, কখনও আমরা নিজেদের জন্য কোনো বিষয়কে কল্যাণকর মনে করি কিন্তু আমীর অন্য বিষয়কে আমাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিক উপযুক্ত বলে মনে করেন। এমন অবস্থায় শরীয়তের সীমারেখার ভেতর থেকে আমাদের সেটাই করা উচিত, যা আমীর করতে বলবেন।' যেহেতু জিহাদে শামিল হবার সূচনালগ্ন থেকেই তিনি শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজের রাহবার ও সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্বকে ছেড়ে শরীয়ত নির্দেশিত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত থাকেন।

ওই মতবিরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ও শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এমনকি আস্থা পোষণ করতেন। খুবই আদব সহকারে তার কথা উল্লেখ করতেন। তাতে মনে হতো, তিনি নিজ অভিভাবক ও শিক্ষকের কথা আলোচনা করছেন। আমি কখনোই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুখ থেকে শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে কোনো কটু কথা শুনিনি। একবার একজন অজ্ঞতার কারণে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করার পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যখন জানতে পারলেন, তখন তীব্র নিন্দা জানিয়ে বললেন: « “ওই সাহেব যদি শায়খের আখলাক সম্পর্কে জানতেন, তাহলে কখনোই তার ব্যাপারে এমনটা বলতে পারতেন না।“ »

এই উভয় মহান ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, তাদের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিন! জান্নাতের মাহফিলে ভালোবাসা ও নেয়ামত সহকারে পুনরায় তাদেরকে [360]

মিলিত করুন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে জান্নাতের দৃশ্য তুলে ধরেছেন :

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

–

অর্থ : । তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল , আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা -সামনি আসনে বসবে। (47) । ’ [সূরা হিজর আয়াত নং ৪৭]

জান্নাতের অন্যতম নেয়ামত হল , ঈমানদারগণ সেখানে পৌছার পর পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর হয়ে যাবে। উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে আরও জানা যায় , জান্নাতে অনেকেই এমন হবে, দুনিয়াতে যাদের মাঝে মনোমালিন্য ছিল , কিন্তু জান্নাতে গিয়ে তা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের এই অনুসারীদেরকে কিয়ামতের দিন সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মিলিত করুন , আমীন।

এখানে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বিবৃতির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করছি —যা তিনি শহীদ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর আস -সাহাব মিডিয়ায় প্রচার করেছেন। ঐ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে , একদিকে যেমন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শহীদ আহসান রহিমাহুল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আস্থা পোষণ করতেন, অপরদিকে শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহর দুর্লভ ঈমানী ও চারিত্রিক গুণাবলি স্বীকার করতেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শহীদ আহসান রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে বলেন :

« মুহতারাম ভাইগণ ! দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে কয়েক বছর পর্যন্ত তার শিষ্যত্ব লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তার সান্নিধ্যে থেকে আমি উপকৃত হয়েছি। যদিও আমি তার একজন অযোগ্য শিষ্য ছিলাম , কিন্তু তার সঙ্গে থাকা প্রতিটি মুহূর্ত আমার এবং

আমার মতো অন্যান্য মুজাহিদের জন্য ঈমান বৃদ্ধি, ইলমে-আমলে উন্নতি, চিন্তা-চেতনার বিস্তৃতি ও গভীরতা এবং প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম বলে প্রমাণিত হয়েছে। জনাব আহসান রহিমাহুল্লাহ সর্ব প্রথম আমাকে জিহাদী দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেন। তিনি কলম ধরতে শেখান, মূল্যবান গ্রন্থাবলী অনুবাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর লেখালেখি করতে অনুপ্রাণিত করেন এবং স্নেহভরে আমার ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দেন। তারই নির্দেশে আমি শায়খ হামুদ বিন উকলা

63 শাঈবী
রহিমাহুল্লাহর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া অনুবাদ করেছি— যেখানে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার বৈধতা এবং জাযিরাতুল আরব থেকে মুশরিকদেরকে বের করে দেয়ার শরীয়াহগত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তারই নির্দেশে, আল্লাহর তাওফীকে শহীদে মিল্লাত শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর নির্বাচিত বয়ানের অনুবাদ সংবলিত দুটি কিতাব প্রস্তুত করেছি, যেগুলোর সার্বিক সৌন্দর্য বর্ধন, বর্ণনাগত সাহিত্যগত সজ্জা তিনি নিজ হাতে করেছেন। অতঃপর তারই দিকনির্দেশনায় আল্লাহর তাওফীকে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর

63 শাইখ হামুদ বিন উকলা শাঈবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সৌদি আরবের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের মাঝে গণ্য করা হতো। তিনি ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে নিজে আফগানিস্তানে উপস্থিত হতে পারেননি কিন্তু তিনি আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাইয়াতকে ওয়াজিব মনে করতেন। তিনি সৌদি আরব থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে বাইয়াতবদ্ধ হন। সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক ছিলেন এবং এই গুণের কারণে সমকালীন বিশ্বে সালফে সালেহীনের স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন। কাফেরদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া প্রসঙ্গে রচিত তার (আল কওলুল মুখতার ফী হুকমিল ইস্তিআনা বিল কুফফার) গ্রন্থটির ভূমিকা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখে দিয়েছেন। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি সৌদি আরবের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে লিখিত তার ঐতিহাসিক চিঠিপত্রে —যেখানে মার্কিন সেনাবাহিনীর সাহায্য নেয়ার অজুহাতে জাজিরাতুল আরবে তাদেরকে বসবাসের সুযোগ দেয়ার বিরুদ্ধে দলিল দেয়া হয়েছে এবং আমেরিকানদেরকে আরব থেকে বের করে দেবার দাবি পেশ করা হয়েছিল— শাইখ হামুদ বিন উকলা শা'ঈবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ফতোয়া দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। ২০০১ সালের শেষ দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন! আমিন!!

[362]

‘মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা ঈমান আনার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ' গ্রন্থটি তরজমা করি—যার সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও মূল্যবান ভূমিকা তিনি লিখে দিয়েছেন। তিনিই উর্দু ভাষায় জিহাদী দাওয়াত বিস্তারের জন্য মিডিয়া ব্যবহারের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া নেয়ার পর এই মোবারক আমলের সূচনা করেছেন। আমরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দাওয়াতের স্পর্শকাতরতা ও সঠিক পন্থা শিখেছি। শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণেই টেকনিক্যাল বিষয়াদিতেই শুধু তার পারদর্শিতা ছিল না; বরং দাওয়াতের অস্থিরতা, এ ময়দানের দীর্ঘ সময় ব্যাপী অভিজ্ঞতা, মানব রুচি প্রকৃতির পরিচিতি, উর্দু সাহিত্যকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে গ্রহণ এবং আরবী ভাষায় আগ্রহের কারণেও তিনি অনন্য ছিলেন। এই গুণাবলির কারণেই তিনি একজন দৃষ্টান্তহীন দাঈ ছিলেন। উপমহাদেশে আজকের জিহাদী জাগরণে নিঃসন্দেহে হযরতের নীরব, সরল, একাগ্র, অধ্যবসায়পূর্ণ ও ধারাবাহিক দাওয়াতী কর্মপ্রচেষ্টার একটা বড় অবদান রয়েছে। জিহাদের ভালোবাসা ছিল তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। আমাকে এবং আমার মতো অনেক ভাইকে সর্বপ্রথম তিনিই জিহাদ ফরয হবার সবক দিয়েছিলেন। তিনি উম্মাহর ব্যথা- বেদনা আমাদের বুকে সঞ্চার করেছেন। মুহাজিরীন ও আনসার দলের বসতিতে জীবন যাপনের ব্যাকুলতা আমাদের মাঝে জাগ্রত করেছেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর বৈশ্বিক জিহাদী দাওয়াত আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা, তাদের পায়ের কাছে বসে শেখা, ঈমানদারদের সামনে বিনয়ী হবার শিক্ষা দান করেছেন। কুফরকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন। পশ্চিমা সংস্কৃতির মন্দ দিকগুলো আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছেন। ফলে তার

[363]

দাওয়াত আমাদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। ঘরে বসে থাকা এবং সাধারণ জীবন যাপন করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্য বলতে হলে স্বীকার করতেই হবে, শহীদ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর কপালের ঝলক এবং চেহারায় চিন্তার যে রেখা ছিল— সালফে সালেহীনের গ্রন্থাবলীতে আমরা যা পড়ে এসেছি—সেটাই সর্বপ্রথম আমাকে জিহাদের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল। আমি গোটা জীবনে অল্প সংখ্যক লোকের মাঝেই কুরআন ও সুন্নতের ভালোবাসা, উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, দীনদারদের প্রতি স্নেহ-মমতা, উন্নত চারিত্রিক গুণ, সংবেদনশীলতা, লজ্জা, পবিত্রতা, দানশীলতা, পরিমিত কথা, দাঈ সুলভ অস্থিরতা, মুজাহিদ সুলভ দুনিয়া বিমুখতা, মেধা, দক্ষতা এবং এজাতীয় উন্নত গুণাবলির সমাহার পেয়েছি— যেমনটা আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর মাঝে দেখেছি। তার ব্যাপারে এমনটাই আমাদের ধারণা এবং আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট! আমরা কামনা করি, আল্লাহ যেন তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

64

সালফে সালেহীনের দৃষ্টান্ত দুনিয়াবিমুখী দরবেশ আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান শহীদ রহিমাহুল্লাহ

জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামাবাদে শিক্ষা গ্রহণের সময়কালেই মাওলানা সাঈদুল্লাহ ইবনে মাওলানা ইউসুফ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তিনি ছিলেন আল্লাহর মহান ওলী, সালফে সালেহীনের দৃষ্টান্ত, আলেমে রব্বানী, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। ক্রুসেড 64 শহীদ আহসান আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির শাহাদাতের পরিপ্রেক্ষিতে আসসাহাব মিডিয়াতে প্রকাশিত উস্তায আহমদ ফারুক রহমতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য থেকে সংগৃহীত

[364]

যুদ্ধগুলোতে ইহুদীদের রক্ষক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুপ্তচরবৃত্তির ফলে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণকারী ‘দির’ জেলার অধিবাসী তিনি।

• বড় দুই ফ্রন্টের গাযী

মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ‘দির’ জেলার একটি সম্ভ্রান্ত দীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ ‘দির’ জেলার প্রসিদ্ধ আলেমে দীন এবং মুজাহিদ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রুশবিরোধী জিহাদের সূচনাকাল থেকেই মুজাহিদীনের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় তিনি এগিয়ে এসেছিলেন এবং সশরীরে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাঙ্গনে নেতৃত্ব দান করেন। পাক আফগান সীমান্তবর্তী এলাকার অধিবাসী হওয়ার কারণে তার ঘরে সে সময় মুজাহিদীনের যাতায়াত ছিল। সে সময় মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ অনেক ছোট্ট ছিলেন। মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ দরসে নিজামীর প্রাথমিক কিতাবগুলো ‘দির’ জেলার বিভিন্ন মাদরাসায় পড়েন এবং মারদান থেকে দাওরা হাদীস সমাপন করেন। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্রই আফগানিস্তানে রাশিয়া এবং তার সহযোগী ধর্মহীন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তান বিজয়ের পর গাযী হয়ে ফেরেন, কিন্তু জিহাদের পিপাসা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাশ্মীরের ভাইদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য কাশ্মীর চলে যান।

কাশ্মীরের গাযী...

রুশ বিরোধী জিহাদ শেষ হওয়ার পর যখন মুজাহিদীন পাকিস্তান আমেরিকা এবং অন্যান্য

[365]

দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, ওই সময় মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ খুবই ব্যথিত ও বেদনাহত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আল্লাহর দীন বিজয়ের লক্ষ্য বুকে ধারণ করেছিলেন আর হতাশ হয়ে বসে থাকা কোনো মুসলিমের চরিত্র হতে পারে না, তাই তিনি কাশ্মীরে চলে যান, যেখানে সাহসিকতা, বীরত্ব ও সামরিক গুণাবলির উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেখানে তার চিন্তাধারার গভীরতা পরিপক্কতা এবং মুসলিম উম্মাহর সমস্যাগুলো সমাধানের অস্থিরতা অন্যদের মাঝে সঞ্চার করেন। কিন্তু কাশ্মীর জিহাদে অংশগ্রহণের ফলে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, এখানে জিহাদরত জামাআতগুলো চক্রান্তকারী বিশ্বাসঘাতক সংস্থা আইএসআই'র শিকলে আবদ্ধ; গোপন এজেন্সিগুলোর প্রভাবমুক্ত হয়ে জিহাদী পরিকল্পনা দূরের কথা; এই জিহাদী সংগঠনগুলো পাকিস্তান আর্মির দিকনির্দেশনা, অনুমতি ও সহযোগিতা ছাড়া কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করতে পর্যন্ত সক্ষম নয়। তার কাছে রুশ জিহাদের সময়কাল থেকেই আইএসআই'র স্বার্থান্বেষী অন্যায় আচরণ স্পষ্ট ছিল, তাই উম্মাহর সঙ্গে অন্যায়কারী আইএসআই'র দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জিহাদ করা তার পছন্দনীয় ছিল না।

ওই অবস্থায়ও তিনি হতাশ হয়ে বসে থাকতে রাজি ছিলেন না; বরং অবস্থার সংশোধনমূলক বিশ্লেষণ এবং সংস্কারমূলক অন্যান্য পথ খোঁজ করতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি সত্য অনুসন্ধানী ছিলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জিহাদ সত্যনিষ্ঠ হবার বিষয়ে আস্থাশীল ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে মুজাহিদীনের গৃহযুদ্ধের কারণে ব্যথিত হয়েছিলেন। একইভাবে কাশ্মীর জিহাদের মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা তার

[366]

অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার উৎসস্থল আইএসআই'র তত্ত্বাবধানে কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি অপর কোনো সঠিক পথ লাভের আশায় গ্রন্থাবলী ঘাঁটাঘাঁটি করতে আরম্ভ করেন। তার এই অস্থিরতা দেখে তার পিতা রহিমাহুল্লাহ পরামর্শ দেন, এভাবেই যদি কিতাবপত্র পড়তে হয়, তাহলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো জামিয়ায় ভর্তি হয়ে নাও এবং পছন্দসই বিষয়গুলোতে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করো। তখন তিনি বিদ্যাঙ্গনে তার ভ্রমণ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইসলামাবাদ-এর ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। আল্লাহর ইচ্ছায় ওই সময় এই ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহও ভর্তি হয়েছিলেন। কয়েকটি ক্লাসে মাওলানা সাঈদুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সহপাঠীও ছিলেন উভয় হযরতের শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিতি ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ায় অল্প সময়ের ভেতর তাদের মাঝে আন্তরিকতা গড়ে ওঠে এবং তারা সমমনা বন্ধুতে পরিণত হন। অতঃপর এই বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে উভয় হযরতকে সঙ্গী বানিয়ে দেয়।

ইলমে দীনের ভালোবাসা মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ইলমে দীনের ভালোবাসা ও আগ্রহে সালফে সালেহীনের দৃষ্টান্ত ছিলেন। ইলমী ব্যস্ততায় এমনভাবে ডুবে যেতেন, না থাকতো ঘরের চিন্তা আর না শরীরের। তার সাদাসিধে জীবনের অবস্থা হলো, প্রথম সাক্ষাতে তাকে দেখে কোনো ফকির মনে হতো। কিন্তু আলোচনা শুরু করলে মনে হতো, অশান্ত সাগরে জোয়ার উঠেছে। তার

[367]

উস্তাদগণও তাকে উস্তাদ বলতেন। মাওলানা সাহেব আরবী বালাগাত (ভাষা অলঙ্কার শাস্ত্র) ও ফিকহে বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও শরীয়াহর তুলনামূলক আইনতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন। উলুমে শরঈয়াতে পরিপক্কতা অর্জনের পর আন্তর্জাতিক ও ব্রিটিশ আইনের ব্যাপক অধ্যয়ন একদিকে যেমন মানব রচিত আইন-কানুনের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিগুলো তার সামনে স্পষ্ট করেছে, অপরদিকে শরীয়তে রব্বানীর মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত থাকার দৃষ্টিভঙ্গি তার আরও পরিপক্ক হয়েছে।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তার সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের কথা ওইসব ব্যক্তির জানা আছে, যারা তাদেরকে ইউনিভার্সিটির দিনগুলোতে দেখেছে। মাওলানা সাঈদুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাঝে ইলমে দীনের ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দিতেন, ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে ইজামের অবাক করা তাকওয়া, স্মরণশক্তি ও মেধাশক্তির ঘটনা শুনিয়ে ইলমে দীনের প্রতি অনুপ্রাণিত করতেন। অপরদিকে মাওলানা সাহেবের মাঝে আমলের মুহব্বত, বিপ্লব, আমর বিন মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের আগ্রহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তৈরি করতেন।

মাওলানা সাহেব ইলমে দীনের পাগল ছিলেন। কিতাব পড়া, সে অনুযায়ী আমল খোঁজ করা, কিতাবের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা এবং কিতাবটি উপকারী হলে অন্য সাথিদেরকে তার প্রতি মনোযোগী করা তার বিশেষ কাজ ছিল। একবার তিনি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে বলেন, "আমার উস্তাদ বলতেন, যদি জ্ঞান অর্জন করতে চাও তাহলে দৈনিক ৫০০ পৃষ্ঠা পাঠ করো।’ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করেন: "আপনি কি দৈনিক এই পরিমাণ পাঠ করেন?’ তখন তিনি জবাব দেন: "আলহামদুলিল্লাহ! করে [368]

নিই এবং এই পরিমাণ না পড়লে আমার ঘুম আসে না’। অনেকের কাছে অতিরঞ্জন মনে হতে পারে, কিন্তু যার জীবন ও সময়ে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন, তার জন্য এতটুকু পাঠ করা কঠিন কিছু নয়।

ইলমে দীনের এই মহাব্বত শুধু নিজের মাঝে নয়; বরং অন্য জ্ঞানী সাথিদের মাঝেও এই ভালোবাসা সঞ্চার করে দেয়া মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর নেশায় পরিণত হয়েছিল। আমি এখনও তার ঐ বর্ণনাভঙ্গি ভুলতে পারি না যেদিন তিনি উদ্দীপনা সহকারে আল্লামা সারাখসি রহিমাহুল্লাহ কুয়ায় বসে ‘মাবসুত’ গ্রন্থ রচনার ঘটনা বলেছিলেন। তৎকালীন শাসক ইমাম সাহেবকে বন্দী করে কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিল। তিনি সেখানে বসে বসে হযরত ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর অন্যতম শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহর সংকলিত গ্রন্থগুলো ব্যাখ্যা করেন। ইমাম সারাখসী'র শিষ্য কুয়ার পাড়ে বসে তিন খণ্ড সংবলিত এই বিরাট ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। হাজার হাজার ইলমী ফিকহী মাসআলা সংবলিত এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা সময় ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহর কাছে অধ্যয়নের জন্য কোনো গ্রন্থ ছিল না। এ কথা বর্ণনা করে উদ্দীপনার আতিশয্যে মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর চোখগুলো চকচক করতে শুরু করে। আর আমাদের অন্তরে একদিকে উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, শাসকদের জুলুম-নির্যাতনের মুখে তাদের সাহসী অবস্থান স্থান করে নেয়; সেই সঙ্গে সালফে সালেহীনের জ্ঞান অর্জনের আকুলতা, জ্ঞানগভীরতা ও প্রশস্ততার ইঙ্গিত পেয়ে ইলমে দীনের প্রতি আমাদের আগ্রহ বেড়ে ওঠে।

পিছনের পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচনা হয়েছে যে, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যখন তার দাওয়াতী শিক্ষাগুলোতে অধিক মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ কিছুটা [369]

চিন্তিত হন এই মনে করে যে, আল্লাহর দীনের দাওয়াতের আগ্রহে ইলমে দীনের প্রতি তার আগ্রহ না কমে যায়। আমার সঙ্গেও তার এমনই স্নেহপূর্ণ আচরণ ছিল। আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসের পড়া নেয়া, অধ্যয়নে মনোনিবেশের এবং বৃথা আলাপচারিতা ও রাজনৈতিক গল্পগুজবে সময় নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেন। ইউনিভার্সিটি করিডোর দিয়ে যাওয়ার সময় যদি তার মুখোমুখি হতাম, সেখানে দাঁড়িয়েই আমার পড়াশোনার বিস্তারিত খোঁজ নিতেন। আমি অমনোযোগী হলে ভালোবেসে সচেতন করে দিতেন। নম্রভাবে কিছুটা তিরস্কার করতেন। আমার সবক শেষ না হলে কিংবা পড়াশোনায় গভীরতা না থাকলে এতটাই চিন্তিত হতেন যে, আমি হতবাক হতাম। ওই সময়কার একটি মজার ঘটনা মনে এসেছে। ইউনিভারসিটিতে নবীন বরণ অনুষ্ঠান হয়। আয়োজকবৃন্দ অনুষ্ঠানের মাঝখানেই মতামত ব্যক্ত করার জন্য হঠাৎ আমার নাম ঘোষণা করে। ইউনিভার্সিটির শিক্ষানীতি সম্পর্কে আমার তাৎক্ষণিক কিছু কথা বলতে হয়। আমি নিরুপায় অবস্থায় কিছু আবেগি ধরনের কথা বলে বসি। ইউনিভার্সিটির স্থূল দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষার্থীরা আমার কথা খুবই পছন্দ করে। আমার গ্রহণ যোগ্যতা তৈরি হয়। অনুষ্ঠান থেকে যখনই আমি বের হই, তখন বাহিরের দরজায় মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে এক কোণায় নিয়ে গেলেন। যথেষ্ট তিরস্কার সহকারে বললেন, তোমার আলোচনায় গভীরতা নেই কেন? এটা তোমার অধ্যয়নের অভাবে হয়েছে, অর্থাৎ তুমি পড়াশোনায় মনোযোগ কম দিচ্ছো। অতঃপর আমাকে খুবই নম্রভাবে ভালোবেসে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে এবং ইলমে দীন হাসিলের আগ্রহ তৈরি করতে বলেন। আল্লাহ তাআলা তার

[370]

প্রতি রাজি হয়ে যান এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে আমাদেরকে তার সঙ্গ দান করুন, আমীন।

জিহাদের দিগন্তগুলো আপনাকে স্মরণ করছে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর ভালোবাসা ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা ও আস্থা বিনিময়ে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করে। বিনয়, দুনিয়া বিমুখতা ইত্যাদি গুণ সমুদ্রে ডুবে থাকা মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজের ইমাম বলেন। কখনও কখনও তাদের জুটি দেখে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ এবং হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহ-এর পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্পর্কের ঘটনাগুলো মনে পড়ে যেত। হযরত শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহর ইলমী অবস্থান হযরত সাইয়েদ সাহেব রহিমাহুল্লাহ চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল। কিন্তু দাওয়াত ও জিহাদের উদ্দেশ্যে তিনি সাইয়েদ সাহেব রহিমাহুল্লাহ -এর হাতে বায়আতবদ্ধ হয়েছিলেন। এক কথায় মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অন্তরে কুরআনে কারীম এবং উলুমে কুরআনীয়ার (তথা কুরানিক জ্ঞান-বিজ্ঞান) ভালোবাসা স্থাপন করে, অপরদিকে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর অন্তরে জিহাদ, আমর বিল মারূফের মুহব্বত এবং উম্মাহর বেদনা বৃদ্ধির পেছনে ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে নির্বাচন করেছিলেন। অবশেষে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার ফরয দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে নিজের মুরশিদ ও পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

[371]

ওই সময়কার আরও একটি মজার ঘটনা মনে পড়েছে। আল্লাহর তাওফীকে কয়েকজন বন্ধু ইউনিভার্সিটিতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দাওয়াত প্রসার করছিলেন। তখন ইউনিভার্সিটির একটা গ্রুপ তাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। তারা মুজাহিদীনের কেবল বিরোধিতাই নয়; বরং তাদের ব্যাপারে মিথ্যাচার করতে আরম্ভ করে। তাদের ব্যাপারে এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা পোষণের অপবাদ দেয়, যা তাদের মাঝে নেই। ওই সময় মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা বিভাগে পড়াশোনা করছিলেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ততদিনে পড়াশোনা সমাপন করে চলে গিয়েছিলেন। যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব একজন বুযুর্গ আলেমে দীন হিসেবে সকলের কাছে স্বীকৃত ছিল, এজন্য মুজাহিদীনের বিরোধীরা মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর কাছে গিয়ে মুজাহিদীনের ব্যাপারে তাকে ভুল তথ্য দিলেন। তারা আরও বললেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিপরীতে এই মুজাহিদরা খারেজীদের আকীদা পোষণ করে। তখন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বললেন, যদি আসলেই তাদের ধ্যান-ধারণা এমন হয়, তাহলে তাদেরকে আমার সঙ্গে বসতে বলবেন, আমি তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেব। মাওলানা সাঈদুল্লাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে বসার সাহস আমাদের মাঝে কার ছিল? অবশ্য আমি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে অভিযোগ করি, আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনের বিরোধিতায় এ কেমন কথা বললেন? তার কিছুদিন পর প্রায় দেড় বছরের জন্য আমি জেলখানায় আটক থাকি। জগৎ স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা আমার উপর বিশেষ দয়া বর্ষণ করেন এবং একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে বর্বর এজেন্সি আইএসআই'র গোপন সেল থেকে আমি মুক্তি লাভ করি। সফর থেকে ফেরার পর

[372]

সর্বপ্রথম যে সুসংবাদ আমার কাছে পৌঁছে তা হল: মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ শুধু বৈশ্বিক জিহাদের পুরোপুরি সমর্থক হয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং এই পথে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার ইচ্ছায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জিহাদী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সমর্থক তিনি আগে থেকেই ছিলেন; কিন্তু সত্য অনুসন্ধানের পথে মুজাহিদীনকে তিনি পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখতেন। বিরোধীরা তাকে ভুল তথ্য দেয় যে, ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পর এই যুবকেরা জিহাদের ময়দানে তাকফীরি চিন্তাধারা ও বিশৃঙ্খলামূলক ধ্যানধারণার অধিকারী হয়ে ওঠে। তাই মাওলানা রহিমাহুল্লাহ চিন্তিত হন এবং তাদেরকে নিজের সঙ্গে বসতে বলেন। তাই যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার সামনে সব কিছুই স্পষ্ট করে দেন এবং তাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আশ্বস্ত করেন যে, মুজাহিদীন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের আকীদা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি সর্বান্তকরণে এ পথের রাহি হন।

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর পরিকল্পনা ইউনিভার্সিটি থেকে বিশেষ ডিগ্রি অর্জনের
পর মাওলানা সাঈদুল্লাহ শহীদ রহিমাহুল্লাহর পরিকল্পনা ছিল একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার। সেখানে প্রচলিত আরবী মাদরাসার সিলেবাসের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মুখোশ উন্মোচনকারী নানা বিষয় পড়ানো হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে তখন এই সভ্যতা মোকাবেলার আগ্রহ তৈরি হবে। সেই সঙ্গে কুফর ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করে ইসলাম বাস্তবায়নের পন্থাও তাদের বুঝে আসবে। ওই মাদরাসায় শিক্ষা সমাপনকারীদের জন্য নতুন যুগের ফিতনা ও কূটনীতি বোঝার লক্ষ্যে

[373]

আরও থাকবে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা। তাই তিনি ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা সমাপনের পর বড়ই অভাবের মধ্যে মাদরাসার জন্য শলা-পরামর্শ আরম্ভ করে দেন। অবশেষে ‘মারি' জেলায় তিনি একটি মাদরাসা চালু করে পাঠদান কার্যক্রম আরম্ভ করে দেন। কিন্তু যেহেতু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ফরযে আইন বলে বিশ্বাস করতেন এবং সর্বদা এর জন্য প্রস্তুত থাকতেন, তাই যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ হিজরতের সংকল্প করেন এবং তাকে হিজরতের দাওয়াত দেন, তখন মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ পেছনে থেকে যেতে পছন্দ করলেন না। তিনি নিজের সবকিছু ছেড়ে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য হিজরত করেন এবং ওয়াজিরিস্তানের ভূখণ্ডে ইলমের নূর ছড়াতে আরম্ভ করেন।

ওয়াজিরিস্তানে দাওয়াতী কাজ
এই কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভানা'র জেলাগুলোতে মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী কার্যক্রমের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নিজে গিয়ে গিয়ে ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদীন, আলিমগণ সহ গোত্রীয় নেতৃবৃন্দের মাঝে ঈমানী জাগরণ এবং শত্রুর কূটচাল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি তুলতেন। তার দাওয়াতী কার্যক্রমের অনেক সুফল বাস্তবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইহুদী খ্রিস্টানদের গোলাম সেনাবাহিনী এটা কেন মেনে নেবে যে, গোত্রীয় এলাকার সীমানায় হযরত সাঈদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর অনুসারীরা আবারও দাওয়াত ইসলাহ ও জিহাদের একটি নতুন আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করবে?

[374]

শাহাদাত ...

অবশেষে ক্রুসেডারদের গোলামরা স্থলে মনিবদের সেবা দিয়ে স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আকাশপথে মিসাইল চালানোর দায়িত্ব কাফের গোষ্ঠী নিজেরাই নেয়। সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে ভানা .. দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মার্কিন ড্রোন বিমানের মিসাইলের আঘাতে তার ছোটো ভাই ইলিয়াস উসমান সহ আরও ৪ সাথি শহীদ হন ; কিন্তু মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজে গুরুতর আহত হন।

তিনি আহত এবং কিছুটা অচেতন অবস্থায় ছিলেন। চেতন পাওয়ার পর প্রিয় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে কাছে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সাথিদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন , যারা বোমাবর্ষণের সময় কেন্দ্রে তার সঙ্গেই উপবিষ্ট ছিলেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বললেন , তারা সকলেই শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তখন মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ একটি শীতল আহ্ উচ্চারণ করলেন। তার চোখে অশ্রু চলে এলো এবং দুঃখ নিয়ে তিনি বললেন :

إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا -

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং পবিত্র জিনিসই তিনি কবুল করে থাকেন। ” [সহীহ মুসলিম]

তিনি অনুতপ্ত ও চিন্তিত ছিলেন যে , আল্লাহ তাআলা অপর ভাইদেরকে তার পথে কবুল করে নিলেন আর আমাকে কেন শাহাদাত থেকে বঞ্চিত রাখলেন ? তার অবস্থার উন্নতি হতে থাকলে তিনি পেশোয়ারে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সফর ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। পথে পথে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চৌকি ছিল। তাদের দিক থেকে কোনো অবস্থাতেই দয়া -মায়ার কোনো আশা ছিল না। আল্লাহ তাআলা ওয়াজিরিস্তানের বীর বাহাদুর ও আত্মমর্যাদাশীল আনসার ভাইদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তারা নিজেদের জীবন হাতে নিয়ে মাওলানা

সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে পেশোয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দেন। আল্লাহর দীন ও জাতির শত্রু সেনাবাহিনীর ভয় ও প্রেসারের কারণে তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদেরকে রাজি করানোটাও একটা সমস্যা ছিল। হামলার পর তখন পর্যন্ত আহত অবস্থায় এক সপ্তাহের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। বারুদ-উপকরণের বিষক্রিয়া শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে মুসলিম উম্মাহর মহান এই গুণী ব্যক্তি পেশোয়ারে রবের সঙ্গে সাক্ষাতের যাত্রা আরম্ভ করেন। আল্লাহ তাআলা তার সৌভাগ্যবান আত্মার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে ঐ সমস্ত কিছু দান করুন, যেগুলো তার ওলিদের জন্য রেখেছেন! আমীন।

প্রথমে শরীয়তের হুকুম জিজ্ঞেস করো তারপর কাজ করো
মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: সমস্ত দুনিয়াবি বিষয়কে ধর্মীয় মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা। সকল বৈঠকে একটি বিষয়ের দাওয়াত প্রদান করতেন—যা কিছু করতে হয়, প্রথমে দেখতে হবে, এ বিষয়ে কি দিকনির্দেশনা এসেছে? জিহাদের পথে আসার পর তিনি মুজাহিদীনের মাঝে কোনো উদ্যোগের আগে শরীয়তের বৈধতা অবৈধতা খোঁজার দাওয়াত প্রচারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। যে কাজকে তারা অতি মামুলি মনে করতো, সেটার ব্যাপারেও তিনি মনোযোগ দিতেন এবং সংশোধন করতেন। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ জিহাদের নামে অর্থ সংগ্রহ করে এবং সেখান থেকে কিছু খরচ করে অথবা জিহাদের প্রয়োজনে নিজের মর্জি মতো কিছু ক্রয় করে, তখন মাওলানা সাহেব জানতে পারলে তাকে বলতেন: এই অর্থ ব্যয়ের আগে আপনি উলামায়ে কেরামকে শরীয়তের মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন যে, এই অর্থ ব্যবহার করা আমার জন্য জায়েয

[376]

কিনা? এমনিভাবে যাকাতের অর্থ জিহাদে ব্যবহার করার শরঈ পন্থা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন। মুজাহিদীনকে নির্দেশনা দিতেন, এ বিষয়ে মালিকানা নিশ্চিতের ব্যাপারে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। একইভাবে প্রতিটি বিষয়ে শরীয়তের প্রতি সকলকে মনোযোগী করে তুলতেন। শুধু হারাম নয় বরং সন্দেহপূর্ণ অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে ভয় করতেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ ভীতি অবলম্বনের নসীহত করতেন।

আমরা কেন এক নয়? মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ফারুক
ভাই রহিমাহুল্লাহর মাঝে এমন চিন্তা প্রবেশ করাতে সক্ষম হন যে, নিজের সকল কাজের ব্যাপারে যাচাই করে দেখতে হবে, এ কাজ করা বা না করা কোনটির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে? অতঃপর মাওলানা রহিমাহুল্লাহ এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেদেরকেই প্রশ্ন করলেন— যখন আমাদের শত্রু এক, আমাদের দীন এক, তাহলে কেন জিহাদের ময়দানে মুজাহিদীন এক হয়ে কাজ করবে না? পৃথক পৃথক দল বা গ্রুপে বিভক্ত থাকার পরিবর্তে কেন এক জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না? মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন: যে কাজ আল্লাহ করতে বলেন; কুরআন ও হাদীসে যে কাজের ব্যাপারে বারবার জোর দেয়া হয়েছে, তা করা জরুরি, তাতে অবহেলা করা উচিত নয়। আর যে কাজ করার নির্দেশ আল্লাহ দেন, তাতে কল্যাণ নিশ্চিত— চাই তাতে কোনো ক্ষতি দৃশ্যমান হোক বা না হোক। মাওলানা সাহেব জিহাদী গ্রুপের দায়িত্বশীলদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন: একক উদ্যোগে জামাত অথবা গ্রুপ গঠন করা কেমন? বাইতুল মাল (তহবিল) গঠন করা অতঃপর নিজেরাই সেখান থেকে ব্যয় করার বৈধতা কোথা থেকে পেলেন? যে সমস্ত

[377]

আয়াতে বিভক্তি-বিভাজনের নিন্দা করা হয়েছে এবং একতা ও ঐক্যের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে, সেসব আয়াতের ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন? এক কথায় মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর উদ্যোগেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেও ইত্তিহাদুল মুজাহিদীন (মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সাধন) প্রচেষ্টা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন। পরিশেষে আল-কায়েদা উপমহাদেশ নামে তাদের প্রচেষ্টার সুফল আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ এই জামাআতকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, সাহায্য করুন এবং উপমহাদেশে ইমাম মাহদি আলাইহির-রিযওয়ানের অগ্রসৈনিক দল হিসেবে কবুল করুন। এই জামাত প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সত্যপন্থি আলেমে দীন মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর, যিনি এই জামাত অস্তিত্বে আসার প্রায় ছয় বছর আগেই শাহাদাত বরণ করেন। এ বিষয়টা অনেকেরই জানা নেই। একনিষ্ঠভাবে আকুল হয়ে তিনি যে বীজ বপন করেন, তা কয়েক বছর পর বৃক্ষে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা এই সকল প্রচেষ্টা মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

আরব আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করার পর আল-কায়েদার আরব আলেমদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হন। ওই বৈঠকগুলোতে আকীদা-বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। আল-কায়েদার আরব উলামা বিশেষভাবে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহকে একদিকে যেমন আল্লাহ তাআলা ইলম ও ইসলামী আইন শাস্ত্রে দুর্লভ যোগ্যতা

[378]

দান করেছেন, অপরদিকে তারা শরঈ বিষয়াদিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছেন। এ বিষয়টা জেনে মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহ খুবই পুলকিত হন। আল-কায়েদার এই আলেমগণ দীনি বিষয়ে উদাসীন নয়। কোনো বিষয়ে মত প্রকাশে তারা তাড়াহুড়ো করেন না এবং উলুমে শরীয়তের বিস্তৃত সমুদ্র হওয়া সত্ত্বেও বিনয় নম্রতা তাদের ভূষণ। এ বিষয়টাও মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে খুবই আনন্দিত করে। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার পরেই তিনি রীতিমত আল-কায়েদায় সংযুক্ত হন।

অপরদিকে শায়খ আতিয়াতুল্লাহও মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহর ইলম ও বিনয়ে খুবই প্রভাবিত হন। মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর এক বিবৃতিতে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানি যুবকদেরকে তার আদর্শ গ্রহণের দাওয়াত দেন। শায়খ মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা জানিয়ে বলেন:

« “শায়খ সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে খুব কাছে থেকে জানার সুযোগ আমার হয়েছে। যদিও তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ সময়ের ছিল না, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা অন্তরসমূহে পারস্পরিক ভালোবাসা দান করেছিলেন, তাই এই অল্প সময়ের সম্পর্কই আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান। এ সময়ে তাকে একজন আদর্শ আলেম, ইলম অনুযায়ী আমলকারী, শরীয়াহ বিষয়ের আদর্শ তালেবে ইলম (জ্ঞান অন্বেষী), আল্লাহর পথের মুহাজির এবং প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গকারী মুজাহিদ হিসেবেই পেয়েছি। আমি তার মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দীনকে সাহায্যের আকুলতা দেখেছি। ইসলামের জন্য তীব্র ভালোবাসা এবং আল্লাহর দীনের মর্যাদাবোধ বুকে ধারণকারী হিসেবে তাকে জেনেছি। তাকে উম্মাহর চিন্তায় চিন্তিত এবং [379]

মুসলিম জাতির উন্নতি অগ্রগতির জন্য অস্থির দেখা যেত। বাস্তবতা হলো, শায়খ সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর জীবন তালিবুল-ইলমদের জন্য আদর্শ।“

ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ চিন্তা করেছিলেন, আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতি বিজয়ী হবার পর নগরায়নের ওপর জোর দিয়েছে আর পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছে। ফলে জাগতিক উন্নতি অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় পরিবার ও আত্মীয়- স্বজনের প্রতি গুরুত্ববান মানুষ কমতে আরম্ভ করেছে। মানুষজন এখন ব্যক্তি জীবনে ও ঘরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পরিবার, বংশ ও গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণে মানুষ সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সমাজে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনার যোগ্যতাও তাদের মাঝে কমে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ইসলামে নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মীয়তার ভিত্তিতে সম্পর্ক রক্ষা করা, একে অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা এবং বিপদে-আপদে শরীয়তের মূলনীতি অনুসরণের দ্বারা শুধু ইসলামী সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয় এতটুকুই নয়; বরং অনেক ইতিবাচকতার প্রসার ঘটে। স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম নিকটাত্মীয়দের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাওলানা সাহেব এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে গিয়ে জাহেলী আসাবিয়াতের (অন্যায় স্বজন প্রীতি, গোত্র প্রীতি ইত্যাদি) সমালোচনা করতেন, সেগুলোর খারাপ দিক সম্পর্কে সতর্ক করতেন; কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতির জোয়ারে গোটা বংশীয় ব্যবস্থা যেন ধ্বংস করে না বসি, সেদিকেও [380]

দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাই তিনি মুজাহিদীনকে উপদেশ দিতেন, তারা যেন বংশীয় বন্ধন ও যোগাযোগ রক্ষা করেন, জীবনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বংশের মুরুব্বীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তাদেরকে শ্রদ্ধা করেন এবং ছোটোদেরকে স্নেহ করেন। এভাবেই একটি ইসলামী কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের জন্য সহজ হবে।

সাইয়েদুনা সালমান ফারসি রাযিয়ল্লাহু আনহুর মতো চিন্তা
আহযাব যুদ্ধে যখন আরবের সকল গোত্র মদীনা মনোয়ারায় (হাজার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মদীনাওয়ালার ওপর) চড়াও হওয়ার জন্য এগিয়ে আসছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হযরত সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দিলেন, পারস্যে আমরা শত্রুপক্ষের হামলা প্রতিরোধের জন্য নিজেদের এলাকায় পরিখা খনন করে থাকি। তবে কি আমরা মদীনায় হামলা প্রতিরোধের জন্য পরিখা খনন করতে পারি না? এ পরামর্শ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুবই পছন্দ হলো। সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম মিলে পরিখা খনন করেন। এভাবেই কাফেরদের হামলা প্রতিরোধ সম্ভব হয়।

একইভাবে যখন ভানার আকাশে ড্রোন হামলার মাত্রা বেড়ে গেল, এদিকে প্রতিরোধের কোনো উপায় দেখা যাচ্ছিলো না, তখন মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে বললেন, রুশ জিহাদের সময় আমরা দেখেছি, আফগান মুজাহিদীন রুশ বোমা হামলা থেকে বাঁচার জন্য কেন্দ্রগুলোতে বড় বড় পরিখা খনন করেন। পরিখাগুলো শুধু শত্রুর বোমা হামলা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হতো না; বরং [381]

শীতকালে অতিরিক্ত শীত থেকে আত্মরক্ষারও ব্যবস্থা হতো। শুরুতে সাথিরা যখন এই দীর্ঘমেয়াদি ক্লান্তিকর পরিকল্পনার প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো না, তখন মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ নিজে আঙ্গুর আদার কেন্দ্রে গমন করেন এবং কোদাল বেলচা উঠিয়ে পরিখা খনন করতে আরম্ভ করেন। তাকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হন। ধীরে ধীরে এই কাজ অগ্রসর ও বিস্তৃত হতে থাকে। এ কাজের অনেক সুফল দেখা দেয়, যা পিছনের অধ্যায়গুলোতে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

মুফাককিরে জিহাদ (চিন্তাবিদ) মাসিহুল মুজাহিদীন ডক্টর আবু খালেদ মুহাম্মাদ সারবুলন্দ যুবায়ের খান শহীদ রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যখন বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন, তখন পেশোয়ারের বিশিষ্ট সার্জন, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ, মুফাক্কিরে জিহাদ ডক্টর সারবুলন্দ যুবায়ের খান রহিমাহুল্লাহ তার একান্ত উপদেষ্টা ও সহকারী হয়ে যান।

ডক্টর সারবুলন্দ খান রহিমাহুল্লাহ এসেছিলেন পাঞ্জাবের ঝিলাম জেলা থেকে। তার পরিবার ঝিলামে দীনদার ও দাঈ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি স্থানীয় স্কুল থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। মেট্রিক পাস করার পর মেডিকেলের সাবজেক্টগুলো নির্বাচন করেন। অতঃপর পাঞ্জাবের মেডিকেল কলেজ ফয়সালাবাদে ভর্তি হন। এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনের পর সার্জারি বিষয়ে স্পেশালাইজেশনের প্রথম পরীক্ষায় পাশ করেন এবং

[382]

পাকিস্তানের বিভিন্ন হসপিটালে সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রুশ জিহাদে অংশগ্রহণ কলেজের শুরুর দিকেই তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তানে চলে যান। তিনি প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে ভারী অস্ত্র এবং তোপের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। মর্টার শেল চালনার যোগ্যতা অর্জন করেন। আকাশপথে যুদ্ধ করার জন্য রাশিয়ার তৈরি হাতিয়ারগুলোর উপরেও পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং রণাঙ্গনে সেগুলো ব্যবহার করেন। তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে পরিখা ও মোর্চাগুলোতে অবস্থান করেন এবং যুদ্ধাবস্থার কঠিন জীবন যাপন করেন।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালে তিনি আফগান সমাজ, প্রথা প্রচলন ও রীতিনীতি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। তিনি আফগান মুসলিমদের উচ্চ গুণাবলি, বীরত্ব, আতিথেয়তা, সরলতা, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। এই অবলোকন তার ভবিষ্যৎ চিন্তাধারা গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

মেডিকেল কলেজের রাজনৈতিক জীবন
ডক্টর আবু খালেদ রহিমাহুল্লাহ যখন মেডিকেল কলেজে পৌঁছেন, তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামপন্থি ও সেক্যুলার ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে তীব্র বিরোধ চলছিল। উভয় গ্রুপ একে অপরের বিরুদ্ধে মোর্চা তৈরি করে শিক্ষাঙ্গন দখলের জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। ছাত্ররা কলেজে অস্ত্র নিয়ে

[383]

যেত। দুই গ্রুপের মাঝে রক্তারক্তি মামুলি ব্যাপার ছিল। ডক্টর আবু খালিদ রহিমাহুল্লাহ সকল দাঙ্গায় ইসলামপন্থিদের গ্রুপেই শুধু শামিলই ছিলেন না বরং সর্বদাই প্রথম সারিতে তাকে দেখা যেত। ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন , কলেজ জীবনের এই অভিজ্ঞতা তার মাঝে রাজনৈতিক অনুভূতি অনেক পোক্ত করেছে। সেই সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পন্থা , যুদ্ধের কূটকৌশল এবং মানুষের মানসিকতা বোঝার আগ্রহ তৈরি করেছে।

ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহ চিকিৎসার ময়দানে ইমারত ইসলামিয়ার আমলে , ইমারতের প্রথম কালে এবং পুনরায় খোরাসানের গোত্রীয় এলাকায় জিহাদের সময়টাতেও বিরাট অবদান রেখেছেন। তিনি দল মত নির্বিশেষে সকল মুজাহিদ এমনকি ওই অঞ্চলে বসবাসরত সকল মুসলিমের চিকিৎসক ছিলেন। তীব্র বোমা বর্ষণ হোক কিংবা গরমের কাঠফাটা রোদ , দিন হোক কিংবা রাত দুপুর , নিরাপত্তার অবস্থা হোক কিংবা ড্রোন মিসাইলের বোমাবর্ষণ , বসতিতে পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর আর্টিলারির বোমাবর্ষণ হোক কিংবা অন্যায় কারফিউ — ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহ সদা প্রস্তুত এবং প্রতি মুহূর্তে মুজাহিদীনের নুসরতের জন্য তৈরি থাকতেন। তার ঘরের দরজা সর্বদা সকল অসুস্থ ব্যক্তির জন্য খোলা থাকতো। তিনি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে অন্ত্র , হাড় এবং শরীরের গভীর ক্ষতগুলিতে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী অপারেশন করতেন। এত কিছু সত্ত্বেও তার ব্যক্তিত্ব যেন নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিফলন হতো :

لا نريد منكم جزاء ولا شكورا –

অর্থ : “আমরা তোমাদের কাছে না কোনো প্রতিদান চাইছি আর না কৃতজ্ঞতা। ” [সূরা ইনসান ৭৬ : ০৯]

বোমাবর্ষণ এবং ড্রোন হামলা সত্ত্বেও যেখানেই রোগী দেখার জন্য কিংবা অপারেশনের জন্য ডাক্তার

সাহেবকে ডাকা হতো , তিনি পৌঁছে যেতেন। ডজন ডজন ড্রোন মাথার উপর ঘোরাফেরা করতো কিন্তু তিনি নিশ্চিন্তে অপারেশনে ব্যস্ত থাকতেন। আল্লাহ তাআলা তার হাতে শেফা ও বরকত রেখেছিলেন। দেখা গেল , কেউ গভীর ক্ষত নিয়ে এলো , অন্ত্র কাটা , শরীরের এমন কোনো অংশ নেই যেখানে গুলি লাগেনি ; কিন্তু তবুও আল্লাহর রহমতে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর চিকিৎসায় খুব দ্রুতই এমন ব্যক্তিরা সুস্থ হয়ে উঠতেন। এমনকি গোত্রীয় অঞ্চলের বড় সরকারি হসপিটালের ডাক্তারও যদি কোনো রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যেতেন, তাকে বলতেন, "লোয়াড়ার ’ পাহাড়ে একজন পাঞ্জাবি ডাক্তারের ঘর রয়েছে। সেখানে চলে যান। ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠবেন। কখনও সরকারি হসপিটালে কোনো আহত ব্যক্তির হাত বা পা কাটার প্রয়োজন দেখা দিলেও ওই ব্যক্তি ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর কাছে গেলে অঙ্গ কাটা ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠতেন। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর হাসপাতাল হতো কখনও পাহাড়ের গুহায় আবার কখনও মাটির গর্তে। কাঠের সাধারণ তক্তা দিয়ে অপারেশন টেবিল তৈরি করা হতো এবং ডাক্তার সাহেবের বসার জন্য কখনও ‘ওয়াটার ক্যান ’ রাখা হতো , আলোর জন্য ছোটো ছোটো বাতি জ্বালানো হতো , চিকিৎসার সাধারণ সরঞ্জামাদি এবং আধুনিক মেশিনারি না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তার মোবারক হাতে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ আহত ব্যক্তিকে শেফা দান করেছিলেন। বিষয়টি সত্যিই বিস্ময়কর। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ চিকিৎসার নতুন নতুন সূত্র তৈরি করতেন এবং কঠিন সময়ে সবচেয়ে কম সরঞ্জাম ব্যবহার করে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততম সময়ে বড় বড় কাজ করার মূলনীতি তৈরি করতেন। তিনি বলতেন , এসব কিছু শুধু আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করার এবং দুনিয়া ত্যাগ করার সুফল। আল্লাহ তাআলা উম্মাহর এই মহান সেবক এবং আল্লাহর দীন হেফাযতের সৈনিক

নেতার উপর রহম করুন এবং জান্নাতের সর্দারদের মাঝে তাকে গণ্য করুন, আমীন।

কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি
সাথিদেরকে সর্বদাই কিছু না কিছু শেখাতে চেষ্টা করা ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজের কাছে যে জ্ঞান, কলা-কৌশল ছিল, অন্য সাথিদেরকে তা পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি সর্বদা অস্থির থাকতেন। চিকিৎসা ও সার্জারি বিষয়েও তিনি এমনই ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে কঠিন অবস্থায় ন্যূনতম উপায় ব্যবহার করে সার্জারির কৌশল শিখিয়েছেন। পাহাড়ের গুহায় এত বড় বড় অপারেশন সম্ভব, প্রথমে তো ডাক্তারদের কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। কিন্তু যখন তারা ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলেন, তখন তার কর্মপন্থার ওপর তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠলেন। এমন কিছু লোককেও তিনি কাজ শিখিয়েছিলেন, যারা নিছক একজন টেকনিশিয়ান হিসেবে গ্রামে গঞ্জে চিকিৎসার কাজ করতেন। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের বিশেষ মনোযোগে তারাও ছোটো অপারেশন নিজেরা করার যোগ্য হয়ে উঠলেন।

ইতিহাস অধ্যয়ন
ডাক্তার আবু খালেদ রহিমাহুল্লাহ বলতেন, চিকিৎসা আমার পেশা, সার্জারি আমার কুশলতা—যা আল্লাহর দীনের জন্য আমি ব্যবহার করি; কিন্তু আমার আগ্রহ ও শখ হচ্ছে ইতিহাস পাঠ। শৈশবকাল থেকেই মূল্যবান বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের সীমাহীন আগ্রহ ছিল। তাফসীর হাদীস ফিকহের পাশাপাশি ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলী তিনি চষে বেড়াতেন।

[386]

তিনি একজন ইতিহাসবিদ ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই ইতিহাস তার আগ্রহের বিষয়বস্তু ছিল। জিহাদ বোঝা এবং জিহাদী কর্মপন্থা স্পষ্ট করার জন্য ইতিহাসকে তিনি মাধ্যম মনে করতেন। ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থাবলী ছাড়াও শত শত গ্রন্থের সারনির্যাস ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর মুখস্থ ছিল। অপারেশন ও চিকিৎসা চলাকালেও তিনি সহকারী ও রোগীদেরকে ইতিহাসের নানান শিক্ষা ও সূক্ষ্ম বিষয় বোঝাতেন। অপারেশনের পর রোগীরা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতো, ততদিনে ইতিহাস শাস্ত্রের কয়েক ধাপ তাদের অতিক্রম হয়ে যেত।

ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ শুধু ঐতিহাসিক জ্ঞান অন্বেষী ছিলেন না। যা কিছু করতেন, তার সারসংক্ষেপ ও মূল পয়েন্টগুলো টুকে রাখতেন। ইতিহাস পাঠের আগ্রহ শুধু সময় পার তথা টাইম পাস করার জন্যই হতো না; অধ্যয়নকালে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো শুধু মনেই রাখতেন না; বরং পাঠ সারসংক্ষেপ, সারনির্যাস, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং লেখকের ব্যাপারে কোথাও আপত্তি থাকলে সেটাও খুবই সাজিয়ে গুছিয়ে নিকটস্থ সাথিদের কাছে বর্ণনা করতেন। তিন দশক ধরে চলমান তার ইতিহাস অধ্যয়ন একজন চিন্তাবিদ হিসেবে তাকে গড়ে তোলে। মুজাহিদীনের জন্য বিভিন্ন অবস্থান এবং সমস্যা মোকাবেলার নানান পন্থা সাজেশন করতে পারতেন।

ইতিহাস অধ্যয়নকালে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস তার ব্যাপক পাঠ পরিক্রমা থেকে বাদ পড়েনি। তিনি জাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে মুজাহিদীনের জন্য কোন অঞ্চলে কাজ করার আশানুরূপ সুযোগ রয়েছে এবং কোথায় সমস্যার আশঙ্কা রয়েছে, সচেতন করতেন। সমস্যা সমাধানেরও পরামর্শ দিতেন। এই দিক থেকে তিনি গোত্রগুলোর মানসিক কাঠামো উপলব্ধিতে দক্ষ ছিলেন।

[387]

নেতৃত্বের জন্য ইতিহাসের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া জরুরি
ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, জিহাদ সুসংগঠিত করার জন্য এবং এর মাধ্যমে কুফরী ব্যবস্থা নির্মূল করতে সাধারণভাবে মুজাহিদীন এবং বিশেষভাবে নেতৃবৃন্দের ওপর ইতিহাসের ব্যাপক অধ্যয়ন আবশ্যক। ইতিহাস শুধু তাদের মন-মানসিকতা ও দূরদৃষ্টি প্রশস্ত করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং বিভিন্ন সামরিক জ্ঞান, শত্রুপক্ষের নানান কুটিলতা, জিহাদী অঞ্চলের গোত্রগুলোর রুচ-প্রকৃতি ও অভ্যাস, যুদ্ধ কৌশল এবং যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের করণীয় সম্পর্কে জানতেও সহায়তা করে। এছাড়ায় এমন কত সামরিক জ্ঞান রয়েছে, ইতিহাসের ব্যাপক ও সর্বব্যাপী পাঠ ছাড়া যেগুলো অর্জন করা কঠিন। ইতিহাসের আগে তিনি সীরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন এবং সেখান থেকে বহু হিকমত খুঁজে মুজাহিদীনের দিকনির্দেশনের জন্য তুলে ধরেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের পর সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সীরাত এবং তাদের যুদ্ধের ইতিহাসগুলো ব্যাপক অধ্যয়নের নসীহত করতেন। সেই সঙ্গে কাফরদের নিজেদের মধ্যে যে বড় যুদ্ধগুলো হয়েছে, সেগুলোর কলাকৌশল ও কূটচাল বোঝার জন্য ইউরোপের বিস্তারিত ইতিহাস থেকেও হিকমত ও জ্ঞানের অনেক বিষয় খুঁজে আনতেন। তিনি মুজাহিদীন এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য দিকনির্দেশনা দিতেন। তাদের মাঝে বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের অনুপ্রেরণা তৈরি করতেন।

ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের একজন আহ্বায়ক ছিলেন, আবার ঐতিহাসিক

[388]

ছিলেন। সে সঙ্গে তিনি একজন স্নেহশীল দক্ষ চিকিৎসক ও সার্জন ছিলেন। সফল সার্জারির আগে তিনি রোগ চিহ্নিত করতেন, এরপর চিকিৎসার চেষ্টা করতেন। সর্বপ্রকার জীবাণু বিনাশের চেষ্টা করতেন। কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয় রোগীর স্টোরি। মুসলিম উম্মাহর বিপদ আপদ ও দুর্গতি সংশোধনের জন্যেও তিনি সেই একই পন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

নেতা বন্ধু এবং তর্জুমান
ডাক্তার আবু খালেদ রহিমাহুল্লাহ নিজের আমীর, বন্ধু, সুহৃদ, সফর সঙ্গী ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম উম্মাহর সমস্যাগুলো সমাধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং ডাক্তার সাহেবের মাঝে এই সমস্ত বিষয়ে আজব মিল ছিল। আমার দৃষ্টিতে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর চিন্তাভঙ্গি যিনি সবচেয়ে বেশি বিশদভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী কাজ এগিয়ে নিতে ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি ছিলেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ। অধিকাংশ পরামর্শ সভায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ডাক্তার সাহেবের চিন্তাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং ফারুক ভাইয়ের দিকনির্দেশনায় ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্য মুজাহিদীনের কাছে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পান। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দায়িত্ব ছিল ইলমী ও শরীয়াহগত দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সমস্ত বিষয় তুলে ধরা, যেগুলো ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাজেশন করতেন। শরীয়তের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিতেন, যেহেতু আমি আলেম নই, তাই এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের কাছে

[389]

জিজ্ঞেস করতে হবে। তিনি নিজেও কোনো রায়ের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার আগে অবশ্যই উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতেন। এক কথায় ডাক্তার সারবুলান্দ খান রহিমাহুল্লাহর বন্ধুত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে উলুমে শরীয়তের জ্ঞানান্বেষী হবার পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসেও অভিজ্ঞ করে তোলে। তাই একদিকে চিন্তা দর্শনের গভীরতা এবং হিকমতের ভাণ্ডার তার জন্য উন্মোচিত হয়, অপরদিকে তার রচনাবলী ও বক্তৃতাগুলো প্রমাণনির্ভর, চিত্তাকর্ষক তথ্য-উপাত্ত সংবলিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেকোনো অবস্থা বিশ্লেষণ করার পূর্ব যোগ্যতা আরও শাণিত হয়।

চিত্তাকর্ষণের ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী
যেহেতু ডাক্তার সাহেব জিহাদী অঙ্গনে একজন
বড় মাপের চিন্তাবিদ ও আহ্বায়ক ছিলেন, তাই তার চিন্তা অনুধাবনের জন্য ইতিহাসের যে সমস্ত গ্রন্থ, অধ্যায়, বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলী ব্যাপক অধ্যয়নের পরামর্শ ডাক্তার সাহেব দিতেন, সেগুলো তুলে ধরা এখানে উপকারী হবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ সাধারণভাবে উপমহাদেশ অথবা আফগানিস্তানের মুজাহিদীনকেই সম্বোধন করতেন। এই কারণে নিচের ইতিহাস গ্রন্থগুলো এই অঞ্চলের সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

** মোকাদ্দমা ইবনে খালদুন

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত গ্রন্থ পাঠের পর দুনিয়ার ইতিহাস বোঝার [390]

জন্য, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর রীতিনীতি অভ্যাস ও যুদ্ধনীতি বোঝার জন্য ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে খালদুন রহিমাহুল্লাহর দ্বারা ডাক্তার সাহেব খুবই প্রভাবিত ছিলেন। তার চিন্তাধারার ওপর ইবনে খালদুন রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির প্রচ্ছন্ন ছাপ ছিল। বিশেষ করে মোকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন অধ্যয়নের জন্য তিনি বিপ্লবকামী প্রতিটি ব্যক্তিকেই নসীহত করতেন। অবশ্য ইবনে খলদুন রহিমাহুল্লাহর যে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন, ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ সে বিষয়গুলোতে উম্মাহর উলামায়ে কেরামের রায় বেছে নিতেন।

** তারিখে দাওয়াত ও আজিমত (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস)

ইবনে খালদুন রহিমাহুল্লাহর পরে ডাক্তার সাহেবের চিন্তাধারার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব রেখেছে যে গ্রন্থখানা —যা অধ্যয়নের জন্য তিনি খুবই জোর আরোপ করতেন— তা হল: মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহিমাহুল্লাহ রচিত তারিখে দাওয়াত ও আজিমত। এটিকে তিনি একটি বৈপ্লবিক গ্রন্থ বলতেন, যা পাঠ করার দ্বারা উম্মাহর ইতিহাস বোঝা যায়। উম্মাহর সমস্যা এবং জিহাদের পন্থা বোঝা যায়। জিহাদের পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্যাবলী এবং সেগুলোর সমাধান বোঝা যায়। উলামায়ে কেরাম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের প্রতি মূল্যায়ন বোধ তৈরি হয়। মুজাহিদ নিজের সমাজ, ইতিহাস ও আকাবিরদের মাঝে আত্মপরিচয়ের শিকড় খুঁজে পায় এবং সে এই ধারণা থেকে বের হয় যে, এই জিহাদ সে-ই আরম্ভ করেছে এবং তার জামাত প্রথমবারের মত এরূপ ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করছে। এই গ্রন্থের দ্বারা বিপ্লবীরা বুঝতে পারে, আল্লাহর দীনের জন্য কুরবান হওয়া,

[391]

গোটা জীবন দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করা, প্রতিকূলতা ও তুফানের মাঝে আজিমত, হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে মুসলমানদের হাল ধরে রাখার ইতিহাস ততটাই প্রাচীন, আল্লাহর দীন যতটা প্রাচীন।

দাওয়াত ও আজিমতের ইতিহাসে তিনজনের দ্বারা তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন। তাদেরকে ইমাম বলতেন। তিনি তাদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং সকল মুজাহিদকে তাদের ইতিহাস পাঠের, উপলব্ধির এবং সেখান থেকে কার্যপন্থা খোঁজার নসীহত করতেন। উম্মাহর এই মহান ব্যক্তিগণ একদিকে সামাজিক সংস্কার, আত্মশুদ্ধি অপরদিকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত এবং তৃতীয়তঃ জিহাদ ও রাজনীতি— সকল অঙ্গনেই উম্মাহর রাহনুমা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন, এদেরকে উপলব্ধি করা ছাড়া এবং তাদের চিন্তাধারা গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের আন্দোলনগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, বড়দের কাছ থেকে আমরা দূরে থেকে যাবো। মহান এই তিন ব্যক্তি হলেন: হযরত ইমাম মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দি রহিমাহুল্লাহ, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এবং হযরত আমীরুল মুমিনীন সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ।

তিনি যখন আমাদেরকেও উপমহাদেশের ইতিহাস বোঝাতেন, তখন দাওয়াত ও জিহাদের ক্রমধারা বর্তমান কাল পর্যন্ত নিয়ে আসতেন। হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহিমাহুল্লাহর সামাজিক সংস্কার, কুসংস্কারের অপনোদন, যুগের বাদশাহের সামনে সত্য বাণী উচ্চারণ, সরকার ব্যবস্থায় দুর্নীতির সংস্কার এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র; হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ সাহেবের উলুমে হাদীসের প্রচার, মুসলমানদের সম্মিলিত জীবনের সমস্যাবলীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি এবং ভারতের মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অসুবিধা [392]

দূরীকরণের ব্যবস্থা; হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর দাওয়াত ইসলাহ হিজরত জিহাদ ও খেলাফত আন্দোলন এবং তা থেকে শিক্ষা, অতঃপর হযরত সাইয়েদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত এবং আন্দোলনের অন্যান্য পর্যায়; অবশেষে ১৮৫৭ সালে আযাদি আন্দোলন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা, রেশমি রুমাল আন্দোলন, হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহিমাহুল্লাহ এবং তার সঙ্গী- সাথিদের ত্যাগ-তিতিক্ষা—এই সকল কিছু ডাক্তার সাহেব বিস্তারিত বর্ণনা করতেন।

পাকিস্তান স্টাডিজ বইয়ের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ অধিকাংশ সময় বলতেন, পাকিস্তান স্টাডিজ বইয়ের বিষয়বস্তু পাকিস্তানিদের অনেক বড় ক্ষতি করেছে। তিনি বলতেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ষাটের দশকে পাকিস্তান স্টাডিজ নামে করাচি ইউনিভার্সিটি প্রফেসরগণ ইতিহাস সংকলন করেছেন। তিনি বলতেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা শুধু পাকিস্তান স্টাডিজ বইগুলো থেকেই ইতিহাস শিখে থাকে। তারা শুধু মুসলিম লীগের ইতিহাস এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বন্দ্ব বিবাদ জানে। এগুলোকেই তারা ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম বলে মনে করে। উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে ‘আকাবিরীনে উম্মাহ' দীনের প্রচার-প্রসার, দাওয়াত, আজিমত এবং ইসলামের স্থায়িত্ব নিশ্চিতের জন্য যা কিছু করেছেন, সেগুলো দায়সারাভাবে শিক্ষার্থীদেরকে জানানো হয়। এর দ্বারা মহান এই ব্যক্তিদের না দৃষ্টি ভঙ্গি বুঝে আসে, না তাদের অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন হয়। [393]

উদাহরণস্বরূপ মেট্রিক পাশ একটা ছেলেকে যদি মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহিমাহুল্লাহ, আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ, শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে খুব কম ছেলেকেই এই মহান ইমামগণের ইতিহাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত পাওয়া যাবে। বিপরীতে নেহেরু এবং মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ১৪ দফা থেকে নিয়ে ‘ক্রিপস' ও ‘সাইমন' মিশন এবং ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকগুলোর ইতিহাস শিক্ষার্থীদের ভালোভাবেই জানা আছে। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন, পাকিস্তান স্টাডিজ গ্রন্থ প্রস্তুতকারীদের অন্যায় হলো, তারা পাকিস্তানের বাচ্চাদেরকে প্রকৃত পূর্বসূরিদের সঙ্গে পরিচিত হতে দেয়নি, তাদের ইতিহাসের শিকড় তুলে ধরেনি এবং ভারত স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে সত্যিকার অর্থে যে নেতারা সংগ্রাম করেছেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

আকাবিরদেরকে চেনো!
ডাক্তার সাহেব বিশ্বাস করতেন, মুজাহিদদের উচিত পূর্বোক্ত আন্দোলনের ইতিহাস ভালোভাবে রপ্ত করা, উল্লেখিত আকাবির ও পূর্বসূরি মহান ব্যক্তিদের দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধ করা এবং তাদের আদর্শের আলোকে তাদের ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের অঞ্চলে একটি সফল আন্দোলন সংগঠিত করা। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমাদের আজকের জিহাদী আন্দোলন ওই সংস্কার আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা, যা আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরম্ভ করেছিলেন। তাই প্রত্যেক মুজাহিদ যেন তার আত্মপরিচয়ের শিকড় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে, সে বিষয়ে তিনি খুবই

[394]

জোর দিতেন। কারণ আত্মপরিচয়ের সংকট নিয়ে কখনও সঠিক উপলব্ধির জিহাদ পরিচালনা সম্ভব নয়।

ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ অধিকাংশ মুজাহিদীনকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনারা কি জানেন, এই জিহাদ কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে? তখন কেউ বলতো: লাল মসজিদ ট্রাজেডির পর; কেউ বলতো: আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা করার পর; কেউ আবার তালেবান শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার সময় থেকে শুরু হয়েছে বলতো; আর যে ব্যক্তি এদের মাঝে সবচেয়ে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতো, সে বলতো, রুশ জিহাদের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে। তখন ডাক্তার সাহেব উত্তেজিত হয়ে বলতে চাইতেন: "এজন্যই তো আমি আপনাদেরকে বলি হে বুদ্ধিমানেরা! নিজেদের ইতিহাস পাঠ করুন, নিজেদের পূর্বপুরুষকে চিনুন জানুন। এটা তো দাওয়াত ও আজিমতের ইতিহাস, জিহাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তো উপমহাদেশে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহিমাহুল্লাহর খানকা, দিল্লিতে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহিমাহুল্লাহর হাদীসের মসনদ (আসন) থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বালাকোট, আন্দামান উপত্যকা, মালটার কয়েদখানা থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে’.. অতঃপর তিনি মায়াবিজড়িত কন্ঠে প্রত্যেক মুজাহিদকে বলতেন, "নিজেদের পূর্বপুরুষের জিহাদ, দাওয়াত আজিমত, ইসলাহ ও সংস্কার প্রয়াসের ইতিহাস পাঠ করুন, তাহলে বর্তমানের কর্মপন্থা নির্ধারণ আপনাদের জন্য সহজ হবে।’

রেশমি রুমাল আন্দোলন এবং কাবায়েলি অঞ্চল ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ রেশমি রুমাল আন্দোলনের প্রাণপুরুষ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহিমাহুল্লাহর বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। তার আন্দোলন গভীরভাবে পাঠ করার পরামর্শ [395]

দিতেন। হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ এবং তার সঙ্গী-সাথিরা বালাকোটের ময়দানে শাহাদাত লাভের পর যখন হিন্দুস্তানের দাওয়াত ও ইসলাহের কাজে উলামায়ে কেরাম মনোযোগী ছিলেন, সেখানে সাইয়েদ সাহেব রহিমাহুল্লাহর অবশিষ্ট সঙ্গী- সাথিরা উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বিশেষ করে সোয়াত থেকে ওয়াজিরিস্তান পর্যন্ত কাবায়েলি অঞ্চলে কোনো না কোনোভাবে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। এই গোত্রগুলো গোটা ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য মাথা ব্যাথার কারণ ছিল। এই অঞ্চলের লোকেরা ইসলামের মর্যাদার উপর কোনোরূপ আঁচড় পড়তে দেয়নি। অতঃপর যখন উলামায়ে হিন্দ সুসংগঠিত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে দ্বিতীয়বারের মতো রেশমি রুমাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী পদক্ষেপ নিলেন, তখন এই গোত্রগুলোই তাদের প্রথম আশ্রয়কেন্দ্র হয়েছিল।

এককথায়, এখানে ডাক্তার সাহেব গোত্রগুলোর ইতিহাস ও জিহাদের তাৎপর্য বোঝার দাওয়াত দিতেন। সেই সঙ্গে তিনি ওয়াজিরিস্তানের ভাইদেরকেও নিজেদের ইতিহাস পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি তাদেরকে আমীরুল মুজাহিদীন হাজী সাহেব মির্জা আলী খান রহিমাহুল্লাহর (Faqir of Ipi) ইতিহাস বলতেন। তিনি মেহসুদ গোত্রের ভাইদেরকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনাকারী নেতা মোল্লা পেওয়ান্দা রহিমাহুল্লাহর ঘটনাবলী শুনিয়ে বলতেন, কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই সংগ্রামী সাধকদের অস্ত্র ছিল নলের বন্দুক, কুড়াল আর পাথর; কিন্তু তা সত্বেও ইংরেজদের মনে তাদের এত ভয় ছিল, তারা কখনও নির্ভয়ে ওয়াজিরিস্তান অতিক্রম করে আফগানিস্তানে আক্রমণ করতে পারেনি; বরং পথিমধ্যেই ওয়াজির গোত্রগুলো কাফন পরিধান করে ইংরেজ কাফেলাকে প্রতিহত করেছে। মেহসুদ গোত্র নিজেদের বক্ষ ইসলাম প্রতিরক্ষার জন্য উন্মুক্ত করে

[396]

দিয়েছে। দাওড় গোত্রও জিহাদের আগ্রহ এবং আল্লাহর দীন ও শরীয়তের হেফাযতে কারও থেকে পিছপা থাকেনি। একইভাবে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ পেশোয়ারের প্রান্তে হাজী সাহেব তরঙ্গজাই (Turangzai) রহিমাহুল্লাহর ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন, যিনি শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন।

জিহাদ: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর…
ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন, হিন্দুস্তান ও কাবায়েলি (গোত্রীয় এলাকায়) অঞ্চলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ কোনো না কোনোভাবে চলমান ছিল। পরিশেষে ভারত থেকে ইংরেজ বিদায়ের সময় চলে আসে। তারা তাদের আস্থাভাজন শ্রেণিকে ক্ষমতা সোপর্দ করে ভারতকে বিভক্ত করে বিদায় হয়। এমন অবস্থায়ও ওই গোত্রগুলো এবং মুজাহিদীন জিহাদ পরিত্যাগ করেননি। ওই সময় আমীরে ওয়াজিরিস্তান ফকির অফ ইপি (হাজী মির্জা আলী খান রহিমাহুল্লাহ) তার প্রসিদ্ধ উক্তি পেশ করেন:

« এই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অবিকল সেই ইংরেজ গাধা শুধু তার ওপর নতুন গদি বসানো হয়েছে »

এমন অবস্থায় পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী কারাদাঁদে মাকাসেদ (Objectives Resolution) নামে ভারতের মুসলিমদেরকে আবার প্রতারিত করে। সংবিধানে আল্লাহ তাআলার ‘হাকিমিয়াতে আলা’ তথা সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা নির্দেশক দৃষ্টিনন্দন অনুচ্ছেদ লিখে দেয়া হয় কিন্তু বাস্তবে ওই একই ব্রিটিশ আইন চালু থাকে। আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিধি-বিধান চলতো আর এখন গোটা পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের পর আমেরিকার জারি নিয়ম-কানুন চলে এতোটুকুই পার্থক্য। আগে ব্রিটেন থেকে

[397]

ভারতে শ্বেতাঙ্গ ভাইসরয় আসতো, কিন্তু এখন পাকিস্তানের শাসক নিজেই একজন দেশীয় ইংরেজ, যার নিয়োগ প্রাপ্তির আদেশ আসে ওয়াশিংটন থেকে। এক কথায় শাসন ব্যবস্থা আগেরটাই থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মুসলিম সমাজ, উলামায়ে কেরাম, মুজাহিদীন যথাসম্ভব সংস্কারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু তারা যতই চেষ্টা-শ্রম ব্যয় করেন, এই সরকার ও সেনাবাহিনীর সংশোধনের ব্যাপারে তাদের হতাশ হতে হয়। কারণ এদের গঠন লগ্নেই ইংরেজদের প্রতিরক্ষা এবং তাদের নিয়ম-কানুন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। অতঃপর খতমে নবুওয়াত আন্দোলন এবং নিজামে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন্দোলনের সময় পুনরায় মুসলিমদের আজিমত ও সংগ্রামের পথে অচলাবস্থা শুরু হয়; কিন্তু আফগানিস্তানের জিহাদের পরেই প্রকৃত বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ হয়।

রুশ জিহাদ এবং বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন
এরই মধ্যে রাশিয়া সেনাবাহিনী নিয়ে মিল্লাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ওপর হামলা করে বসে। এখানে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ ইতিহাসের এই বাঁক সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করতেন। পাকিস্তানের মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই জিহাদে অংশগ্রহণ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা বর্ণনা করতেন। অপরদিকে গোটা বিশ্ব থেকে বিশেষ করে আরব বিশ্ব থেকে উম্মাহর হাজার সংখ্যক সন্তান ইসলাম প্রতিরক্ষার জন্য কিভাবে আফগানিস্তানে জড়ো হয়েছিলেন, সে কথা বর্ণনা করতেন। আফগানিস্তানের পাহাড়ের গুহায় ভারতের মুসলিমদের দাওয়াত ও আজিমতের ধারা এবং সারা বিশ্বের মুসলিমদের বিশেষ করে আরব বিশ্বের জিহাদ ও দাওয়াতের মেহনত একাকার হয়ে যায়। এই উভয় কল্যাণ সমুদ্র সম্মিলিত

[398]

হওয়ার কারণে যেই সামুদ্রিক মিলন স্থল তৈরি হয়, সেটাকেই ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করতেন।

রাশিয়ার হামলার পর আফগানিস্তানে রীতিমতো জিহাদ আরম্ভ হয়। বিশ্বের সুপার পাওয়ার দাবিদার রাশিয়া আগুন ও রক্ত বৃষ্টি নিয়ে আফগানিস্তানের ওপর হামলা করে। লক্ষ লক্ষ আফগান শহীদ হয়। না জানি কত ঐতিহ্য ও লোকপ্রথা পদদলিত হয়, এহেন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের নিরস্ত্র মুসলিম জনসাধারণ নিজেদের দীন ও ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে ঈমান ও বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে এই লাল ভালুকের বিরুদ্ধে লড়বার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ত্যাগ ও সংকল্পের এমন জীবন্ত গল্প রচনা করে, ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বাস্তব ময়দানে পরিচালনাকামী মুসলিম উম্মাহ তাদের আকুলতা ও অস্থিরতা প্রশমিত করার যথাস্থান পেয়ে যায়। গোটা পৃথিবী থেকে মুসলিমরা জিহাদের নিয়তে আফগানিস্তানে যাত্রা করতে থাকে এবং হাজার সংখ্যক মুহাজির মুজাহিদীন আফগান ভাইদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করে।

উম্মাহ দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হোক...
ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর মতে আফগানিস্তানের জিহাদে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উম্মাহর মাঝে জিহাদী পুনর্জাগরণ ঘটেছে। উম্মাহর প্রতিরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি গোটা উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মুজাহিদ জিহাদী দক্ষতা ও কুশলতার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় এই উম্মাহ পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: এ জিহাদে [399]

উম্মাহর শত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধে যখন গোটা পৃথিবী থেকে মুসলিমরা আল্লাহর জন্য শুধু দীন ইসলামের নামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, এক জায়গায় জিহাদের আমল আরম্ভ করেছে, তখন উম্মাহর প্রকৃত আত্মিক বন্ধন পুনরায় সুদৃঢ় হতে আরম্ভ করেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মুজাহিদীন, উলামায়ে কেরাম পরস্পরে মিলিত হওয়া, একই চিন্তা, একাগ্রতা সহকারে উম্মাহর শত্রুর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। আরব বিশ্ব ভারতীয় উপমহাদেশ খোরাসান তুরস্কসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহর দীনের প্রতি ভালোবাসা এবং ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিমরা যখন একত্রিত হয়েছে তখন পুনরায় মুসলিম উম্মাহ এক জাতি এক উম্মাহ হবার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। ইংরেজরা খেলাফত পতনের পর মুসলিমদেরকে পঞ্চাশের অধিক দেশে বিভক্ত করে যে দৃষ্টান্ত মুছে দিতে চেষ্টা করেছে, পারস্পরিক মতবিরোধ ও ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে দিয়ে, জাতীয়তাবাদের মূর্তি স্থাপন করে যে বন্ধনের কথা তারা উম্মাকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে, উম্মাহ পুনরায় সেই ঐক্য বন্ধনের বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করেছে। প্রতিটি সমস্যা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাধান করতে আরম্ভ করেছে। তারা ভৌগোলিক জাতীয়তার সীমারেখা থেকে বের হয়ে বৈশ্বিক পরিসরে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে।

আরব বিশ্বের সমকালীন জিহাদের ইতিহাস ইতিহাসের এই বাঁকে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ একটু বিরতি দিতেন। অতঃপর তিনি বর্তমান বিশ্বে আরব দেশে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার যেই প্রচেষ্টা সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা তুলে ধরতেন। এর গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি বলতেন, আমরা

[400]

যেহেতু মুসলিম উম্মাহ হওয়ার দাবিদার, আমরা যেহেতু বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার দাবি করি, তাই নিজেদের অঞ্চলের দাওয়াত ও সংগ্রামের ইতিহাসের পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষত আরব বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াও আমাদের জন্য জরুরি। যদি আমরা এই সংযোগ রক্ষা না করি, আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে যদি আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তাহলে আমরা বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবো। অন্য মুসলিমদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবো এবং আমাদের এই সংগ্রাম একটি আঞ্চলিক আন্দোলনের চেয়ে বেশি কিছু হবে না।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব
সমকালীন জিহাদ বোঝার জন্য ডাক্তার সাহেব
দুই মহান ব্যক্তির ইতিহাস, জীবন ও কর্ম বর্ণনা করতেন এবং আল্লাহর দীনের বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা অনুধাবনের দাওয়াত দিতেন। তাদের মাঝে তালিকার শীর্ষে মিশরের আলেমে দীন, চিন্তাবিদ শহীদ সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ ছিলেন। তারপর মুজাদ্দিদে জিহাদ আলেমে রব্বানী শহীদ ডক্টর আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ছিলেন। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন: সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ বর্তমান যুগে ইংরেজদের চিন্তাধারার মোকাবেলা করেছেন। আল্লাহর আইন পেছনে ফেলে যে আইন রচনা করা হয়, তিনি সেটাকে জাহেলিয়াত বলে আখ্যায়িত করেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অতঃপর সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ ঐ আইনের আলোকে তৈরি সামাজিকতাকে জাহেলিয়াতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলেন। এমন সমাজের সংস্কার-সংশোধনের এবং জাহেলিয়াতের

[401]

পতাকাধারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের দাওয়াত পেশ করেন। সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর দীনের মাঝে অন্য আদর্শের মিশ্রণ মেনে নিতে পারতেন না। তিনি বলতেন, কালেমায় তাইয়েবায় প্রথমে কুফরী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, অতঃপর তাওহীদ স্বীকার করা হয়েছে। ইংরেজরা ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে উম্মাহর ওপর যে শাসক শ্রেণিকে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে, তারা আজও পর্যন্ত ইংরেজদের প্রতিরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে —কোথাও সামরিক স্বৈরশাসক রূপে, কোথাও রাজ পরিবার রূপে আবার কোথাও গণতান্ত্রিক বহুদলীয় রাজনীতি এবং ইস্টাবলিশমেন্ট রূপে তারা উম্মাহকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। কিন্তু সর্বত্র ওই ইংরেজ আইন চলছে। সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ এই শাসন ব্যবস্থা নির্মূল করে নিজামে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিষ্ঠার আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি এই শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে কোনোরূপ সহাবস্থান বা সন্ধি চুক্তির পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, এই বাতিল শাসন ব্যবস্থার সামনে আমাদের সেরকম সাহসিকতা ও মনোবল নিয়ে দাওয়াত দিতে হবে, যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদেরকে মক্কায় দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং একথা পর্যন্ত বলেছিলেন:

« যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি এই দাওয়াত থেকে সরে আসবো না; যতক্ষণ না আল্লাহ এই দীনকে বিজয়ী করবেন অথবা এই পথে আমি মারা যাবো »

65

এক কথায় সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ উম্মাহর সঙ্গে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের নামে কৃত প্রতারণা ফাঁস করে দিয়েছেন। সরাসরি জাহিলিয়াতকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করাটা 65 সিরাতে ইবনে হিশাম
[402]

জাহেলিয়াতের পতাকাধারীরা কিভাবে মেনে নিতে পারে? অবশেষে তারা সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহকে ফাঁসির আদেশ শোনায়। অতঃপর যখন তাকে বলা হয়, নিজের চিন্তাধারা থেকে সরে আসুন; কেউ কেউ আবার কল্যাণকামী হয়ে পরামর্শ দেয়, শুধু দেখানোর জন্য চিন্তা পরিবর্তনের ঘোষণা দিন, তখন সাইয়েদ রহমাতুল্লাহি রহিমাহুল্লাহর উত্তর ছিল:

«এটা আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিষয় (শাসন ব্যবস্থা ও সরকারের সঙ্গে এই বিরোধ) আর আকীদা বিষয়ে কোনো ‘তাউরিয়া’ জায়েয নয়

66।

অতঃপর যখন তাকে বলা হলো, আপনি বিচারকের কাছে আপিল করুন, যেন আপনার প্রতি দয়া দেখানো হয়, তখন তিনি সংকল্পের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখনীয় জবাব দেন:

« “নামাযের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যদানকারী শাহাদাত আঙ্গুল তাগুতি শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয়ার মতো কোনো একটি অক্ষর পর্যন্ত লিখতে প্রস্তুত নয়। এখন আপনারা আমাকে বলুন, কি কারণে আমি দয়া দেখানোর আপিল করবো? যদি আমাকে আসলেই যথার্থ কারণে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে তা মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু যদি বাতিল বিষয় ও জুলুমের ভিত্তিতে আমাকে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে আমিও এতটা তুচ্ছ নই যে, বাতিলের কাছে দয়ার আপিল করবো। নামাযের মধ্যে তাওহীদের সাক্ষ্য দানকারী আমার শাহাদাত আঙ্গুল তাগুতের ফায়সালা কবুল করার মতো কোন অক্ষর লিখবে না। যদি আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো সঠিক হয়, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি প্রস্তুত; আর যদি বাতিল

66শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত ফী জিলালি সূরা
তওবা

[403]

হয় তাহলে আমি বাতিলের কাছে দয়ার আপিল করার মতো তুচ্ছ নই।” »

অতঃপর যখন সরকারি মৌলভী ফাঁসির দড়ি গলায় পড়াবার আগে সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহকে বললেন, সাইয়েদ সাহেব কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়ে নিন, তখন তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাস সহকারে বলেন:

« “এই কালেমায় আপনাদের রুটি রুজি আর এই কালিমার ওপর আমল করার কারণে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে।” » এরপর তিনি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু" পড়ে নেন এবং তাকে শূলে চড়ানো হয়।

67»

আল্লাহ তাআলা তার উপর অসীম রহমত অবতীর্ণ করুন। মিশরের ফেরাউন সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহকে শহীদ করে দেয়; কিন্তু তার বাণীগুলো পরবর্তীদের মাঝে জীবন্ত হয়ে ওঠে স্বয়ং সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলতেন:

« “আমাদের কথাগুলো মোমবাতির মতো (খুবই সামান্য যার উত্তাপ ও আলো) কিন্তু যখন আমরা নিজেদের অবস্থানের জন্য মৃত্যুবরণ করি, তখন আমাদের কথাগুলো জীবন্ত হয়ে যায়; সমাজের মাঝে তখন তা উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে থাকে।”

68»

সাইয়েদ সাহেব রহিমাহুল্লাহ ত্যাগ স্বীকার করে মুসলিমদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কুফরী ও জাহেলিয়াত যে রূপেই আসুক না কেন, তার সঙ্গে কোনো প্রকার সমঝোতা করা যেতে পারে না; মুসলিমদের প্রকৃত উন্নতি অগ্রগতি তখনই হবে, যখন তাদের দীন বিজয়ী ও বাস্তবায়িত হবে। প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো, এই দীন-বিজয়ের জন্য দেহ মন সবকিছু উৎসর্গের জন্য তৈরি হওয়া।

67
শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ রচিত ফী জিলালি সূরা
তওবা

68 শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ রচিত জাখায়েরুল ইজাম [404]

মুসলিম উম্মাহকে পুনরায় উন্নতির শিখরে আরোহণ করানো সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি ভূখণ্ডের প্রয়োজন ছিল, যেখানে পুনরায় মুসলিমদের সম্মান ও গৌরব পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম হবে। সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর সেই পতাকা ফিলিস্তিনের আলেমে দীন শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ উত্তোলন করেন, সমকালীন জাহিলিয়াত ও তার সরদারদের মোকাবেলার জন্য বৈশ্বিক জিহাদের রূপরেখা তৈরি করেন। বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের বিবরণে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আফগানিস্তানে দুই সমুদ্রের মিলন
অতএব আফগানিস্তানে দুই সমুদ্রের মিলন ঘটে।
শাহ ওয়ালীউল্লাহ ধারার অনুসারী ভারত ও খোরাসানের বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ সন্তানদের চিন্তা যখন সাইয়েদ সাহেব এবং আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মিলে যায়, তখনই বৈশ্বিক জিহাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। এই ভিত্তি কাফেরদের বানানো জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সীমানা অস্বীকার করে। এই সীমানার ভিত্তিতে শত্রুতা মিত্রতার ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। ভাষা বা ভৌগোলিক জাতীয়তার অন্যায় বন্ধন বর্জন করে। কোনো ধর্মীয় ঘরানা, মাযহাব বা উপধারার ভিত্তিতে উম্মাহর মাঝে বিভাগ বিভাজন পরিহার করে চলে। এই আন্দোলন গোটা উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে বিশুদ্ধ ইসলাম, তাওহীদ, পবিত্র বিষয় ও পুণ্য স্থানগুলো রক্ষার আহ্বান জানায় এবং এ কাজে সর্বপ্রকারের দলাদলি গোত্র প্রীতি ইত্যাদি পদদলিত করে।

[405]

মুজাহিদীন এবং তাদের নেতৃবৃন্দের জন্য দাওরা আয়োজন
ডাক্তার আবু খালিদ রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানের গোত্রগুলোতে উপস্থিত মুজাহিদীনের প্রতি মনোযোগী হন, তাদেরকে ইতিহাস, সামরিক বিদ্যার উপর বিভিন্ন ক্লাস করাতে আরম্ভ করেন। ওই ক্লাসগুলোতে শত শত মুজাহিদ এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। একদিকে পাকিস্তানের স্থানীয় মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ অপরদিকে আরব মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দ ইতিহাস ও সামরিক বিদ্যার অনেক বিষয় বোঝার জন্য তার শরণাপন্ন হতেন। তার শিষ্যদের মাঝে বড় মাপের উলামায়ে কেরাম, বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক, প্রশিক্ষক, মুজাহিদীনের উমারা ও সামরিক নেতৃবৃন্দ শামিল থাকতেন। এমনকি আলেমে রব্বানী, কায়েদে জিহাদ, শায়খ আবু ইয়াহিয়া লীবী রহিমাহুল্লাহ এবং প্রখ্যাত প্রশিক্ষক ও হাকীম মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত রীতিমতো ক্লাসগুলোতে অংশগ্রহণ করে তার কাছ থেকে জাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস শিক্ষা লাভ করতেন এবং পরবর্তীতে সেগুলো নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করতেন। এছাড়াও মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দের মাঝে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর বৈঠক ও চিন্তাধারা থেকে অনেকেই উপকৃত হয়েছিলেন যাদের মাঝে আমীর বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ, মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ, মোল্লা নাজির ওয়াজির রহিমাহুল্লাহ, আমীর হাকিমুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ, মাওলানা ফজলুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, জনাব আজম তারেক মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ, হাফেজ গুলবাহার সাহেব রহিমাহুল্লাহ, শায়খ ফাতেহ উসমান শাহরী রহিমাহুল্লাহ, হাজী ওয়ালীউল্লাহ ইমরান সিদ্দিকী রহিমাহুল্লাহ, কারী মাওলানা

[406]

উবায়দুল্লাহ ইমরান রহিমাহুল্লাহ, উস্তাদ আসলাম

69 রহিমাহুল্লাহ সহ মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দের
আরও অনেকেই শামিল ছিলেন।

ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর ইতিহাস ক্লাসের বুনিয়াদি বিষয় ছিল ওই ছয় আকাবির তথা হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহিমাহুল্লাহ, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ, হযরত শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ, শহীদ সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এবং শহীদ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর পরিচিতি, তাদের সংগ্রামী জীবন, দাওয়াত ও আজীমতের পথে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার আলোচনা এবং তাদের ইতিহাস থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা।

এই ইতিহাস অধ্যয়ন, অতঃপর গোত্রীয় এলাকার মুজাহিদীনকে নিয়ে দাওরা আয়োজনের ফলে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর মাঝে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের রুচি ও মেযাজ বোঝার যোগ্যতা চলে আসে। তার মাঝে গোত্রীয় মুজাহিদীনের অসামান্য ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। ফলে কাবায়েলি মুজাহিদীনও তার প্রতি আস্থাশীল এবং স্বভাবতই তার অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এই গুণের দিক থেকে অন্যান্য অ-গোত্রীয় মুজাহিদীনের মধ্যে তিনি অনন্য ছিলেন। কাবায়েলি মুজাহিদীন তাকে আপন ভাবতেন এবং তার কাছে গিয়ে নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্য ভুলে বন্ধুর মতো বসে থাকতেন। নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটানোর জন্য তার শরণাপন্ন হতেন। তার একটা কারণ 69 উস্তায আসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি পাকিস্তানের একজন
গুরুত্বপূর্ণ নেতা শহীদ আমজাদ ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ-এর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইমারত ইসলামিয়ার শাসনামলে আরব প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের ক্রুসেডার বাহিনী এবং তাদের তাবেদারদের ওপর বেশ কয়েকটি বড় হামলার পরিকল্পনা করেন, তন্মধ্যে আল্লাহর দ্বীন ও জাতির শত্রু জেনারেল পারভেজের ওপর পরিচালিত হামলাগুলো এবং জিএইচকিউ (পাকিস্তান আর্মির জেনারেল হেড কোয়ার্টার) 'র ঐতিহাসিক হামলা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। খুবই বুঝমান সতর্ক ও কুশলী ব্যক্তি ছিলেন। মুজাহিদীনের কাছে খুবই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ২০১৮ সালে আফগানিস্তানের পাকতিকা জেলার বারমাল এলাকায় মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন।

[407]

তো এই ছিল যে, গোত্রীয় এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে তার গভীর অধ্যয়ন ছিল। কিন্তু অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, চিকিৎসক হবার কারণে স্থানীয়দের সঙ্গে তিনি মিশে গিয়েছিলেন। সুখে- দুঃখে তিনি তাদের পাশে থাকতেন; কোনো পার্থক্য নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতেন এবং সহযোগিতা করতেন।

সমকালীন জিহাদের চিন্তাগত ভিত্তি
ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ ইতিহাস অধ্যয়ন করে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো একটি গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্ত করেন। এটা তার একটি বড় অবদান। দুই খণ্ডের ওই গ্রন্থটি "সমকালীন জিহাদের চিন্তা গত ভিত্তি’ নামে ‘ইদারায়ে হিত্তিন' প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে। এই গ্রন্থে একদিকে তিনি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস এবং তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বর্ণনা করেছেন, অপরদিকে ইউরোপের বস্তুবাদী ও ভাববাদী দুই ধারার যুদ্ধগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কুফফার গোষ্ঠীর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে বিস্তারিতভাবে সেগুলো অপনোদন করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ফ্রান্সের পর গোটা দুনিয়াতে ধর্মহীনতার যে সয়লাব দেখা দিয়েছে তার পেছনে আসল কারণ কি? এমনিভাবে গ্রেটার ইসরাইলের (greater Israel) পরিকল্পনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে পশ্চিমা বিশ্ব ও আমেরিকা কর্তৃক এই পরিকল্পনায় সরাসরি অংশগ্রহণের কারণও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের বড় অংশে পশ্চিমাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিবাদ, তাদের ইতিহাস, উপমহাদেশে মুসলমানদের উত্থান পতনের ইতিহাস এবং তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। এই গ্রন্থটি ইতিহাস রাজনীতি সমাজবিজ্ঞানের উপর

[408]

সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্বতন্ত্র একটি ইনসাইক্লোপিডিয়া। কোনো নিরপেক্ষ পাঠক এই গ্রন্থের উপকারিতা অস্বীকার করতে পারে না।

প্রজ্ঞা হলো ঈমানদারের মিরাস
হাদীসে পাকের ভাষ্য অনুসারে হিকমত বা প্রজ্ঞা হলো ঈমানদারের জন্য মিরাস; যেখানেই পাওয়া যাবে সেখান থেকেই কুড়িয়ে নিতে হবে (মিরাস হলো মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি যার মালিক তার ওয়ারিসগণ।) ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ কাফেরদের ইতিহাস ও সামরিক বিদ্যার গ্রন্থগুলো বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করেছেন, সেগুলো থেকে মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব কথা তিনি সাথিদেরকে জানাতেন। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন, যুদ্ধ শিখার জন্য শত্রুপক্ষের অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হওয়া জরুরি। এভাবেই তিনি খুবই উপকারী ও চিত্তাকর্ষক তথ্য উপাত্ত আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। আমার মনে আছে, প্রথমবার যখন ২০০৭ সালে ডাক্তার আবু খালেদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আঙ্গুর আদার ফ্রন্টে আমার পরিচয় হয়, তখনও তাকে মুজাহিদীনের চিন্তা ও আচরণগত সংশোধন করতে দেখেছি। যারা শহরের থেকে আসতো, সাধারণত তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি অথবা গোত্রীয় রক্ষণশীল কিছু রীতি নীতির উপকারিতা জানা থাকতো না। তেমনি একটি রীতি হচ্ছে আফগানি ও গোত্রীয় এলাকার লোকেরা সর্বদা কাঁধে একটি চাদর রাখতো। আঙ্গুর আদার ফ্রন্টে কাঁধে চাদর রাখার ব্যাপারে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ শহর থেকে আসা সাথিদেরকে বলেন, একজন রুশ জেনারেল আত্মজীবনীতে আফগানিদের চাদরকে আফগানিস্তানে রাশিয়ার পরাজয়ের একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। ওই জেনারেলের বক্তব্য হল: আফগানিরা এক চাদর দিয়ে এত কাজ করে, যেগুলো

[409]

করার জন্য আমাদের অনেক সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। এতসব কাজ করার জন্য আমাদের সৈন্যদের অনেক ভারী ভারী বোঝা বহন করতে হয়। অথচ আফগানিরা হালকা- পাতলা চাদরকে ঠাণ্ডা গরম থেকে আত্মরক্ষা, আহতদের স্ট্রেচার, গরম পট্টি, রশি, হাতকড়া, তাঁবু, দস্তরখান, পর্দা, ক্যামোফ্লাজ (ছদ্মবেশ ধারণ) এবং পতাকা সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। এভাবে উদাহরণ দিয়ে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ শুধু সাথিদের সামরিক সচেতনতা ও অভিজ্ঞতাই বৃদ্ধি করতেন না; সাদাসিধে জীবন এবং বাহ্যত তুচ্ছ জিনিসের গুরুত্ব তাদের কাছে বর্ণনা করতেন।

সমর বিদ্যা ক্লাস ডাক্তার সারবুলন্দ খান রহিমাহুল্লাহ বলতেন, মুজাহিদীনকে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রাথমিক অবস্থায় অথবা পরবর্তীতে উলুমে হারব তথা যুদ্ধবিদ্যা পড়ানো উচিত। সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে সাধারণত অস্ত্রশস্ত্র ও দৈহিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়; কিন্তু ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলতেন, এগুলো তো যুদ্ধবিদ্যার খুবই ক্ষুদ্র অংশ। যুদ্ধের মূলনীতি, ইতিহাস, প্রকৃতি, জোটবদ্ধতা ও মিত্র শক্তি বৃদ্ধি, যুদ্ধের কৌশল, শত্রুপক্ষের গতিবিধি বোঝা, রূপরেখা তৈরি করা, সামরিক পরিকল্পনা, সংঘর্ষ চলাকালীন করণীয় নির্ধারণ, যুদ্ধে নেতৃত্ব দান, শত্রু কমানো এবং মিত্রবৃদ্ধির কৌশল—এমনই আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত শাস্ত্র হল সমর শাস্ত্র। তিনি বলতেন, অস্ত্র চালনা ও অনুশীলন যেকোনো জায়গায় হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত প্রশিক্ষণ দ্বারা নেতৃত্ব তৈরি হয়, আর সেটাকেই বলে সমর শাস্ত্র শিক্ষাদান। এ কারণেই প্রচলিত সৈন্যবাহিনীর

[410]

অফিসারদেরকে স্টাফ কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমর শাস্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অতঃপর ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনকে রীতিমতো সমর শাস্ত্র ক্লাস করাতে আরম্ভ করেন। ইতিহাস ক্লাসের মতো এটাও অনেক উপকারী প্রমাণিত হয়। তিনি যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতির জন্য ‘নেসাবে হারব’ নামে সিরিজ পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন, যার দুটি কিস্তি ‘ইদারায়ে ইদাদ' প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। এই পুস্তিকা মুজাহিদীনের মাঝে যুদ্ধের জাগ্রত অনুভূতি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রমাণিত হয়েছে।

‘যরবে ওজব’ নামক বর্বর অপারেশন চলাকালে চিকিৎসা সেবা
২০১৪ সালে পাক আর্মি অন্যায়ভাবে ওয়াজিরিস্তানে বর্বর হামলা চালায়। ঘর-বাড়ি, বাজার, মসজিদ— এক কথায় যেখানে লোকসমাগম ঘটে, তেমন সব জায়গায় জেট বিমানের সাহায্যে কয়েক টন ওজনের গুলি বর্ষণ করে। চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অভাব দেখা দিয়েছিল সে সময়। এহেন পরিস্থিতিতে ডাক্তার আবু খালেদ রহিমাহুল্লাহ এবং তার মেডিকেল টিম কোনো ঝুঁকির পরোয়া না করে মুজাহিদীন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। ওই সময় প্রাণান্তকর পরিশ্রম, ভীষণ ক্লান্তি এবং কয়েক ঘণ্টা যাবৎ দীর্ঘ অপারেশন করা এবং কাজের চাপের কারণে ডাক্তার সাহেব অসুস্থ হয়ে স্ট্রোক করেন। তার অসুস্থতায় পরিচিত সকলেই তার জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করতে থাকেন। কয়েক দিনের মাঝেই অলৌকিকভাবে তিনি পুরোপুরি সুস্থতা লাভ করেন এবং পুনরায় চিকিৎসা সেবায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওই সময় তার কাছে দৈনিক

[411]

কয়েকজন করে আহতকে নিয়ে আসা হতো, যাদের মাঝে শিশু নারী সহ মুজাহিদীন এবং জনসাধারণ সব শ্রেণির লোক থাকতেন। মার্কিন ড্রোন মিসাইল হামলার আহতরাও থাকতেন, আবার পাকিস্তানি জেট বিমানের নৃশংস বোমা হামলার আহতরাও থাকতেন, পাশবিক চরিত্রের পাকিস্তানি আর্টিলারি বাহিনীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরাও থাকতেন, আবার যুদ্ধের কারণে দুর্ভিক্ষে দুর্বল অসুস্থ ব্যক্তিরাও তার কাছে আসতেন।

হসপিটালে বিশ্বাসঘাতক আর্মির বোমা বর্ষণ আফগান বর্ডারের কাছেই পাকিস্তানি লোয়াড়া নামক এলাকায় ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর হসপিটাল ছিল। সরল মনের কিছু মানুষ ভেবেছিলেন, যেখানে জনকল্যাণমূলক কাজ হয়, নারী শিশুদের চিকিৎসা হয়, বর্বর হিংস্র বাহিনী সেখানে হয়তো বোমাবর্ষণ করবে না। কিন্তু এ সেনাবাহিনীর ইতিহাস জানা লোকেরা বুঝতে পেরেছিল, এই নির্দয় হিংস্র সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যই হলো নারী শিশুদের অধিক সমাগম স্থলে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো। বাস্তবেও তেমনটাই হয়েছিল। যখন ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ আহত একজনকে দেখার জন্য ঘর থেকে হসপিটালে যাচ্ছিলেন এবং হসপিটাল থেকে কয়েক মিনিট দূরত্বে ছিলেন, তখন পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর F16 বিমানগুলো ডাক্তার সাহেবের হসপিটালে কয়েক টন ওজনের গোলা বর্ষণ করে। হসপিটালের একাংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং পাশের দালানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ধ্বংসস্তূপের নিচে নারী-শিশু সহ তিনজন শহীদ হন।

[412]

শাহাদাতের ঘটনা
সেনাবাহিনীর বোমা বর্ষণ দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিলো। কিন্তু ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ যুদ্ধ কবলিত এলাকা থেকে, ওয়াজিরিস্তান থেকে বেশি দূরে যেতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বর্ডার থেকে দূরে নিরাপদ এলাকায় যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন ওয়াজিরিস্তানের কাবায়েল বা গোত্রগুলোর বিচ্ছেদ তার পছন্দ নয় বলেই। তিনি এই কাবায়েলি অঞ্চল, এখানকার ধর্মীয় ও জাতিগত আত্মমর্যাদাবোধ, মূল্যবোধ ও প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন তাদের সঙ্গেই তার জীবন মরণ হোক।

অবশেষে সাথিদের পীড়াপীড়ির পর তিনি আফগানিস্তানের বর্ডারেই ওয়াজিরিস্তানের গোত্রীয় অন্য এলাকায় চলে যেতে রাজি হলেন। কিন্তু ওই অপারেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল এমন— ওয়াজিরিস্তানে সেনাবাহিনী বোমাবর্ষণ করে মুজাহিদীনকে পেছনে সরে যেতে বাধ্য করবে, আকাশে মার্কিন ড্রোন নেতৃবৃন্দকে টার্গেট করে হামলা করবে। অতঃপর যারাই আফগানিস্তানে আসতে চাইবে তাদের জন্য আমেরিকান সৈন্যরা অ্যামবুশ পেতে পাক মার্কিন যৌথ অপারেশন নিশ্চিত করার কথা ছিল। তেমনটাই হয়েছে। আফগানিস্তানের বর্ডারে যাওয়ার পর এক সপ্তাহ অতিক্রম না হতেই এক রাতে মার্কিন সেনাদের একটি কমান্ডো বাহিনী তার ঘরের নিকটস্থ জঙ্গলে অবতরণ করে। আকাশে ড্রোন এবং অন্যান্য বিমান উড়ছিল। ডাক্তার সাহেব নিজের দুই পুত্র এবং ভগ্নিপতি মেজর আদি আব্দুল কুদ্দুস সহ ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। তার ছেলে ১৩ বছরের উযায়ের এবং ১১ বছরের সুলাইমান পিতার সঙ্গী ছিলেন। অল্প বয়সী এই দুই কিশোর ঈমানে বলীয়ান ছিলেন। পিতার কাছ [413]

থেকে সামরিক কলাকৌশল শিখে নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তীর এবং ঘোড়ায় আরোহণ করার প্রশিক্ষণ ডাক্তার সাহেব নিজেই সন্তানদেরকে দিয়েছিলেন। ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর ওয়াজিরিস্তানে হিজরতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল সন্তানদেরকে দীনী ও ঈমানী দীক্ষা প্রদান। অবস্থা শোচনীয় দেখে ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ সন্তানদেরকে শহরে পাঠিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার সাহেব সম্মত হননি। তিনি বলেছিলেন, কেমন করে আমি আমার সন্তানদেরকে ফিতনার মাঝে ছেড়ে দেবো। শহরে গিয়ে ফিতনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে এখানে আমার সঙ্গে শহীদ হওয়া তাদের জন্য অধিক উত্তম। তার বড় ছেলে উযায়েরের মাঝে তার মতো মেধা, পড়াশোনার আগ্রহ এবং স্মরণশক্তি ছিল। আর সামরিক বিষয়ে সুলায়মানের অধিক আগ্রহ চোখে পড়ার মতো ছিল। সন্তানদের অল্প বয়স সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর পন্থায় তাদের মাঝে অস্ত্রের ভালোবাসা ও পারদর্শিতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে ডাক্তার সাহেব তাদের জন্য ক্লাশিনকোভের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এক কথায় এই তিন বাপ বেটা এবং বাচ্চাদের ফুফা মেজর আদেল আব্দুল কুদ্দুস সকলেই অস্ত্র তুলে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের মুখোমুখি হবার সাহস মার্কিনীদের ছিল না। অবশেষে আমেরিকানরা বিমান দিয়ে টার্গেট করে তাদের ওপর বোমা হামলা চালায়। যার ফলে তাওহীদের এই চার সন্তান জীবন দানকারীর তরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এভাবেই মানবতার এক পরম বন্ধু দুই দশকের দাওয়াত, সংগ্রাম, প্রশিক্ষণ প্রদান ও মানবতার কল্যাণমুখী পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে আখিরাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মানব সমাজের চিকিৎসা সেবায় উৎসর্গিত প্রাণ ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহর

[414]

(Datta Khel)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَـرُوا يُقَـاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّـيْطَانِ كَـانَ ضَعِيفًا

শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে , (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। ’ [।সূরা আন নিসা ০৪ :৭৬]

আল্লাহর দীনের সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্ক আছে এমন যে কেউ আমেরিকাকে তাগুত বলতে অস্বীকার করবে না। এই আমেরিকাই গোটা বিশ্বে শক্তি প্রয়োগ করে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মেনে নিতে বাধ্য করে সকলকে কি নিজের উপাসনা করাচ্ছে না ? এই আমেরিকা কি দাবি করেনি যে , যারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিরোধী , তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে ? এখন যেই বাহিনী এই তাগুতি শক্তির মিশন সফল করার জন্য লড়াই করে , তাদের প্রকৃত পরিচয় কি হতে পারে ? কি নাম ও কি টাইটেল দিয়ে তাদেরকে ডাকা যেতে পারে ? তাদেরকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ এবং সত্যের পথে শহীদ বলা হবে নাকি ‘আমেরিকার পথের মুজাহিদ ’ এবং আমেরিকা ও ইহুদীদের উদ্দেশ্যের জন্য শাহাদাত বরণকারী বলা হবে ? আজ যদি তাদের নুন খাওয়া গোলামেরা অথবা তাদের ভয়ে আতঙ্কিত হযরতগণ তাদেরকে শহীদ বলে , তাহলেও কি ইতিহাসের কোনো নিরপেক্ষ পাঠক এই বর্বর হিংস্র সেনাবাহিনীকে কখনও মুজাহিদ কিংবা শহীদ বলার দুঃসাহস করতে পারে ? নীতি -নৈতিকতা বিবর্জিত পাশবিক চরিত্রের অধিকারী এই সেনাবাহিনীকে যারা মুজাহিদ বা শহীদ বলতে চান , তারা কি জানেন , এরা জেট বিমান দিয়ে ছোটো ছোটো শিশুদের ওপর বোমাবর্ষণ করে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। হামলার তীব্রতার কারণে ছোটো ছোটো সন্তানদেরকে ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বের করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাফন করারও সুযোগ পায়নি। কালকে কিয়ামতের দিন এই শিশুরা যদি হাশরের ময়দানে দাবি উত্থাপন করে : (যেমনটা কুরআনে কারীমে এসেছে): بأي ذنب قتلت - আমাকে কোন্ অপরাধে হত্যা করা হয়েছে ? তখন এই হিংস্র বাহিনীর সমর্থকরা কি জবাব দেবেন ? যে রহমাহতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবলা প্রাণীর কষ্ট দেখেও অস্থির হয়ে উঠতেন, তার সুপারিশ লাভের আশায় এবং তার হাত থেকে হাউজে কাওসারের পানি পান করার জন্য কোন মুখে তার সামনে দাঁড়াবেন— যদি তাদের হাতে মুখে জালেম অত্যাচারী গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার কালি লেগে থাকে?

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ডাক্তার আবু খালিদ সারবুলন্দ যুবায়ের খান রহিমাহুল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তার এক একটি কাজের বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা তাকে দান করুন এবং নিজের নেয়ামত রাজি দ্বারা তার চক্ষুদ্বয় শীতল করে দিন, আমীন।

দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়ার অচেনা ঘোড়সওয়ার ইঞ্জিনিয়ার ইবরাহীম গৌরী শহীদ রহিমাহুল্লাহ
দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়ার অঙ্গন হোক অথবা জিহাদ, কিতাল, হিজরত বা রিবাতের সফর হোক কিংবা তালিম তরবিয়ত শিক্ষা দীক্ষার অঙ্গন হোক— সর্বাঙ্গনে সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর একজন সঙ্গী ছিলেন। তিনি ১৭ বছর পর্যন্ত আল্লাহর দীন বিজয়ের মিশনে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সহকারী ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও জিহাদী ব্যক্তিত্ব, সিদ্ধান্ত সমূহ এবং দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর সাহচর্য ও বন্ধুত্বের বিরাট প্রভাব ছিল। মুজাহিদীনের মাঝে তাকে জহির এবং আমজাদ নামে ডাকা হতো। আমার জন্য গর্বের বিষয় হল, তিনি সম্পর্কে আমার বড় ভাই ছিলেন।

[417]

প্রাথমিক জীবন
শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জন্মের তিন মাস পর। তিনি আফগান গৌরী বংশের ছিলেন, যারা পাকিস্তান গঠনের আগেই কাশ্মীরে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। তার সম্মানিত পিতা ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (CSS) উত্তীর্ণ হন এবং ফেডারেল ভিসা তথ্য ও সম্প্রচারে কর্মরত থাকেন। এভাবেই শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর পারিবারিক জীবন কেটেছিল ফেডারেল রাজধানী ইসলামাবাদে। তার সম্মানিত মাতা পুরো জীবন নারীদের মাঝে দীন ইসলামের দাওয়াত, কুরআনে কারীমের তালিম এবং কল্যাণ প্রচারে উৎসর্গ করেছিলেন। নারীদের মাঝে আত্মশুদ্ধি আল্লাহর দীনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি এবং শরীয়ত অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় তিনি সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। সেই সঙ্গে কুরআনে কারীমের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক, নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি অধ্যায়ে কুরআনে কারীমের দিকনির্দেশনা ও অনুশাসন এবং কুরআনিক শিক্ষা সমাজে প্রচার প্রসার করা শহীদ রহিমাহুল্লাহর মাতার বৈশিষ্ট্য ছিল।

ইন্টার পর্যন্ত শহীদ ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহ ইসলামাবাদের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ ইসলামাবাদ বয়েজ কলেজে শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর তিনি ২০০৩ সালে ‘ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি তক্ষশীলা’ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন।

ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহ দীনদার সু ধার্মিক পরিবারে লালিত-পালিত হন। আল্লাহর দীনের সঙ্গে পিতা-মাতার গভীর সম্পর্ক এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুসরণের গুরুত্ব থাকার কারণে

[418]

ভাই ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহর মাঝে শৈশবকাল থেকেই দীনের প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদী অনুপ্রেরণা এবং দীন ইসলামের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করে দেয়ার স্বপ্ন ছিল। এছাড়াও শৈশবকাল থেকেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তার মাঝে ছিল। ভাই ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহর ছোট্টকালের একটি মজার ঘটনা আছে। তিন বছর বয়সে একবার তিনি অসুস্থ হন এবং তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার সাহেব যখন রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত বের করলেন, তখন তিনি তা দেখা মাত্রই হসপিটালে উচ্চ আওয়াজে স্লোগান দিতে আরম্ভ করেন: ‘রক্ত আনিবে রঙ, আসিবে বিপ্লব’।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব একই শহরে বসবাস এবং পারিবারিক সম্পর্কের কারণে ছোটোকাল থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তার পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ক্যাডেট কলেজে পড়াশোনা করার সময় কুরআনের ক্লাস করাতে আরম্ভ করলে তাদের বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয়। ওই সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ইসলামাবাদে উলামায়ে কেরামের কিছু মজলিসে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। এরপরেই তিনি আল্লাহর দীনের দাওয়াতের জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কুরআনের ধারাবাহিক ক্লাসের আয়োজন করেন। ওই সময় থেকেই শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ফারুক ভাইয়ের প্রকৃত বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সে সময়ে উভয়ের বয়স ১৬ বছরের কাছাকাছি ছিল।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কুরআন ক্লাসের কথা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ এই পুরো সময়ে শুধু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ক্লাসে অংশগ্রহণই করতেন না বরং এই আয়োজনের ব্যবস্থাপকদেরও একজন [419]

ছিলেন। তাঁদের কর্মপন্থা এরূপ ছিল: ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কুরআনের কোনো সূরা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। ওই আলোচনার পর শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ কোনো হাদীস, আত্মশুদ্ধিমূলক বিষয়ের ওপর কোনো হযরতের বয়ান বা কোনো কিতাবের সারাংশ শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতেন। এভাবে বছরের পর বছর এই ক্লাস আয়োজনে দুই হযরত জুটিবদ্ধ থাকেন।

এ সময় তাদের উভয়ের সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা আমরা এভাবে অনুমান করতে পারি যে, ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসার পর এবং ছুটিতে একটা দিনের জন্যও তারা পরস্পরে আলাদা থাকতেন না। আজ এখানে ক্লাসের জন্য যেতেন কাল সেখানে সাথিদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য যেতেন। অতঃপর আমলের উন্নতি ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও যেই গতিতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ অগ্রযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, একইভাবে তার পেছনে পেছনে শহীদ ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ যাত্রা চালিয়ে যেতে থাকেন। বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার পাশাপাশি শুরু থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রতি ইবরাহীম ভাইয়ের অন্তরে আস্থার ভাব বসে গিয়েছিল; অথচ সাধারণত সমবয়সীদের মাঝে এমন শ্রদ্ধাপূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতার সম্পর্ক তৈরি হয় না।

জিহাদে অংশগ্রহণ
জীবনের অন্যান্য সিদ্ধান্তের মতোই কাশ্মীর জিহাদে যাবার ব্যাপারেও উভয়ই একসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেখানে গমন করেন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ একই সঙ্গে তারা সম্পন্ন করেন। পরবর্তী দিনগুলোতে উভয়জন কাশ্মীর জিহাদের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত একই সঙ্গে নেন। আইএসআই-এর [420]

স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারণে উভয় হযরত যখন কাশ্মীরি সংগঠনগুলোর ব্যাপারে হতাশ হয়ে যান, তখন তারা একই সঙ্গে প্রকৃত জিহাদ খোঁজ করার জন্য যাত্রা আরম্ভ করেন। অতঃপর একই সময়ে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তারা মিলিত হন এবং তার মধ্যস্থতায় জিহাদী কাফেলার সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে যান। জিহাদেও এই উভয় হযরত দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়া বিভাগে একই সঙ্গে কাজ করেন এবং সম্মিলিতভাবে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। এক কথায় বুঝ হওয়ার পর থেকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ নিজেদের গোটা জীবন পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযাত্রার মধ্য দিয়েই অতিক্রম করেন। এই দুই বন্ধু নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে গ্রহণ করতেন। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জীবনী আলোচনায় তার পুরানো বন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা জরুরি বলে মনে হচ্ছে।

জীবনের জন্য জীবনের আগমন

শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ -এর মাঝে আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা পেতে দেয়ার এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি যদি কোন বিধান ফরয বলে জানতেন, তৎক্ষণাৎ তা পালন করতেন। সম্ভবত তার নামের কারণেই এমন বৈশিষ্ট্য। সাইয়েদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ ۖ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

- “যখন তার পরওয়ারদিগার তাকে বললেন আত্মসমর্পণ করো, (মাথা পেতে দাও) তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন : আমি

রাব্বুল আলামীনের (প্রতিটি হুকুমের সামনে) মাথা পেতে দিলাম।” (সূরা বাকারা, ০২: ১৩১)

ঠিক এমনটাই ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর স্বভাব ছিল। তিনি শরীয়তের নির্দেশের সামনে কোনো চিন্তা, কল্যাণ ভাবনা বা অকল্যাণের আশঙ্কার পরোয়া করতেন না; তৎক্ষণাৎ কাজ আরম্ভ করতে চাইতেন। তাই যখন ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি কাশ্মীর জিহাদে অংশগ্রহণের দাওয়াত পান, তখন পড়াশোনার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেন। অতঃপর যখন বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের দাওয়াত পান, তত দিনে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা সম্পন্ন করে নতুন নতুন চাকরি পেয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উচ্চ মেধা দান করেছিলেন, তার শিক্ষাগত রেকর্ড ভালো ছিল। তাই জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার সামনে কামাই রোজগারের পথ চারদিক থেকে উন্মুক্ত দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, কাফেরদের কোনো মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করবো না। "জ্ঞানী লোকেরা’ বলেছে, ক্যারিয়ারের শুরুতে কোনো বড় পশ্চিমা কোম্পানিতে কাজ করার দ্বারা ভবিষ্যতের সব জায়গায় সুযোগ খুলে যাবে। তখন সঞ্চিত অর্থ দিয়ে জিহাদ করা অথবা দুনিয়া উপার্জন চালিয়ে যাওয়া আপনার ইচ্ছা। ওই সময়ে আমেরিকার বড় তেল কোম্পানিতে তিনি চাকরির অফার পান। কিন্তু তিনি ছোটোকাল থেকেই আখিরাতের ফিকির, পরকাল চিন্তা এবং ‘জিন্দেগি বরায়ে বন্দেগি’ তথা এই জীবন আল্লাহর ইবাদতেই নিবেদিত’—এমন শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি দুনিয়া উপার্জনের আকর্ষণীয় পজিশনগুলো ভালোভাবেই বুঝতেন। তিনি জানতেন, দুনিয়া উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে পুনরায় সবকিছু ছেড়ে আসা খুবই কঠিন। তিনি ঈমানের জন্য জাগতিক অফারগুলোকে হুমকি মনে করতেন— বিশেষ করে মার্কিন কোম্পানিগুলোতে চাকরির চিন্তা করে তো তার লোম

[422]

দাঁড়িয়ে যেত। তিনি দুনিয়াবি এই অফারগুলোর ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী থেকে এতটাই তুচ্ছভাবে এগুলো সরিয়ে দিতেন, শোনা মাত্র সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত যে, ইনি কোন দুনিয়ার মানুষ? দুনিয়া কোন দিকে যাচ্ছে আর ইনি কোন দিকে যাচ্ছেন? যাই হোক শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ তার কল্যাণকামীদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন: আমি ঝুপড়িতে থাকবো কিন্তু শুধু পয়সা কামানোর জন্য আমার জীবন ব্যয় করবো না; আমার জীবনের লক্ষ্য এর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে।

অতঃপর তিনি একটি পাকিস্তানি টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করেন। এই চাকরি নেয়ার উদ্দেশ্য হলো, এখানে সপ্তাহের কয়েকদিন লেকচার দেয়ার জন্য যেতে হয় আর বাকি দিনগুলোতে অবসর পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর দীনের দাওয়াতী কার্যক্রমে এই অবসর ব্যয় করতে চাইতেন। তাই এমন চাকরির প্রতি তার আগ্রহ ছিল, যেখানে বেতন কম কিন্তু অবসর পাওয়া যাবে বেশি।

২০০৪ সালে যখন তিনি রীতিমতো শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মিলিত হন; শায়খ রহিমাহুল্লাহ যখন তাকে নিজের শহরে থেকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার দায়িত্ব প্রদান করেন, তখন তিনি বলেন: ব্যস এখন আমি আমার পুরো সময় জিহাদের কাজে ব্যয় করবো। শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ বললেন যে, বর্তমানে আপনার অর্ধেক সময় ব্যয় করাই যথেষ্ট; এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন নেই।

ওই সময় শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ নতুন বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু আমি সম্ভবত ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে এমন কাউকে দেখিনি, যার দৃষ্টিতে দুনিয়া মশার পাখার মতোই তুচ্ছ। ইবরাহীম সাহেবের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জন্য সম্পদ

[423]

উপার্জনের কোনো গুরুত্ব ছিল না। এমন নয় যে, তিনি নির্বোধ ছিলেন অথবা দুনিয়ার প্রয়োজনাদি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তা কখনোই নয়; বরং সমাজের মধ্যে তাকে খুবই বুদ্ধিমান সচেতন ব্যক্তি বলে করা হতো। কিন্তু তিনি আল্লাহর দীনের জন্য উৎসর্গিত এবং সবকিছু বিলিয়ে দিতে চাইতেন। তার পারিবারিক খরচ হিসাব করে বের করলেন, কষ্ট করে ৪০০০ রুপির মধ্যেই খরচ শেষ করা যায়। তখন তিনি চিন্তা করলে, আমি তো সপ্তাহে একদিন লেকচার দিয়েই ৪০০০ রুপি কামাই করতে পারি, তাহলে বাকি দিনগুলো কেন আমি দুনিয়ার জন্য নষ্ট করবো? তখন তিনি অফিসের প্রধান ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন, পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট অর্থ হাতে পেতে যতটুকু কাজ করতে হয়, আমি তার চেয়ে বেশি কাজ করতে চাই না। বাকি দিনগুলো আমার দীনের জন্য কাজ করতে হবে। তার কল্যাণকামী কেউ বললো: ‘একজন শ্রমিকেরও তো এত কম বেতন হয় না। আপনি তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী কেন নিয়েছেন?’ তখন ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ জবাব দিয়েছিলেন: ‘আমি এই দুনিয়া কামাই করার জন্য শিক্ষা অর্জন করিনি; এই শিক্ষা দিয়ে আল্লাহর দীনের সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা আমার।’ দুনিয়ার ব্যাপারে এতটা উদাসীনতা ও অমুখাপেক্ষী আচরণ সালফে সালেহীনের জীবনীতেই পাওয়া যায়।

রণাঙ্গনের অস্থিরতা তিনি শহরে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার সবকিছু থেকে হাত ঝেড়ে সর্বস্ব আল্লাহর দীনের জন্য উজাড় করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এতোটুকুতে তুষ্ট ছিলেন না। প্রতিনিয়ত রণাঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা তাকে অস্থির করে তুলতো। তিনি উপায় পাচ্ছিলেন না, কিভাবে আফগানিস্তানে যাবেন এবং [424]

জিহাদের ময়দান থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ লাভ করবেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রহিমাহুল্লাহ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহকে পীড়াপিড়ি করলেন, আমাকে আফগানিস্তান পাঠিয়ে দিন। কিন্তু আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ অন্যান্য দাওয়াতী কার্যক্রমের কারণে দুঃখ প্রকাশ করলেন। অপরদিকে যখন তিনি কাশ্মীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তখন একটি দৈহিক কসরতের সময় তার কোমরের জয়েন্ট সরে গিয়েছিল। এ কারণে তিনি নিয়মিত কোমর ব্যথায় ভুগছিলেন। কিন্তু তবুও তার মাঝে জিহাদের আগ্রহের অভাব ছিল না। ওই সময় তার ছোটো ভাই হিসেবে আমি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে জিহাদী ময়দানে যাবার সুযোগ লাভ করেছিলাম। ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ যেতে না পারার কারণে এতটা পেরেশান ছিলেন যে, বিছানায় মুখ লুকিয়ে কাঁদতেন।

ওই সময় একদিন তিনি আমাকে বললেন, "আফগানিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা না গেলে আমাকে ইরাকে পাঠিয়ে দাও’। আমি হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ইরাকে? এত দূরে?’ তিনি বললেন: "আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদের হুকুম এসেছে। কাছে হোক দূরে হোক তাতে কি? যেখানেই সুযোগ হবে আমি অবশ্যই যাবো।”

অতঃপর যখন শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ হিজরতের সংকল্প করলেন, তখন তাকে বললেন, যদি সহজ হয় এবং তার ইচ্ছা থাকে তাহলে তিনি সঙ্গে নিতে পারেন; নয়তো ঘরে থেকেই যেন জিহাদী মিডিয়ার কাজ করেন। অবশ্য এই কথাও বললেন, যদি হিজরত করে একসঙ্গে কাজ করেন সেটাই বেশি উত্তম হবে। ওই সময় শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ নতুন বিয়ে করেছেন বিধায় বের হওয়াটা কঠিন ছিল। কিন্তু তিনি কোনো কিছুর পরোয়া না করে হিজরতের জন্য যাত্রা করলেন। আমার মনে আছে আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম, শহরে থেকেই যখন কাজ করা যাচ্ছে এবং আপনার আমীর শায়খ আহসান আজীজ [425]

রহিমাহুল্লাহ থেকে যাবারও অনুমতি দিয়েছেন, তাহলে কেন যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন: "আল্লাহর দীনের জন্য যা উত্তম সেটাই করবো। আর যখন আমি মুজাহিদীনের মাঝে থাকবো, তখন যে মিডিয়ার কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারবো, তা বোঝাই যাচ্ছে।”

আমার মনে হয়, আল্লাহর দীনের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ এবং নির্দ্বিধায় নমরুদের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সাহসী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জীবনের অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত খুব সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়া বিভাগে
জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে অংশগ্রহণের পর শহীদ উসামা ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহর আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি ক্রুসেডারদের উপর ফিদায়ী হামলা করবেন অথবা আফগানিস্তান অথবা ইরাকে গিয়ে ক্রুসেডার জায়নবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মুখোমুখি রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা যখন হলো না, তখন তার তৃতীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা এবং সৃজনশীলতার কারণে জিহাদের অস্ত্র তৈরি করবেন। পড়াশোনার সময় ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই নিয়তে নির্বাচন করেছিলেন যে, এই বিষয়ের মাধ্যমে জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা সহজ হবে এবং মুসলিম উম্মাহর গৌরব পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার জন্য উপকারী কোনো কাজ করা যাবে। যখন তিনি শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে জিহাদের কাজ করতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথম প্রথম তিনি তার কাছে এমন পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন যে, আমার ইচ্ছা, মুজাহিদীনের জন্য আধুনিক অস্ত্র তৈরির একটি ওয়ার্কশপ বানাবো। ওই সময় শায়খ আহসান রহিমাহুল্লাহ তানজীম আল-কায়েদার পক্ষ [426]

থেকে দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহকে মিডিয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করে তার সঙ্গে মিডিয়াতে কাজ করতে রাজি করালেন।

উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ পারিবারিক শিক্ষার কারণে ছোটোকাল থেকে ক্যামেরা ও ফটো থেকে দূরে থাকতেন। ছবি তোলা ও প্রিন্ট করাকে পুরোপুরি নাজায়েয মনে করতেন। ছোটোকাল থেকেই এমন সব মাহফিলে অংশগ্রহণ পরিহার করতেন, যেখানে ছবি তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে স্বভাবতই কোনো দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করা এবং অপ্রয়োজনে ছবি তুলতে তিনি নারাজ ছিলেন। জিহাদী কার্যক্রম ছাড়া ছবি তুলতে সর্বদাই তিনি নিরুৎসাহিত করতেন। যখন শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ তাকে জিহাদী মিডিয়ার দায়িত্বে আসতে বলেন, তখন ক্যামেরা ব্যবহার এবং ছবি তোলার ব্যাপারে তার অভিযোগ ছিল। আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ তাকে বোঝালেন, মিডিয়া বর্তমান সময়ে মুজাহিদীনের অনেক বড় হাতিয়ার; জবানের মাধ্যমে জিহাদের এটি একটি পন্থা এবং এর মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের ন্যাক্কারজনক প্রোপাগান্ডার জবাব দেয়া হয়। শায়খ রহিমাহুল্লাহ তার কাছে সুস্পষ্ট করলেন যে, এটি অবিকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবি সাইয়েদুনা হাসান বিন সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাজের মতো, যিনি ইসলাম প্রতিরক্ষার জন্য কাফেরদের প্রতি অবমাননাকর কবিতা রচনা করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এমন কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের দোষত্রুটি বর্ণনা করো.. জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তোমার সঙ্গে রয়েছেন। হাদীসে পাকের ভাষ্য এরকম:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: «اهْجُ المُشْرِكِينَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ» [427]

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি কুরাইযা যুদ্ধের দিন হাসান ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, "মুশরিকদেরকে অবমাননা কর; নিশ্চয়ই জিবরাঈল তোমার সঙ্গে রয়েছেন।" [সহীহ আল বুখারী]

একইভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন:

«اهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ»

অর্থ : "কুরাইশের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করো। কারণ তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপের চেয়েও এটা বেশি আঘাতকারী।" [সহীহ মুসলিম]

শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ তাকে বোঝালেন: বর্তমান সময়ে যেখানে কাফেরদের তৈরি বিশ্ব ব্যবস্থা গোটা পৃথিবীকে লোহার শিকলে আবদ্ধ করেছে, সেখানে তাদের শয়তান মিডিয়া ২৪ ঘণ্টা হাজারটা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে গোটা পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যাচ্ছে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। ইসলামের মুজাহিদীনের উজ্জ্বল চেহারা বিকৃত করে তুলে ধরা, তাদেরকে হিংস্র জংলি হিসেবে চিত্রিত করাই যেন তাদের প্রধান কাজ। এই মিডিয়াগুলো ইসলামী সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা মুসলিম সমাজগুলো থেকে সরিয়ে তাদের অশ্লীল সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে বদ্ধপরিকর। কাফেরদের চাপিয়ে দেওয়া এ জাতীয় ভয়ানক মিডিয়া যুদ্ধে আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামের মুজাহিদীনের জন্য দাওয়াতের প্রাচীন মাধ্যমগুলো ব্যবহার খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি নিজের পরিবার ও পিতা-মাতার সঙ্গে যোগাযোগের পথেও এই জল্লাদ তাগুতি প্রতিষ্ঠানগুলো হাজার রকমের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে

মুজাহিদীনের জন্য মিডিয়া ইসলাম ও জিহাদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিতের একটি হাতিয়ার। এর মাধ্যমে নেতিবাচক বিষয় ও অপবাদের জবাব দেয়া হবে, কাফেরদের অন্যায়গুলো প্রচার করে তাদের প্রতি ঘৃণা ভাব বৃদ্ধি করা হবে, জিহাদ ফরয হওয়া এবং এই ফরযের গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সচেতন করা হবে এবং কোনো ভয়-ভীতি ছাড়া বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ পন্থায় ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। এ কারণে বর্তমান সময়ে প্রচার মিডিয়ায় লেখালেখি, অডিও-ভিডিও কনটেন্টের মাধ্যমে আল্লাহর দীন ও জিহাদের দাওয়াত বেগবান করা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা করে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহকে জিহাদী মিডিয়ায় কাজ করতে সম্মত করেন। এরপর উসামা ইবরাহীম সাহেবের ফটো হারাম দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: কোনো সন্দেহ নেই যে, ছবি হারাম হবার প্রমাণ হিসেবে নববী হাদীসের সমাহার রয়েছে; কিন্তু দীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ক্যামেরা ব্যবহারকে বর্তমান যুগের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম শুধু জায়েয বলে ফাতওয়াই দেননি বরং নিজেদের দাওয়াতী তাবলীগী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পুরোদমে ব্যবহার করে যাচ্ছেন; অথচ মুহতারাম উলামায়ে কেরামের পক্ষে দাওয়াতের অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই— সেখানে মুজাহিদীনের কাছে যেহেতু এছাড়া দাওয়াতের অন্য কোনো পন্থা নেই, তাদের ব্যাপারে আপত্তি তোলার কি কারণ? এখন যদি ধরে নেয়া হয়, ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা হারাম, তবুও তো মুসলিম উম্মাহর প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি অবস্থায় উলামায়ে কেরাম এ বিষয়টি জায়েয ফাতওয়া দিয়েছেন—যেমনিভাবে যুদ্ধের ময়দানে জরুরি

[429]

অবস্থায় এমন অনেক বিষয় বৈধ, সাধারণ অবস্থায় যেগুলোর অনুমতি নেই। মুসলিম উম্মাহ যখন ইহুদী খ্রিস্টানদের কব্জায়, মসজিদে হারাম যখন মার্কিনীদের বেষ্টনীতে, সমস্ত মুসলিম দেশ যখন প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে, গোটা পৃথিবীতে যখন আল্লাহর শরীয়ত অবহেলিত, হাজার হাজার মুসলিম মা-বোন এবং লাখ লাখ মুসলিম ভাই কাফেরদের কাছে বন্দী, এর চেয়ে অধিক জরুরি অবস্থা আর কি হতে পারে? অতএব এই অবস্থায় জিহাদের দাওয়াত প্রচারের জন্য মিডিয়া ব্যবহার করা শুধু জায়েয নয় বরং ওয়াজিব পর্যায়ের। এমনই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরে শহীদ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ শহীদ উসামা ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহকে মিডিয়া বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হতে এবং মনে প্রাণে এই বিভাগের মাধ্যমে আল্লাহর দীনের বাণী উচ্চকিত করতে রাজি করান।

হিজরত করার পরে ওয়াজিরিস্তানে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় মিডিয়া আস-সাহাব ফাউন্ডেশনের প্রধান -দায়িত্বশীল শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর কাছে ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহকে চেয়ে নিজের সঙ্গে আস-সাহাব মিডিয়ায় যুক্ত করেন। এভাবেই ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ মিডিয়া বিভাগে তার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ আরব ভাইদের কাছ থেকে অর্জন করেন এবং খুব দ্রুতই মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন।

জিহাদী মিডিয়া বিনির্মাণ
প্রচার মিডিয়া যেকোনো দলের জন্য মেরুদণ্ডের মতো। আগেকার দিনে যেভাবে সেনাবাহিনীর পতাকা দেখে সকল সৈন্য মনোবল ধরে রাখতো। শত্রুপক্ষ চেষ্টা করত পতাকা ভূপতিত করতে। [430]

আধুনিক বিশ্বে মিডিয়া- মুজাহিদ দলের জন্য ওই পতাকারই ভূমিকা পালন করে। মিডিয়ার মাধ্যমে লোকেরা আপনাকে চিনতে পারে, আপনার দাওয়াত গতি পায় এবং এই প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে শত্রুপক্ষের নেতিবাচক প্রোপাগান্ডার জবাব আপনি দিতে পারেন।

অপরদিকে কোনো দলের মধ্যে যারা মিডিয়ায় কাজ করে, তারা নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে থাকে। কারণ তারা নেতৃবৃন্দের ওই সমস্ত বক্তব্য-বিবৃতি প্রচারের কাজ করে— যেগুলোকে নেতৃবৃন্দ নিজেদের পলিসি মনে করে এবং সরাসরি নেতাদের দিকনির্দেশনায় মিডিয়ার কাজ সম্পাদিত হয়। শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ জিহাদী দাওয়াত ও মিডিয়ার কাজ এমন প্রতিষ্ঠানে শিখেছিলেন, যার সদস্যগণ উম্মাহর নেতৃবৃন্দ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ প্রমুখের দিকনির্দেশনায় মিডিয়া পরিচালনা করতেন। এই কারণে ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ জিহাদী চিন্তা, এ অঙ্গনের রাজনীতি, কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনা, জিহাদের ইতিহাস, সমাজের উত্থান পতনে মিডিয়ার অবদান, এই অঙ্গনের নীতিনৈতিকতা, মিডিয়ার বিভিন্ন নীতিমালা —এক কথায় জিহাদের দাওয়াত প্রাসঙ্গিক যত বিষয় রয়েছে, সবকিছু নেতৃবৃন্দের সরাসরি দিকনির্দেশনায় শিখেছেন এবং বুঝেছেন। এই কারণে তিনি সমসাময়িকদের মাঝে শুধু টেকনিক্যাল দিক থেকেই নয়; বরং জিহাদী মিডিয়ার গোটা অঙ্গনেই সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তার রায় সবচেয়ে বেশি ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হতো। তার মতামতে এমন সূক্ষ্ম দিক ও গুরুত্ববহ পয়েন্ট থাকতো, কখনও কখনও অন্য হযরতগণের দৃষ্টি সেদিকে যেতই না। অপরদিকে ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ খুব বেশি অধ্যয়ন করতেন। মেধা শক্তির কারণে যা কিছু

[431]

পড়তেন, সারমর্ম আয়ত্ত করে নিতেন। সাধারণ সমাজ— বিশেষ করে পাকিস্তানি সমাজ, বিভিন্ন শ্রেণি, সমাজের ইতিহাসেও তার বেশ দখল ছিল। এই দিক থেকে তার রায় মিডিয়া অঙ্গনের কৌশল নির্ধারণে খুবই পরিপক্ক ও অর্থপূর্ণ ছিল।

তার ব্যক্তিত্বের এই দিকটি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর গোটা জীবনে অনেক বড় অবদান রেখেছে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ দাওয়াতী বিষয়ে শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর মতামতের ওপর নির্ভর করতেন। কখনও কখনও এমন হয়েছে যে, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কোনো বিষয়ে দাওয়াতী ও প্রচার কার্যক্রম চালাতে চেয়েছেন, কিন্তু শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ সেটা উপযুক্ত মনে করেননি; পরবর্তীতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ স্বীকার করে নিয়েছেন, শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর রায় সঠিক ছিল। এক কথায় শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপক্কতা শুধু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকেই নয়; বরং সাধারণ মুজাহিদীন এবং তাদের নেতৃবৃন্দের বিরাট উপকারে এসেছিল।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার জীবনে যতগুলো দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, সেগুলোর মাঝে তার উপদেষ্টা ছিলেন শহীদ ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ। তিনি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মিডিয়া কার্যক্রম শুধু পর্যালোচনাই করতেন না; অনেক কিছুই সংশোধন করে দিতেন। শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জন্য এত সুশৃঙ্খল বিরাট দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব ছিল বলে আমার মনে হয় না। শহীদ ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ উর্দু আস-সাহাব মিডিয়ার প্রধান দায়িত্বশীল এবং প্রাণ ভোমরা ছিলেন। প্রাণান্তকর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের বরকতে তিনি ফারুক [432]

ভাই রহিমাহুল্লাহর দিকনির্দেশনা ও বিশেষ মনোযোগে আস-সাহাব উর্দু প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটিকে একটি ফলবান বৃক্ষে পরিণত করেন। তিনি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মিডিয়ায় দাওয়াতী কাজের জন্য দক্ষ সাথি তৈরি করেন এবং নিজে অন্যান্য গবেষণা-প্রকল্পে মনোযোগ দেন।

যেহেতু উর্দু ভাষায় জিহাদী মিডিয়ার প্রকৃত নির্মাতাদের মাঝে তাকে গণ্য করা হতো, এ কারণে জিহাদী মিডিয়ার মূলনীতি নির্ধারণ করার গুরুত্ব অন্য মুজাহিদীনের অন্তরে প্রবিষ্ট করা, শরীয়াহ বিরোধী বিষয়গুলো থেকে এই অঙ্গন রক্ষা করা, সরল চিন্তা ও চারিত্রিক উৎকৃষ্টতাকে জিহাদী প্রকাশনার শর্ত হিসেবে স্থির করার ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলতেন, জিহাদী মিডিয়া যেমনিভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, সেই সঙ্গে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি পথ। এখানে এমন অনেক দরজা আছে, যেগুলো দিয়ে প্রবেশ করে শয়তান এবং মানুষের নফস মুজাহিদের আমল নষ্ট করে দিতে পারে। তন্মধ্যে একটি ভয়াবহ ব্যাধি হলো নিজেকে ফুটিয়ে তোলার আগ্রহ। এই ব্যাধি পরবর্তীতে রিয়া ও লৌকিকতার পথে নিয়ে ব্যক্তির ধ্বংস সাধন করে। তাই ভাই ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ নিজেও এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন, অপর সাথিদেরকেও আত্মপ্রকাশের ব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রমে সর্বদা অখ্যাত থাকতে চাইতেন। তার বিনয় ও আত্মবিস্মৃতির কারণে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, তিনি কোন স্তরের লোক ছিলেন এবং এই অঙ্গনে কতটা অবদান রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বড়দের কাছ থেকে শেখা লক্ষণের দেখে যাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ ও খ্যাতি পাওয়ার আগ্রহ টের পেতেন, তাদেরকে মিডিয়া অঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে দিতেন।

[433]

একবার মিডিয়া বিষয়ে তার সঙ্গে আমার বৈঠক ও মতবিনিময় হয়। তিনি আমাকে বলেন, মিডিয়া অনেক ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগ এবং এখানে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আমি বললাম, বারুদ বিভাগও তো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ; কিন্তু যেহেতু জিহাদী প্রশিক্ষণ সহজ করা এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য বারুদের বিষয়ে ব্যাপক অনুমতি এসেছে, তাই মিডিয়ার কাজও উন্মুক্ত করে দেয়া উচিত এবং সকলকে এই অঙ্গনে কাজের অনুমতি দেয়া উচিত। তখন তিনি বললেন: কখনোই এমনটা নয়; বারুদের ভুল ব্যবহারে ক্ষতি ও ধ্বংসের আশঙ্কা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ভুল হাতে মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষতি তার চেয়েও ভয়াবহ এবং ইসলামের জন্য আরও বেশি ক্ষতিকর। বারুদের ভুল ব্যবহারে একটা অঞ্চল ধ্বংস হতে পারে। এই ক্ষতি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু মিডিয়ার ভুল ব্যবহার গোটা বিশ্বে আমাদের দাওয়াত বিকৃত করে, মুজাহিদীনের দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট করে, জিহাদের উদ্দেশ্যগুলো পদদলিত করে এবং ইসলামের খেদমতের নামে কাফেরদের স্বার্থে কাজ করতে আরম্ভ করে। তিনি বলতে লাগলেন, আমি মনে করি, কোনো সাথির মাঝে কিছু গুণের অভাব থাকলে তাকে মিডিয়ার কাজ থেকে পুরোপুরি দূরে রাখা উচিত:

** যথেষ্ট পরিমাণে আল্লাহ তাআলার ভয় এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার মেজাজ। অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে কেউ যদি বেপরোয়া হয়, তাহলে তার গায়ে মিডিয়ার বাতাসও লাগা উচিত নয়। জিহাদী ফিল্ম বানাতে গিয়ে যদি কখনও হারাম ছবি সামনে আসে আর তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত না করা হয় এবং তারপর যদি নিজ ইচ্ছায় একবারের জন্য হলেও ওই ছবি দেখে, তাহলে পরবর্তীতে এমন ব্যক্তির মিডিয়া বিভাগে কাজ না করা উচিত। কারণ নিজের ঈমান হেফাযত করা তার জন্য প্রথম ফরয। তিনি বলেন, আরব উস্তাদদেরকে এতটা

[434]

সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখেছি যে, কোনো ভিডিও এডিটিং করতে হলে যেখানে নারীদের ছবি থাকার আশঙ্কা, সেখানে ওই ভিডিও তারা Thumbnail view (অর্থাৎ আঙ্গুলের নখ পরিমাণ দৃশ্য):-এর মাধ্যমে দেখতেন এবং অশোভন দৃশ্যগুলো কেটে দিতেন। এত ছোটো স্ক্রিন অর্থাৎ আঙ্গুলের নখ বরাবর স্ক্রিনে ভিডিও দেখার দ্বারা না কোনো চিত্র স্পষ্ট বোঝা যেত আর না কোনো আকৃতি। এক কথায় নিজের ঈমান হেফাযতের জন্য যে ব্যক্তি উচ্চ মাত্রায় সতর্ক না হবে, এই বিভাগ থেকে তার দূরে থাকা উচিত।

** দ্বিতীয় যে গুণের কথা তিনি বলেছিলেন তা হল আনুগত্য। অর্থাৎ মিডিয়াতে যে ভাই কাজ করবেন, আমীরদের শতভাগ আনুগত্য তাকে নিশ্চিত করতে হবে। আত্মকেন্দ্রিক এবং একগুঁয়ে সাথি মিডিয়ার জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। যদি এ বিষয়টা লক্ষ্য রাখা না হয়, তখন দেখা যাবে, আমীর কোনো পলিসি ঘোষণা করতে চাইলেন আর মিডিয়ার সাথি অন্যদিকে চলতে শুরু করলেন। এভাবে ঝগড়াটে মেজাজের সাথিদেরকেও মিডিয়া থেকে তিনি দূরে রাখতে বলেছেন।

** তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গুণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন: মুসলিম উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং উম্মাহর অনুভূতি ধারণ করা। তিনি বলেছেন, যার অন্তরে উম্মাহর ব্যথার তুলনায় স্বজাতির, কোনো দল বা বিশেষ ঘরানার প্রতি ভালোবাসা অধিক হবে, তাকে মিডিয়া থেকে অনেক দূরে রাখা উচিত। ইসলামী আইন শাস্ত্রের মতভেদপূর্ণ বিষয় নিয়ে তর্কের পরিবেশ তৈরি করার মেজাজ যাদের রয়েছে, তাদেরকে কখনোই মিডিয়ায় প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। এমন লোকেরা যদি মিডিয়ায় চলে আসে, তাহলে মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক ঘৃণা ভাব ছড়িয়ে মুসলিম উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশাই শুধু বৃদ্ধি করবে।

[435]

** উলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনায় মিডিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করার মেজজ। ধর্মীয় বিষয়ে নিজ থেকে ইজতিহাদ বা গবেষণার মেজাজ পরিহার করা। উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং তাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কের মেজাজ থাকা। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের যেই ঘরানার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকুক না কেন, নিজ ঘরানার উলামায়ে কেরামের একান্ত অনুসরণ তার জন্য জরুরি। তিনি বলেন, যে সমস্ত লোকের মাঝে শরীয়ার বিষয়ে নিজে কিতাব খুলে গবেষণার ব্যাধি রয়েছে, তাকে কিছুতেই মিডিয়াতে কাজের সুযোগ না দেওয়া উচিত।

এই সাক্ষাৎকারে তিনি মিডিয়ার জিহাদী জামাতে কারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, তাদের গুণাবলি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। এছাড়া মিডিয়াতে নিজে থেকে কি কি কাজ করা যাবে, প্রকাশনা ও দাওয়াতের পন্থা কেমন হওয়া উচিত, এই রণাঙ্গনের করণীয়- বর্জনীয় কল্যাণ-অকল্যাণের দিকগুলো কি কি, সেই সম্পর্কে আল-কায়েদার আরব-অনারব নেতৃবৃন্দ সময়ে সময়ে মিডিয়া মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রকাশ করেন, যেগুলো খুব সহজেই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। দাওয়াতী ও মিডিয়া অঙ্গনে কর্মরত সকল মুজাহিদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক সেসকল নীতিমালা লক্ষ্য রেখে কাজ করা উচিত।

আল-কায়েদা উপমহাদেশ গঠনের পর দাওয়াত ও প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে দেওয়া হয়। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শেষ সময় পর্যন্ত পীড়াপীড়ি করে বলতে থাকেন, ইবরাহীম গৌরী ভাই রহিমাহুল্লাহ যেহেতু জামাতে আছেন, তাকেই এ দায়িত্ব দেয়া উচিত। তার জীবনের শেষ দিনগুলোতে এ সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল যে, তিনি কেন দায়িত্ব নেন না? ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বলেন: এই অঙ্গনে [436]

আমার চেয়ে অধিক দক্ষ ব্যক্তি যখন আছেন, দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত করা উচিত। তবে হ্যাঁ আমি নিজে দাওয়াতের যে কাজ করতে পারবো, সেগুলো অবশ্যই করবো; কিন্তু এই বিভাগের দায়িত্বশীল ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ হওয়া উচিত; আমি নই।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর আমীরুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহকে রীতিমতো জামাতের মিডিয়া বিভাগের দায়িত্বশীল এবং কেন্দ্রীয় শুরা পরিষদের সদস্য বানান। তিনি শাহাদাতের আগ পর্যন্ত নিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা
শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর
আরও একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হলো: সত্যকে তিনি আঁকড়ে ধরতেন এবং কারও বিরোধিতার পরোয়া না করেই সত্য বাণী তুলে ধরতেন। খুবই সোজাসাপ্টা কথা বলতেন। তার অন্তর যেমন পরিষ্কার ছিল ভাষাও তেমন প্রচ্ছন্ন ছিল। ভিতর বাহির একরকম হওয়াটা তার বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভালোবাসা সত্ত্বেও তার কোনো কথা সত্যের বিপরীত হলে এবং সে কথা মেনে নেয়ার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তিনি নির্দ্বিধায় তার বিরোধিতা করতেন এবং নিজের অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ হাজির করতেন। এক্ষেত্রে তিনি কার বিপক্ষে বলছে, দেখতেন না বরং কি বলছেন তা লক্ষ্য করতেন। ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহর এমন সাহসী ব্যক্তিত্ব জিহাদী পরামর্শ সভাগুলোর অনেক উপকারে এসেছিল। তিনি স্পষ্ট করে সকল দিক বিবেচনা করে পরামর্শ দিতেন, পরামর্শ প্রদানের সময় সবার অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হতেন না, আর না কারও চাপের মুখে [437]

অবস্থান পরিবর্তন করতেন। তার এমন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি পরামর্শ সভার প্রাণভোমরা ছিলেন। আবার অধিকাংশ সময় যে বিষয়ে দৃঢ়তা দেখাতেন, তা বৃথা যেত না। তিনি উপদেষ্টা ছিলেন। সঠিক পরামর্শ প্রদানের যোগ্যতা পুরো মাত্রায় তার মাঝে ছিল। এ বিষয়ে তার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্যের দিক হলো, যার সঙ্গে মত পার্থক্য, তিনি তার সামনেই কথা বলতেন। পেছনে পেছনে পরনিন্দা থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকতেন এবং অন্যদেরকেও পরনিন্দা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। আরও একটি গুণ হলো: তিনি নিজের মতামত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরতেন; কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত হত এবং তার মতামতের উপেক্ষিত হত, তখন তিনি নিজের মতামতের পরোয়া করতেন ন; পরিষদের সিদ্ধান্ত অম্লান বদনে মেনে নিতেন। মোটকথা, যদি বলা হয়, পরামর্শ সভা ও উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাহলে ভুল হবে না। পরামর্শ প্রদানের উক্ত পন্থা যদি কোনো উপদেষ্টা মেনে চলেন, তাহলে সমাজ সংশোধন সম্ভব। তার কর্মপন্থার সারকথা ছিল:

** সত্য বাণীর নির্ভীক সাহসী উচ্চারণ

** সরাসরি কথা বলা; অগোচরে সমালোচনা না করা

** সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে এবং তা নিজের মতামতের বিপরীত হলেও অম্লান বদনে মেনে নেয়া

এই গুণাবলি আলোচনার পর আশা করি এ কথা পুনরায় বলার প্রয়োজন নেই যে, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং তার জিহাদী সফর এই গুণাবলির দ্বারা কতটা উপকৃত হয়েছিল।

[438]

একজন সফল নেতা ও সংস্কারক
শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ একজন সফল আমীর ও নেতা ছিলেন। তিনি মিডিয়া বিভাগে আসার পরপরই এই বিভাগের অন্যান্য সাথির নেতৃত্বভার তার ওপর ন্যস্ত হয়। অন্যান্য বিভাগের বিপরীতে মিডিয়া বিভাগ খুবই জটিল। এখানে বিভিন্ন প্রকারের সৃজনশীল কাজ সম্পাদন করতে হয়। সর্বদা কর্মীদের জ্ঞান ও জানাশোনার পরিধি বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয়। পূর্ণ একাগ্রতার পাশাপাশি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়। তাই এই বিভাগের জন্য বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন সাথি নির্বাচন করা হয়। ইবরাহীম গৌরী শহীদ রহিমাহুল্লাহ এই বিভাগেরই প্রাণ ছিলেন না; এ বিভাগের সাথিদেরও তিনি প্রাণ ছিলেন। এই বিভাগের সকল সাথি বয়সে তার ছোটো এবং অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে ছিল। তিনি তাদের শিক্ষক ছিলেন, আমীরও ছিলেন, কিন্তু কর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব এতটা গভীর ছিল, যেন তারা একই পরিবারের সদস্য। সুখে-দুঃখে সাথিদের পাশে থাকতেন, তাদের সঙ্গে হাসতেন, খেলতেন, তাদের চিন্তা গত ভিত্তি মজবুত করতেন, পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিতেন, তাদের মানসিক উন্নয়নের জন্য বোঝাতেন, সর্বোপরি তাদের আমল আখলাক সংশোধন করতেন। সাথিরা তাকে খুবই আপন ভাবতো এবং তার সান্নিধ্যে তাদের আমল-আখলাকের সংশোধন হত। এই গুণের দিক থেকে তিনি সমসাময়িকদের মাঝে অনন্য ছিলেন।

তার চেয়ে ছোটো সাথিদের সঙ্গে তার নৈকট্যপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে তারই এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী আমাকে লিখেছেন:

« তিনি আমাকে বুঝতেন এবং আমিও তাকে বুঝতাম। তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যেতো। তার প্রতি বিশ্বাস

[439]

ছিল, তিনি আমার কথা বুঝবেন, আমার কথা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবেন না; আমার ভুল ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো এড়িয়ে যাবেন। জিহাদী বিষয় হোক কিংবা ব্যক্তিগত—তিনি দূরদর্শী পরামর্শ দিতেন, পাশাপাশি সমবেদনা জানাতেন। »

অপর এক ভাই শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

« সর্বদা আমার ঈমানের ব্যাপারে ফিকির এবং নসীহত করতেন। শেষবারের সাক্ষাতেও তিনি মনোযোগ সহকারে আমাকে নসীহত দিয়ে বিদায়ের সময় বলেছেন: "ভাই আপনার নামায আগের মতো নেই 'আল্লাহু আকবার! আমজাদ ভাই [শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর জিহাদী নাম] আমার ঈমান ও দীনদারীর ব্যাপারে এতটাই সচেতন ছিলেন! »

ইঞ্জিনিয়ার ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ আগাগোড়া প্রেমময় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার গুণাবলির দ্বারা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ অনেক উপকৃত হয়েছেন। যেখানেই কোনো সাথি পেরেশান হতেন বা অন্যকে পেরেশান করতেন, সেখানেই ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহকে জটিলতা সমাধানের জন্য নিযুক্ত করা হতো। যারা নিজেদের বিশেষ মেজাজ অভ্যাস অথবা কোনো পেরেশানির কারণে সমস্যার মুখোমুখি হতেন, ইবরাহীম শহীদ রহিমাহুল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় জিহাদী কাজেই শুধু ব্যবহার করতেন না; তাদের সংশোধন ও সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতেন। এই জটিল কাজের জন্য সহনশীলতা খুব প্রয়োজন। কোনো সংশোধনকারী যদি সহনশীলতার নেয়ামত পেয়ে যান, তার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। সংশোধনের কাজে তিনি কখনও হতাশ হতেন না। আমি কখনও কোনো সাথির ব্যাপারে তাকে বলতে শুনিনি: ‘সে খারাপ; তার মধ্যে খারাবি রয়েছে, তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত'। বরং কারও মাঝে খারাবি দেখা গেলে তিনি তাকে কাছে টেনে

[440]

ভালোবাসা দিতেন। এ বিষয়ে তার দৃষ্টি খুবই উচ্চ ছিল। কোনো সাথির সংশোধনের ব্যাপারে হতাশ হতেন না। কেউ তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করলে তিনি ভালো ব্যবহার করতেন। গালির জবাবে পুষ্প বর্ষণ করতেন এবং স্নেহ দিতেন। কোনো মুসলিমের ব্যাপারে তার অন্তরে সামান্য পরিমাণও বিদ্বেষ বা ঘৃণা ভাব ছিল বলে দেখা যায়নি। গর্ত বন্ধ করা এবং ভেঙে যাওয়া বস্তু জোড়া লাগানো তার স্বভাব ছিল। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

নেকি ও প্রতিদানের দিক থেকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ দীন ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। জটিলতা ও কষ্ট পরিশ্রমের দিক থেকে দীন ইসলামের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় এটি। অপরদিকে সৎকর্মে উন্নতির কারণে শয়তান শত্রুতা করে ওই কাজ নষ্ট করার চেষ্টা করবে সেটাও বোধগম্য বিষয়। এত দীর্ঘ প্রাণান্তকর কাজকে শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচানোর জন্য, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য, আল্লাহর মহব্বত এবং দীন ইসলামের তরে শাহাদাতের আগ্রহ সদা জাগ্রত রাখার জন্য, নিজের চরিত্র পরোপকার ও আত্মদানের অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত করার জন্য সর্বদা জিহাদের ময়দানে এমন সংশোধনকারীদের প্রয়োজন হয়ে থাকে, যারা প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে ভালোবাসা স্নেহ দিয়ে সাথিদেরকে সংশোধন করে দেন। শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ তার সংশোধন মূলক মেজাজ দিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অনেক খেদমত করেছেন এবং প্রতিটি কঠিন সময়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়েছেন। পারিবারিক অভ্যস্ততার পর তার মেজাজ তৈরিতে শহীদ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্য ও সাহচর্যের স্পষ্ট প্রভাব ছিল।

সাথিদের অবস্থা সংশোধন বিষয়ে শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর একটি অনন্য সুন্দর গুণ ছিল — "সাথিদের প্রতি আস্থা রেখে তাদেরকে কাজ [441]

শেখানো।' সাধারণত দেখা যায়, নেতারা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নিজেরা করতে অভ্যস্ত থাকেন। অনেক সময় অধিক নেকির আমলগুলো নিজে করে নেকি অর্জন করার আগ্রহ নিহিত থাকে, আবার কখনও কখনও ছোটো সাথিদের ওপর আস্থার অভাব ক্রিয়াশীল থাকে। শহীদ ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ এমন কর্ম পন্থার খুবই বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন: এভাবে নতুন সাথিরা কাজের জন্য প্রস্তুত হবে না এবং নতুন নেতৃত্ব তৈরি হবে না। তাই আমীরের উচিত, নিজের সাথিদের মাঝে অধিকাংশ কাজ বন্টন করে দেয়া এবং নিজে কাজ করার পরিবর্তে সাথিদেরকে দিয়ে কাজ করানো; নিজে শুধু কাজের তত্ত্বাবধান করা। তার এমন গুণের কারণে তার অধীনে থাকা সাথিরা খুব দ্রুতই উৎকৃষ্ট মানের কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। তাই যখন তিনি শাহাদাত বরণ করেন, তখন একদল দক্ষ সাথি রেখে যান, যাদের মাঝে প্রত্যেকেই আলহামদুলিল্লাহ স্বতন্ত্র একটি বিভাগ পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন। নিজে চলে যাওয়ার পরের অবস্থা চিন্তা করা সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এমন গুণ, অনেক হযরত যা সম্পর্কে সচেতন নয়।

ভালোবাসা যার অন্তরে বাসা বেঁধে নয়
উচ্চ নৈতিকতা ও হাসিমুখে কথা বলা শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর এমন গুণ ছিল, যার কারণে তিনি সবার মাঝে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এক সাথি আমাকে বললেন, মুসাফাহা এবং প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের সময়ই ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহর প্রতি ভালোবাসা জন্মে যায়। একবার মিরান শাহ-এর জামে মসজিদের উঠানে বসে আমার ভাই শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। আলাপচারিতার মধ্যেই এক সাথি এসে আমাদের মাঝে বসে গেলেন। এই সাথি ইবরাহীম ভাই

[442]

রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে জানতেন না। কিছুক্ষণ পর ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহ চলে গেলেন। তখন ওই ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন , "এতক্ষণ আপনার সঙ্গে যিনি বসা ছিলেন তার সম্পর্কে আপনি জানেন ?' আমি বললাম: "ইনি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অন্যতম একজন জিম্মাদার সাথি ' তখন ওই সাথি বললেন : "আমি এক বর্ণনায় পড়েছি , দামেস্কের জামে মসজিদে প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত আবু মুসলিম খাউলানি রহিমাহুল্লাহ গমন করেন। তখন মসজিদে এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখেন। দেখামাত্রই ওই ব্যক্তির ভালোবাসা তার অন্তরে স্থান করে নেয়। নামায শেষ হওয়ার পর আবু মুসলিম খাউলানি রহিমাহুল্লাহ তার কাছে গিয়ে বলেন : اني لأحبك في الله - অর্থ : আপনাকে আমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসি » যার প্রতি আবু মুসলিম খাউলানি রহিমাহুল্লাহ ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন, তিনি ছিলেন মাহবুবে রাসূলে খোদা সাইয়েদুনা মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু। সাইয়েদুনা মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু মুসলিম রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে কোলাকুলি করে বললেন : "যদি তুমি সত্য বলে থাকো তাহলে তোমার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ রয়েছে , তিনি ইরশাদ করেছেন:

الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ "

অর্থ : “আল্লাহর জন্য যারা একে অপরকে ভালোবাসে তারা কিয়ামতের দিন নূরের মেম্বারের ওপর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যেদিন ওই ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। ” [মুসনাদে আহমদ]

এই হাদীসের আলোচনা করে উপর্যুক্ত সাথি ভাই বলেন : "এই সাথিকে দেখে (ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহ) হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা আমার

মনে পড়ে গেছে। তাকে দেখে এবং কয়েক মিনিট তার সঙ্গে বসেই তার ভালোবাসা আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে।”

পারিবারিক পরীক্ষা এবং ধৈর্যধারণ
জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে আসার পর থেকে শাহাদাতের আগ পর্যন্ত এক বড় পরীক্ষা তার ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। তিনি জীবনের এই দশটা বছর খুবই কষ্টের মাঝে কাটিয়েছেন। এমন দুঃখ-কষ্ট, যা কলম দিয়ে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি এমন অবিচলতা ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তা দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়। আমরা আরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই, যখন দেখি, তার এই পরীক্ষা ওই সময়টাতেও ছিল, যখন তিনি একাগ্রতা মনোযোগ সহকারে দাওয়াত ও মিডিয়ার মৌলিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাহ্যিকভাবে হাসি-খুশি থাকতেন, কিন্তু তার অন্তর বেদনাহত। অন্যদের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করতেন। লোকদেরকে খুশি করতেন কিন্তু তার নিজের অন্তর ক্ষতবিক্ষত। এই পরীক্ষা সত্ত্বেও জিহাদী দায়িত্ব পালনে, চেহারার মুচকি হাসিতে এবং ভাইদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসায় কোনো ত্রুটি করতেন না। তিনি এই পরীক্ষায় যেরূপ ধৈর্য ধারণ করেছেন, সেটাকে ‘সবরে জামিল' বলাই সাজে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, এই পরীক্ষার প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ যেন জান্নাতুল ফেরদাউসে তাকে সীমাহীন আনন্দ দান করেন, আমীন।

ঘটনা হলো, তিনি এক খালাতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন এবং তাদের মাঝে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকা এবং জোরপূর্বক সম্পর্কচ্ছেদ সত্ত্বেও তিনি নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে এমনভাবে কথা বলতেন, তা থেকেই অনুমিত হত তাদের ভালোবাসা। পূর্বে উল্লেখ [444]

করা হয়েছে যে, শহীদ ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ শিক্ষা সমাপনের পর নিজের জীবন আল্লাহর দীনের জন্য ওয়াকফ করার ইচ্ছা করেন। তিনি নিজের মূল্যবান সময় আল্লাহর দীনের দাওয়াতে ব্যয় করতেন এবং দুনিয়া বিমুখতা ও অল্প তুষ্টির জীবন যাপন করতেন। তার এই কর্মপন্থা তার শ্বশুরালয়ের সদস্যগণ ভালোভাবে নেননি। তারা তাকে দুনিয়াবি স্ট্যাটাস বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হতে বলেন। তার কিছুদিন পর যখন তিনি শহীদ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে হিজরতের ইচ্ছা করেন, তখনও তার বিবাহের মাত্র কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল। তিনি পুরোপুরি অনুভব করেছিলেন, মুসলিম উম্মাহর উপর কাফেররা চারদিক থেকে হামলা করছে এবং এই অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি নিজের গোটা জীবন জিহাদের জন্য উৎসর্গ করা এবং ‘হালকা হোক ভারী হোক' যেকোনো অবস্থায় জিহাদের বের হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখলেন না। তার ইচ্ছা ছিল, হিজরতের পথে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং তিনি ব্যবস্থাও করে নিয়েছিলেন; অপরদিকে তার শ্বশুরালায় আশঙ্কার কথা চিন্তা করে নিজেদের কন্যাকে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, বছরের পর বছর স্বামী স্ত্রীকে দেখা সাক্ষাৎ করতে বাধা দেয়া হয় এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও বন্ধ করে দেয়া হয়। ওই সময়ে কিছু ব্যক্তির পক্ষ থেকে হুমকি মূলক ভাষাও ব্যবহার করা হয় এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় তাকে চাপ দেয়া হয় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য। তিনি ধৈর্য সহকারে সবকিছু সহ্য করেন, যা সত্যি আশ্চর্যের বিষয়। কখনও তিনি কোনো অভিযোগ মুখে আনেননি। এমনকি শ্বশুরবাড়ির লোকদের ব্যাপারেও কখনও কঠোর চিন্তা বা প্রতিশোধ মূলক মনোভাব ব্যক্ত করেননি। নিজের স্ত্রীকে তিনি

[445]

অপারগতার কথা বলতেন এবং ক্ষমা চাইতেন। এমনকি শাহাদাতের বছর যখন তার শ্বশুরালয়ের লোকেরা তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে , অবস্থা সঙ্গিন দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নেন , যদি তার স্ত্রী শ্বশুর বাড়ির প্রভাবের বাইরে দীনদার , খোদা ভীরু কোনো মহিলার ঘরে গিয়ে স্থির মনে সন্তুষ্টচিত্তে তালাক চান ; অতঃপর ওই মহিলা যদি তার স্বামীর মাধ্যমে এই সংবাদ পৌঁছে দেন , তাহলে তিনি তালাক দিতে পারেন। কিন্তু এরপর তিনি একথাও লিখেছেন যে , হয়তো আল্লাহ তাআলা ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা করে দিবেন এবং আমাকে এই অপছন্দনীয় কাজ করতে হবে না। সম্ভবত তিনি ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছিলেন , তার শাহাদাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। চিঠি লেখার অল্প কিছুদিন পর চিঠি স্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছার আগেই তিনি আল্লাহর রাহে কুরবান হয়ে প্রকৃত স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন , আমীন।

এ ঘটনা থেকে একদিকে যেমন তার দীনি দায়িত্ববোধ , মিশনের ব্যাপারে নিষ্ঠা , প্রত্যয় ও অবিচলতার কথা জানা যায় , অপরদিকে আমরা দেখতে পাই : বিপদের মুখে তিনি কি রূপ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তার ধৈর্যের মাঝে না ছিল কোনো অভিযোগ , না ছিল দুঃখময় অভিব্যক্তি , না ছিল হতাশা , না ছিল ক্লান্তি কিংবা উন্নত চরিত্রের কোনো ঘাটতি। অবিকল সাইয়েদুনা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ধৈর্যধারণ। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে এসেছে :

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

অর্থ : “আমি আল্লাহর সামনে আমার অস্থিরতা ও পেরেশানি পেশ করছি। ” [সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৬]

আল্লাহ তাআলা এই উচ্চমাত্রার সবর ও ধৈর্যের মহা প্রতিদান তাকে দান করুন , জান্নাতুল ফেরদাউসে এমন

আনন্দ নসীব করুন যার পর না থাকবে কোনো পেরেশানি , না থাকবে কোন দুঃখ , আমীন।

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের মতো ধৈর্য

প্রিয় মানুষদের বিচ্ছেদে যেভাবে তিনি উত্তম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আদর্শ জাগ্রত করেছেন , একইভাবে অসুস্থ অবস্থায় কষ্টের মুখোমুখি হয়ে ধৈর্য ধারণের গুণ তার জীবনীতে সাইয়েদুনা আইয়ুব আলাইহিস সালামের সীরাতের ঝলক এনে দেয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে আইয়ুব আলাইহিস সালামের আলোচনা করেছেন:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

অর্থ : “এবং আইয়ুবকে দেখুন যখন তিনি তার রবকে ডেকে বললেন: “আমার কষ্ট হচ্ছে আর আপনি সকল অনুগ্রহকারীর মাঝে শ্রেষ্ঠ দয়াময়। ”

২০০২ সালে মানসেহরা জেলায় কাশ্মীরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় যখন তিনি উপর থেকে পড়ে যান , তখন কোমরে চোট পান এবং কোমরের জয়েন্ট নড়ে যায়। অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন কিন্তু আশানুরূপ ফল পাননি। তিনি পরবর্তী ১৪ বছর কোমরের ব্যথায় ভোগেন। ওই সময়ে মিডিয়া বিভাগকে আরও গতিশীল করার জন্য রাত দিন কম্পিউটারে বসে কাজ করতে হতো। এ কারণে ব্যথা বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এইসব কষ্ট জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর পথে বাধা হতে পারেনি। নিয়মিত পেইন কিলার ওষুধ খেতেন। কোমরে বেল্ট বাঁধতেন। এই কষ্টের অবস্থায় আল্লাহর বাণী উচ্চকিত করার কাজ করে যেতেন। সেই একই কোমর ব্যথা নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন , ভারী অস্ত্র বহন

করতেন এবং পাথুরে পাহাড়ে আরোহণ করতেন, কিন্তু কখনও পেছনে থেকে যেতে চাইতেন না। শাহাদাতের আগের বছরগুলোতে তিনি সর্বক্ষণ জ্বরাক্রান্ত থাকতেন। সম্ভবত বড় বড় সফরের কারণে টাইফয়েড জ্বর আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু ঘরে থাকুন কিংবা সফরে— কখনোই অসুস্থতার কারণে আলাদা সেবা- যত্নের আশা করেছেন এমনটা পাওয়া যায় না। এই সকল কষ্টে ধৈর্য ধারণ, কৃতজ্ঞতা আদায়, উচ্চ মনোবল ধরে রাখা, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা— সবকিছুই শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহর স্বভাব ছিল।

প্রতি মুহূর্তে যার ছিল শাহাদাতের ধ্যান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবার আগ্রহ এবং জান্নাতের নেয়ামত সমূহ লাভের আকাঙ্ক্ষা শহীদ ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহর ওপর সর্বদাই ছায়া বিস্তার করে রাখতো। রণাঙ্গনে অবস্থান করে শাহাদাত লাভের ঈর্ষণীয় ব্যাকুলতা ছিল তার মাঝে। স্বভাবতই তিনি সাহসী ছিলেন। মৃত্যু মুখে লড়াই করা তার বিশেষ স্বভাব ছিল। তিনি খুবই শক্ত স্নায়ুর অধিকারী এবং উচ্চ মনোবল সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অর্ধ রজনীতে শাহাদাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা তার অভ্যাস ছিল। মিডিয়া ও প্রকাশনা ব্যস্ততার পাশাপাশি রণাঙ্গনে সময় কাটানোর জন্য তিনি অস্থির থাকতেন। যেখানেই সুযোগ হতো, কিতাল ফি সাবীলিল্লাহর আগ্রহে রণাঙ্গনে চলে যেতেন। আফগানিস্তানের পাকতিকা জেলার বারমাল এলাকায় আমেরিকান সেনাবাহিনী এবং মার্কিন জোটের বিরুদ্ধে বেশ কিছু লড়াইয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। একইভাবে কাবায়েলী (গোত্রীয়) অঞ্চলেও যখন আল্লাহর দীনের

[448]

শত্রু সেনাবাহিনী গোত্রের মুসলিমদের ওপর এবং বিদেশি মেহমানদের ওপর হামলা করে তাদেরকে কোনঠাসা করতে চেষ্টা করতো, তখন শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ মেহসুদ পাহাড়ের গুহা এবং ভানার ফ্রন্টগুলোতে মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় বুক টান করে দাঁড়িয়ে যেতেন। শুধু নিজেই নন; তার মিডিয়া বিভাগের ভাইদেরকেও সময় সময়ে লড়াইয়ের ময়দানে পাঠাতে আগ্রহী ছিলেন। তার রায় ছিল, ঈমানের উত্তাপ ধরে রাখা এবং লড়াইয়ের ময়দানে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে মিডিয়া বিভাগের ভাইদের উচিত রণাঙ্গন থেকে দীর্ঘ সময় দূরে না থাকা। অতঃপর শাহাদাত লাভের কয়েক মাস আগে যখন তিনি দক্ষিণ আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন, তখন পথিমধ্যে কান্দাহারে কিছুদিন কারও অপেক্ষায় অবস্থান করতে হয়েছিল। তিনি অবসর কাজে লাগিয়ে কান্দাহারের মুজাহিদীনের সঙ্গে মার্কিন জোটের বিরুদ্ধে অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। শহীদ আমীর মুহতারাম মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ এ কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

« এই ঈদে আল-কায়েদা উপমহাদেশের শুরা সদস্য এবং আস-সাহাব মিডিয়ার দায়িত্বশীল, মিডিয়া জগতের অখ্যাত সিপাহসালার, উসামা ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ ওরফে আমজাদ ভাই (ইসলামাবাদ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে জাবুল প্রদেশে মার্কিন অভিযানে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের শাহাদাত কবুল করুন এবং উম্মাহর মা-দের গর্ভকে বন্ধ্যা না করুন, যেন তারা উসামা ইবরাহীমের মতো সন্তান জন্ম দিতে পারেন। উর্দু আস-সাহাব অতঃপর আস-সাহাব উপমহাদেশের প্রাণপুরুষ, অপার মেধার অধিকারী, সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। তিনি কিছুদিন আগে কান্দাহারে শরীয়তের

[449]

শত্রুদের মোর্চায় দুঃসাহসী আক্রমণ করেন এবং শত্রুদের দাঁত ভেঙে দেন।

70

একবার ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে এক সাথি ফিদায়ী হামলার অনুমতি নিতে গেলেন। ওই ভাই জিদ করছিলেন কিন্তু আমীরগণ অন্যান্য জিহাদী দায়িত্বের কারণে তাকে ফিদায়ী হামলার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। তখন আমি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে বললাম: যখন কেউ শাহাদাতের আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং জান্নাতে যেতে অস্থির থাকে, তখন কেন তার জন্য সহজ রাস্তার ব্যবস্থা করেন না? এরপর আমি বললাম: "সাধারণত দেখা যায় শাহাদাত পিপাসু এমন ব্যক্তিরা কিছুদিনের মধ্যেই শহীদ হন। তখন মানুষ আক্ষেপ করে বলে, যদি তিনি ফিদায়ী হামলা করতেন তাহলেই তো ভালো হতো!' আমার কথার জবাবে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মুচকি হেসে বললেন: "ঠিক আছে কিন্তু প্রতি বার এমনটা হওয়া জরুরি নয়। আপনি সম্ভবত জানেন না, আমাদের ইবরাহীম ভাই জিহাদে এসেছেন, তখন থেকে ফিদায়ী হামলার গোঁ ধরে আমার পেছনে লেগে আছেন। এখন আপনিই বলুন, যদি আমি ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহকে ফিদায়ী হামলার জন্য পাঠাতাম, তাহলে এত বড় দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রম কি করে সম্ভব হতো? সুশৃঙ্খলভাবে জিহাদের দাওয়াত প্রচারের প্ল্যাটফর্ম ‘আস-সাহাব উর্দু' কি এভাবে অস্তিত্বে আসতো?”

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একই সঙ্গে শহীদ হবার দোয়া করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জিহাদ ও উম্মাহর একজন দায়িত্বশীল হয়ে উঠলেন, তখন শহীদ ইবরাহীম

70 মাওলানা আসিম উমরের বিবৃতি "জেনে নাও আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে" থেকে সংগৃহীত

[450]

রহিমাহুল্লাহ নিজের জন্য শাহাদাতের এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জন্য হেফাযতের দোয়া করতেন।

শহীদী মর্যাদা লাভের সময় ঘনিয়ে...
অবশেষে দীন ইসলামের এই মহান সিপাহি, সুহৃদ, স্নেহশীল, অন্তরের ক্ষত নিরাময়কারী, সত্য অনুসন্ধানীদের জন্য পথের দিশারী, কঠোরতায় ধৈর্য ও অবিচলতার মূর্ত প্রতীক, অসাধারণ দূরদর্শিতার অধিকারী, নেতা ও ব্যবস্থাপক, উম্মাহর প্রকৃত ব্যথা বুকে ধারণকারী, দাঈ ইলাল্লাহ, চতুর্মুখী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং মিডিয়া অঙ্গনের দৃষ্টান্তহীন অভিযাত্রী উসামা ইবরাহীম গৌরী আফগানিস্তানের কোহিস্তানে শাহাদাত বরণ করেন। এমনিতেও আফগানিস্তানের ভূখণ্ড তার অনেক প্রিয় ছিল। পিতৃ পুরুষের ভূখণ্ড হওয়ার কারণে স্বভাবজাত ভালোবাসা তো বটেই; কিন্তু আফগানদের ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, গর্বিত তালেবানের পবিত্র শরীয়তের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান তার খুবই প্রিয় ছিল। আফগানিস্তামের ভূখণ্ডেই আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শহীদ হবার পূর্বাকাঙ্ক্ষা ছিল তার। আল্লাহ তাআলা তার এই ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন।

রমযানুল মুবারক মাসে আল-কায়েদা উপমহাদেশের শুরার মজলিসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মজলিস চলাকালে এবং পরেও তার ব্যক্তিত্বের ওপর এমন প্রভাব ছায়া ফেলেছিল যে, তিনি নিজের কাজ সম্পন্ন করেছেন; এখন অন্যরা দায়িত্ব সামলাবেন। মজলিসের পর মিডিয়া বিভাগের কাজ সম্পর্কে আমি দিকনির্দেশনা চাই, তখন তিনি বলেন: "তুমি এই কাজ করতে পারবে। আল্লাহর কাছে চাও। ভরসা রাখ এবং তাওয়াক্কুল সহকারে এগিয়ে যাও'। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন, আলহামদুলিল্লাহ, এত সাথি রয়েছেন যারা কাজ এগিয়ে নেবেন। এ কারণে [451]

তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো উচিত। তার কণ্ঠস্বরে যেন নিম্নোক্ত ছন্দটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল :

ہم عہد اپنا نبھا چکے ہیں تم عہد اپنا بھلا نہ دینا

অর্থ : আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি , তোমরা তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে গাফিল থেকো না।

তার নৈতিক উৎকর্ষ ও প্রেমপূর্ণ চরিত্র আফগানী সহচর ও সাহায্যকারীদেরকে অনেক প্রভাবিত করেছিল। আনসার ভাইদের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে , তিনি সফর থেকে ফিরলে এলাকার যুবক বৃদ্ধ সকলেই সাক্ষাৎ ও কুশল জিজ্ঞাসার জন্য দলে দলে তার কাছে আসতো। তিনি পশতু ভাষায় সাবলীল ভাবে কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু একবার তালেবানের একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্বশীল মোল্লা আমীর খান হক্কানী হাফিযাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তখন ইবরাহীম ভাই রহিমাহুল্লাহ অনুবাদকের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় করেন , তার কাছে দোয়া চান এবং তার মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদা হাফিযাহুল্লাহর কাছে আল-কায়েদা উপমহাদেশের লাজনায়ে শারঈয়া কর্তৃক প্রকাশিত একখানা গ্রন্থ মন্তব্য লিখে দেবার জন্য দিয়ে পাঠান। ওই সাক্ষাতের পর সাদা দাড়ি বেষ্টিত হক্কানী সাহেব হাফিযাহুল্লাহ তার সাথিদেরকে বলেন : এই যুবকের আখলাক আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছে।

যাই হোক , ২০১৬ সালের ঈদুল আযহা ১৪৩৭ হিজরীর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার খাবারের জন্য তিনি তার এলাকাবাসীকে দাওয়াত করেন। মধ্যরাতে তার ঘরে অত্যাচারী আমেরিকান এবং তাবেদার আফগান সেনাদের কমান্ডো বাহিনী আকাশপথে অভিযান চালায়। বোমাবর্ষণের ফলে তিনি নিজের এক সাথিসহ মানজিলে মাকসুদে পৌঁছে যান। আল্লাহ তাআলা ইসলামের এই মহান সন্তানকে তার সন্তুষ্টি দান করুন,

জান্নাতুল ফেরদৌসে আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা, সালেহীনের সঙ্গে তাকে মিলিত করুন এবং জিহাদের যেই পতাকা তিনি উত্তোলন করেছেন, সদা সর্বদা তা প্রতিষ্ঠিত রাখুন, আমীন।

নবম অধ্যায়: বৈশ্বিক জিহাদী
আন্দোলন এবং তৎ সংযুক্তি

শহীদ উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার (ফরয) দায়িত্ব পালনের জন্য জামাত আল-কায়েদার সঙ্গে মিলিত হন। তিনি জামাতের পথপ্রদর্শক, দাঈ, দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়া বিভাগের দায়িত্বশীল হওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শুরা পরিষদের সদস্য ছিলেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আল-কায়েদাকে তার জানাশোনার ভেতরে ওই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সত্যের সর্বাধিক নিকটবর্তী জামাত বলে মনে করতেন। জামাত হিসেবে বিবেচনা করার আগে তিনি আল-কায়েদাকে একটি দাওয়াত ও দৃষ্টিভঙ্গির নাম মনে করতেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে রাজি ছিলেন। উস্তাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের বর্ণনা ওই সময় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল-কায়েদার ইতিহাস, দাওয়াত, চিন্তাভঙ্গি এবং শীর্ষস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠাতাদের পরিচয় উল্লেখ না করবো। এই উদ্দেশ্যেই অধ্যায়টি এই কিতাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে ফারুক রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের সম্পর্কের ধরন এবং জামাতের শীর্ষস্থানীয়

[453]

উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে তার উপকৃত হওয়ার ঘটনাবলীও বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমামুল জিহাদ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহ
জিহাদের পথে অধ্যাপক ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আগমনের ঘটনায় আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, হাফেজ তৈয়ব নেওয়াজ শহীদ রহিমাহুল্লাহ রায় দিয়েছিলেন, জিহাদের কর্মপন্থা বোঝার জন্য ফারুক ভাইকে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া উপযুক্ত হবে। তাই নিয়ম মাফিক ফারুক ভাই শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করেন, তার দিকনির্দেশনায় শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর কিতাব সমূহ অধ্যয়ন এবং চিন্তা উপলব্ধি করতে মনোনিবেশ করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা গঠনে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর কিতাবসমূহ অধ্যয়নের বিরাট প্রভাব ছিল। তিনি আযযাম রহিমাহুল্লাহকে উসমানী খেলাফত পতনের পর উত্থিত জিহাদী আন্দোলন সমূহের ইমাম ও অভিভাবক মনে করতেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এযুগের শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কেরামের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থেকে শরীয়াহ শাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। অতঃপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ইসলামী বিশ্বের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে

[454]

ভর্তি হন। ইলম অর্জনের পর তদনুযায়ী আমলের নিয়তে দীনের দাঈ এমনকি জিহাদের দাঈ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মীয় ঘরানা ও আন্দোলন সম্পর্কে অবগতি, বিভিন্ন আন্দোলনে কার্যত অংশগ্রহণ এবং আরও অগ্রসর হয়ে আল্লাহর দীনের গভীর ইলম ও ঐশী প্রজ্ঞা অর্জনের কারণে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর রচনাবলী, বক্তৃতামালা- ইলম ও প্রজ্ঞার উৎসমুখ বলে বিবেচিত হয়। তিনি আলেমও ছিলেন, ফকীহও ছিলেন, স্নেহশীল বুযুর্গও ছিলেন। তিনি মুসলিমদের সমাজে বসবাস করতেন এবং তাদের প্রত্যেকটি গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে জানতেন। মুসলিম উম্মাহর মায়া ও বেদনা তিনি বুকে ধারণ করতেন।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহ ১৯৪১ সালে আম্বিয়ায়ে কেরামের ভূখণ্ড ফিলিস্তিনের পশ্চিম প্রান্তের জেনিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ফিলিস্তিনে প্রাইমারি শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ১৯৬৬ সালে তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘শারঈয়্যাহ' শাস্ত্রের সার্টিফিকেট অর্জন করেন। ১৯৬৭ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধের পর ইসরাইলের নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি পরিবারের মতো তার পরিবারও জর্ডানে হিজরত করেন। অতঃপর তিনি মিশরে গমন করেন এবং সেখানে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘শারঈয়্যাহ' বিষয়ের উপর উচ্চতর ও বিশেষজ্ঞ ডিগ্রী অর্জন করেন। মিশর থেকে ফিরে এসে তিনি ওমানের জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অধ্যাপনাকালে তিনি পুনরায় মিশরে গমন করেন এবং আল-আযহার থেকে ১৯৭৩ সালে উসুলুল ফিকহের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সৌদি আরবের আব্দুল আজীজ

[455]

বিশ্ববিদ্যালয় জেদ্দা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদে অধ্যাপনা করেন।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ এবং তার সহচরদের সঙ্গে সম্পর্ক

মিশরে তার যাতায়াতের সূচনাকালে মুসলিম ব্রাদারহুডের দাওয়াত সেখানে তুঙ্গে ছিল। সে সময় ব্রাদারহুডের চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রকার জাহেলিয়াত ও কুফরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ কোনো প্রকারের জাহেলিয়াত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কুরআনে বর্ণিত وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ অর্থ : "এবং পরিপূর্ণ দীন ও শাসন ব্যবস্থা আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। " লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আগ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবার আহ্বায়ক ছিলেন। সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ কাফেরদের চাপিয়ে দেয়া এই শাসন ব্যবস্থাকে জাহেলিয়াতের শাসন ব্যবস্থা বলতেন, যা কুরআন হাদীসের বিরোধিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি এই শাসন ব্যবস্থাকে অস্বীকার এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ধর্মীয় মৌলিক ফরয বলতেন। সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর সীমাহীন ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি তাকে দাওয়াত ও আজিমতের ইমাম মনে করতেন। অবশেষে মিশরের তাগুত সরকার আমেরিকা ও রাশিয়ার চাপে কঠোর অবস্থানে যায় এবং সাইয়েদ সাহেব রহিমাহুল্লাহ এবং তার সহচরদেরকে ফাঁসি দেয়। মিশরের দীনদার ঘরানার বড় অংশে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। নির্যাতন এত তীব্র ছিল যে , নারী শিশু বৃদ্ধ কেউই তা থেকে রক্ষা পায়নি। এমন অবস্থায় সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এবং তার সহচরবৃন্দ যেই অবিচলতা ও প্রত্যয় সহকারে ইসলামের পতাকা

উত্তোলন করেছিলেন, একেক জন কালিমায়ে তাইয়্যেবার প্রতিরক্ষা সংগ্রামে শির উন্নত করে ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েছিলেন, তাদের সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর অন্তরে জায়গা করে নিলো। এগুলো তার জন্য সত্য পথের মশাল হলো। এক কথায় শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ মিশরের ইতিহাসের এই অধ্যায় খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তিনি নিজে সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ এবং তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন। সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর ঘটনা তাদের কাছ থেকে সরাসরি শুনেছেন। এমনই এক সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন:

« আমাকে হামিদা কুতুব [সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর স্ত্রী যিনি স্বামীর সঙ্গে মিশরের কারাগারে গ্রেফতার ছিলেন] বলেছেন: সেদিন ১৯৬৬ সালে ২৮ তারিখ ছিল [পরের দিন অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ২৯ তারিখে সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহকে ফাঁসি দেওয়া হয়] আমাকে ফৌজদারি কারাগারের সুপারেনডেন্টের কাছে নেয়া হয়। তিনি আমাকে সাইয়েদ কুতুব, হাউওয়াশ এবং আব্দুল ফাত্তাহের ফাঁসির অর্ডার সম্পর্কে অবগত করেন। অতঃপর বলেন: আমাদের কাছে শেষ সুযোগ রয়েছে সাইয়েদ সাহেবকে ফাঁসি থেকে বাঁচানোর। তিনি যদি সরকারের কাছে ক্ষমা চান, তাহলে অসুস্থতার বাহানায় তার ফাঁসির অর্ডার বাতিল করা যাবে এবং ছয় মাস পর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তার সাজা মাফ করে দেয়া হবে। এভাবেই তিনি মুক্ত হবেন। সাইয়েদ সাহেব নিহত হলে পুরো বিশ্বের ক্ষতি হবে। এজন্য আপনি যান, সাইয়দ সাহেবকে বোঝান। সম্ভবত তিনি ক্ষমা চাইতে রাজি হবেন। তিনি (হামিদা কুতুব) বলেনঃ “আমি সাইয়েদ সাহেবের কাছে যাই' ... এ কথা সরাসরি তিনি আমাকে বলেছেন.. আমি সাইয়েদ সাহেবকে বললাম: “এই লোকেরা বলছে, যদি আপনি ক্ষমা চান, তাহলে আপনার

[457]

ফাঁসির রায় পরিবর্তন করা যেতে পারে'। সাইয়েদ রহিমাহুল্লাহ বললেন: “হামিদা! কি কারণে ক্ষমা চাইবো? রব্বুল আলামীনের পক্ষে কাজ করার কারণে? আল্লাহর কসম! যদি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য কাজ করতাম তাহলে অবশ্যই ক্ষমা চাইতাম। কিন্তু আল্লাহর জন্য কাজ করার কারণে কখনোই ক্ষমা চাইবো না। নিশ্চিন্ত থাকো হামিদা! যদি আমার জীবন শেষ হয়ে থাকে, তাহলে ফাঁসি অবশ্যই হবে। আর যদি আমার জীবন বাকি থাকে, তাহলে ফাঁসির রায় নিশ্চিত আমলে নেয়া হবে না। অতএব জীবন দীর্ঘায়িত করা বা সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে কোনো লাভ নেই।”

মিশরে অগ্নিপরীক্ষার পরের যুগ এবং দীনদারদের তিন শ্রেণি
মিশরে সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এবং তার সহচরদের কুরবানীর পরে দীনদার সমাজের মাঝে তিনটি শ্রেণি দেখা যায়:

** আহলে আজিমত (দৃঢ় প্রত্যয়ী)

প্রথম শ্রেণি সাইয়েদ রহিমাহুল্লাহর চিন্তাধারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং মিশরের তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উঠে দাঁড়ায়। তারা মিশরের বিভিন্ন সংস্থা, মিশরীয় ইন্টেলিজেনসের জালেম ধর্মত্যাগী অফিসারবৃন্দ, মিশরে ইহুদী এবং তাদের সহযোগীদের ওপর হামলা করে রীতিমতো ইসলাম প্রতিরক্ষার জন্য জিহাদ আরম্ভ করে। এই জিহাদী আন্দোলন এমন ব্যাপকতা লাভ করে, মিশরীয় সেনাবাহিনীর ভেতর থেকেই ঈমানী উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে মুজাহিদ মেজর খালেদ ইসলাম্বুলি রহিমাহুল্লাহ মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে—যে এতদঞ্চলে ইসরাইলের প্রিয়ভাজন

[458]

হিসেবে উদীয়মান ছিল— সেনা প্যারেডে অভিবাদন জানানোর সময় কাছে আসার সুযোগ নিয়ে হত্যা করে। এই অপরাধের কারণে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ফাঁসির আদেশ মেনে নেয়। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ মিশরের ওই মুজাহিদীনের পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন। তিনি তাদেরকে উম্মাহর নেতা বলতেন। তিনি তাদেরকে সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের প্রকৃত উত্তরসূরি মনে করতেন। উম্মাহর সামনে তাদের ঘটনাবলী এতটা মহব্বতের সাথে বর্ণনা করতেন যে, মুসলিম যুবকরা তাদেরকে নিজেদের আইডল বানিয়ে নিতো। শায়খ রহিমাহুল্লাহ বলতেন, মিশরের আত্মমর্যাদাশালী মুজাহিদীনের জীবনী থেকে আমি যতটা প্রভাবিত হয়েছি, আল আযহারের মাশায়েখদের সকলের জীবন থেকে এতটা হইনি। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনের মাহফিলে আল্লাহর দীনের মর্যাদাবোধসম্পন্ন ইসলামের বীর বাহাদুরদের আলোচনা এভাবে করেছেন:

« আমি আপনাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের মধ্যে কয়জন "কারম আনাদোলী'র

71

আদালতে দেয়া বক্তব্য শুনেছেন? তাকে আপনারা শুনেছেন? সংক্ষিপ্ত একটি বক্তব্য কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকার মতো। এমনকি আল আযহারের মাশায়েখদের রচনাবলীর চেয়েও বেশি প্রভাবশালী সেই বক্তব্য। এক যুবক আদালতে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে বলতে থাকে: “এটা আসলে মিলিটারি কলেজের কেস নয়! এটা সালেহ সুরিয়া'র কেস নয়! এটা

71 ইসলামের সিংহ "কারম আনাদোলী" মিশরের রাজধানী কায়রোর মিলিটারি
কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন। তিনি তার নেতা সালেহ সুরিয়া'র সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯৭৪ সালে মিলিটারি কলেজের অস্ত্র ডিপো দখল করে ইহুদীদের বিশ্বস্ত দাস মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত-এর হত্যা এবং মিশরে বিপ্লব তৈরির পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই মিশন পরিচালনাকালে তিনি এবং সালেহ সুরিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে এই উভয় হযরতকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করা হয়। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন!

[459]

"কারম আনাদোলী'র কেস নয় এটাতো মিশরে জবাই হতে চলা ইসলামের কেস!” এতটা শক্তিশালী বক্তব্য আমি কখনও শুনিনি। একজন যুবক.. যুবক ‘কারম আনাদোলী’কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে কিন্তু তার কথাগুলোর প্রতিধ্বনি এখনও কানে বাজছে। আমি তো আল-আযহারের মাশায়েখ সকলের চেয়ে বেশি ‘কারম আনাদোলী'র দ্বারা প্রভাবিত। আমি নিজেও তো আল আযহারের একজন শায়খ। কিন্তু তার চেয়ে বেশি আমি তার দ্বারা প্রভাবিত।” [শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রচিত তাফসীর ফিী জিলালি সূরা আত-তাওবা]

পরীক্ষা যাদের পদস্খলন ঘটিয়েছে
মিশরের দ্বিতীয় শ্রেণিটি সরকারের চাপের মুখে দমে যায়। তারা ক্ষমতাসীনদের নৈকট্য গ্রহণ করে। দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ এবং জীবন বাঁচানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়। চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো শক্তিশালী ভিত্তি তাদের থাকেনি, বরং অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যেক জালেম অত্যাচারীর সঙ্গে সহযোগিতা করাই তাদের মানহাজ হয়ে দাঁড়ায়। ভয়ের কারণে দীনের মূলনীতি থেকে ধীরে ধীরে তারা পিছু হটতে থাকে। তাদের মাঝে এমন লোকেরাও ছিলেন, যারা সাইয়েদ সাহেব রহিমাহুল্লাহর সহচর ছিলেন কিন্তু পরীক্ষার পর তারা শুধু সাইয়েদ রহিমাহুল্লাহর পথ থেকেই বিচ্যুত হয়নি; তার চিন্তাধারা বিরোধী শিক্ষা বিস্তার করতেও আরম্ভ করে। শায়খ এই শ্রেণিকেও কাছ থেকে দেখেছেন এবং কথা বলেছেন। শায়খ তাদেরকে নসীহত করেছেন, নম্রতা ও স্নেহভরে তাদেরকে তাদের চিন্তাধারার বিভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি এক দরসে এমন শ্রেণির কথা এভাবে তুলে ধরেছেন:

« কিছু হযরত ব্রেন ওয়াশিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। যুবকরা যে দাওয়াতী ভিত্তির উপর [460]

প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য ওই হযরতগণ বিভিন্ন দলীল দিয়ে তাদের মতপরিবর্তনের চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ কিছু লোক এমন ছিলেন যারা প্রথমে ইসলামের দাওয়াতে সহযোগী ছিলেন কিন্তু যখন রণাঙ্গন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে; যাত্রা যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে আরম্ভ করে; চামড়ার উপর যখন চাবুকের আঘাত তীব্র হয়ে ওঠে, তখন তারা এই পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। সরকার তাদেরকে ব্যবহার করে। উলামায়ে কেরাম যারা কুরআন ও সুন্নাহের ধারক বাহক ছিলেন, তাদের একদলকে সরকার বলে: তোমাদের দায়িত্ব হল, প্রতারিত ব্যক্তিদেরকে তোমরা বোঝাও। সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহকে বোঝানোর জন্য তাদেরকে পাঠানো হলে তিনি জবাবে বলেন: আমার যেই শাহাদাত আঙ্গুল সালাতের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ প্রকাশের জন্য উত্তোলিত হয়, তা তাগুতের ফায়সালা মেনে নেয়ার মতো একটি অক্ষরও লিখতে প্রস্তুত নয়। এই লোকেরা মিশরের জাতীয় উদযাপনের দিনগুলোতে জামাল আব্দুল নাসেরের প্রতি শুভেচ্ছা ও সমর্থনের কবিতা লিখতো নিজেদের রক্ত দিয়ে। তাদের মধ্যে কেউ নিজের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করতো, অতঃপর কোনো পতাকা উত্তোলন করতো এবং নিজের রক্ত দিয়ে জামাল আব্দুল নাসেরের সমর্থনবাক্য লিখতো। আমি ওই সমস্ত লোকের কথা বলছি যারা দাওয়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় এই পথভ্রষ্ট লোকেরা সারিবদ্ধ হয়ে ‘কুতুব গিয়েছে জাহান্নামে’ স্লোগান তোলে। কঠিন সময়ে উচ্চ মনোবলসম্পন্ন লোকদের প্রয়োজন হয়। যারা দীনী দাওয়াতের পথে চলে, তাদেরকে বোঝানো উচিত— এ পথে তাদের মৃত্যু আসতে পারে। তারা ব্রাদারহুডের সঙ্গে, তাদের মা-বোনদের সঙ্গে, তাদের শিশুদের সঙ্গে এবং তাদের দাওয়াতের সঙ্গে যত অন্যায় করেছে, সেই সবকিছুর পর যখন আব্দুল নাসের মারা

[461]

যায়, তখন দাঈ দাবিদার এই ব্যক্তিরা কাতারে অথবা অন্যান্য জায়গায় মিশরীয় দূতাবাসে আব্দুল নাসেরের প্রতি শোক জানানোর জন্য একত্রিত হয়। তাদের এই অন্যায়ের চেয়ে জঘন্য কোনো অন্যায় আছে বলে আমি মনে করি না। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়, যেন লোকেরা এসে প্রয়াত প্রেসিডেন্টের প্রতি শোকবার্তা জানায়—যেহেতু জামাল আব্দুল নাসের তাদের জাতীয়তাধারী ছিল। আব্দুল নাসের তাদের জাতি ভাই ছিল। এই জাতীয় লোককে আপনারা দাঈ মনে করেন? » [আয-যাখায়েরুল ইজাম - শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ]

শায়খ রহিমাহুল্লাহ তাদের চিন্তাধারার কঠোর সমালোচনা করতেন, তাগুত গোষ্ঠীর দাসত্ব গ্রহণের ভয়াবহতা এবং সত্য জানার পরেও বিচ্যুত হবার শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতেন। সেই সঙ্গে তিনি সত্যপন্থি উলামায়ে কেরামের সত্যের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করার ঘটনাবলী তুলে ধরতেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ও অবিচলতার পরিচয় দিতেন। দমে যাওয়া এবং আদর্শের ব্যাপারে সমঝোতা করার খারাবি নিয়ে আলোচনা করতেন। অবশ্য একটি বিষয়ে তিনি খুবই খেয়াল রাখতেন। ভীরুতা কাপুরুষতা এবং নত হবার খারাবি বর্ণনা করতে গিয়ে ইসলামী দাওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তির নাম নিয়ে কখনও সমালোচনা করতেন না। তার সমালোচনায় দাঈ সুলভ বেদনা ও ভালোবাসা পাওয়া যেত। পদস্খলন ঘটা ব্যক্তিদের জন্য ফাতওয়ার ভাষা কখনও ব্যবহার করতেন না। মুজাহিদীনকেও এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান অবলম্বনে বারণ করতেন।

নিছক আবেগের বশবর্তী তৃতীয় শ্রেণিতে ছিল দীনি আন্দোলনে বেড়ে
ওঠা ওই যুবক দল, যাদের মাঝে আবেগ উদ্দীপনা [462]

সাহসিকতা সবকিছু পুরো মাত্রায় ছিল; কিন্তু দীনি সঠিক বুঝ ছিল না। কেবল আবেগ দিয়ে যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন জীবনের রাজপথেও হুমড়ি খেয়ে হয়। সরকার এবং তাগুতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ তাদেরকে এমন কট্টরপন্থা ও বাড়াবাড়ির পথে নিয়ে যায়, যার কারণে তারা মুসলিমদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করতে এবং তাদের প্রতিও ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করতে আরম্ভ করে। তাকফীরি এই শ্রেণি মিশরের ওই দুর্বল প্রকৃতির মুসলিমদেরকেও তাকফীর করতে পিছপা হয়নি, যারা নিজেদের ছিনিয়ে নেয়া অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য এবং জীবন ভিক্ষা চাওয়ার জন্য মিশরের তাগুতের সামনে নত হয়েছিল অথবা জালেম তাগুতের চাবুকের ভয়ে নিজেদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ কাছ থেকে দেখেছেন যে, জযবাতি লোকেরা কেমন করে দীনি প্রমাণপঞ্জির আলোকে ভুল নীতিমালা তৈরি করে এবং নিজেদের রচিত ওই নীতিমালার আলোকে সাধারণ মুসলমানদের এবং ধর্মীয় দলগুলোর সদস্যদেরকে তাকফীর (কাফের বলে আখ্যায়িতকরণ) করে। এভাবে তারা ইসলামের খেদমতের পরিবর্তে আরও ক্ষতি করে বসে। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এই শ্রেণির ব্যাপারে খুবই ব্যথিত ছিলেন। তাদেরকে মুজাহিদীনের মধ্যকার ব্যাধি বলতেন এবং চিকিৎসার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। তিনি ঐ অজ্ঞতা ও ব্যাধিগুলো চিহ্নিত করতেন, যেগুলো তাদেরকে কট্টরপন্থার দিকে নিয়ে যেতো। তিনি তাকফীরের পরিবর্তে একজন মুজাহিদকে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি করার প্রতি মুজাহিদীনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইতেন। এমনই একটি বিষয়ে মুজাহিদীনকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন:

« জনসাধারণের ব্যাপারে যদি আমরা সালফে সালেহীন উলামায়ে কেরামের আকায়েদ বিষয়ক মূলনীতিগুলো প্রয়োগ করি, তাহলে আপনারা কোনো একজনকেও তাকফীর

[463]

করতে পারবেন না। কিন্তু যদি আপনারা কাউকে নিজের খেয়াল খুশি মতো কাফের বানাতে চান, তাহলে ‘কাফের’ এবং ‘ধর্মত্যাগী’ নামাঙ্কিত কার্ড দিয়ে পকেট ভরে ফেলুন। এরপর যাকেই দেখবেন তাকে একটা কার্ড লাগিয়ে দেবেন। এটা আপনাদের বিষয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ খলকে কুরআন মতবাদকে কুফরী মনে করতেন কিন্তু সেই সঙ্গে মামুন এবং মুতাসিমের পেছনে নামায পড়তেন, এর উদ্দেশ্য কি? তিনি কি কাফেরের পেছনে নামায পড়তেন? ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ খলকে কুরআন প্রবক্তা সকলকে তাকফীর করতেন না; বরং যারা এ মতবাদের শীর্ষস্থানীয় ছিল তাদেরকে তাকফীর করতেন। হে আমার ভাইয়েরা! এ বিষয়ে আলোচনা অনেক ব্যাপক। আমি কেবল আপনাদেরকে সতর্ক করতে চাইছি। আমি চাই আপনারা এমন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হন, যা আপনাদের উপকারে আসবে। আপনারা যদি নিজেদের দোষ-ত্রুটি খোঁজ করেন, তাহলে আপনাদের উপকার হবে। নিজেদের নফস ও অন্তরে যে ত্রুটি রয়েছে সেগুলো খোঁজ করুন, মুসলমানদের দুর্বলতা খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হবেন না।

হে ভাইয়েরা! কোনো মুসলমানের তাকফীরের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আলেমদের কমিটি গঠিত হয়ে তবেই কাউকে কাফের বলতে পারে। আর আপনারা একাই জনসাধারণের সবাইকে কাফের বানিয়ে দিচ্ছেন! খুবই খেয়াল রাখুন আপনারা একটি কিতাবের লাইন পড়ে বিধান বর্ণনা করেই কার্যকর করে দেন। খবরদার কখনও এমনটা করবেন না। কোনো ব্যক্তিকে মুসলিম বলে বিচার করতে গিয়ে যদি শতবারও ভুল হয়, তবুও কাউকে ভুল করে কাফের হিসেবে বিচারিত করার চেয়ে উত্তম। [আত্- তারবিয়াতুল-জিহাদিয়া - শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য সংকলন]

শায়খ রহিমাহুল্লাহর কাছে স্পষ্ট ছিল, মুসলিম উম্মাহ নেতৃত্বের আসন হারাবার পর থেকে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। অতঃপর কয়েক শতাব্দী যাবৎ [464]

কাফেরদের কর্তৃত্বের কারণে ইসলামী আকীদা- বিশ্বাসে অনেক বিকৃতি সাধিত হয়েছে। এখন সমাজ সংস্কারের পরিবর্তে যদি আমরা কাফের আখ্যায়িতকরণের হাতিয়ার অজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিই, তাহলে বিশৃঙ্খলাই শুধু বাড়বে এবং ইসলামের খেদমতের নামে দীনের মূলোৎপটিত হতে আরম্ভ হবে। তিনি মনে করতেন, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার জন্য শুধু ইখলাস ও নিষ্ঠা যথেষ্ট নয়; বরং শরীয়তের ইলমের আলোকে সঠিক পথে চলাও জরুরি। তিনি খারেজী গোষ্ঠীর কাজ খুবই সূক্ষ্ম উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন:

« শুধু ইখলাস যথেষ্ট নয়। খারেজী গোষ্ঠীর ইখলাসের ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা যে পথভ্রষ্ট সেটাও কেউ অস্বীকার করে না। তাই ইখলাসের পাশাপাশি ইলম ও সঠিক পথ নির্বাচন করাও জরুরি। নতুবা অনেক সময় মানুষ ইখলাস থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে ইসলামের ধ্বংস নামিয়ে আনে। যেমন সাইয়েদুনা আলী ইবনে আবি তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: দুই শ্রেণির লোক আমার কোমর ভেঙে দিয়েছে; অজ্ঞ আবেদ এবং পাপিষ্ঠ আলেম। এরা ইসলামের এমন ক্ষতি ডেকে আনে, যেমন একটা ভালুক আপন মালিককে হত্যা করেছিল। একটা ভালুকের সঙ্গে তার মালিক খুবই সদাচরণ করতো। একদিন মালিক গাছের নিচে ঘুমাচ্ছিলো আর মাছি বারবার চেহারার ওপর বসে তার ঘুম নষ্ট করে দিচ্ছিলো। ভালুক কয়েকবার মাছি তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু মাছিটা বারবার ফিরে আসে। ভালুক তখন অনেক রেগে যায়। সে একটা বড় পাথর উঠিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে মাছিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। মাছি মরে যায়, সঙ্গে তার মালিকও মারা যায়। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই মাছিকে হত্যা করা; যদিও এর জন্য তার মালিকের জীবন চলে যায় না কেন। [শায়খ আব্দুল্লাহ

[465]

আযযাম রহিমাহুল্লাহ রচিত - তাফসীর ফী জিলালি সূরা তওবা]

মোটকথা শায়খ তিন শ্রেণিকেই কাছ থেকে খুব গভীর ভাবে দেখেছেন। তিনি এই উপসংহারে পৌঁছেন যে, প্রথম শ্রেণি প্রত্যয় ও সংকল্পের অধিকারীরা যে পথ অবলম্বন করেছেন, সেটাই সঠিক। কিন্তু তিনি এ কাজের জন্য মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সুশৃঙ্খল একটি বৈশ্বিক আন্দোলন পরিচালনা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অনিবার্যতা উপলব্ধি করেন। তিনি মনে করেন, এর জন্য এমন একটি ভূখণ্ড দরকার, যেখানে মুসলিমদেরকে তাদের ভুলে যাওয়া ফরয জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ওপর আমল করানো যাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় তার আকাঙ্ক্ষা আফগানিস্তানের ভূমিতে প্রতিফলিত হয়।

মিশরে উচ্চতর পড়াশোনা সমাপন করে তিনি জর্ডানের বিশ্ববিদ্যালয়ে উলুমে শরঈয়্যা বিষয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এর কিছুদিন পর তিনি সৌদি আরবে অধ্যাপনার জন্য গমন করেন। এসময় তিনি ফিলিস্তিন মিশর এবং সিরিয়ার জিহাদী আন্দোলনগুলোতে উপদেষ্টা ও নসীহত কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর যখন ইসলামাবাদে আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উলামায়ে কেরামের মাঝে যাদেরকে সর্বপ্রথম এখানে অধ্যাপনার জন্য বাছাই করা হয় তাদের মাঝে তিনিও ছিলেন। এভাবেই তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন এবং ইসলামী ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

রুশ জিহাদে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদান
এরই মধ্যে রাশিয়া আফগানিস্তানে হামলা করার পর জিহাদ আরম্ভ হয় এবং আফগানদের

[466]

দৃষ্টান্তহীন দীনি সাহসিকতা ও ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধ উম্মাহর যুবকদের মাঝে পুনরায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করে। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ শুরু থেকেই ঐ জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঐ জিহাদের দাঈ ছিলেন। এতে কার্যতভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুজাহিদীনের একজন নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি সকলের শায়খ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি গোটা উম্মাহর দাঈ ছিলেন। তিনি যুগপৎ আফগান এবং আরব ছিলেন। আবার তিনি ইখওয়ানী (ইখওয়ানুল মুসলিমীন তথা মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য) ছিলেন। তিনি সালাফী ছিলেন, আবার সুফী ছিলেন। তিনি মুসলিমদের বেশ কয়েকটি দেশে গমন করেন এবং দীর্ঘসময় অবস্থান করেন। যেই মুসলিম এলাকাগুলোতে তিনি যেতে পারেননি, আফগানিস্তানের জিহাদে আল্লাহর তাওফীকে সেখানকার মুসলিমদেরকে কাছ থেকে দেখেছেন এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। যেই এলাকাগুলোতে তিনি অবস্থান করেছেন সেখানে শুধু মুসাফির হিসাবে থাকেননি; বরং সমাজের অংশ হয়ে থেকেছেন। তিনি ওই এলাকার উলামায়ে কেরাম, আত্মশুদ্ধি কার্যক্রম ও বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলোর আহ্বায়কদের সম্পর্কে জেনেছেন, তাদের সঙ্গে মিশেছেন। মুসলিম সমাজের সমস্যাবলী সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন এবং মুসলিম রাজনীতির ব্যাপারেও তার আগ্রহ ছিল; এমনকি কোনো কোনো দেশের শাসক গোষ্ঠীর ব্যাপারেও তার ব্যক্তিগত জানা শোনা ছিল।

মুজাহিদীনের দাঈ, সংগঠক এবং অভিভাবক আফগানিস্তানের জিহাদে গোটা উম্মাহর বাছাইকৃত সন্তানদেরকে প্রশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলারও সুযোগ পেয়ে যান এই জগৎভোলা সাধক। রাশিয়ার জিহাদে সম্ভবত এমন কোনো মুসলিম অঞ্চল

[467]

ছিল না যেখান থেকে মুসলিমরা বিরাট সংখ্যায় জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আসেনি। শায়খ গোটা বিশ্বের মুজাহিদীনের খেদমতের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং চিন্তাগত, শরঈ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামরিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার জন্য 'মাকতাবুল খিদমাত' নামে প্রতিষ্ঠান চালু করেন। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ তাদেরকে দীন শেখাতেন, আদব শিষ্টাচার শেখাতেন, ইসলামী নৈতিকতা শেখাতেন, জিহাদী চিন্তাধারা ও মানহাজ বোঝাতেন, সামরিকভাবে প্রশিক্ষিত করতেন এবং জিহাদী রণাঙ্গনে তাদেরকে অংশগ্রহণ করাতেন; সেই সঙ্গে তাদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সমন্বয়মুখী বিশেষ পন্থায় তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। তিনি পুস্তক পুস্তিকা বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে এবং বয়ান বক্তৃতার মাধ্যমে জিহাদের দাওয়াত এবং মুজাহিদীনের শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। তার দাওয়াত ও দিকনির্দেশনার পরিসর এভাবে অনুমান করা যায় যে, তার রচনাবলী ও বয়ান বক্তৃতাগুলো الذخائر العظام للامام الهمام عبد الله عزام - নামে চার খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। একেকটি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হাজারের উপরে। শায়খ আযযামের বয়ান বক্তৃতার এই মহামূল্যবান সংকলনে মুসলিমদের ধর্মীয় বিভিন্ন আগ্রহের বিষয় এবং প্রয়োজনীয় অধিকাংশ প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। সেগুলোতে শরঈ আলোচনা রয়েছে, ইতিহাস রয়েছে, বিভিন্ন আগ্রহ উদ্দীপক বিষয়বস্তু রয়েছে, জিহাদের কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা রয়েছে, আত্মশুদ্ধিমুলক বিভিন্ন অধ্যায় রয়েছে এবং বিশ্ব রাজনীতির কথাও রয়েছে।

যে ফরয আমরা ভুলে গিয়েছি...
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ উম্মাহকে জিহাদ
ফরয হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—যে ফরয দাসত্বের যুগে উম্মাহর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেয়া হয়েছিল। তিনি এই ফরয বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন—ঠিক যেভাবে জিহাদের আয়াত সমূহ ও বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে। এই অর্থে তাকে যদি এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলা হয় তাহলে অত্যুক্তি হবে না। তার সময় আমাদের জানা শোনার ভেতর অন্য কেউ এতটা স্পষ্টভাবে বিস্তারিত কোনো অস্পষ্ট ছাড়া সর্বপ্রকারের উপায়-উপকরণ অবলম্বন ও ব্যবহার করে গোটা বিশ্বে ঘুরে ঘুরে জিহাদের দাওয়াত প্রচার করেননি। তিনি জিহাদ ও শাহাদাতের ফাযায়েল বর্ণনা করে করে যুবকদের মনে রণাঙ্গনে আসার আগুন জ্বালিয়েছেন এবং হাজার সংখ্যক যুবক গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয় আজও পর্যন্ত তার বয়ান বক্তৃতা ও রচনাবলী মুসলিমদের অন্তরে জিহাদের জযবা ও অস্থিরতা সঞ্চার করে যাচ্ছে।

শায়খ রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, জিহাদই উম্মাহকে তার হারানো গৌরব ফিরিয়ে দিতে পারে। জিহাদকে তিনি উম্মাহর প্রাণশক্তি মনে করতেন। তিনি ‘ফানা ফিল জিহাদ’ ছিলেন। তিনি বলতেন: জিহাদ ছাড়া জীবন জীবনই নয়। এমনকি তিনি বলতেন: যেই জীবনে আমি প্রাণশক্তি উপভোগ করেছি; যেটা আমার প্রকৃত জীবন, তা হল জিহাদে কাটানো জীবন। বাকি জীবনে আমি যেন মৃত ছিলাম। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে জিহাদকে জীবন বলে অভিহিত করেছেন। জিহাদে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি মুসলিমদের কাছে মুজাহিদীন ও শহীদদের জীবনী বর্ণনা করতেন, জিহাদী ঘটনাবলী শোনাতেন, আবেগঘন কবিতা আবৃত্তি করতেন, শাহাদাত ও আত্মদানের ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন—এক কথায়

[469]

সম্ভাব্য সকল পন্থায় যুবকদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতেন।

তিনি ঘোষণা করতেন, যে ব্যক্তি জান্নাত চায়, সে যেন জিহাদে আসে; হুরদেরকে পাওয়ার আগ্রহ যার রয়েছে, সে যেন ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে; যে ব্যক্তি নিজের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করাতে চায়, সে যেন কিতালের জন্য আসে। তিনি সব শ্রেণিকে সম্বোধন করতেন। মুসলিম জনসাধারণকে আপন করে নিতেন। ফাসেক ও পাপাচারীদেরকেও ভালোবেসে সম্বোধন করতেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ দুনিয়াবি সবকিছু জিহাদের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। নিজের দুনিয়াবি ক্যারিয়ার ছেড়ে জিহাদকে ক্যারিয়ার বানাতে তিনি মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। মুজাহিদীনের তিনি ইমাম ছিলেন। তাদের মাঝে সবচেয়ে অগ্রসর ছিলেন। জিহাদী পরিবেশ উম্মাহর মাঝে ব্যাপক করা এবং জিহাদী চিন্তা-চেতনা ও প্রশিক্ষণ ব্যাপক করতে তিনি আহ্বান করেন।

তিনি ফাতওয়া দিয়েছেন, যেহেতু মুসলিম বিশ্বের উপর কাফেররা হামলা করেছে —বিশেষ করে রাশিয়া আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে, তাই মুসলিমদের জন্য অর্থ সম্পদ এবং জবান দিয়ে এতে অংশগ্রহণ করা ফরয; নামায রোযা যেমন ফরয, ঠিক তেমন ফরয। তারপর কথা হলো: শুধু আফগানিস্তানেই নয়; যতগুলো ভূখণ্ড এক দিনের জন্য হলেও ইসলামী শাসনের অধীন থেকে এখন কাফেরদের দখলে চলে গিয়েছে, প্রতিটি ভূখণ্ড যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত না হবে, জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত ফরযে আইন থাকবে। এই ফাতওয়ার আলোকে স্পেন এবং ফ্রান্সের কিছু এলাকা স্বাধীন হবার আগ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন। তিনি দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন, পূর্ববর্তী পরবর্তী ইমামগণ এবং উম্মাহর ফুকাহায়ে কেরাম এই ব্যাপারে একমত। অতঃপর এই ফাতওয়ার সারকথা হজের সময় মিনায় ‘মারকাজুত [470]

তাওঈয়্যাহ আল আম্মাহ ’ (জনসচেতনতা কেন্দ্র)'য় শতাধিক উলামায়ে কেরামের মজলিসে পেশ করেন এবং তাদের সমর্থনের পর তা প্রচার করা হয়। তার এই ফাতওয়া সংবলিত গ্রন্থ دفاع عن اراضي المسلمين - এর উর্দু অনুবাদের সৌভাগ্যও আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর। এই ফাতওয়ার সারকথা কিছুটা এমন :

اتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلاميه أنه اذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمرأة دون إذن زوجها

পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল আলেম এবং ইসলামী ইতিহাসের সর্বযুগের ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীন একমত : যদি মুসলিমদের ভূখণ্ডের কোনো একটির উপরেও হামলা হয় , তাহলে নারী -পুরুষ সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। এই অবস্থায় পুত্র পিতার অনুমতি ছাড়া এবং স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া (জিহাদে) বের হতে পারবে। [শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ রচিত – ‘ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয ’..]

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মুসলিমদের এলাকা অবৈধ দখল মুক্ত করা ঈমানের পর সবচেয়ে বড় ফরযে আইন। সে কারণে তিনি প্রতিটি ইসলামী ভূখণ্ডে দখলদার কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলন চালু করতে চাইতেন। সেই সঙ্গে তিনি বয়ান বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মাঝে দীন , ইজ্জত ও অর্থ সম্পদ প্রতিরক্ষায় হাতিয়ার ওঠাতে উদ্বুদ্ধ করতেন। মুসলিমদের দীন ও ঐতিহ্য আক্রমণকারী মূলগত কাফের হোক কিংবা কাফেরদের সহযোগী— উভয়ের শ্রেণির হামলা প্রতিরোধের জন্য তিনি জিহাদের দাওয়াত দিতেন। এ বিষয়ে তিনি অধিকাংশ বয়ানে শায়খুল ইসলাম ইবনে

তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর ঐতিহাসিক ফাতওয়া বর্ণনা করতেন, যেখানে বলা হয়েছে:

العدو الصائل الذي يفسد الدين والـدنيا ليس أوجب بعد الإيمـان من دفعه

অর্থ: "ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হচ্ছে: দীন দুনিয়া ধ্বংসকারী আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা।"

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ মৌলিকভাবে ইহুদী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জিহাদ চালু করতে চাইতেন। যে সময় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার শাসকবর্গ সরাসরি ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুশরিকদের ফ্রন্টলাইনের সহযোগী হিসেবে মুসলিমদের সাথে লড়াই করার জন্য আসবে, তাদের সম্মানের চাদর ও চার দেয়ালের পবিত্রতা পদদলিত করবে, দীনদার মুসলিমদেরকে ফাঁসি দেবে, জিহাদের নাম নিলেই জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে, তখন তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করতে হবে বলে তিনি রায় পেশ করেন। এমন অবস্থায় স্থানীয় বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর হতে বলতেন এবং প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নেবার নির্দেশ দিতেন। সে সময় সবচেয়ে বড় তাগুত রাশিয়া এবং তার পরাজয়ের পরে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করাটাই শায়খের বুনিয়াদি দাওয়াত ও মৌলিক দাবি ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে গোটা মুসলিম উম্মাহর যেই এলাকাগুলোতে শরীয়ত বাস্তবায়নের আন্দোলন চলছে, আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমরা স্বদেশে চেপে বসা বিশ্বাসঘাতক অন্যায়কারী এবং কাফেরদের তাবেদার শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালে লিপ্ত রয়েছে, শায়খ তাদেরকেও অবমূল্যায়ন করতেন না। এমন মুসলিমদের পক্ষে কথা বলতেন, তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দৃঢ় সংকল্পের কারণে তাদের নেতৃবৃন্দকে মুসলিমদের

আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতেন এবং এখানে খোরাসানে বসে সেসব আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

উম্মাহর জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সকল মুসলিম এক উম্মাহ হবার দাবিদার ছিলেন। তিনি সকল এলাকা ও অঞ্চলকে নিজের এলাকা মনে করতেন। উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ক্ষুণ্ণ করে এমন সকল বিভাজন রেখা ও সীমানা প্রাচীর তার চক্ষুশূল ছিল। মুজাহিদীনকে তিনি উম্মাহর একটি অংশ বলতেন; তারা একাই গোটা উম্মাহ এমনটা বলতেন না। তিনি বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উম্মাহর সাধারণ-বিশেষ সকল শ্রেণিকে নিজেদের সঙ্গে না জুড়বো, ততক্ষণ আমরা জলহীন মাছের মতো খাবি খাবো। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার গন্তব্যে কখনোই পৌঁছুতে পারবো না। তিনি ফাসেক পাপাচারীদেরকেও উম্মাহর অংশ মনে করতেন এবং ঈমানী বন্ধনের কারণে তাদেরকেও দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাছে টানতে চাইতেন। তিনি বলতেন, ইসলামী সমাজে মুজাহিদীনের দৃষ্টান্ত হলো: বিস্ফোরক দ্রব্য বিস্ফোরণের জন্য যেভাবে প্রথমে ছোটো আকারের ডেটোনেটর বিস্ফোরণ করানো হয়, সেটা বিস্ফোরিত হলে তার উত্তাপে মূল বিস্ফোরক ফেটে যায়; তেমনিভাবে মুজাহিদীন যদি নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে তাদের অন্তরের উত্তাপ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু মুজাহিদীনের সঙ্গে যদি সমাজের শক্তি না থাকে এবং তাদের আওয়াজ যদি সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তার দৃষ্টান্ত হলো ডেটোনেটর বিস্ফোরণ করানো হলো; কিন্তু মূল বিস্ফোরক তার সঙ্গে নেই। এ কারণে শায়খ রহিমাহুল্লাহ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতেন, মুসলিমদেরকে সম্ভাব্য সকল শরীয়ত সম্মত পন্থায় যুক্ত করার আহ্বান

[473]

জানাতেন। এমন কাজ করতে বারণ করতেন, যা মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। জনসাধারণের বুঝ শক্তি অনুপাতে তাদেরকে সম্বোধন করতে বলতেন। সমাজের সঙ্গে তাদের কোনো পার্থক্য রাখতেন না।

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল শ্রেণি ও ঘরানাকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য কমিয়ে এনে জিহাদের ময়দানে মুসলিম উম্মাহ হিসেবে সাধারণ শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ করতে চেষ্টা করতেন। গোটা উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে আবির্ভূত হওয়ায় তিনি গোটা উম্মাহর সম্পদ ছিলেন। তিনি মনে করতেন, জিহাদই একমাত্র প্ল্যাটফর্ম, যেখানে পুনরায় উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। যে সমস্ত বিষয় উম্মাহর মাঝে ফাটল তৈরি করে, তিনি সেগুলো এড়িয়ে যেতে বলতেন। তিনি রাজনীতি বা ঘরানার ভিত্তিতে দলাদলির কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি শুধু উম্মাহ, উম্মাহ এবং উম্মাহ'র পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যখন শহীদ ইমাম হাসান আল বান্না রহিমাহুল্লাহর আলোচনা করতেন এবং তার সহচরদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংকল্পের কথা বলতেন, তখন তাকে ব্রাদারহুড সমর্থক বলে মনে হতো। অতঃপর যখন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ, শায়খ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ, আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহর গুণকীর্তন করতেন, সালাফিীরা তখন তাকে নিজেদের মনে করতো। অন্য কোনো বৈঠকে যখন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর সংকল্পের ঘটনা, উলামায়ে দেওবন্দ এবং আহনাফের ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাবলীগ জামাতের কষ্ট মেহনত আলোচনা করতেন, তাদের প্রশংসা বয়ান করতেন, তাদের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করতেন এবং শরঈ বিষয় সমূহে হানাফী ফিকহ মূল্যায়নের কথা বলতেন, তখন তাকে হানাফী বলে মনে হতো। আবার তিনি যখন আফগানিদের সুফী ধ্যান-ধারণা, জযবা, আবেগ উদ্দীপনার কথা বলতেন, জিহাদের ময়দানে তাদের

[474]

কারামতের বর্ণনা দিতেন, তখন তার সমসাময়িকগণ তাকে সুফী অভিহিত করতো। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই কঠিন যে, শায়খ রহিমাহুল্লাহ কোন গ্রুপের ছিলেন? বাস্তবতা হলো, তিনি সবার ছিলেন এবং সবাই তাকে আপন মনে করতো। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাসলাকী মতপার্থক্যগুলো বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন এবং এগুলোকে ঝামেলার পরিবর্তে রহমত মনে করতেন। ঘরানা ভিত্তিক মতপার্থক্যের কারণে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের রেখা অঙ্কনের কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি শুধু কালিমায়ে তাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বায়ক ছিলেন। মাসলাকি মতপার্থক্য ও ঝগড়া বিবাদকে তিনি দাসত্ব-যুগের সৃষ্টি মনে করতেন এবং অধঃপতনের কারণ বিবেচনা করতেন। উন্নতি অগ্রগতির এবং স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য জিহাদকে এগুলো থেকে পবিত্র করার কথা বলতেন। তার ওপর উম্মাহর সামগ্রিকতার রূপ ফুটে উঠেছিল। তিনি আল্লাহর রঙে রঙিন হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল শ্রেণির সারবস্তু ও উৎসমুখ। এটাই ছিল তার চিন্তা এবং এটাকেই বৈশ্বিক জিহাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি মনে করতেন। গোটা বিশ্ব থেকে আগত মুজাহিদীন—বিশেষ করে আরব মুজাহিদীনের মাঝে এই দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দেন যে, ‘উম্মাহকে আপন ভাবতে হবে; শুধু নিজেদেরকে উম্মাহ ভাবা যাবে না’। নিজের এমন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি তিনি মুজাহিদীনের মানসিক গঠনে আয়োজিত এক বৈঠকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

« ইসলামী জামাতগুলোর ব্যাপারে আমার আবেদন হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ما أنا عليه وأصحابي অর্থ: “আমি এবং আমার সাহাবীরা যেই

আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত"[72] তার অর্থ এই নয়, তোমরা ওই দলকে মুসলিম ব্রাদারহুড, আনসারুস সুন্নাহ অথবা তাবলীগ জামাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ মনে করবে আর বাকি সকলকে জাহান্নামী মনে করবে। হাদীসের মধ্যে যাদের (যে সমস্ত পথ ভ্রষ্ট দলের) কথা বলা হয়েছে, তারা তো ইসলামের জন্য মেহনতকারী; এই সমস্ত আন্দোলনের লোকেরা নয়। পথভ্রষ্ট দলের ব্যাপারে এসেছে—যেমনটা আমরা জানি — নুসাইরি ইসমাইলি শিয়া দারওয়াযী তারা। নয়তো প্রায় সকল ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে কথা হলো, যতক্ষণ তারা ইখলাস ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করবে তারা সত্যপন্থিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এগুলো জাহান্নামী দল নয়; কারণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের দেখানো পথে চলার চেষ্টা করছে। আমরা ঐ সমস্ত উম্মতের মতো নই, যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে: كلما جاءت أمة لعنت أختها - " এক উম্মত যখন (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখন অন্য উম্মতকে অভিশাপ দেবে [সূরা আল আরাফ ০৭: ৩৮] আমরা মনে করি, এই দীনের পথে যে ব্যক্তি কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার অনুগ্রহ স্বীকার করা আমাদের দায়িত্ব। ইখওয়ানি, সালাফী, খালাফী, তাবলীগ জামাত, ধর্মীয় অন্যান্য জামাত, জিহাদী জামাত সবগুলোই ছোটো ছোটো নদী, যা ইসলামের মহাসমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়। আপনারা যদি ইখওয়ানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান, তার অর্থ হলো, আপনারা ইসলাম নামক সমুদ্রের একটি বড় নদী

---

72 তিরমিজি শরীফের বর্ণনার মর্মকথা হচ্ছে: "আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে। একদল ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন: (যেই একদল জান্নাতে যাবে) সেটি কোনটি? তখন তিনি এরশাদ করেন: যারা ওই আদর্শ অনুসরণ করবে আমি এবং আমার সাহাবীরা যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শাইখ আযযামের আলোচনায় এই হাদিসের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

হত্যা করতে চাইছেন। যদি সালাফীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চান, তাহলেও বাস্তবিক পক্ষে ইসলামের অপর একটি নদী ধ্বংস করতে চাইছেন। একইভাবে তাবলীগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও ইসলামের তৃতীয় এক নদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হবে। তার অর্থ হলো, আপনারা ইসলামের মহাসমুদ্র শুকিয়ে দিতে চাইছেন। মুসলিমদের কর্মপন্থা হলো, মতপার্থক্য সত্ত্বেও তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখবে, কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ধরে রাখবে। উলামায়ে কেরামের সকলেই একমত: হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী হাম্বলী কারও পেছনেই অন্য মাযহাবের কারও নামায ছেড়ে দেওয়া জায়েয নয়। সত্য হলো: যে পক্ষ থেকে সত্য আসবে তা কবুল করে নেয়াই দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ আমি মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থক এবং আমি মনে করি, তাদের চিন্তা-চেতনা ও রচনাবলী আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহের সবচেয়ে কাছাকাছি। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যান্য জামাতের প্রতিও আমার ভালোবাসা রয়েছে। সালাফীদেরকেও আমি ভালোবাসি। তাদের থেকে নুসুস (কুরআন বা হাদীসের অকাট্য প্রামাণিক ভাষ্য) গ্রহণ করি এবং ইলম অর্জন করতে চেষ্টা করি। আমি জামাতুল জিহাদের

73 প্রতিও
মুহব্বত রাখি; কারণ তারা অনেক সাহসী। তাগুতের সামনে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের জীবন দিয়েছে। এজন্য মুসলিমদের উচিত তাদের প্রতিও মুহব্বত রাখা। তাবলীগ জামাতের প্রতিও আপনারা মুহব্বত রাখবেন। তাদের আদব, বিনয়, নম্রতা, মানবতার মুক্তির জন্য তাদের জান-মালের কুরবানীর কারণে তাদেরকে ভালোবাসবেন! দাওয়াতের কাজ করা এবং মানব জাতির হেদায়াতের জন্য তাদের চেষ্টা মেহনতের কারণে তাদেরকে মুহব্বত করবেন। এমনিভাবে আমি ওই সুফীদের ব্যাপারেও কঠোর অবস্থান নিই না এবং

73 [মিশরে সত্যপন্থী ও সংকল্পের অধিকারীদের একটি যোদ্ধা দল যার প্রধান ছিলেন শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি]

[477]

"শাকরি মুস্তফা'র

74 মতো প্রত্যেক সুফীকে কাফের বলে
ফাতওয়া দিই না। এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা সুন্নতের খুবই নিকটবর্তী। তাদের তাসাউফ হলো দুনিয়া বিমুখতা। তারা কিতাব সুন্নাহের অনুসারী। তাদের আকীদা স্পষ্ট। তারা রাতে কিয়াম করে এবং দিনে সিয়াম পালন করে কিন্তু তাদেরকে সুফী বলা হয়।

আমাদের এখানে ‘মাক্তাব আল খিদমাতে'

75যারাই
জিহাদের জন্য আসবে, তারাই আমাদের চোখের মণি, মাথার মুকুট। কেউ সালাফী হোক, ইখওয়ানী হোক, তাবলীগী হোক কিংবা অন্য কোনো ঘরানার হোক—তাকেই আমরা সর্বোচ্চ মর্যাদা দেব। আমরা তাকে নিজেদের সঙ্গে জুড়বো, তারাও আমাদের ভাই, আমরাও তাদের ভাই। আমরা যা পাবো তারাও তা পাবে। এজন্য আমাদের সাথে ইখওয়ানী, সালাফী, তাবলীগী ও মুজাহিদীন সকলেই রয়েছেন। যেই আসবে, তাকেই আমরা মুহব্বত করবো—আন্তরিক মুহব্বত। যে সাহসী হবে, মুত্তাকী হবে, তাকেই আমি কুরআন হেফাযতকারী মনে করবো। আমি এটা জানার প্রয়োজন বোধ করবো না, সে ব্রাদারহুড সমর্থক নাকি সালাফী। এভাবে জিহাদী নেতৃবৃন্দেকেও সাধারণত নিযুক্ত করা হয় তাদের গুণাবলি দেখে যেমন: সাহসিকতা, পুরানো হওয়া এবং বিপদ আপদ মোকাবেলা ইত্যাদি। » [শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ রচিত - আত তারবিয়াতুল জিহাদিয়্যাহ]

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ উম্মতকে দাসত্ব মুক্ত করার এবং উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখাতেন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি উম্মাহর সর্বশ্রেণিকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করাতে চাইতেন। এ কাজ করতে গিয়ে

74 খারেজীদের পথ অবলম্বনকারী মিশরের সংগঠন জামাআতুত তাকফির ওয়াল হিজরাহ প্রধান

75 শাইখ আযযাম রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিষ্ঠিত আফগানিস্তানের জিহাদের খেদমত ও পরিষেবা সরবরাহকারী একটি সংস্থা

[478]

শায়খকে কিছু সংকীর্ণমনা এবং মাসলাকি ক্যাচালে সদালিপ্ত ব্যক্তিদের কঠোর বিরোধিতা; এমনকি তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং অবিচলতার সঙ্গে মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন।

বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের রূপকার
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর বৈশ্বিক দীনি জিহাদী অভিজ্ঞতা এবং সারা বিশ্বের মুজাহিদীনের সু প্রশিক্ষিত সঙ্ঘবদ্ধতার ভিত্তিতে আল্লাহর বাণী উচ্চকিত করাকে জীবনের লক্ষ্য বানাবার মতো একটি প্রজন্ম তৈরি হয়ে যায়। এটা ছিল বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের গোড়ার কথা। রাশিয়া পরাজিত হয়ে পালাবার পথ খুঁজছিল। শায়খ রহিমাহুল্লাহ গোটা বিশ্বের মুজাহিদীনকে নিয়ে সু প্রশিক্ষিত একটি প্রজন্ম তৈরি করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা সময়ের এই মহান ইমামের দ্বারা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মাহকে একত্রিত করার খেদমত নিয়েছিলেন।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বোঝা জরুরি। বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন কোন শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর আবিষ্কার নয়; এটাতো সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জিহাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং শত শত দেশ ও ভাষার লোকদেরকে ইসলামে প্রবেশ করিয়ে এক উম্মাহ বানান। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জিহাদ বৈশ্বিক ছিল। গোটা বিশ্বে যেখানেই মুসলিমরা ছিল, তাদের নিরাপত্তাকে সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের দায়িত্ব মনে করতেন। মুসলিম উম্মাহর বড় শত্রু ছিল পারস্য। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কুফরী বিশ্বের [479]

প্রধান ছিল রোমান। সেনাবাহিনী সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাদের সঙ্গেও টক্কর দেন। তাদের মিশন ছিল বৈশ্বিক জিহাদ। কোনো অঞ্চলে তাদের মিশন সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে ইংরেজরা এবং অন্যান্য কাফের গোষ্ঠী আগ্রাসন চালাবার পর মুসলিম বিশ্বকে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করে দেয়। খেলাফত তারা বিলুপ্ত করে এবং মুসলিমদেরকে ভাষা অঞ্চল ভৌগোলিক জাতীয়তার শিকলে বেঁধে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। এমন অবস্থায় মুসলিমদেরকে পুনরায় এক উম্মাহ হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধ করা জিহাদের ময়দানেই সম্ভব ছিল। এখানে উম্মাহ ইসলামের সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে। এমনিভাবে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ গোটা বিশ্বের মুসলিমদেরকে বিশ্বের কাফের পরাশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা যুদ্ধে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার মুজাদ্দিদ ও ইমাম ছিলেন। নিঃসন্দেহে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এই আন্দোলনের উদ্ভাবক ছিলেন না বটে; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলনের মুজাদ্দিদ অবশ্যই ছিলেন।

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তগণ রাশিয়ার পরাজয়ের পর গোটা বিশ্বে কাফেরদের শক্তি এক মেরু-কেন্দ্রিক হয়ে যায়। আমেরিকা ইহুদীদের রক্ষাকর্তা হয়ে তাদের এজেন্ডা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নেমে পড়ে। শায়খ রহিমাহুল্লাহ তাঁর লেখালেখি ও বয়ান বক্তৃতাগুলোতে হেযাজের একজন পুণ্যবান যুবকের কথা খুব বেশি আলোচনা করেছেন, যাকে তিনি আল্লাহর ওলী মনে করতেন। এমনকি তিনি নিজের সন্তানদেরকেও এই পুণ্যবান যুবকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অসিয়ত করেছেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ ওই যুবকের তাকওয়া

[480]

লিল্লাহিয়াত আদব উদারতা এবং উচ্চ গুণাবলির প্রশংসা করতেন এবং ওই যুবকের ব্যক্তিত্বকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতেন। ওই যুবককে পরবর্তীতে দুনিয়াবাসী মুসলিম উম্মাহর হিরো শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ নামে চেনে। শায়খ রহিমাহুল্লাহ নিজের কিছু কিছু দাওরা তথা ক্লাসে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর আলোচনা এভাবেই করেছেন:

« ভাই উসামা বিন লাদেন; আল্লাহ তাকে সম্মান দান করুন, তাকে হেফাযত করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি গোটা পৃথিবী ছেড়েছেন, অর্থ সম্পদ ত্যাগ করেছেন, নিজেকে ভুলে গিয়ে পাহাড়ে পর্বতে বরফের উপর জীবন যাপন করেছেন। তারা (উসামা বিন লাদেনের ভাইয়েরা) মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ প্রকল্পে ৮ বিলিয়ন রিয়ালের ঠিকাদারি পেয়েছে। কিন্তু তিনি সেই সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন এবং এখন জালালাবাদে মুজাহিদীনের সঙ্গে থাকছেন। প্রতি মুহূর্তে তার ইচ্ছা হচ্ছে: যুদ্ধে যেন তিনি কোনো অবদান রাখতে পারেন। তার ভাইদের বিন লাদেন কোম্পানি মুসলিম বিশ্ব এবং বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক কোম্পানি। তিনি তার এক পকেটে লবণ অন্য পকেটে পানির বোতল রাখেন। লবণ চেটে পানির ঢোক নেন, যেন তার ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোলে থাকে এবং রণাঙ্গনে তিনি স্থির থাকতে পারেন। তিনি এমন এক মহামানব, এই দুনিয়াতে যার মতো অন্য কাউকে আমি দেখিনি। নিজের ঘরে ফকিরের মতো জীবন যাপন করতেন। যখন কখনও আমি হজ অথবা ওমরার জন্য যেতাম, তখন জেদ্দায় তার ঘরে অবস্থান করতাম। তার ঘরে না ছিল কোনো চেয়ার, না ছিল কোনো টেবিল। জর্ডান অথবা মিশরের একজন চাকরের ঘরও (ঘরের আসবাবপত্রের দিক থেকে) তার ঘরের চেয়ে সুন্দর হবে। কিন্তু যদি আপনি তার কাছে মুজাহিদীনের জন্য ১০ লক্ষ রিয়াল চান, তৎক্ষণাৎ আপনাকে চেক লিখে

[481]

দেবেন। তিনি তার এক বোনের কাছে গিয়ে তাকে ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর জিহাদ বিল মাল সংক্রান্ত ফাতওয়া দেখিয়েছেন। তার বোন ৮০ লক্ষ রিয়ালের চেক লিখে দিয়ে দেন। অন্যরা বোনকে বোঝালো, একবারেই এত পয়সা দিয়ে দিলেন ? আপনি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন। কিছু পয়সা নিজের কাছে রেখে দিতেন। সেটা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনতেন ! মানুষের জোরালো কথায় বোন এসে উসামাকে বললেন : আমার ভাই! ওই পয়সাগুলো থেকে দশ লাখ রিয়াল আমাকে ফেরত দাও। সেটা দিয়ে আমি ঘর বানাবো। তখন ভাই বললেন : "আল্লাহর কসম এক রিয়ালও আমি তোমাকে দেব না। কারণ তুমি আরামদায়ক ফ্ল্যাটে থাকো , আর ওখানে লোকেরা (আফগানিস্তানের লোকেরা) মারা যাচ্ছে ; তাদের তাঁবু পর্যন্ত নেই। ” তিনি (উসামা) যদি আপনার সঙ্গে বসেন তাহলে এতটা আদবের সঙ্গে বসবেন যেন তিনি কোনো খাদেম। বিশ্বাস করুন ! যখন টেলিফোনে রিং বাজতো , আমাকে উঠতে দিতেন না ; নিজে গিয়ে টেলিফোন এনে আমাকে দিতেন। খাবারের পাত্র এগিয়ে দিতেন। আদব , লাজুকতা , সাহসিকতা ... সালাম ! লাজুকতা ও সাহসিকতা উভয়টি একই সঙ্গে তার মাঝে ছিল। কারণ লজ্জাও ঈমানের অঙ্গ আর সাহসিকতাও ঈমানের অঙ্গ। সারাক্ষণ যুদ্ধ ফ্রন্টে থাকতে চাইতেন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি , আমাদের ভাই আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহকে হেফাযত করুন এবং তার বয়স জীবন জান ও মালে বরকত দান করুন, আমীন। »[76]

আরেক জায়গায় শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে অনবগত কিছু লোক তার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ খুবই জাদুকরী পন্থায় শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে কিছু কথা উল্লেখ করেছেন : তার ভাষ্য নিম্নে দেয়া হলো :

---

76 التربية الجهادية للشيخ عبد االله عزام

والله إني أشهد أن أسـامة ولي من أوليـاء االله يـدب على الأرض والله لو لم يكن لله ولي في هـذه الـدنيا إلا شـخص واحد لظننت أنه أســامة بن لادن وإني لأعرفه من قبل أن يــأتي الى بيشــاور وأعرفه أكــثر مما يعرفه أحد منكم وما رايت فيه إلا مســلما حقا أسأل االله أن أكون مثل جزء منه

অর্থ : “শপথ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , উসামা রহিমাহুল্লাহ এই পৃথিবীতে বিদ্যমান আল্লাহর ওলীদের মধ্য থেকে একজন ওলী। আল্লাহর কসম যদি আল্লাহর এই দুনিয়ায় শুধু একজন ব্যক্তি ওলী হয় তাহলে আমি মনে করবো , তিনি হলেন উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ। পেশোয়ার আসার আগে থেকেই আমি তাকে চিনি এবং আপনাদের সকলের চেয়ে আমি তাকে বেশি জানি। তাকে একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবেই আমি পেয়েছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি , আমি যেন তার একাংশের মতো হয়ে যাই। ” »[77]

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ তার সহচর পেয়ে যান। শায়খের পরিষেবা কেন্দ্র এবং বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিকে এই পুণ্যবান যুবক উসামা বিন লাদেনের কাছে ন্যস্ত করে দেন। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ২৪ শে নভেম্বর ১৯৮৯ সালে পেশোয়ারের এক জামে মসজিদে জুম্মা পড়ানোর জন্য যাচ্ছিলেন। মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা তার গাড়িতে বোম লাগিয়ে রাখে। তিনি পুত্র মুহাম্মদ আযযাম সহ পথিমধ্যেই শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এভাবেই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ভূখণ্ড থেকে ধারাবাহিক হিজরতকারী এবং অঞ্চলের পর অঞ্চল আল্লাহর দীনের পতাকা সমুন্নতকারী , যুগের ইমাম খোরাসান ও ভারত ভূমির মিলনস্থল অর্থাৎ পেশোয়ারে স্রষ্টার কাছে জীবন অর্পণ করেন।

---

[77] প্রাগুক্ত

মুসলিম উম্মাহর শায়খ; শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

আল-কায়েদা কাকে বলে?

১৯৮৯ সালে পেশোয়ার শহরে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর বৈশ্বিক জিহাদ থেমে যায়নি। শায়খ রহিমাহুল্লাহ তো বিদায়ের আগেই এই পতাকা হেজাযের পুণ্যবান যুবক আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর কাছে সোপর্দ করে গিয়েছিলেন— যিনি কিছুদিন আগে বাইতুল আনসার নামে মুজাহিদীনের খেদমতের ব্যবস্থা করেছিলেন। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর মৌলিক ইচ্ছা ছিল বৈশ্বিক জিহাদের ভিত্তি স্থাপন করা। এ কারণেই তিনি গোটা দুনিয়া থেকে মুসলিমদেরকে আফগানিস্তানে হিজরত করতে বলতেন এবং তাদের খেদমতের জন্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠান চালু করেছিলেন। তিনি এমন জিহাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন, যা গোটা পৃথিবীতে চালু হবে; মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি অঞ্চলের মুসলিমরা দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং মুসলিম উম্মাহর পবিত্র বিষয়গুলো রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে। তিনি চাচ্ছিলেন এমন বৈশ্বিক জিহাদ, যা ভবিষ্যতে হযরত ইমাম মাহদি আলাইহি রিযওয়ানুল্লাহির বাহিনীর অগ্রসেনাদল ও ভিত্তি বলে প্রমাণিত হবে। ভিত্তি শব্দকে আরবীতে কায়দা বলা হয় এবং জিহাদের ভিত্তিকে বলা হয় কায়দাতুল জিহাদ। শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ রাশিয়ার লাল ভালুকের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ থেকে অবসর হতেই উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির উপর মুসলিম উম্মাহর বিশ্বব্যাপী শত্রু ক্রুসেডার জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ভিত্তি রচনা করেন এবং এই জামাতের নাম রাখেন কায়দাতুল জিহাদ,

[484]

যা পরবর্তীতে মিডিয়ার লোকেরা আল-কায়েদা বলে উল্লেখ করতে আরম্ভ করে।

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর পিতা মুহাম্মদ বিন লাদেন ইয়েমেনের হাজরামাউত থেকে হিজরত করে হেজাযে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ তার বাণিজ্যে বিপুল বরকত দান করেন। শ্রমিক পেশা থেকে শুরু করে এত উন্নতি করেন যে, মৃত্যুর সময় তাকে আরবের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক কোম্পানির মালিক বিবেচিত হতো। জাগতিক অর্থবিত্ত রিয়ালের পাশাপাশি দীনের ভালোবাসা এবং ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ পারিবারিক সূত্রেই লাভ করেছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকেই সাইয়েদ কুতুব শহীদের ভাই ও আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ শায়খ মুহাম্মাদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এবং আলেমে রব্বানী শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও সৌদি আরবের অন্যান্য বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য লাভের এবং তাদের দ্বারা ইস্তেফাদা করারও সুযোগ ঘটেছিল। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানের ইসলামী ভূখণ্ডে পরিচালিত বর্বর রাশিয়ার হামলা তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হিসেবে প্রমাণিত হয়। আফগানিস্তানে রুশ হামলার দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই আফগানিস্তানকে সাহায্য করার জন্য তিনি উদ্যমী হয়ে ওঠেন। ১৯৮০ সালে তিনি আফগান মুসলিমদের জন্য অঢেল আর্থিক অনুদান সহকারে পাকিস্তান সফর করেন। অর্থের মাধ্যমে জিহাদে অংশগ্রহণ তার ভালোবাসার আগুন নেভাতে পারেনি। তাই তিনি শাহাদাত লীলার অনুসন্ধানে জীবন হাতে নিয়ে যুদ্ধ ফ্রন্টে গিয়ে পৌঁছান। আফগানিস্তানের জিহাদে তার অংশগ্রহণের পথনির্দেশক ও ভূমিকা পালনকারী ছিলেন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ। তিনিই প্রথম সারির যোদ্ধা ছিলেন

[485]

এবং রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় জীবন বাজি রেখেছিলেন। এভাবে বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ফ্রন্ট ছিল ‘মারেকায়ে জাযী’ বা জাযী রণাঙ্গন

78যেখানে মুষ্টিমেয় আরব যুবক শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে আল্লাহর সাহায্যের বলে বলীয়ান হয়ে রুশ সেনাবাহিনীর এক বড়বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। অতঃপর তিনি শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাক্রমে পেশোয়ারে বাইতুল আনসার নামে একটি কেন্দ্র চালু করেন, যেখান থেকে আরব হযরতদের জন্য আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ওই সময়ে মিশরের মুজাহিদ নেতা শায়খ আবু ওবায়দা পঞ্জশীরী

79একটি
শিবির প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ওই শিবিরকে আরব মুজাহিদীন ‘আল-কায়েদা’ তথা বেস ক্যাম্প [Base camp] বলতো [স্মরণ রাখা চাই, আরবী ভাষায় বুনিয়াদ বা ভিত্তিকে আল-কায়েদা বলা হয়], পরবর্তীতে এই নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং আরব মুজাহিদীন —বিশেষ করে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে এই নামে পরিচয় করানো হয়।

78 আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের অন্তর্গত যাঝি জেলাকে (Zazi District/ Jaji) আরব হযরতগণ এভাবেই উচ্চারণ করেন।

79 শাইখ আবু ওবায়দা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রুশ জিহাদের আরব নেতৃবৃন্দের মাঝে গণ্য হতেন। Panjshir Valley তে রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণে তাকে পাঞ্জশীরী উপাধি দেয়া হয়েছিল। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ -এর সবচেয়ে কাছের সহচর এবং আলকায়দার প্রতিষ্ঠাতাদের মাঝে তিনি গণ্য হতেন। তিনি শাইখ উসামা রহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকনির্দেশনায় আফগানিস্তানে মুজাহিদীনের জন্য বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন। পরবর্তীতে আফ্রিকার ভূমিতে জিহাদের পতাকা সমুন্নত করার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তথায় তানজানিয়া যাওয়ার পথে ইকুয়েডর ঝিলে নৌকাডুবিতে শাহাদাত বরণ করেন! আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমিন!!

[486]

কমিউনিস্ট রুশ তুফানের সামনে মুসলিম উম্মাহর জন্য জীবন ও অর্থবিত্ত উজাড় করে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর জীবনে একটি নতুন বাঁক এমন সময়ে এসেছে, যখন ১৯৯০ সালে সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে হামলা করেন। ধর্মহীন কমিউনিস্ট চিন্তা-চেতনার বাহক সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত হামলা আরব রাজ পরিবারের সিংহাসন নাড়িয়ে দেবার মতো ছিল। ওই সময়ে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৌদি রাজ পরিবারকে প্রস্তাব করেন, সাদ্দাম হোসেনের কমিউনিস্ট তুফান প্রতিরোধের জন্য আফগানিস্তানে রুশ জিহাদের সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধাদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের তাবেদার সৌদি রাজ পরিবারের দৃষ্টি অন্যদিকে ছিল। এরপর শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী তাদের জীবনের সবচেয়ে চিন্তাক্লিষ্ট দিবসটি ছিল। সেদিন সৌদি সরকার মার্কিন ক্রুসেডার বাহিনীকে সাদ্দাম হোসেনের মোকাবেলার জন্য জাযিরাতুল আরবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিল। শায়খ রহিমাহুল্লাহ বলেন, জাযিরাতুল আরবে ক্রুসেডার জায়ানবাদী কাফেরদেরকে বসবাসের সুযোগ দেয়া শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও বাণীর সুস্পষ্ট বিরোধিতাই নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর পুণ্য স্থানগুলো কাফেরদের হাতে তুলে দেবার নামান্তর। মুসলিম উম্মাহ প্রথম কেবলা হারাবার মাশুল তখনও গুণে যাচ্ছিলো, এরই মধ্যে হারামাইন শরীফাইনের স্বাধীনতাও হুমকির মাঝে পড়ে গেল। লক্ষ লক্ষ মার্কিন সেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিতে দাঁত কেলিয়ে ঘোরাফেরা করা, মুসলিমদের আসবাবপত্র লুটে নেয়া, মুসলিমদের শাসন ক্ষমতা পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া, নিজেদের দুর্গন্ধময় সংস্কৃতি বিস্তার করা এবং

[487]

আরবে নিজেদের অবস্থান ও অন্যান্য যুদ্ধের মাধ্যমে ইসরাইলকে শক্তিশালী করা—এসব কিছুই শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সামনে সময়ের দাবি স্পষ্ট করে দেয়। শুরুতে তিনি সৌদি শাসকবর্গ এবং সরকারি আলেমদেরকে চিঠি লিখে এই ন্যাক্কারজনক কাজের ব্যাপারে নিন্দা জানান এবং জাগতিক পরলৌকিক ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। এমনকি সৌদি শাসকদেরকে দীনি বিষয়ে চাটুকারিতা উদাসীনতা সুদি বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক দুর্নীতির ব্যাপারে সতর্ক করেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় সৌদি সরকার তাকে নজরবন্দী করে সফরের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নেয়। আল্লাহর সাহায্যে তিনি পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান এবং পুনরায় পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছে যান। এটা ১৯৯১ সালের ওই সময়ের কথা, যখন রাশিয়া পরাজিত হয়ে ফিরতি পথ ধরে আমু দরিয়ার তীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সে সময় আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় আফগান যোদ্ধারা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আফগানিস্তানে পৌঁছার পর তিনি আরব মুজাহিদীনকে আমেরিকা এবং ইহুদীদের নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদের জোরালো আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে আফগানিস্তানের বিবদমান গ্রুপগুলোর মাঝে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। অপরদিকে আরব মুজাহিদীনকে আফগান যোদ্ধাদের পারস্পরিক বিবাদ থেকে দূরে রাখতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এ কারণে ১৯৯২ সালে আপন সাথিদেরকে নিয়ে সুদানে চলে যান। সেখানে প্রায় চার বছর পর্যন্ত তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জিহাদের পরিকল্পনা তৈরি এবং সুদানে কৃষি উন্নয়নের কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। আমেরিকা সুদান সরকারকে প্রেসার দেয় যেন শায়খকে সুদান থেকে বের করে দেয়া হয়। তাই তিনি ১৯৯২ সালে মহান আফগান জিহাদী নেতা মৌলভী ইউনুস খালেস

[488]

রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতে পুনরায় আফগানিস্তানে গমন করেন। সেখানে তিনি আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহিমাহুল্লাহর হাতে বায়আতবদ্ধ হন। মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহ তাকে আফগানিস্তানে বসবাসের অধিকার দেন। তিনি জিহাদী প্রশিক্ষণের জন্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত মুসলিমদেরকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার এবং হারামাইন ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা ও ইহুদীদের বিশ্ব রাজনীতির বিরুদ্ধে জিহাদের পরিকল্পনা করার অনুমতিই শুধু দেননি; এই কাজে শায়খের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন।

জামাতে আল-কায়েদা সূচনাকালে একটি নিয়মতান্ত্রিক জামাতের চেয়ে একটা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির নাম হিসেবে বেশি পরিচিত ছিল। পেশোয়ারে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত মেহমান খানা এবং আফগানিস্তানে শায়খ আবু উবায়দা পাঞ্জশীরী রহিমাহুল্লাহর প্রশিক্ষণ শিবির থেকেই এর যাত্রা শুরু হয়। তাই ওই মেহমানখানা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে আল-কায়েদার লোক বলা হত। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে এবং তাদের সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাবেদার ও সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যারাই ইহুদী গোষ্ঠী, আমেরিকা এবং তাদের সমর্থকদের কাছ থেকে উম্মাহর প্রতিশোধ নিতে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, সে যে দলের হোক না কেন; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের যে ঘরানার হোক না কেন, তার খেদমতের জন্য শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর উত্তরসূরি শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ কোমর বেঁধে নেবেন। এভাবেই বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের ভিত্তি রচনা হয়।

[489]

আমেরিকা-ই জুলুম অনাচারের উৎস স্থল
শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ শুধু একজন চিন্তানায়ক ছিলেন না, আর না তিনি কোন দার্শনিক বা কবি ছিলেন। তিনি একজন দাঈ ছিলেন, যুদ্ধ ফ্রন্টের সামরিক নেতা ছিলেন, মুজাহিদীনের মুরুব্বী ও অভিভাবক ছিলেন। একজন স্নেহশীল পিতার মতো মুসলিম উম্মাহর জন্য চিন্তা করতেন। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ ইহুদীদেরকে সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করতেন। তিনি জানতেন, ইহুদী গোষ্ঠী আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় কিরূপ সতর্কতার সাথে গোটা পৃথিবীকে নিজেদের জালে জড়িয়ে নিচ্ছে। অতঃপর উপসাগরীয় প্রথম যুদ্ধের বাহানায় যেই ভূমিতে কখনও জিবরাঈল আমীন আলাইহিস সালাম রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ওহী নিয়ে অবতরণ করতেন; যেই ভূমিতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পবিত্র সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের রক্ত বইয়ে ইসলাম ও তাওহীদের ঠিকানা রচনা করেছেন, সেখানে ইহুদী খ্রিস্টানরা রীতিমত ডেরা স্থাপন করে বসেছে এবং স্থল পথ, নৌ পথ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। শায়খ রহিমাহুল্লাহ আরও দেখলেন, কিভাবে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা ইরাকে মুসলিমদের জীবনোপকরণ সরবরাহের পথ বন্ধ করে ১৫ লক্ষ শিশুকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছে। যেই মসজিদে আকসাতে দুজাহানের সরদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীদের ইমামতি করেছেন; যে মসজিদ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কতটা গুরুত্ব সহকারে নির্মাণ করেছিলেন; নবীদের সিজদা স্থল সেই মসজিদ কাফের বিশ্বের নেতা আমেরিকা এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় নবীদের হত্যাকারীদের হাতে চলে গিয়েছে। অপরদিকে জাতিসংঘের নামে ওই জায়নিস্ট গোষ্ঠীই মুসলিমদের সকল রাজ্য নিজেদের বিচরণ ভূমি

[490]

বানাচ্ছে, সেখানে তারা এক্সপেরিমেন্ট করছে; মুসলিম দেশগুলোর প্রেসিডেন্ট হোক, প্রধানমন্ত্রী হোক —সকলেই ইহুদী খ্রিস্টানদের মর্জিমতো চলছে। যত আইন প্রণয়ন হচ্ছে, সবই তাদের সন্তুষ্টি মতো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তাদের ইশারায় তৈরি হচ্ছে, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সব কিছুই তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী চলছে। সব কিছুর পিছনেই আমেরিকা তথা ইহুদীদের পরিকল্পনা কাজ করছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলো যেই চুক্তি করছে, আদতে সেগুলোকে চুক্তি বলা যায় না; বরং মনিবদের ফায়সালা মেনে নিচ্ছে, এটাই আসল কথা। কারণ চুক্তি উভয় দিকের সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে, অথচ মুসলিম দেশগুলোর শাসকেরা নামমাত্র যে চুক্তিগুলো করছে, সেগুলো মার্কিন দূতাবাসের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলিম দেশগুলো দখলের পর ইহুদীরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির নামে মুসলিম দেশগুলোর রপ্তানিগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। নিজেদের পছন্দসই পরিমাণে সেগুলো যখন ইচ্ছা যত দামে ইচ্ছা যাদের কাছে ইচ্ছা, বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে।

শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ চিন্তা করলেন, আমেরিকা কী এমন হয়ে গেল যে আমাদের এলাকাগুলোতে পাঠ্য সিলেবাস চাপিয়ে দেবে? কেন তারা মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিশু বিদ্যালয়গুলোর ঠিকাদারি করবে? সিলেবাসে যা ইচ্ছা রাখবে যা ইচ্ছা সরিয়ে দেবে? শায়খের ঈমানী মর্যাদা বোধ জেগে ওঠে যে কেন এই নাপাক ইহুদীরা তার সহচরদেরকে আমাদের ভূখণ্ডের উপর জোর করে শাসক বানাবে? কেন পশ্চিমা শক্তিগুলো আমরা মুসলিমদেরকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরআনের শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে বাধা দেবে? যেখানেই মুসলিমরা নিজেদের এলাকায় দীন বাস্তবায়নের

[491]

আন্দোলন আরম্ভ করে, কেন আমেরিকা তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে সেখানকার শাসকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ওই আন্দোলন দমিয়ে দেয়? ইসলামের শত্রুদের কাছে এগুলোর কোন কারণ থাকতে পারে; কিন্তু কেন আমাদের হাবিব, আমাদের মনিব, আমাদের হৃদয়ের শীতলতা, অন্তরের প্রশান্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রে কালিমা লেপনকারীরা গর্বের সঙ্গে প্রকাশ্যে ধৃষ্টতা দেখায়? কেন তারা এমন বলে, যা শুনে পৃথিবীর বিবেক সম্পন্ন মানুষদের অন্তর কেঁপে ওঠে? ঈমানদার ব্যক্তিরা তবে এমন হতভাগাদেরকে নিঃশেষ করার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে না কেন?

উম্মাহর অবলম্বনগুলোর ছিনতাইকারী আমেরিকা এভাবে উম্মাহর সকল সম্ভাবনা উপায় অবলম্বনগুলো কাফের গোষ্ঠী এবং তাদের এজেন্টদের মাঝেই ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহ দুঃখ দুর্দশা ও অভাব-অনটন পোহাতে থাকে। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এগুলো কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। যদিও তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীর দুলাল ছিলেন, কিন্তু তিনি মুসলিম উম্মাহর সাধারণ জনসাধারণের ব্যাপারে চিন্তা করতেন। তিনি ভাবতেন, মুসলিম উম্মাহ প্রযুক্তিতে সবচেয়ে এগিয়ে। পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান যেই সম্পদের উপর ভিত্তি করে পশ্চিমা বিশ্ব চোখ ধাঁধানো উন্নতি করেছে, সেই তেল সম্পদের সবচেয়ে বড় খনি তো মুসলিম উম্মাহর কাছে। সেলাই মেশিন এবং মোটরসাইকেল থেকে আরম্ভ করে ড্রোন বিমানের প্রস্তুতি; এমনকি সব ধরনের মেশিনারি তৈরি থেকে আরম্ভ করে সেগুলো ব্যবহারের সকল পর্যায়ে এই তেলের প্রয়োজন হয়। এরপর বিশেষভাবে যুদ্ধগুলোতে এই তেলের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে

[492]

যায়। কারণ হাতিয়ার চালানো থেকে আরম্ভ করে স্থানান্তর এবং সেনাবাহিনীর যাতায়াতের সকল পর্যায়ে তেলের প্রয়োজন হয়। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ চিন্তা করতেন, এই তেলের ৯০% মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আমার উম্মতের; অথচ প্রকৃত চিত্র হচ্ছে, আমার প্রিয় এই উম্মাহর মাঝে এমন পিতাও রয়েছেন, যিনি ফুলের মতো তার নিষ্পাপ সন্তানকে এ কারণে হত্যা করে যে, সন্তান তার ঈদে বাবাকে কাপড় কিনে দিতে বলবে অথচ তার কাছে রুটি খাওয়াবারও অর্থ নেই। উম্মাহর এমন দুর্দশায় শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর চোখ দিয়ে যেন রক্ত ঝরতো। তিনি কাটা মোরগের মতো ছটফট করতেন যে, কেমন করে উম্মাহর অর্থ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা যায়।

গোটা বিশ্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা
শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এই দুর্গন্ধময় নিকৃষ্ট ক্ষমতাধর আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে জিহাদের ঘোষণা করেন। গোটা বিশ্বের যেখানেই কোনো মার্কিন কাফের পাওয়া যাবে, তার কাছ থেকেই আমাদের মুসলিম উম্মাহর প্রতিশোধ নেয়া হবে। যারা ইহুদীদের সঙ্গে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগী হবে, তারাও ইহুদীদের মাঝে গণ্য হবে। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ বলতেন, মার্কিন কাফেরদেরকে হত্যায় কারও সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই; যেখানেই কোনো মার্কিন কাফের পাওয়া যাবে, তাকেই আপনারা হত্যা করুন, কারণ তারা শুধু কফিনের ভাষা বোঝে। শায়খ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমেরিকানরা যদি আমাদের কথা বুঝতো, তাহলে কখনও বিমানে বসে আমাদেরকে হামলা করার প্রয়োজন হতো না। শায়খ মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের

[493]

ঘরে আমেরিকার জ্বালানো আগুন তাদের ঘরেও না জ্বলবে, আমেরিকানদের ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বকে তারা শান্তিতে থাকতে দেবে না। শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যদি স্বাধীনতা চান, তাহলে আমেরিকানদেরকে হত্যা করুন। যদি উন্নতি অগ্রগতি চান, তাহলে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন। যদি আল্লাহর দীন ও শরীয়তের জন্য কিছু করতে চান, তাহলে ইহুদী গোষ্ঠী এবং আমেরিকানদের মোকাবেলা করুন। যদি শান্তি নিরাপত্তা চান, তাহলে আমেরিকানদের শান্তি নিরাপত্তা ছিনিয়ে নিন। যদি পৃথিবী থেকে জুলুম অত্যাচারের অবসান চান, তাহলে এই নিকৃষ্ট ক্ষমতাধর আমেরিকার অস্তিত্ব মুছে দেয়ার চেষ্টা করুন। আমেরিকায় যদি পৌঁছতে না পারেন, ইসরাইলে গিয়ে যদি ইহুদীদেরকে হত্যা করতে না পারেন, তাহলে মার্কিন যত প্রতিষ্ঠান রয়েছে—রাজনৈতিক হোক কিংবা সামরিক—পৃথিবীর যেখানেই সেই প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থিত হবে, সেখানেই তাদেরকে টার্গেট করুন এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে তাদের অস্তিত্ব মুছে দিন। সেই সঙ্গে যারাই আমেরিকান এবং ইহুদীদের সমব্যথী ও সহযোগী হবে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী বলে গণ্য হবে। সম্ভাব্য যেকোনো পন্থায় তাদেরকে হত্যা করা যাবে। শায়খ রহিমাহুল্লাহ জিহাদের ঘোষণা করার আগে জাযিরাতুল আরব এবং পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বড় বড় উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে এই বিষয়ে ফাতওয়া নিয়েছেন এবং বেশ কয়েকটি জিহাদী সংগঠনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে রণাঙ্গন প্রস্তুত করেছেন।

শায়খ সর্বপ্রথম আমেরিকার স্লোগান ব্যাখ্যা করে বলেন, হতভাগা আমেরিকার শত্রুতা উম্মাহর সর্ব সম্মত বিষয়। আমার পিতা-মাতা যেই সত্তার কাছে

[494]

উৎসর্গিত, সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা এবং আমেরিকার ভালোবাসা কখনও এক অন্তরে স্থান করতে পারে না। আমেরিকাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গোটা বিশ্ব কোনো সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রহিমাহুল্লাহ অথবা নুরুদ্দিন যিনকী রহিমাহুল্লাহ এর অপেক্ষায় রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি উম্মাহর সর্ব স্বীকৃত শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, সে এই উম্মাহর সমব্যথী এবং পথপ্রদর্শক হয়ে যাবে। উম্মাহ তাকে ভালোবাসবে, তার পাশে থাকবে, তাকে সমর্থন করবে। তার গুরুজন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা তার জন্য দোয়া করবে। এভাবেই এই জিহাদ উম্মাহর জিহাদ হবে। কোনো একক দল বা গ্রুপের জিহাদ নয় বরং গোটা উম্মাহর জিহাদ হবে। ইংরেজ ও ইহুদীরা আমাদের থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সেই খেলাফত পুনরুদ্ধার করা হবে।

শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, আমেরিকার স্বার্থ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জাতিসংঘ আমেরিকার এমন ভৃত্য, যার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে আমেরিকা তার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে এবং শাসন বিস্তার করে। এরপর মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর নেটওয়ার্ক, ধর্মহীন পশ্চিমা সংস্কৃতি বিস্তারক এবং কাফেরদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী এনজিওগুলোর ব্যাপারে কথা হলো, তাদের স্বার্থের সঙ্গে আমেরিকার এবং আমেরিকার স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে।

আমেরিকা: সাপের মাথা এবং নিকৃষ্ট বৃক্ষ
শায়খ বলতেন: আমেরিকা হলো সাপের মাথা। তার সঙ্গে জোটবদ্ধ অন্য দেশগুলো হলো এই সাপের দেহ। আমরা যদি দেহে আঘাত করে নিজেদের শক্তি শেষ করে ফেলি এবং আমাদের চেষ্টা যদি সাফল্যের কাছাকাছিও [495]

চলে যায়, তাহলেও সাপের মাথা পুনরায় আমাদেরকে দংশন করবে। তাহলে শুরুতেই কেন সাপের মাথা পিষে দেয়া হবে না? মাথা যখন বিভিন্ন দিক থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন দেহের যে অংশগুলো সামনে আসবে সেগুলোও টার্গেট হবে। যেহেতু আমেরিকান নামক সাপ পৃথিবীতে বিষ উদগীরণের ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই, তাই এই অকল্যাণের উৎস মুখ বন্ধ করে দেয়ার কাজে মুসলিম জনসাধারণ দলে দলে এ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, মাথাটুকুই শুধু বিষযুক্ত নয়, বরং দেহের কারণেই এই মাথা মাটিতে হেঁটে যাচ্ছে এবং বিষ ছড়াচ্ছে। তাই শায়খ রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমেরিকায় আঘাত করা এবং কিছু এলাকায় সরাসরি মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্বারা উম্মাহর অঞ্চলগুলোতে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আমেরিকার প্রতি ঘৃণা জোটের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের উপরেও পড়বে এবং আমেরিকার স্থানীয় সহযোগী গোষ্ঠী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দীনের সাহায্যকারীদের হামলার শিকার হবে।

শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ কুফরীকে নিকৃষ্ট বৃক্ষ বলতেন। বিশৃঙ্খলার প্রধান শক্তি আমেরিকাকে নিকৃষ্ট বৃক্ষের কাণ্ড এবং আমেরিকার সহযোগী স্থানীয় শক্তিগুলোকে সেই বৃক্ষের শাখা বিবেচনা করতেন। তিনি দুনিয়ার সকল অন্যায় অনাচার বিশৃঙ্খলা কুফরী ও ধর্মহীনতার কেন্দ্রভূমি আমেরিকাকে মনে করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি গোটা বিশ্বে আমেরিকা এবং তার তাবেদারদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন।

[496]

লস্করে উসামার উত্তরাধিকারী হাকীমুল জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর জিহাদী চিন্তাভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেছিলেন। বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হবার পর প্রথম দিন থেকেই তার কুশলী সহচর ছিলেন কেনান ভূমি মিশরের ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর ভক্ত অনুরাগী এমনিতে অনেক ছিল, কিন্তু গোটা বিশ্বে আমেরিকার মতো সুপার পাওয়ারের সঙ্গে টক্কর দেবার পরিকল্পনায় তার সহযোগী হবার মতো কে এমন ছিল, যে নিজের জ্ঞান-গরিমা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, কুশলতা, কর্মস্পৃহা, নীতি নৈতিকতা, জিহাদের সফরে দৃঢ় সংকল্প এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের এই যাত্রায় শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সহযাত্রী হতে সক্ষম হবে? শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর দূরদৃষ্টি মর্দে মুজাহিদ ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর দিকে ফিরে যায় আর এভাবেই তিনি শায়খের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরসূরি বলে গণ্য হন।

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য নিজের সংগঠন ভেঙে দিয়ে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর হাতে বায়আতবদ্ধ হন। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ একজন বড় মাপের দাঈ ছিলেন। কার্যকরী পন্থায় জিহাদের দাওয়াত দিয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে জিহাদের ব্যাকুলতা তৈরি করে কাফেরদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ করার উল্লেখযোগ্য অবদান তারই ছিল। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর নৈতিক উৎকর্ষের কারণে তার দাওয়াত উম্মাহর মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মুজাহিদীন এবং অন্যান্য মুসলিম শায়খ রহিমাহুল্লাহর প্রতি [497]

মনোযোগী হতে আরম্ভ করে। অপর দিকে তার দাওয়াতের ফলে জিহাদের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণকারী মুজাহিদীনের পথনির্দেশনা এবং বৈশ্বিক জিহাদকে সুশৃঙ্খল আন্দোলনে রূপ দেয়ার কঠিন কাজে প্রজ্ঞাবান, বিজ্ঞ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহকে অবদান রাখতে দেখা যায়। তিনি শুধু শরঈ উলুমের একজন একাগ্র তালিবুল ইলম-ই ছিলেন না; বরং ইতিপূর্বেও বিভিন্ন জিহাদী আন্দোলন পরিচালনার বিস্তর অভিজ্ঞতা তার ছিল। তিনি ধৈর্যধারণ, আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আস্থা, দৃঢ় সংকল্প, অবিচলতা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে নেতৃত্বের এমন উচ্চ গুণাবলি সম্পন্ন ছিলেন যে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা- ইলহাম আকারে তার কাছে পৌঁছে যেত। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ যদি বৈশ্বিক জিহাদের নেতা হয়ে থাকেন, তাহলে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ রাহবার ও পথনির্দেশন ছিলেন। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ আহ্বায়ক হলে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ রূপকার ছিলেন। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ আবশ্যকীয় ব্যক্তিত্ব হলে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এক কথায় উভয়ের ব্যক্তিত্ব যদি আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের প্রকৃত চিত্র আমাদের সামনে আসবে না।

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর পরিচিতি
শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ মিশরের শিক্ষিত
ধনী একটি বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এমনিতেই তার পরিবার বিখ্যাত ডাক্তারদের কারণে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কারণেও তাদের প্রসিদ্ধি ছিল। তার নানা

[498]

শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব আযযাম রহিমাহুল্লাহ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খ, লেখক, আলেম এবং পাকিস্তান ও সৌদি আরবে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ফার্সি ভাষায়ও তার নানার অনেক দক্ষতা ছিল এবং প্রথমবার ফার্সিতে রচিত আল্লামা ইকবালের ‘কুল্লিয়াতে ইকবাল’ আরবীতে কাব্যিক রূপান্তর করেন। তাই শায়খ আইমান পারিবারিকভাবেই ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং মুসলিম উম্মাহর উন্নতি অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন। মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা তখনও শেষ হয়নি, এরই মাঝে মিশর সরকার মহান আল্লাহর দীনের দাঈ সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহকে ফাঁসি দেয়। এটা শায়খের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বাঁক ছিল। এরপরেই তিনি একজন বিপ্লবী যুবক হয়ে ওঠেন, যিনি কখনও শিক্ষার্থীদের মাঝে শরীয়াহ শাসনতন্ত্রের আওয়াজ ওঠাতেন, কখনও বিনয়ের সঙ্গে উলামায়ে কেরামের কাছে তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদের বৈধতা জিজ্ঞেস করতেন, আবার কখনও আরব জনসাধারণকে দীন প্রতিরক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। দাওয়াতী কার্যক্রম বিন্যাসের পর মিশরে যখন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদীদের কাছে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়ে যায়, তখন মিশরের মুজাহিদীন ইহুদীদের বিশ্বস্ত আনোয়ারকে শিক্ষা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য মিশর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকেই ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে খোঁজ করতে থাকে। অবশেষে তাদের একজন পুণ্যবান যুবক মিশর সেনাবাহিনীর মেজর খালেদ ইসলামবুলী রহিমাহুল্লাহর হাতে আনোয়ার সাদাত-এর সমাপ্তি ঘটে।

রুশবিরোধী জিহাদ শুরু হবার পর শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতে লাব্বাইক বলে শায়খ

[499]

আইমান রহিমাহুল্লাহ খোরাসানে হিজরত করেন। রুশ জিহাদে জিহাদী নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য অর্জন করেন। রাশিয়া চলে যাবার পর আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদেও তিনি শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন। বসনিয়ায় জিহাদ শুরু হলে এবং আফগানিস্তানে রাশিয়ার পরাজয়ের পর শিশানে যখন কাজ পুনরায় বেগবান হয়, তখন তিনি দাঈ ও অভিভাবক হন। এরপর যখন ৯০ এর দশকের শুরুর বছরগুলোতে আফগানিস্তানে আইএসআই এবং মার্কিন সিআইএ'র ষড়যন্ত্রের ফলে আফগান মুজাহিদীনের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তখন মীমাংসার সকল প্রচেষ্টার পর এজাতীয় ফিতনা থেকে দূরে থাকার জন্য তার গুরু শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সুদানে হিজরত করেন। সুদানে থেকে আরব বিশ্বে মার্কিন স্বার্থ বিরোধী জিহাদের প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করেন। সে সময় যখন আলজেরিয়াতে সেনাবাহিনীর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় জিহাদ আরম্ভ হয় এবং কিছু কট্টরপন্থি লোকের অজ্ঞতা ও সরকারি এজেন্টদের ষড়যন্ত্রের কারণে অবস্থা শোচনীয় হতে আরম্ভ করে, শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহও আলজেরিয়ার মুজাহিদীনকে সংশোধনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর যখন আমেরিকা এবং আরব রাষ্ট্রগুলো শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহকে আশ্রয় দেবার অভিযোগে সুদানকে বয়কট করে কঠিন অবস্থা সৃষ্টি করে, তখন সুদান সরকার মুজাহিদীনকে বের করে দেয়। সে সময় আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদের নেতৃত্বে একটি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্ধেকের বেশি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। মোল্লা মুহাম্মাদ উমর আমীরুল মুমিনীন হবার সংবাদ পেয়ে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ সহচরদের সঙ্গে পুনরায় আফগানিস্তানে হিজরত করেন। ফেরার জন্য শায়খ আইমান

[500]

রহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ স্থল ভ্রমণের পথ অবলম্বন করেন। দাগিস্তানও অতিক্রম করতে হয় তাকে। সেখানে বর্ডার ক্রস করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন। দাগিস্তানে অবস্থানের ফলে শিশানের মুজাহিদীন এবং সেখানকার জিহাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়। মুক্তি লাভের পর অনেক প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে সুদান থেকে বের হওয়ার দেড় বছর পর এক দীর্ঘ প্রতিকূল ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তালেবান শাসনের প্রথম দিকে তিনি আফগানিস্তান পৌঁছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় নিজের গুরু শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়ে আল-কায়েদা গঠনে অংশ নেন এবং ক্রুসেডার জয়নবাদী যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে বৈশ্বিক রণাঙ্গন তৈরির ঘোষণা করেন। আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণায় তিনি শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ছিলেন এবং ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকার হামলা সহ অন্যান্য বড় হামলার পরিকল্পনায় তিনিও শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে শরীক ছিলেন।

শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ ইমারতে ইসলামিয়ার শাসনামলে আফগানিস্তানে উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে সরাসরি ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করেন এবং বেশ কিছু স্তর অতিক্রম করেন। তিনি ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী হন। তার রচনাবলীতে শরঈ জ্ঞান সম্ভারের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পারিবারিক সাহিত্য রুচির ঝলকও তার লেখালেখিতে দেখা যায়।

বৈশ্বিক জিহাদের প্রজ্ঞাবান পরিচালক

[501]

১১ই সেপ্টেম্বরের হামলাগুলোর পর জাযিরাতুল আরবে মুজাহিদীন যখন মার্কিন স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম আরম্ভ করে, তখন শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে যান। ইরাকে মার্কিন হামলার পর সেখানে জিহাদ সুশৃঙ্খলভাবে আরম্ভ হয় এবং শায়খ আবু মুসআব যারকাবী রহিমাহুল্লাহ আমেরিকানদের ওপর ক্রমাগত হামলা শুরু করেন। নিজের কর্মকাণ্ড বৈশ্বিক জিহাদের সম্পৃক্ত করার জন্য শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এর প্রতি বায়আত ঘোষণা করেন। তখন ইরাকের জিহাদ বিশুদ্ধ পন্থায় পরিচালনা এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সব রকমের বিচ্যুতি থেকে বাঁচানোর জন্য শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহকেই নিযুক্ত করা হয়। আফ্রিকায় ক্রুসেডার এজেন্ডা এবং শরীয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হয় এবং ‘আল শাবাব’ নামে সেখানকার মুজাহিদীন সংঘবদ্ধ হন। তখন শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ ঐ জিহাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন। ইয়েমেনের গোত্রগুলো যখন মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের বিশেষ কেন্দ্র হিসেবে ইয়ামেন শক্তিশালী হয়, তখন শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ ওই আন্দোলনের প্রাণভোমরা ও অভিভাবক ছিলেন। লাল মসজিদ অপারেশনের পরে যখন পাকিস্তানে জিহাদ ঘোষণা হয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুজাহিদীন সঙ্ঘবদ্ধ হন, তখন তাদেরকে জিহাদের বাস্তব রূপরেখা তৈরি করে দেয়ার জন্য, কার্যক্ষেত্রে তাদেরকে পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্য শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহই নিজ সাথিদের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমনকি যখন উপমহাদেশের মুজাহিদীনকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সঠিক পথে আনার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে তাদেরকে আল-কায়েদা উপমহাদেশ নামে সংঘবদ্ধ করা

[502]

হয়, তখন শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহই তাদের পেছনে চেষ্টা ব্যয় করেন এবং দিকনির্দেশনা দেন। সিরিয়ার মজলুম মুসলিমগণ যখন নিজেদের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সেখানকার তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে, সেখানেও প্রথম দিন থেকেই শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ তাদের পক্ষে দাঈ ও নেতার ভূমিকা পালন করেন। এক কথায়, অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ বিস্তৃত তার দাওয়াত আজিমত হিজরত জিহাদ নিরবচ্ছিন্ন ইস্তিকামাত, (আহ্বান, দৃঢ় সংকল্প, স্বদেশ ত্যাগ, আল্লাহর পথে লড়াই এবং অবিচলতা) গোটা উম্মাহর সমস্যা সম্পর্কে অবগতি এবং উম্মাহর অসংখ্য ইসলামী আন্দোলনের পথনির্দেশনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জিহাদী অঙ্গনের এই মহান নেতা, আলেমে রব্বানী, দুনিয়া বিমুখ, ইবাদতগুজার, সাহিত্যিক, কবি ও ইসলামের মহান মুজাহিদকে এমন মর্যাদা দান করেন, যার ভিত্তিতে মুজাহিদীন তাকে হাকীমুল উম্মাহ উপাধিতে ভূষিত করে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার সকল সমস্যায় বিশেষ পথ নির্দেশনা আসে এবং তিনি আল্লাহ তাআলার ওলীদের মতো পূর্ণ দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতা সহকারে সমস্যার মোকাবেলা করেন। তিনি কারাবাস করেছেন, আল্লাহর জন্য পথে পথে ঘুরেছেন, পাহাড়ের গুহা এবং পরিখায় অবস্থান করেছেন, বরফের পাহাড় পাড়ি দিয়েছেন, এই পথে তার স্ত্রী ও সন্তানের শাহাদাতের সাক্ষী হয়েছেন, তাদের কারাবাস দেখেছেন, কিন্তু আল্লাহর এই ওলী পাহাড়ের মতো অবিচল থেকেছেন এবং সকল পরীক্ষায় ধৈর্য সহকারে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। ক্রুসেডারদের যত হামলা, শত্রুপক্ষের যত প্রতিকূলতা ও বয়কট— সবকিছু তার ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের উদ্দীপনা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে সত্যের পথে

[503]

অবিচল রাখুন এবং সকল বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা থেকে হেফাযত করুন, আল্লাহ তার সাহায্যকারী হোন, আমীন।

আপন গুরু শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর মতোই শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ মুসলিম উম্মাহর প্রতি স্নেহ ভালোবাসায় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন। উম্মাহর বিভিন্ন শ্রেণিকে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করার আহ্বায়ক ছিলেন। হিজরত, রিবাতের পথে অবিচলতা এবং বিভিন্ন ফ্রন্টে মুজাহিদীনের সাধারণ নেতৃত্বে থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জিহাদী কল্যাণ সম্পর্কে অবগতি এবং শরীয়াহর রাজনৈতিক জ্ঞানে গভীরতা দান করেছিলেন। বর্তমান বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন ও মুজাহিদীনের মৌলিক দাওয়াতের বিষয়বস্তুই শায়খ আইমানেরও দাওয়াতের বিষয়বস্তু। কিন্তু কিছু বিশেষ বিষয় রয়েছে, যেগুলো সাধারণ মুজাহিদীন এবং মুসলিম উম্মাহকে বোঝানো শায়খ আইমানের অগ্রগণ্যতার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

দীন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক পন্থায় সম্ভব নয়
শায়খ মনে করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা পবিত্র শরীয়তের আলোকে জীবন যাপন করতে না পারবে, ততদিন তাদের মাঝে স্থিতিশীলতা আসবে না। তিনি শরীয়ত বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক পন্থাগুলোকে উম্মাহর সঙ্গে ঠাট্টা ও প্রতারণার উপাখ্যান বলে ব্যক্ত করেন। গণতন্ত্রের নামে মানব রচিত আইন-কানুনকে তিনি শুধু আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহই মনে করেন না; সেগুলোর জাগতিক ক্ষতি ও নিহিত অপকারগুলো স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন। কিন্তু যেহেতু তিনি একজন দাঈ ছিলেন এবং উম্মাহকে ভালোবেসে সম্বোধন করেন, তাই উম্মাহর যতগুলো আন্দোলন [504]

উসমানীয় খেলাফত পতনের পর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অস্তিত্বে এসেছিল, সবগুলোকেই তিনি মূল্যায়ন করেন এবং ন্যায়পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করেন। বিশেষ করে যে সমস্ত আন্দোলন গণতান্ত্রিক পথ ও পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবিদার, শায়খ বন্ধু ও মুসলিম ভাই সুলভ আচরণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপকারিতা এবং মুখোশের পেছনের বীভৎস চেহারা তাদের সামনে উন্মোচন করেন। নিজ বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি খোলা মনে উলামায়ে কেরাম এবং আল্লাহর দীনের ঐ দাঈদের অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করে। কোনো প্রকার গালাগাল ছাড়া ইজতিহাদী (আইনশাস্ত্রীয়) মতপার্থক্যের মূলনীতি রক্ষা করে শায়খ শ্রদ্ধাভরে তাদের নাম উচ্চারণ করেন। অতঃপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপকারিতা তুলে ধরেন। তিনি কখনও গণতন্ত্রের শরঈ ও বুদ্ধিজাত অসারতা বর্ণনা করেন, কখনও এর ধোঁকা-প্রতারণা, কখনও গণতান্ত্রিক সমাজে অমানবিক শ্রেণি বৈষম্যের কথা, আবার কখনও গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ তিনি তুলে ধরেন। তিনি মুসলিমদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন সবিস্তারে অধ্যয়ন করেন এবং সেগুলোর অনৈসলামিক ধারাগুলো চিহ্নিত করেন। সরকারের আইন ও সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ওই প্রতারণাগুলো তিনি স্পষ্ট করেন, যেগুলো ব্যবহার করে দীনের শত্রুরা এবং নিষ্ঠাবান কেউ কেউ জাহিলী আইনকে ইসলামিক বলার চেষ্টা করে। শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি ওই শুষ্ক মস্তিষ্ক আলেমের মতো ছিল না, যিনি প্রাচীন ও পরবর্তী ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের উদ্ধৃতির মাধ্যমে গণতন্ত্রের ব্যাপারে ফাতওয়া সংকলন করেন, সেমতে গণতন্ত্রকে কুফর ও শিরক বলার পর গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা পোষণকারী সকলের ব্যাপারে এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন—যেমনটা

[505]

কাফেরদের ব্যাপারে পোষণ করা হয়; বরং শায়খ রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, উসমানীয় খেলাফতের পতন এবং ঔপনিবেশিক যুগ বেশিদিন হয়নি বলে মুসলিম উম্মাহকে সমকালের সবচেয়ে বড় মূর্তি গণতন্ত্র বোঝানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপর থেকে যখন উম্মাহর সংস্কার ও বিপ্লবী আন্দোলনের একটি বড় অংশ এবং উলামায়ে কেরামের মাঝে কেউ কেউ গণতান্ত্রিক পন্থাগুলোকে ইসলামী পন্থা এবং গণতন্ত্রকে ইসলামী গণতন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করছেন, এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিমদের জন্য এই বিষয়টা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন ও আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে— যা উম্মাহকে আপন করে নেয়া ছাড়া বোঝানো সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে শুধু ফাতওয়া ব্যবহার সম্ভবত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে না; বরং গণতন্ত্রের মাঝে যত ধরনের দীনী ও জাগতিক অপকারিতা নিহিত রয়েছে, সেগুলো ভালোবাসা ও প্রজ্ঞার সহিত সুস্পষ্ট আকারে মুসলিমদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষের পাশাপাশি ঈমানদারদের প্রতি ভালোবাসাও জরুরি
শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ আলেম ছিলেন, নেতাও ছিলেন, আবার চিকিৎসকও ছিলেন। এই তিন প্রকার যোগ্যতা তাকে প্রজ্ঞাবান ও কর্ম কুশলী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। শায়খ রহিমাহুল্লাহ মুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে গিয়ে এ বিষয়ের খেয়াল রাখেন যে, আমাদের মাঝে এবং মুসলিম উম্মাহর জনসাধারণের মাঝে আসল সম্পর্ক আল-ওয়ালা (আল্লাহর জন্য ভালোবাসাকে আল্ওয়ালা বলে) তথা বন্ধুত্ব সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ভালোবাসা ও সাহায্য সহযোগিতার। প্রিয়ভাজন ও বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াতের পন্থাই উম্মাহকে দাওয়াত দেওয়ার পন্থা হওয়া উচিত।

[506]

শায়খ রহিমাহুল্লাহ মনে করেন, যখন আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়েছেন ফেরাউনকে নম্রতার সঙ্গে দাওয়াত দেয়ার জন্য, তখন মুসলিম জনসাধারণ যাবতীয় অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের ভাই, তাই তাদেরকে নম্রতা ও মুহব্বতের সঙ্গে দীনের দাওয়াত দেয়ার অধিক উপযুক্ত তারা। এ কারণে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিতে গিয়ে নৈতিকতা-বিবর্জিত ভাষা ব্যবহার করা, গালমন্দ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলা এবং হুমকি-ধমকি দেয়াকে খুবই অপছন্দ করতেন। এমনকি শায়খ রহিমাহুল্লাহ যেখানে গণতন্ত্রের অপকারিতা আলোচনা করতেন, তখন পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে ওই হযরতগণের কথা তুলে ধরতেন, যারা নিষ্ঠা সহকারে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তিনি তাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা মূল্যায়ন, তাদেরকে শ্রদ্ধা করার এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সংকল্প ও অবিচলতা স্মরণ করিয়ে সত্যের পথে টিকে থাকার নসীহত করেন।

মুজাহিদীন নিজেদেরকে উম্মাহর সর্বোৎকৃষ্ট সারনির্যাস মনে করবে এবং উম্মাহর অবশিষ্ট অংশকে পাপিষ্ঠ গুনাহগার মনে করে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে— শায়খ রহিমাহুল্লাহ এমন চিন্তা-চেতনার ঘোর বিরোধী। তিনি যেহেতু উম্মাহর সকল শ্রেণিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাতে চান, এজন্য যে কেউ যেকোনো পন্থায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করতে চায়, শায়খ তাকে সাহস দেন, মনোবল বৃদ্ধি করেন এবং আরও অধিক প্রচেষ্টার উপদেশ দেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ ওই মুসলিমদেরকেও নিজের সাথি মনে করেন, যারা একটি কথার মাধ্যমে হলেও আমেরিকা এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধাচরণ করে। এমনকি যেই কাফেররা আমেরিকা এবং

[507]

মার্কিন বিশ্ব রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং নিজেরা মুসলিমদের উপর জুলুম-অত্যাচার না করে, শায়খ রহিমাহুল্লাহ তাদের প্রতিও সদাচরণ, ভদ্রতা ও ইনসাফের নসীহত করেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহর চিন্তা হলো, সুস্পষ্ট কোন কাফেরও যদি মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ না করে, তাদের প্রতিও সদাচরণ ও ইনসাফের হুকুম যেখানে রয়েছে, সেখানে মুসলিম জনসাধারণ সর্বস্থায় আমাদের সদাচরণ ইনসাফ ও সহমর্মিতার অধিক উপযুক্ত। তাছাড়া বর্তমান সময়ে মুসলিমরা মজলুম ও নির্যাতিত। একদিকে ক্রুসেডারদের নির্যাতন-নিষ্পেষণ অপরদিকে তাদের স্থানীয় তাবেদারদের জুলুম অত্যাচার, যারা ইংরেজ আমল থেকেই জুলুম-নির্যাতনে বেশ দক্ষ; এই সকল শ্রেণির নির্যাতন ও টর্চারে মুসলিম উম্মাহ যখন পিছপা হয়ে আছে, কুফরী শাসন ব্যবস্থার ভয় শতাব্দীকাল যাবৎ তাদেরকে কাবু করে রেখেছে—এহেন পরিস্থিতিতে যদি ওই কাফেরদের বানানো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অথবা সহাবস্থানের রাজনীতির মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের কিছু অধিকার নিশ্চিত করে অথবা তাদের উপর থেকে জুলুম-অত্যাচারের মাত্রা কমাতে চেষ্টা করে, তখন ভালোবাসা নম্রতা সহকারেই তাদেরকে পথ নির্দেশনা দেয়া উচিত। শায়খ রহিমাহুল্লাহ এমন হযরতদেরকে সম্বোধন করে বলেন, এটাতো কাফেরদেরই প্রতারণা ও যুদ্ধ কৌশল। একদিকে তারা আপনাদেরকে তোপের মুখোমুখি করবে অপরদিকে নিজেদের বানানো গণতন্ত্রে আপনাদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দেবে, যেন আপনারা সেই ব্যবস্থার সহযোগী হয়ে তাদের চিন্তা আপন করে নেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ এমন ব্যাধির চিকিৎসা স্নেহশীল চিকিৎসকের মতো করতেন। একদিকে রোগীর সঙ্গে ভালোবাসা অপরদিকে রোগের প্রতি ঘৃণা ও সতর্কতা— কিন্তু এই ঘৃণা রোগীকে ছুঁতে পারতো না।

[508]

শায়খ রহিমাহুল্লাহ মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে মুজাহিদীনের দূরত্ব মেনে নেন না। তিনি মনে করেন, মুজাহিদীন যেন উম্মাহর বড় অংশ থেকে সরে না দাঁড়ায় এবং আলাদা শ্রেণি বলে নিজেদেরকে বিবেচনা না করে। মুজাহিদীনের ওপর কোনো একক ঘরানার চিন্তার ছাপ তিনি পছন্দ করতেন না; বরং উম্মাহর এমন দল হিসেবে তাদেরকে দেখতে চান, যাদের মাঝে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল ঘরানা অংশগ্রহণ করবে কোন সংকীর্ণতা ছাড়াই।

আমেরিকাকে তার ঘরেই আঘাত করো

শায়খ রহিমাহুল্লাহ হলেন আমেরিকা এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীতে জিহাদের দাঈ। তিনি মনে করেন, আমেরিকা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশগুলোতে হস্তক্ষেপ থামাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই যুদ্ধের আগুন তার ঘর পর্যন্ত না পৌঁছবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তার শহরগুলো নিরাপত্তাহীনতায় না ভুগবে। তিনি উম্মাহর মাঝে আমেরিকার প্রতি ঘৃণাভাব বিস্তার করতে চাইতেন। তিনি আমেরিকার সামরিক কৌশল ও হামলা অপেক্ষা রাজনৈতিক চতুরতা ও মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণগুলো অধিক ভয়াবহ মনে করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে এ সম্পর্কে সচেতন করতে চান। মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গনে তার বিখ্যাত গ্রন্থ فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم - তথা ‘নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পতাকাতলের অশ্বারোহী দল’ এ কথার সাক্ষী। তিনি আমেরিকার অন্যায়গুলোর এমন নকশা এই কিতাবে অঙ্কন করেছেন, পাঠক আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। এমনিভাবে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং আমেরিকার অগ্রসৈনিক দলে থাকা—ব্যক্তি বা সংস্থা যাই থাকুক না কেন—সকল কিছুর বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেন। মুসলিমদের

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী সরকার ও সেনাবাহিনীর থেকে একেক জন মুজাহিদের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য তিনি মুজাহিদীনকে আহ্বান করেন এবং বলেন: তারাও যেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই আহ্বান পৌঁছে দেয়।

জালিম গোষ্ঠী এবং শরীয়ত-দ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ
শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ আমেরিকার তরে লড়াইরত স্থানীয় সরকারগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদের প্রবক্তা ছিলেন। এমনিভাবে যে সমস্ত দেশে স্থানীয় সরকার সরাসরি আমেরিকার পক্ষে লড়াই করছে না, কিন্তু মুসলিম জনসাধারণের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করে যাচ্ছে, তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে; যেমন ভারত কাশ্মীরের উপর, চীন পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের উপর, মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গার মুসলিমদের উপর এবং নুসাইরি শিয়া গোষ্ঠী সিরিয়ার মুসলিমদের উপর—শায়খ এ সমস্ত অঞ্চলের মজলুম মুসলিমদেরকে জালিম শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের আহ্বান জানান। কিন্তু খেলাফত প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত তিনি মূল শত্রু ছাড়া অন্যান্য গ্রুপের বিরুদ্ধে লড়াইকে সুন্নত পরিপন্থি এবং জিহাদের উদ্দেশ্য বিরোধী বলে মনে করেন; এমনকি যে সমস্ত গ্রুপ ও মাযহাব মুসলিমদের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন হিসেবে প্রসিদ্ধ তাদের বিরুদ্ধেও তিনি অবস্থান নেয়ার পক্ষে নন। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই পক্ষ সরাসরি তাগুত সরকারের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন শ্রেণির বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধের পক্ষে তিনি নন। যদি তারা শাসন ক্ষমতায় এসে মুসলিমদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে, তাদের

[510]

সম্মান ও রীতিনীতির ওপর হামলা করে , যেমন ইয়েমেনে হুথি শিয়া এবং সিরিয়াতে নুসাইরি শিয়া গোষ্ঠী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দীন ও ঐতিহ্যের উপর হামলা করেছে — এই অবস্থায় শায়খ রহিমাহুল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে পূর্ণ সহায়তা দেন এবং সমর্থন করেন।

জ্ঞানে পরিপক্কতা এবং উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সুসম্পর্ক

শায়খ রহিমাহুল্লাহ রচিত একটি গ্রন্থ التبرئة যা পাঠ করার দ্বারা তার উচ্চ গুণাবলি , উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সেই সঙ্গে তার জ্ঞান -পরিপক্কতা ও ফিকহী (ইসলামী আইন শাস্ত্রীয়) যোগ্যতা এবং উলামায়ে কেরামের সঙ্গে তার সুসম্পর্কের পরিমাপ করা যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে জিহাদ বিষয়ক শরীয়তী বিধি -বিধান সুবিন্যস্ত করেছেন এবং মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর উপর ইসলামী আইন শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। সেই আলোচনা পাঠ করে তার জ্ঞান গভীরতা পরিমাপ করা যায়। এমনিভাবে তিনি পরবর্তীতে উসুলুল ফিকহের (তথা ইসলামিক আইনের মূলনীতি নামক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের) ওপর نظم الورقات নামক গ্রন্থের এক খণ্ডের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ খুবই সাজানো গোছানোভাবে রচনা করেছেন। গ্রন্থটি দীনি ইলমে তার গভীরতার চিহ্ন বহন করে। এমনিভাবে দীনি আকীদা - বিশ্বাস , জিহাদের ফিকহী বিষয়বস্তুর উপর তার বহুবিধ রচনা , পুস্তক পুস্তিকা ও বয়ান বক্তৃতা দীনি উলুমে তার গভীরতা ও পরিপক্কতার সাক্ষী।

ইলমে দীন এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা তার রচিত গ্রন্থের ওই পরিচ্ছেদ পাঠ করার দ্বারাও

পরিমাপ করা যায়, যেখানে তিনি মুজাহিদীনের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী উলামায়ে কেরামের দীর্ঘ, বিশদ তালিকা উল্লেখ করেছেন। তিনি ওই তালিকায় একদিকে যেমন উলামায়ে কেরামের সম্মানিত নাম উল্লেখ করেছেন, সেই সঙ্গে তাদের ভালোবাসার কথাও স্বীকার করেছেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ আলোচনার মাধ্যমে এমন অভিযোগকারীদের দাবি অপনোদন করেছেন, যারা বলে, মুজাহিদীনের সঙ্গে উলামায়ে কেরামের সমর্থন নেই। সেই সঙ্গে মুজাহিদীনের অন্তরে উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন শ্রদ্ধাবোধ এবং তাদের দ্বারা উপকৃত হবার গুরুত্ব বসাতে চেষ্টা করেছেন। ওই তালিকায় একদিকে যেমন আরব বিশ্বের সমকালীন উলামায়ে কেরামের কথা এসেছে, তেমনি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ উলামায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারাই উলামায়ে কেরামের সঙ্গে তার মুহব্বত ভালোবাসা ঘনিষ্ঠতা এবং তার প্রতিও কিংবা শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর প্রতিও উলামায়ে কেরামের ভালোবাসার কথা স্পষ্ট হয়। বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনে সমর্থন ও সাহায্যের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মেহনতের কথা এভাবেই জানা যায়। ওই উলামায়ে কেরামের মাঝে মাওলানা নিজাম উদ্দিন শামযাঈ, মাওলানা আব্দুল্লাহ গাযী শহীদ রহিমাহুল্লাহ —যিনি শহীদ আব্দুর রশিদ গাযী রহিমাহুল্লাহর পিতা, মাওলানা ইউনুস খালেস রহিমাহুল্লাহ, মাওলানা জালাল উদ্দিন হক্কানী রহিমাহুল্লাহ, মাওলানা ফজলে মুহাম্মদ হাফিযাহুল্লাহ, মাওলানা উস্তাদ ইয়াসির রহিমাহুল্লাহ, শায়খ আব্দুল্লাহ জাকিরি রহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা আব্দুল আলী দেওবন্দী রহিমাহুল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের এই দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত পৌঁছার কিছু কারণ রয়েছে। জিহাদের ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ বিস্তারকারী গ্রুপের

[512]

পক্ষ থেকে শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি প্রথম কেবলা ফিলিস্তিন ভূমি তার মাতৃভূমি হওয়া সত্ত্বেও তা ছেড়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ে গিয়ে কেন বসেছেন অথচ ফিলিস্তিনের সমস্যা উম্মাহর মৌলিক এবং সর্বাধিক গুরুতর সমস্যা? ওখানে মুসলিমদের প্রথম কেবলা রয়েছে যেটি আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের নামাযের স্থান, ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের নিকটতম সময় রণাঙ্গনের কেন্দ্রীয় স্থান? শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর সময় সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ভূমির ফযীলত বর্ণনা করে কিছু মুরজিফ (জিহাদের ক্ষতিকারক গ্রুপ) শ্রেণির লোক আফগানিস্তান থেকে মুসলিমদেরকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করতো। কিন্তু শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ তো আফগানিস্তান জিহাদকেই ফিলিস্তিন ও আল আকসা স্বাধীন করার চাবি মনে করতেন। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তান জিহাদকে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের অংশ এবং গোটা উম্মাহর সমস্যা বলতেন। অপরদিকে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান, এর গভীর উপত্যকা, বিপজ্জনক পাহাড়ি পথ, উত্তপ্ত মরুভূমি এবং সর্বোপরি খোরাসান ভূখণ্ডের পাহাড়ি বীরপুরুষদের ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ, শরীয়ত অনুসরণের স্পৃহা, উন্নত চারিত্রিক উৎকৃষ্টতা, ভদ্রতা, সাহসিকতা, আতিথেয়তা ইত্যাদি গুণাবলির কারণে তিনি মনে করতেন, এখানে জিহাদ ছড়িয়ে গেলে ইংরেজদের দাসত্বের কারণে সামাজিকভাবে গাফিলতি ও উদাসীনতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন আরব গোষ্ঠী জেগে উঠবে। আরব এলাকাগুলোতে জিহাদ চালু হবে। অবশেষে এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে, যার ব্যাপারে কবি ইকবাল রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন:

“মরুভূমি থেকে বেরিয়েছেন যিনি, রোম সাম্রাজ্য উল্টে দিয়েছেন তিনি; সাধকদের কাছে এটি আমি শুনেছি। এই সিংহ আবার কবে জেগে উঠবে?”

[513]

আরব জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প
শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ জানতেন, মধ্যপ্রাচ্যের মরু সন্তানরাও পাহাড়ি অঞ্চলের বীরপুরুষদের অপেক্ষা ঈমান ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে কম নয়; কিন্তু তিনি মনে করতেন, পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ডুবে থাকা সামাজিক আবহের কারণে আরবের মরু সন্তানরা এখনও প্রকৃতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যথাযথ যত্নবান হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে বড় কথা, আরব জাতীয়তাবাদের যে বিষবাষ্প উপনিবেশবাদী পশ্চিমা বিশ্ব আরব সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেটাই বিশুদ্ধ দীন ইসলাম এবং উম্মাহ-ভিত্তিক আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা ছিল।

উসমানীয় খেলাফত দুর্বল করতে এবং মুসলিমদের কেন্দ্রীয় শক্তি নিঃশেষ করে দেবার জন্য আরব জাতীয়তাবাদের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। আরব জাতীয়তাবাদের স্লোগান ঘোষণাকারী ছিল সরাসরি ইহুদী-খ্রিস্টানরা; কিংবা পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত আমেরিকান ইউনিভার্সিটি বৈরুত

80এবং অন্যান্য মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সমাপনকারী ধর্মহীন চেতনার আরব চিন্তাশীলরা। জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে আরব সমাজগুলোতে তুর্কিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তুর্কিদের থেকে স্বাধীনতা লাভের নামে ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চালানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় খেলাফতের অধীন বিভিন্ন আরব রাজ্য ও

80 বৈরুতে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান ইউনিভার্সিটি বিগত দেড় শতাব্দী যাবত ইসলামী বিশ্বে সুপরিকল্পিতভাবে ক্রুসেডার জায়নবাদী ধ্যান ধারণার ছায়ায় দীক্ষা লাভকারী পশ্চিমা তাবেদারদের একটি শ্রেণী তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছিল। একদিকে যেমন আরব বিশ্বে ধর্মহীনতা ও বিশৃঙ্খলা বিস্তার এই ইউনিভার্সিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, অপরদিকে পাঠকদের জন্য চিত্তাকর্ষক তথ্য হচ্ছে, সমকালীন বিশ্বের আফগানি জাতীয়তা ধারণকারী ইহুদীদের দুই বড় তাবেদার জালমি খলিলজাদ এবং ডক্টর আশরাফ ঘানি উভয়জন বৈরুত-এর ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন।

[514]

প্রদেশ সাইকস পিকস চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয় এবং তাবেদারদের মাধ্যমে সেখানে সরকার পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যকে এক ডজনের অধিক দেশে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন সরকার গঠন করে উপনিবেশ আমলের অবসান দেখানো হয়। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বদেশ প্রেম, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ এবং স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও সরকারি সংস্থা গঠন করা হয়। অতঃপর শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বিষ মুসলিম প্রজন্মে ছড়িয়ে দেয়া হয়। যেই মুসলিমদের কাবা এক, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক, কুরআন এক এবং যে উম্মাহ এখন পর্যন্ত একই খেলাফতের অধীনে সোনালী যুগ পার করে এসেছে, তাদেরকে মিশরীয় কুয়েতি সুদানি লেবাননী শামী (সিরীয়) এবং সৌদি জাতীয়তাবাদের নেশায় ডুবিয়ে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ কেড়ে নেয়া হয়।

জাতীয়তাবাদের এই মূর্তি বর্তমান যুগের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রতিমা। এই মূর্তি -রাষ্ট্রগুলোকে আল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহর দীনের তরে ঐক্যবদ্ধ হবার পরিবর্তে জাতীয়তা স্বদেশ পূজা এবং স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একই জাতির সদস্য, একই দীন ও মিল্লাতের ভাই সীমান্তের কারণে বিদেশি হয়ে যায়। এই বিদেশিদেরকে অন্য দেশে পুরোপুরি ‘পর’ ভাবতে বাধ্য করানো হয় এবং শুধু স্বদেশের স্বার্থ ছাড়া তার সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্কের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। উম্মাহ-কনসেপ্ট-বিরোধী জাতীয়তার এই ধারণা মিডিয়া ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা প্রজন্মে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবেই নিজ দেশের বাইরে গোটা

[515]

পৃথিবীর মুসলিমগণ আপনার কাছে বিদেশি হয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন সরকারি অনুমোদনের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। আরব অঞ্চল যেহেতু মুসলিমদের কেন্দ্র ছিল, এজন্য ইংরেজরা এখানে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের এবং ইসলাম ভিত্তিক সামাজিক বন্ধনের ধারণা নির্দেশকারী যেকোনো চিন্তা আরব সমাজ থেকে বের করে দেয়। এক কথায় ইসলামের গোটা ইতিহাস জুড়ে যেখানে মুসলিমদের ধারণা ছিল— বন্ধুত্ব বা শত্রুতা হবে আল্লাহর দীনের জন্য, সেখানে তাদের এই ধারণা পুরোপুরি পাল্টে দেয়া হয় এবং ভৌগোলিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় সীমাকে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেন: চল্লিশের দশকে যখন ইংরেজরা আরব দেশগুলোকে বাহ্যত স্বাধীনতা দেয়, তখন দামেস্কের রেডিওতে এই গান প্রচার করা হয়: “আমি বাথ (সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি) কে এমন রব মেনে নিয়ে ঈমান আনছি, যার কোনো অংশীদার নেই; সেই সঙ্গে অদ্বিতীয় দীন (ও ধর্ম) আরব জাতীয়তার উপরেও ঈমান আনছি, [শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ রচিত: তাফসির ফী জিলালি সূরা তাওবাহ] (কুফরী বর্ণনা করা কুফরী নয়)

এমনিভাবে মিডিয়া ও শিক্ষা সিলেবাসের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমন সমাজ তৈরি করা হয়, যা আরব জাতীয়তাবাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত কিন্তু আল্লাহর দীন ও খেলাফতের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে কুন্ঠিত।

আফগানিস্তানের জিহাদই ফিলিস্তিনের জিহাদ শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ফিলিস্তিনে জিহাদে শরীক ছিলেন। কিন্তু যখন ফিলিস্তিন প্রতিরোধ যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয়ে যায় আল্লাহর [516]

বাণী সমুন্নত করার পরিবর্তে ফিলিস্তিনী জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষ নামের ধর্মহীন নেতৃত্ব

81শুধু জাতীয়তাবাদী
দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সেখানে সামরিক আন্দোলন আরম্ভ করে, তখন শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তানে গমন করেন এবং এটাকে ভিত্তি বানিয়ে বিশুদ্ধ ইসলামী আদর্শের ওপর জিহাদের জন্য উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করেন। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেন: « “যারা মনে করে, আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের দ্বারা ফিলিস্তিন সমস্যা গাফিলতির চাদরে ঢাকা পড়বে, তারা অবুঝ, অনবহিত। তারা জানে না, নেতৃত্ব কিভাবে তৈরি হয়, আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত হয়, কিভাবে এমন ভিত্তি রচিত হয়, যা ইসলামের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে জড়ো করে বিশৃঙ্খলা অপসারণের যোগ্যতা দেবে। মানুষজন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, আপনারা ফিলিস্তিন ছেড়ে আফগানিস্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ কথা ঠিক আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেখানকার মুসলিম মুজাহিদ জাতির সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। নিশ্চয়ই আফগানিস্তানই ফিলিস্তিন আবার ফিলিস্তিনই আফগানিস্তান।”

আরব এবং আফগান সমাজের পার্থক্য আফগানিস্তান এবং আরব সমাজের পার্থক্যকে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করতেন। উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্য জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পরিচালনার উপযুক্ত ভূমি হিসেবে আফগানিস্তান বাছাই করণ, আফগানদের চিন্তাগত

81 ফিলিস্তিনে ৪০-৫০ এর দশকে আরব জাতীয়তার আদর্শ নিয়ে গঠিত
স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মহীনতা ও ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাভাবনা এতটা বিস্তার লাভ করে— শাইখ আযযাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:— ওই আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের প্রতীকি নাম আবু জাহল আবু লাহাব রাখতেও লজ্জিত হতো না।

[517]

স্বাধীনতা এবং আরব সমাজে ছড়িয়ে পড়া চিন্তাগত বিকৃতি নিজের এক লেখায় বিশেষ উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরেছেন: « “যেহেতু শত্রুপক্ষ আরবদের ইতিহাস ও গুণাবলি ভালোভাবে জানে যে, তাদের মাঝে থাকা ভয়াবহ স্বভাবের ফলে তারা জিহাদের দাওয়াত খুব দ্রুত কবুল করে নেয়। কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফ মুখে মুখে রাখার সৌভাগ্যের কারণে অনুবাদ ছাড়াই শরীয়তের প্রমাণপঞ্জি তারা বুঝে যায়। এই কারণে শত্রুপক্ষ মুসলিম বিশ্বের উপর হামলার সময় আরব বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়। বিশেষ করে প্রচার মিডিয়ার ধ্বংসাত্মক আগ্রাসনের মাধ্যমে আরব সংস্কৃতি ও গুণাবলি পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য বিকৃত করে দেয়। প্রমাণ হিসেবে এই তথ্যই যথেষ্ট যে, বিবিসি [ব্রিটিশ প্রচার সংস্থা BBC পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়া যুদ্ধের অশ্বারোহী] ইংরেজি ভাষার পর সর্বপ্রথম আরবী প্রকাশনা আরম্ভ করে। অথচ এই পৃথিবীর মোট জনবসতির দেড় শতাংশ হলো আরব বিশ্ব। অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী যেমন চাইনিজরা গোটা পৃথিবীর মোট জনবসতির এক-পঞ্চমাংশ এবং উপমহাদেশও মোট জনগোষ্ঠীর এক-পঞ্চমাংশ। উপমহাদেশে মুসলিমদের সংখ্যা আরবদের চেয়ে বহুগুণ বেশি কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে আরব সমাজ ধ্বংস করা ব্রিটিশ রাজের উদ্দেশ্য ছিল।” » [শায়খ আতিয়াতুল্লাহর কাছে প্রেরিত শায়খ উসামা'র একটি পত্র থেকে সংগৃহীত]

আরব সমাজে ফিরিঙ্গিদের সামরিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি স্পষ্ট করার পর আফগানিস্তানের কিছু গুণাগুণ সম্পর্কে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ নিজ পত্রে এভাবে আলোকপাত করেন: « “অপরদিকে আফগানিস্তানের জনসাধারণ স্বভাবগতভাবেই দীনদার, সাদাসিধে, সহজ-সরল, ভোগ-

[518]

বিলাস থেকে দূরে এবং বিদেশিদের আগ্রাসনের প্রশ্নে আপসহীন।” »

ইমারতের ইসলামিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক, সাহায্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার

আফগানিস্তান ভূখণ্ডের কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও গুরুত্ব সে সময় বৃদ্ধি পায়, যখন ফখরে উম্মাহ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে ইমারতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমারতের ইসলামিয়ার গর্বোজ্জ্বল শাসন আমলে বিশ্বের মুসলিমগণ এক শতাব্দীর পর খেলাফতে রাশেদার পতাকা দেখেছিল। ইমারতে ইসলামিয়ার আমলে মুহাজির ও আনসারদের ঈমানী অঙ্গীকার পূরণের স্মৃতি এই কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ২০০১ সালে ইমারতে ইসলামিয়ার পতনের পরেও শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এবং তার সহচর শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ উভয়জন মনে প্রাণে ইমারতে ইসলামিয়ার অঙ্গীকারের দাবি পূরণ করেন। তারা মুসলিম উম্মাহকে ইমারত প্রতিরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং ইমারতের ভালোবাসা ও সাহায্যের অনুপ্রেরণা গোটা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দিতেন। নিজেদের সাথি-সঙ্গী ও সকল উপায় অবলম্বন ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। আফগানিস্তানের অধিকাংশ প্রদেশে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম সরবরাহে এই আকাবির হযরতদেরও মৌলিক ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ তো রীতিমতো ভেবে নিয়েছিলেন, খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলিম উম্মাহর অন্তরে ইমারতে ইসলামিয়ার মাহাত্ম্য বড়ত্ব ভালোবাসা বসানো জরুরি। ইমারতে ইসলামিয়ার [519]

মুজাহিদীনের সাহসিকতা, ঈমানী দৃঢ়তা, মুহাজিরদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, ইলমে দীন, হিকমতে রব্বানী বা ঐশী প্রজ্ঞা —এই সকল গুণ শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর অন্তরে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ভালোবাসা ও সাহায্যের অনুপ্রেরণা এবং তাদের নেতৃবৃন্দের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করে দেয়।

যেমনিভাবে আমেরিকা ও ন্যাটো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ আপন সাথিদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন। একইভাবে একদিকে যখন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সংবাদ আসে, অপরদিকে আন্তর্জাতিক বিদ্রোহী সংগঠন দায়েশের কারণে ইমারতে ইসলামিয়া কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়, তখন শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ ইমারতে ইসলামিয়ার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ওই সময়ে যখন কিছু ব্যক্তি নতুন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মনসুর রহিমাহুল্লাহকে বায়আত দিতে দ্বিধা- দ্বন্দ্বে ছিলেন, ফিতনাবাজ ও ষড়যন্ত্রী চক্র মতবিরোধের আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করছিল, শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ তখন অগ্রসর হয়ে প্রকাশ্যে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মনসুর রহিমাহুল্লাহকে হিজরত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং খেলাফতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার বায়আত প্রদান করেন। তার বায়আতের পর আফগানিস্তানের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল মুজাহিদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন আমীরুল মুমিনীনকে বায়আত দিতে এবং নব উদ্যমে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত হতে তৈরি হয়ে যান। শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর এই বায়আতে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরের মুজাহিদীনই শুধু নয়; গোটা বিশ্বের মুজাহিদীন ইমারত

[520]

ইসলামিয়ার সারিতে দাঁড়িয়ে উম্মাহর ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মনসুর রহিমাহুল্লাহ একটি বিবৃতি দিয়ে তার বায়আত গ্রহণ করেন। এমনভাবে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধারাবাহিক বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে ফখরুশ শুহাদা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মনসুর রহিমাহুল্লাহকে পাক সেনাবাহিনীর সহায়তায় আমেরিকানরা ড্রোন হামলায় শহীদ করে, তখন শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ বিশ্বস্ততার ধারা বজায় রেখে ২০১৬ সালে নতুন আমীরুল মুমিনীন শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ হাফিযাহুল্লাহকে একই পন্থায় জিহাদ ও খেলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়আত প্রদান করেন এবং নিজের সাথিদেরকে বরাবরের মতোই ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দের আনুগত্যের নসীহত ও উপদেশ দান করেন। তিনি নিজের বক্তৃতা বিবৃতি এবং লেখালেখির মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়ার প্রশংসনীয় গুণাবলি ও সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরতে থাকেন এবং উম্মাহর অন্তরে ইমারতের প্রতি মুহব্বত ও আস্থা বৃদ্ধির জন্য মৌলিক ভূমিকা পালন করেন।

শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ বলেন, তালেবান আন্দোলন এককভাবে এমন জিহাদী আন্দোলন, যার সর্বস্তরের নেতৃত্ব উলামায়ে কেরামের হাতে। তিনি تبرئة গ্রন্থে সহচর শায়খ আবু ইয়াহিয়া লিবী রহিমাহুল্লাহর একটি লেখা উদ্ধৃত করেন যেখানে তিনি লিখেছেন: « "আমরা স্পষ্ট আকারে ইনসাফের সঙ্গেই বলতে পারি, তালেবান (ইমারত) আন্দোলন বর্তমান সময়ের একমাত্র ইসলামি জিহাদী আন্দোলন, যেখানে উলামায়ে কেরাম এবং তালিবুল ইলমদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। শাসন ক্ষমতায় আসার আগেও উলামায়ে কেরাম এবং তালিবুল ইলমগণ এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন, ক্ষমতায় আসার সময়ও এবং বিলুপ্তির পর পুনরায় ক্ষমতায় আসার সময়ও

ইনশাআল্লাহ তারাই সর্বোচ্চ নেতৃত্বে থাকবেন। মানুষজন জিজ্ঞেস করে সেটা কবে হবে? জবাব হলো: আশা রয়েছে খুব দ্রুতই হবে।” »

শায়খ রহিমাহুল্লাহ ইমারতে ইসলামিয়ার বৈশ্বিক বিস্তৃতি কামনা করতেন। এ উদ্দেশ্যের জন্য তিনি জাযিরাতুল আরব আফ্রিকা সোমালিয়া ইরাক সিরিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের মুজাহিদীনকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহ থেকে আমীরুল মুমিনীন শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ পর্যন্ত সকলের ধারাবাহিক বায়আতে অন্তর্ভুক্ত করিয়ে এই ধারা আরও সুসংহত করে মুসলিমদের সর্বজনীন খিলাফাহ পুনরায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন।

খেলাফতে রাশেদা; স্বৈরাচারীদের খেলাফত নয় খেলাফতের ব্যাপারে শায়খ রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠাকে ফরয বলেন এবং অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ নিজের দেহ মন অর্থ সম্পদ পরিবার-পরিজন সহকারে এই খেলাফত পুনর্জীবিত করার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। এই উদ্দেশ্যের প্রতি মুসলিম উম্মাহর সর্বস্তরের আন্দোলনকে তিনি এভাবে আহ্বান জানান: « “ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে (এই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে) —এই খেলাফত কোনো জাতীয়তাবাদী, দলীয় বা স্বাদেশিক গোত্রপ্রীতি স্বীকার করবে না; আর না লুটেরাদের চাপিয়ে দেয়া রাষ্ট্রীয় সীমানা মেনে নেবে; বরং নববী মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন খেলাফত হবে, যার ভিত্তি হল সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য, ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সাম্য ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা—যা ইসলামের শত্রুদের নির্দেশিত সীমান্ত নিশ্চিহ্ন করবে, ইনসাফ, ন্যায়-নীতি, শুরা ব্যবস্থা, [522]

দুর্বলদের সাহায্য -সহযোগিতা এবং অধিকৃত মুসলিম ভূখণ্ড মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করবে।” [শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ রচিত وثيقة نصرة الاسلام - ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পত্র]

কিন্তু সেই সঙ্গে খেলাফতের নামে বিরোধীপক্ষকে গণহারে হত্যা করা, উম্মাহর আহলে হল ওয়াল আকদ (মুসলিমদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক সর্বোচ্চ পরিষদ)-এর পরামর্শ ছাড়াই মুসলিমদের উপর চেপে বসাকে নববী মানহাজের বিরুদ্ধাচরণ মনে করেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ মনে করেন, লুটেরা কাফের গোষ্ঠী এবং তাদের এজেন্টদের মোকাবেলায় অবিচলতার সঙ্গে জিহাদ করা, জুলুম -অত্যাচারের অবসান ঘটানো, আমর বিল মারূফ, নাহী আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজে বারণ করার দ্বারা এমন একটা সময় আসবে, যখন মুজাহিদীনই মুসলিমদের প্রকৃত নেতা হবেন। প্রকাশ্য বিষয় হলো, এটা তখনই হবে, যখন তাগুত গোষ্ঠীর পতন ঘটবে — যারা জুলুম -অত্যাচারের মাধ্যমে নামমাত্র মুসলিম বনে বসে আছে। এই জিহাদের ধারাবাহিকতার বরকতেই আল্লাহ তাআলা তার অটল অবিচল বান্দাদের হাতে এমন খেলাফত দান করবেন, যা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সর্বস্তরের মৌলিক নীতিমালার সারকথা হবে শুরা পরিষদ গঠন। পরিষদের মাধ্যমে মুজাহিদীনের বিভিন্ন গ্রুপ নিজেদের মাঝে একজন আমীর নির্বাচন করবেন এবং উক্ত পরিষদের মাধ্যমেই মুজাহিদীন ও উম্মাহর শীর্ষপরিষদ একজন খলীফা ও আমীরুল মুমিনীন নির্বাচন করবেন।

আদ-দাওলাতুল -ইসলামিয়া তথা দায়েশ যখন ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অংশ দখল করে খেলাফত ঘোষণা করে, তখন খেলাফত বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্পষ্ট আকারে আলোচনা করা আরও জরুরি হয়ে যায়। খিলাফাহ ঘোষণার পরপরই তাদের নেতাকে বায়আত দেয়া সকল মুসলিমের কর্তব্য বলে ঘোষণা করে এবং কেউ এর বিরোধিতা করলে

অথবা তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলে কাফের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করে দেয়। শুরুতে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ নিজের চিঠিপত্র ও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দায়েশের নেতৃবৃন্দকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মানহাজ থেকে বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং মুসলিমদের পরিবর্তে কাফেরদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কিন্তু শায়খ রহিমাহুল্লাহর পরামর্শ কট্টরপন্থিদের জন্য হিতে বিপরীত হয়। তাই তার প্রতিনিধি এবং ঘনিষ্ঠ সহচর শায়খ আবু খালেদ সুরী রহিমাহুল্লাহকে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়া হয় এবং এই খারেজীরা সিরিয়ার সকল জিহাদী জামাআতকে কাফের আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। তারা এখানেই থেমে থাকেনি; বরং তথাকথিত খিলাফাহ ঘোষণা করার পর গোটা পৃথিবীর সকল মুজাহিদীনের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিবাদ ও ফাটলের কারণ হয়। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও মুজাহিদীনের সারিতে থাকা কট্টরপন্থি এবং শরীয়তী বিধি-বিধান ও শিষ্টাচার সম্পর্কে অজ্ঞ শ্রেণি খারেজীদের খলীফার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে নিজেদের অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে আরম্ভ করে। সর্বত্র মুজাহিদ এবং তাদের সমর্থককে কাফের আখ্যা দেয়া হয়। মুসলিম উম্মাহর সাধারণ উলামায়ে কেরাম, মাদরাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ সমূহকে মুরতাদ গোষ্ঠী ও কুফরের আড্ডা আখ্যা দেয়া হয়। তারা খেলাফতের নামে মুসলিমদেরকে এবং বিশেষভাবে কাফেরদের আতঙ্ক মুজাহিদীনে ইসলামকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করতে আরম্ভ করে।

তখন দাওয়াত ও জিহাদের ইমাম শায়খ যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ সময়ের দাবি উপলব্ধি করেন এবং এই ফিতনা থেকে মুসলিম উম্মাহকে বাঁচানো, কট্টরপন্থি ধ্যান-ধারণা অপনোদন এবং মুজাহিদীনের সংশোধনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে

[524]

কয়েক বছর পর্যন্ত নিজের অধিকাংশ বয়ান বক্তৃতা ও বিবৃতিতে দায়েশের বিভ্রান্তিকর চিন্তা- ধারণার খুবই দক্ষতার সাথে খণ্ডন করেন। একদিকে যেমন তাদের নেতৃবৃন্দের প্রতি নসীহত করেন, অপরদিকে মুজাহিদীনের জন্যেও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ও খিলাফতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার নববী মানহাজ ও পন্থা স্পষ্ট করেন। জিহাদী সংগঠনগুলোকে কট্টরপন্থা ও অন্যায় জুলুম-নির্যাতনমূলক অবস্থান থেকে বাঁচানো ওই সময়ে শায়খ রহিমাহুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ কর্মব্যস্ততা ছিল। জিহাদী সংগঠনগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দায়েশের উত্থাপিত সংশয় অপনোদন, ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতি সমর্থন এবং মুজাহিদীনকে আহলে সুন্নাহ হল জামাত-এর আকীদা মানহাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার ক্ষেত্রে সে সময়ে শায়খ রহিমাহুল্লাহকে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা তাকে গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে ভরপুর উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন।

এই পর্যায়ে অজ্ঞ শ্রেণি অথবা অগভীর অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীরা মনে করতে পারে, শায়খ রহিমাহুল্লাহ দায়েশকে সমস্যায় ফেলার কারণেই তারা আল-কায়েদা ছেড়ে তার আনুগত্য প্রত্যাহার করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দায়েশের প্রধান ব্যক্তি তো শায়খের আনুগত্য ও গুণকীর্তন করতেন এবং অধিক মাত্রায় তার গুণাগুণ বর্ণনা করতেন। তার প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করতেন। যদি শায়খ রহিমাহুল্লাহ নিজের দল বা সংগঠনকেই শক্তিশালী করতে চাইতেন, তাহলে তো শুরুর দিকে সিরিয়া ও ইরাকে তাদের অন্যায় কাজে নীরব থাকতে পারতেন এবং গোপনে তাদেরকে সমর্থন দিয়ে যেতেন; কারণ শুরুতে দায়েশ সকল কার্যক্রম আল-কায়েদার নামেই করেছিল। এছাড়াও আরেকটা বাস্তবতা হলো, শায়খ রহিমাহুল্লাহ দায়েশ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর আগে থেকেই ইরাকের

[525]

মুজাহিদীনের কিছু চিন্তা ও আচরণগত ত্রুটির ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে ইরাকের মুজাহিদীনকে তিনি নসীহত ও সতর্কবার্তা পাঠাতেন। ২০০৭ সালে যখন দাউলাতুল ইরাক নামে কিছু ইরাকি মুজাহিদ শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ, শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ এবং তার সঙ্গী-সাথিদের পরামর্শ ব্যতিরেকেই জোট গঠন করেন, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আগে অস্তিত্বের দাবি করেন, শায়খদের সেটা ভালো মনে হয় না। তারা ইরাকের অন্যান্য মুজাহিদ দলের অধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা করেন। তারা ওই সময় থেকেই ইরাকের মুজাহিদীনকে সংগঠনের বাইরের লোকদের সঙ্গে নম্র আচরণ, ঈমানী আখলাকের উদাহরণ উপস্থাপন, উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন, মুসলিমদের রক্তপাতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন এবং তাকফীরের বিষয়ে কট্টরপন্থা পরিহারের নসীহত করতে আরম্ভ করেন। একথা ঠিক দায়েশের পথভ্রষ্টতা স্পষ্টভাবে তখনি সামনে আসে, যখন তারা সিরিয়ার মুজাহিদীনকে হামলা করে, খারেজীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের দলের বিরোধী সবাইকে কাফের আখ্যা দিতে আরম্ভ করে। তখন শায়খ রহিমাহুল্লাহ নিজ থেকেই এই গ্রুপকে আল-কায়েদা থেকে বহিষ্কার করেন এবং তাদেরকে থামাবার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েন; এমন নয় যে, দায়েশ নিজ থেকে আল-কায়েদা ছেড়ে চলে গিয়েছে। অভিযোগকারীদের আরও ভাবা উচিত, ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে খারেজীদের উত্থানের পর তাদের বিভ্রান্তির ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত হয়েছিল, অথচ তারাও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শেরে খোদা হায়দার আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহচর ছিল। পরবর্তীতে যখন তাদের সংশোধনের ব্যাপারে সাইয়েদুনা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিরাশ হয়ে যান, তখন

[526]

সর্বপ্রথম তিনিই তাদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন।

জিহাদী মানহাজের সংস্কার
আফগানিস্তানে রাশিয়ার বর্বর হামলার পর শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আন্তর্জাতিক দাঈ ও অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। আরব-অনারব হাজার হাজার মুজাহিদ শায়খের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে রাশিয়ার মোকাবেলা করেন এবং আল্লাহর সাহায্যে রাশিয়াকে পরাজিত করেন। অতঃপর মুহসিনে উম্মাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ মসজিদে আকসার স্বাধীনতার জন্য এবং আমেরিকার বিশ্বব্যাপী জুলুম-অত্যাচার বন্ধের জন্য জিহাদের ঘোষণা করলে আবারও গোটা মুসলিম বিশ্ব হাজার হাজার মুসলিম সন্তানকে ক্রুসেডার জায়নবাদী আগ্রাসনের মোকাবেলায় পাঠিয়ে দেয়। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর মুসলিম উম্মাহর মাঝে জিহাদী নবজাগরণ তৈরি হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র— যেমন পাকিস্তান, ইয়ামেন, সোমালিয়া, আলজেরিয়া, মালি, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রীতিমতো সুশৃঙ্খল জিহাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন মুসলিম বিশ্ব এবং পাশ্চাত্যের কয়েক ডজন দেশে ক্রুসেডার জায়নবাদী যৌথ শক্তি এবং তাদের মিত্র গোষ্ঠী বড় রকমের আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর আল-কায়েদার উত্থানে এই অধিকাংশ আন্দোলন বায়আত, সাহায্য-সহযোগিতা অথবা নিদেন পক্ষে চিন্তাগত সমঝোতার ভিত্তিতে এক সূত্রে গ্রথিত হয়। এ অবস্থায় শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর উত্তরসূরি শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ এই বৈশ্বিক আন্দোলনের মুরুব্বী অভিভাবক সংস্কারক ও রূপকার হিসেবে সামনে আসেন। তিনি নিজের পুস্তক-পুস্তিকা,

[527]

বয়ান -বক্তৃতার মাধ্যমে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, অভিযোগকারীদের প্রশ্নের জবাব দেন, উচ্চতর ইসলামী চরিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখান, সামরিক বা জিহাদী কল্যাণ বোঝাতে থাকেন, ভুল সংশোধন করেন এবং যাত্রাপথে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যাবৎ নিজের দাওয়াতী ও জিহাদী অভিজ্ঞতার সারনির্যাস প্রজ্ঞা ও স্নেহ দিয়ে মুজাহিদীনকে তিনি বোঝাতে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন সূক্ষ্ম বিষয় এড়িয়ে যেতেন না। এ পর্যায়ে তিনি নিজের চিন্তাধারা সুবিন্যস্তভাবে মুসলিম উম্মাহর সামনে উপস্থাপনের জন্য ২০১২ সালে দুইখানা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণপত্র তৈরি করেন। প্রথমটির শিরোনাম 'ইসলামের প্রতিষ্ঠার প্রমাণপত্র'[82] এবং দ্বিতীয়টির শিরোনাম 'মুজাহিদীনের জন্য জিহাদী কার্যক্রম বিষয়ক সাধারণ দিকনির্দেশনা'[83]

প্রকৃতপক্ষে প্রমাণপত্র দুটি শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর দাওয়াত, চিন্তাধারা, মানহাজ, উচ্চতর চারিত্রিক উৎকৃষ্টতা এবং কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কিত উপলব্ধির সার নির্যাস। প্রথম পত্রে সকল মুসলিমকে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেন। দ্বিতীয় পত্রে শরীয়াহ রাজনীতির নীতিমালা অনুসারে দীনী কল্যাণ সাধন এবং জিহাদের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে মুজাহিদীনকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহর তৈরিকৃত এই প্রমাণপত্রগুলো গোটা পৃথিবীর মুজাহিদীন ও ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর জন্য কর্মসূচি হবার মতো। এই দিকনির্দেশনার আলোকে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। এ পর্যায়ে প্রমাণপত্রগুলো থেকে কিছু

---

[82] وثيقة نصرة الإسلام

[83] التوجيهات العامة للعمل الجهادي

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরা সমীচীন মনে হচ্ছে, যেন পাঠক বর্গের সামনে আল-কায়েদার চিন্তাধারা, মানহাজ ও কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত আকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সার কথা কখনও মূল পুস্তকের বিকল্প হতে পারে না। তাই পাঠকবর্গের উচিত মূল পুস্তক দেখে নেয়া।

ওয়াসিকা নুসরতিল ইসলাম (ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রমাণপত্র)
যখন গোটা পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর ওপর বিভিন্নভাবে ক্রুসেডার শক্তি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তাদের সমর্থক শাসকবর্গের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠছে, এহেন পরিস্থিতিতে আল-কায়েদা গোটা মুসলিম উম্মাহকে তাওহীদের বাণী ঘিরে ঐক্যবদ্ধভাবে লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে চলার আহ্বান জানাচ্ছে:

০১. মুসলিমদের অধিকৃত ভূখণ্ডের (যেমন ফিলিস্তিন কাশ্মীর শীশান প্রভৃতি রাষ্ট্রের) স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা, এমন যেকোনো সন্ধি চুক্তির বিরোধিতা করা, যেগুলো এ সমস্ত ভূখণ্ডের উপর কাফেরদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে।

০২. মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলোতে পবিত্র শরীয়ত পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা। এই পথে যারাই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তাদের বিরোধিতা করা— চাই তারা জনপ্রতিনিধি নামক গণতান্ত্রিক সরকার হোক কিংবা জাতিসংঘের আদলে পাঁচ

84কুফরী পরাশক্তি নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হোক।

84 জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫ সদস্য রাষ্ট্র আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের দিকে ইশারা করা হয়েছে

[529]

০৩. আমেরিকাসহ অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রের হাতে থাকা মুসলিম উম্মাহর মূল্যবান সম্পদ তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা এবং লুটেরাদেরকে প্রতিহত করা।

০৪. মুসলিম ভূখণ্ড জবরদখলকারী, কাফেরদের এজেন্ট শাসকবর্গের বিরুদ্ধে মজলুমদের আন্দোলনকে সমর্থন দেয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং সেই সঙ্গে শরীয়তী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবীদের মানসগঠন করা।

০৫. অত্যাচারী জালিম গোষ্ঠীর মোকাবেলায় দুনিয়ার সকল মজলুমকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

০৬. নবুওয়াতের আদলে খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা করা। জাতীয়তা, সংকীর্ণ ও অন্যায় গোত্রপ্রীতি প্রত্যাখ্যান করে উম্মাহর ধারণা অবলম্বন করে শুরা ভিত্তিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম ব্যয় করা।

০৭. সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রতি মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ এই প্রমাণপত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান এবং প্রতিটি আন্দোলনকে এই সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। বাস্তবতা হলো: এই বিষয়গুলো প্রতিটি সচেতন মুসলিম হৃদয়ের দাবি। এগুলো ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ ধর্মীয় আন্দোলনের ভিত্তি। তবে কেনই বা এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো না?

[530]

জিহাদী কার্যক্রমের সাধারণ দিকনির্দেশনা

জিহাদী কার্যক্রম সুবিন্যস্ত করা এবং মুজাহিদীনের জন্য কর্মসূচি পেশ করার উদ্দেশ্যে তিনি উপর্যুক্ত শিরোনামে দ্বিতীয় প্রমাণপত্রটি তৈরি করেন, যার সারসংক্ষেপ এরকম:

০১. আমাদের সামরিক কার্যক্রমের প্রথম টার্গেট আমেরিকা এবং ইসরাইল। দ্বিতীয় টার্গেট তাদের স্থানীয় মিত্র শক্তি। আমেরিকাকে ক্রমাগত স্বতন্ত্র আঘাতে দুর্বল করে দিতে হবে, যেন মুসলিম বিশ্বে তার কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায় এবং নিজে থেকেই আমেরিকার স্থানীয় মিত্রদের পতন ঘটে।

০২. কাফেরদের স্থানীয় মিত্রদের ব্যাপারে নীতিমালা হলো, যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা; কিন্তু যখন তারা ক্রুসেডারদের সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হবে এবং সংঘর্ষ এড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া।

আমাদের দাওয়াতের মৌলিক তিনটি অঙ্গ:

ক) উম্মাহকে ক্রুসেডার হামলার প্রকৃতি বুঝানো এবং প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করা।

খ) আল্লাহর অবতীর্ণ শরীয়ত বাস্তবায়নের দাওয়াত।

গ) মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সাধন, কাফেরদের নির্দেশিত রাষ্ট্রীয় সীমারেখা মুছে দিয়ে অখণ্ড মুসলিম জাহান ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার দাওয়াত।

০৪. আমাদের দাওয়াতী কাজেরও দুটি অঙ্গ। একটি হলো মুজাহিদীনের ধর্মীয় ও চিন্তাগত উন্নয়ন; অপরটি হল জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে ক্রুসেডারদের

[531]

বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা।

এই দাওয়াতী ও সামরিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পবিত্র শরীয়তের আলোকে নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়:

০১. মুসলিম সমাজগুলোতে বিশেষভাবে মুজাহিদীনের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, যেন জিহাদী আন্দোলনের সদস্যগণ শরীয়াহর বিধি- বিধানের প্রতি যত্নবান থাকেন; মুসলিমদের প্রতি দয়াশীল এবং কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হন। বিপ্লবীরা যেন জিহাদী যাত্রায় নববী পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

০২. সামরিক কার্যক্রমে কাফের গোষ্ঠীর প্রধান আমেরিকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং গোটা পৃথিবীতে সকল মুজাহিদ মার্কিন স্বার্থে আঘাত করাকে মৌলিক উদ্দেশ্য জ্ঞান করবে।

০৩. কাফেরদের কারাগার থেকে মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করাও বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে।

০৪. আমেরিকা ছাড়াও অন্য কোনো জালেম কাফের শক্তি যদি মুসলিম অঞ্চলে চড়াও হয়.. যেমন কাশ্মীরে ভারত, শিশানে রাশিয়া.. এমনিভাবে বার্মা ও পূর্ব তুর্কিস্তান প্রভৃতি.. তবে সেখানকার মুসলিমদের ধর্ম, প্রাণ ও সম্পদের ওপর আগ্রাসনকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওই অঞ্চলের মুসলিমদের কর্তব্য।

০৫. মুসলিম অঞ্চল জবরদখলকারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা হবে এবং ক্রুসেডারদের দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া হবে। তবে যেখানে স্থানীয় সেনাবাহিনী আমেরিকা অথবা

[532]

ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর অংশ হয়ে সামনে আসবে, সেখানে ভিন্ন কথা (যেমন আফগানিস্তানে আমেরিকানদের তাবেদার মিলিশিয়া)। স্থানীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পরিস্থিতি চলে এলে মুসলিম উম্মাহর সামনে স্পষ্ট থাকা চাই, ক্রুসেডারদের জোটে শামিল হওয়ার কারণেই স্থানীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া হচ্ছে; অন্য কারণে নয়।

০৬. যদি কখনও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশ্বাসঘাতক শাসক বর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামিয়ে প্রকৃত ক্রুসেডার বা মুশরিক কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের দাওয়াত বিস্তার করা হবে এবং নিরাপদ ঠিকানা গড়ার জন্য মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ব্যবহার করা হবে।

০৭. অবশ্য প্রতিরোধ যুদ্ধে ক্রুসেডারদের তাবেদার শাসকবর্গকে এমন জবাব দেওয়া চাই, যার দ্বারা তারা বুঝবে, মুজাহিদীনকে কাবু করা এত সহজ নয়; তাদের প্রতিরোধের সামর্থ্য রয়েছে।

০৮. পথভ্রষ্ট বিদআতী দলগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হবে। তবে কখনও যদি তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে তাদেরকে প্রতিরোধ করা হবে। কিন্তু শুধু আহলে সুন্নাতের ওপর হামলা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হবে; তার চেয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ি, ইবাদতখানা এবং জনসমাগমের স্থানকে কখনোই টার্গেট করা যাবে না। তবে এই সমস্ত বিভ্রান্ত দলের সংশয় অপনোদন এবং তাদের বিচ্যুতি স্পষ্ট করার ধারা চালু থাকবে। মুজাহিদগণ কোনো অঞ্চল দখল করলে সেখানকার পথভ্রষ্ট দলগুলোর সংশয় দূর করা কবে, তাদেরকে

[533]

দাওয়াত দেয়ার পর শরীয়তের মূলনীতির আলোকে তাদের সঙ্গে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করা হবে।

০৯. মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর সংখ্যালঘু গোষ্ঠী— যেমন খ্রিস্টান হিন্দু শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে লড়াই বা অত্যাচার নিপীড়ন পুরোপুরি পরিহার করতে হবে। যদি তারাই আগে অন্যায় কিছু করে তাহলে জবাব দেয়া হবে। কিন্তু তাদেরকে স্পষ্ট করে দিতে হবে, আমাদের লড়াই তাগুতি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আমরা চাই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

১০. যে সমস্ত ব্যক্তি বা দল সরাসরি মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশীদার নয়, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই পুরোপুরি পরিহার করা হবে। তাদেরকে কোনো প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন করা চলবে না। বৈশ্বিক ক্রুসেডার জোট এবং তার মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে।

১১. বেসামরিক নারী শিশুকে হত্যা করা অথবা অন্য কোনো ক্ষতি করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। চাই তাদের পুরুষেরা মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করুক কিংবা না করুক।

১৩. জনসমাগমের স্থান— মসজিদ, মাদরাসা, জানাযা অনুষ্ঠানের স্থান, বাজার প্রভৃতি সকল স্থানে শত্রুপক্ষকে হামলা করা থেকে বিরত থাকতে হবে— যেখানে অন্যদের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

১৪. উলামায়ে কেরামের সম্মান ও হেফাযত সুনিশ্চিত করতে হবে। যদিও উলামায়ে সু তথা নিকৃষ্ট আলেমদের সংশয় দলীল-প্রমাণের আলোকে দূর করা হবে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড ও লড়াই থেকে বিরত থাকতে হবে।

[534]

১৫. অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যে বিষয়গুলোতে আমাদের মিল রয়েছে, সেগুলোতে তাদেরকে সহায়তা করা হবে; যে বিষয়গুলোতে আমাদের মতের অমিল রয়েছে সেগুলোতে নসীহত করা হবে। তাদের সঠিক কথা ও কার্যকলাপের প্রশংসা করা হবে। তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা হবে। তাদের গোপন ত্রুটিগুলো গোপনীয়তার সঙ্গে এবং প্রকাশ্য ভুল-ভ্রান্তিগুলো প্রকাশ্যভাবেই সংশোধন করা হবে। গাম্ভীর্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ পন্থায় নসীহত করতে হবে; নৈতিকতা বিবর্জিত স্থূল আবেগী বিতর্কের পন্থায় নয়। সেই সঙ্গে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মতপার্থক্য যেন ইসলামের প্রকৃত শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের গতিপথ পরিবর্তন না করে।

১৬. গোটা পৃথিবীর নিপীড়িতদের যথাসম্ভব সাহায্য করা হবে এবং অত্যাচারীদের বাধা দেয়া হবে—চাই নিপীড়িত গোষ্ঠী মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম। জালিমদের বিরুদ্ধে গণ বিপ্লবকে সমর্থন দেয়া হবে, সেই সঙ্গে জালিম তাগুতদের পতন ঘটিয়ে আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাঝেই প্রকৃত সমাধান রয়েছে —এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করা হবে।

১৭. যে সমস্ত সংস্থা মুসলিমদের হারানো অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সরব হবে, তাদেরকে যেকোনো প্রকার কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

১৮. মুজাহিদীনের ব্যাপারে যদি মিথ্যাচার করা হয়, তাহলে সত্যিটা তুলে ধরা তাদের কর্তব্য। যদি তাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায়, তবে ইস্তেগফার করবে, ভুল কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করবে এবং ক্ষতিগ্রস্তপক্ষকে শরীয়ত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

[535]

এক কথায় এই উভয় প্রমাণপত্র পাঠ করার দ্বারা শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ এবং আল-কায়েদার শরীয়তী রাজনীতির পরিপক্কতা, নববী পন্থার পূর্ণ অনুসরণ, মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে দয়া অনুগ্রহশীলতা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আল্লাহর বাণী উচ্চকিত করার দায়িত্ব পালনের কথা জানা যায়। এই প্রমাণপত্রের শেষে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ নিজের সকল সঙ্গী-সাথি ও মুজাহিদীনকে এবং তাদের সমর্থক ও ভক্ত অনুরাগী সকলকে এই দিকনির্দেশনা আমলে নেয়ার আহ্বান জানান।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নেতা
যুগের ইমাম শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর আবারও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনায় ফিরে যাই। শায়খ রহিমাহুল্লাহ আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আইডল ছিলেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার আশেক ছিলেন। তাকে এ যুগে উম্মাহর সবচেয়ে বড় পথনির্দেশক মনে করতেন। ফারুক ভাই তার জ্ঞান-গরিমার অনুরাগী ছিলেন। তার গুণ কীর্তনকারী ছিলেন। তার সাহসিকতার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার স্নেহশীলতা ও মহানুভবতা স্বীকার করতেন। তার প্রজ্ঞা সুলভ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতেন। সর্বোপরি তার অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ ঈমানী দৃঢ়তা, অবিচলতা, উচ্চ মনোবল ও দৃঢ় সংকল্পের কারণে তাকে উম্মাহর নেতৃত্ব দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব জ্ঞান করতেন।

হাকীমুল উম্মত শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্পর্ক অনেক গভীর ছিল। উভয়ের মাঝে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর সরাসরি [536]

সান্নিধ্য ও সাহচর্যের সৌভাগ্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ লাভ করেছিলেন। এ সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মৌলিক নীতিমালা, মাসআলা, প্রজ্ঞা ও কল্যাণ-চিন্তা গভীরভাবে নিজেই বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের রূপকার শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং শেখেন। এছাড়াও শায়খ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তিনি বিস্তারিত পত্র বিনিময় করতেন এবং সকল বিষয়ে তার নির্দেশনা নিতেন। ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী শায়খ রহিমাহুল্লাহর নামে তার এক চিঠিপত্রে চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরম্ভ করে কার্যনির্বাহ ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা চাওয়া হয়। এমনকি কোনো সাথির ব্যাপারে সংশোধন পন্থা এবং বায়তুল মাল বা কোষাগরের নীতিমালার মতো বিষয়েও শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর সরাসরি দিকনির্দেশনা চাইতেন। তিনি মুহব্বত করে তাকে শায়খ বলে ডাকতেন। অপরদিকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রতি শায়খ রহিমাহুল্লাহর আস্থা ও ভালোবাসা এভাবে অনুমান করা যায় যে, তার শুরা পরিষদে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষাকারী আস্থাভাজন সাথি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ কোনো লেখা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গেও পরামর্শ করতেন এবং তার রায় দ্বারা বিষয়টা যাচাই করে দেখতেন। ২০১২ সালে যখন শায়খ রহিমাহুল্লাহ ‘জিহাদী কার্যক্রমের সাধারণ দিকনির্দেশনা’ নামে প্রমাণপত্র তৈরি করেন, তখন পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত রূপ দেবার আগে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী কিছু বিষয় পরিবর্তনও করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ওই সাধারণ দিকনির্দেশনা প্রকাশিত হবার পর খুবই আশ্বস্ত ও আনন্দিত ছিলেন।

[537]

তিনি মনে করতেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই ধরনের দিকনির্দেশনা দিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করেছে এবং এ বিষয়গুলো আমলে নেয়ার দ্বারা জিহাদী যাত্রা সঠিক পথে চালিয়ে নেয়া সহজ হবে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ঐ আচরণবিধি সকল মুজাহিদকে পড়াতে ও বোঝাতে বেশ চেষ্টা করতেন। আমার নিজেরও এমন সৌভাগ্য রয়েছে। ওই প্রমাণপত্র প্রকাশিত হবার আগেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাকে ডেকে আচরণ বিধিগুলো শুধু শোনাননি; বরং কিছু পয়েন্টের বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। ২০১৪ সালে মহান জিহাদী নেতা শহীদ হাফিজ তৈয়ব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহ যখন উত্তর ওয়াজিরিস্তানের লেওয়ারা নামক জায়গায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাৎ করেন, তখন হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর আচরণবিধির প্রতিটি অনুচ্ছেদ আলাদা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করার ও সুস্পষ্ট আকারে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে খুবই জোর দেন। এরপর সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করার কথা বলেন। হাফেজ সাহেব রহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, ব্যাখ্যার কাজ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহরই করা উচিত। তখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বিনয়ের কারণে ওজর পেশ করে বলেন, লেখক নিজেই যেহেতু রয়েছেন, ব্যাখ্যার জন্য তাকেই আবেদন করা উচিত।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন, একথাও অনেকের কাছে নতুন মনে হবে। আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ সভায় তিনি উপস্থিত থাকতেন। ফারুক ভাই ২০১০ সালে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সময়কাল থেকেই আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর পরামর্শ সভায়ও উপস্থিত থাকতেন।

[538]

বিশেষভাবে তিনি ওই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শসভায় অংশগ্রহণ করেন, যেখানে দায়েশ নামক গ্রুপকে আল-কায়েদা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বলেন, পরিষদের সকলেই একমত ছিলেন, দায়েশ গ্রুপের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা উচিত। এক কথায়, ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভাগুলোতে উপস্থিত থাকেন। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে যখন আল-কায়েদা উপমহাদেশের দায়িত্ব লাভ করে বিভিন্ন কাজে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন জামাআতের আমীর শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর কাছে তিনি ওজর পেশ করলে শায়খ রহিমাহুল্লাহ মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত দেন: আল-কায়েদা উপমহাদেশ গঠিত হবার পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর খেদমত উপমহাদেশের কার্যনির্বাহী পরিষদের অধীনেই হওয়া উচিত।

‘ফুরসান’ গ্রন্থের সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্পৃক্ততা

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকাতলের অশ্বারোহীগ’ গ্রন্থখানা একদিকে দৃষ্টিভঙ্গি ও জিহাদী চিন্তাধারার অমূল্য সম্ভার; অপরদিকে সমকালীন জিহাদী আন্দোলনগুলোর ইতিহাস এবং সেগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র এতে স্পষ্ট করা হয়েছে। এই দুইয়ের পাশাপাশি পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও গুরুত্ব সুস্পষ্ট করা হয়েছে গ্রন্থখানায়। গ্রন্থখানা প্রকৃতপক্ষে শায়খ রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও জিহাদী জীবনের

ইতিহাস। গ্রন্থখানা পাঠ করলে যে কেউ শায়খ রহিমাহুল্লাহর রচনার গুণগ্রাহী হয়ে যাবে। লেখকের গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদার দ্বারা পাঠকগণ প্রভাবিত না হয়ে পারবেন না। প্রতিটি পৃষ্ঠা শেষ করার পর তার অন্তরে উম্মাহর মুহব্বত ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মাহর জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার অনুপ্রেরণা তৈরি হবে। গ্রন্থখানা পাঠ করার দ্বারা এই বাস্তবতা সুস্পষ্ট হবে, গ্রন্থ প্রণেতার অন্তরে প্রতিটি মুসলমানের প্রতি কিরূপ ভালোবাসা রয়েছে এবং মুত্তাকী বা গুনাহগার সকল মুসলিমের জন্য কিরূপ কল্যাণকামী মনোভাব রয়েছে। অতঃপর যখন গ্রন্থ প্রণেতা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের দুশমনির কারণগুলো বিশেষ বেদনামাখা চিন্তাক্লিষ্ট ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন, তখন পাঠকবর্গের অন্তরে একদিকে যেমন ইহুদী- খ্রিস্টানদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরি হয়, অপরদিকে শায়খ রহিমাহুল্লাহর মুহব্বত ও ভালোবাসা অন্তরে স্থান করে নেয়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ উক্ত গ্রন্থের খুবই প্রশংসা করতেন। গ্রন্থখানা ছাপানো এবং সাথিদেরকে পড়াবার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তার বিশেষ অংশ অনুবাদ করে করে প্রকাশ করাতেন। শেষ দিনগুলোতে যখন তিনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক জায়গায় শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন, তখনও তার কাছে কুরআন শরীফ ছাড়াও উক্ত গ্রন্থের একটি কপি এবং একটি ভয়েস রেকর্ডার ছিল। তিনি উক্ত গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ রেকর্ড করে যাচ্ছিলেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানের উলামায়ে কেরাম এবং আরবী জানা লোকদেরকেও এই গ্রন্থ উপহার পাঠাতেন। তিনি মনে করতেন, সমকালীন জিহাদী আন্দোলন, সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যক্তিবর্গ এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে বোঝার জন্য গ্রন্থখানা পাঠ করা সকল মুজাহিদের

[540]

জন্য জরুরি। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং খালাতো ভাই রায়হান আফফান শহীদ রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ভয়েস রেকর্ড শুনে উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদের উর্দু অনুবাদ সংকলন করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদীনকে উত্তম পন্থায় এই গ্রন্থের অন্যান্য ভাষার অনুবাদ মুদ্রণ ও প্রকাশের তাওফীক দান করুন, আমীন।

জিহাদের আকাবির ও শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার যাত্রা শুধু শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। এরও আগে তিনি আত্মশুদ্ধি অঙ্গনের সাধক, মুরুব্বী, কয়েদে জিহাদ শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজীদ রহিমাহুল্লাহর দীর্ঘ সান্নিধ্য সাহচর্য এবং তার স্নেহের ছায়ায় দীক্ষা লাভ করেছেন যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর কুদরতে এই অমূল্য রত্নের মাঝে ইলমে দীন, আত্মশুদ্ধি ও ইহসান জগতে (আত্মশুদ্ধির অঙ্গনের বিশেষ স্তর) উন্নতির আরও একটি ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিল। উম্মাহর দুই মহান ব্যক্তি, আলেমে রব্বানী, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমায় আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন, দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতার অধিকারী, সালফে সালেহীনের স্মৃতি পুনর্জাগরণকারী শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লীবী রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া লীবী রহিমাহুল্লাহর দীর্ঘ সান্নিধ্য অর্জন এবং তাঁদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ তাআলা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে দান করেছেন। তিনি এই উভয় মহান আলেমের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাদের সহচর ও সহযাত্রীও [541]

ছিলেন, তাদের শিষ্য ছিলেন, আবার পরামর্শদাতা ছিলেন, তাদের বন্ধুও ছিলেন— সর্বোপরি তাদের সান্নিধ্য অর্জনকারী ছিলেন। তিনি ঘরে কিংবা সফরে; নিরাপদ সময়ে কিংবা যুদ্ধাবস্থায়; সুখে কিংবা দুঃখে; সভায় ও অধ্যয়ন-বৈঠকে কিংবা পরিখা ও গুহায়; পরিষদের বৈঠকে অথবা বিশেষ সাক্ষাতে; সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই উভয় হযরতের সঙ্গে ছিলেন। তাদের সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তাদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর স্বভাবে সত্য অনুসন্ধানের প্রবণতা ছিল। তাঁর আসল নাম ছিল সালমান এবং তার পিতা-মাতা হযরত সাইয়েদুনা সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। সত্যের তালাশে বিভিন্ন ঘাটের পানি পান করা সাইয়েদুনা সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বৈশিষ্ট্য ছিল। যতদিন পর্যন্ত তিনি সত্যের দেখা পাননি, অস্থির চিত্তে অনুসন্ধান করেই গেছেন। সম্ভবত তারই নামের বরকতে এই স্বভাব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাঝে ছিল। যখন তার মনে কোনো প্রশ্ন দেখা দিতো, তখন সমাধানের আগ পর্যন্ত তিনি স্থির হতে পারতেন না। কোনো ব্যাপারে দ্বিধা- দ্বন্দ্বে থাকলে যতক্ষণ পর্যন্ত উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে সঠিক পথ না পেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির হতে পারতেন না। আকীদা-বিশ্বাস হোক, সমকালীন জিহাদ কিংবা ব্যবস্থাপনা ও কার্যনির্বাহের কোনো বিষয় হোক— প্রতিটি ধর্মীয় বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্নের সমাধান নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জেনে নিতেন এবং পূর্ণ আশ্বস্তি ও আন্তরিকতা সহকারে তা আমলে নিতেন। এমন কি কেউ কেউ তাকে বলেছেন, আপনি এত সূক্ষ্ম বিষয় সমাধান করা জরুরি মনে করেন কেন? বরং আপনার উচিত বহু বিষয়ে শুধু মূলটা জেনে এরকম

[542]

মনে করা যে, দুনিয়াতে এমনই হয়..অতএব সামনে যাওয়া যাক। কিন্তু আল্লাহর ভয় তাকে এমনটা করতে বাধা দিতো। তিনি মনে করতেন, যদি এমন হয়, এ কাজের দ্বারা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন..! তাই উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে কৌতুহল মিটিয়ে নিতেন। তার এমন মেজাজ বুঝতে পারলে প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, তিনি উপর্যুক্ত দুই হযরতের কাছ থেকে দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে কতটা বিস্তারিত পথনির্দেশনা লাভ করেছেন। এমনকি মনে হয় যেন, তিনি উভয় হযরতের রঙে রঙিন হতে পেরেছিলেন। স্বয়ং শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ তার এক পত্রে স্বীকার করেছেন, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বাহ্যিকভাবে সূক্ষ্ম বিভিন্ন বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতেন। এই দুই আলেমে রব্বানীর কাছ থেকে তার মতো অন্য কেউ এতটা বিস্তৃত জ্ঞানার্জন করেছেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ করলে ভুল হবে না। হতে পারে আরব সাথিদের মাঝে কারও কারও এই আলেম হযরতদের সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর তুলনায় বেশি সময় কেটেছে; কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ইলমে দীনের মুহব্বত এবং সত্যের অনুসন্ধিৎসার কারণে কারও পক্ষে তার চেয়ে বেশি এই সান্নিধ্যের সুবাস লাভ করা মুশকিল। বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা অনেক নেয়ামতের মাঝে এটিও তাকে বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তার ইলম ও আমলের এই বরকতের ওপর ঈর্ষকারীদের ঈর্ষা করা উচিত। কিন্তু আমাদের শিরা-উপশিরায় দৌড়ে বেড়ানো শয়তান এখানেও থেমে থাকেনি। এই প্রশংসনীয় ঈর্ষা কোনো কোনো সাথির মাঝে নিন্দনীয় হিংসার আকার ধারণ করেছে। তাই দেখা গেছে, আরবের ভেতরের বাইরের অনেক ব্যক্তি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর উচ্চ গুণাবলি, উন্নত চরিত্র এবং জিহাদী অঙ্গনের উলামায়ে কেরামের সঙ্গে আস্থাপূর্ণ সুসম্পর্কের কারণে তাকে হিংসা করতো

[543]

এবং তাকে পিছিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতো না।

এখানে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের দুই রূপকার হযরতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা উপকারী মনে হচ্ছে। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ, শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহর পর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহর আলোচনার দ্বারা সমকালীন জিহাদী আন্দোলনের আকাবির ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আলোচনা একটা পর্যায় পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে।

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ
রুশ বিরোধী জিহাদের সময় উভয় হযরত আফগানিস্তানে হিজরত করেন। জিহাদের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শনের পর মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাদের তাকওয়া, উপলব্ধি, উচ্চ মনোবল, উন্নত নৈতিকতা ও অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে তাদেরকে দীনী ইলমের গভীরতা অর্জনের জন্য আফ্রিকার মরুভূমিতে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বিদ্যাপীঠে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠানো হবে। মরু অঞ্চলের বিদ্যাপীঠগুলোর মাঝে আরবে সম্ভবত ওই একটি প্রতিষ্ঠান এমন রয়েছে, যেখানে শরীয়ার উলূম ও জ্ঞান বিজ্ঞান সরকারি হস্তক্ষেপ ও চাপ থেকে যথেষ্ট মাত্রায় মুক্ত এবং শিক্ষা সিলেবাসে ক্রুসেডারদের গোলামরা নাক গলাতে পারেনি বললেই চলে। সালফে সালেহীনের যুগের মতোই সেখানে মরুভূমিতে উলামা ও মাশায়খে কেরামের কাছে গিয়ে শরীয়াহ শিক্ষার্থীরা শরীয়াহ গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে থাকেন। আফ্রিকার তপ্ত মরুভূমিতে রোদে পোড়া দরিদ্র পরিবেশে বালুতে বসে [544]

এবং ক্ষুধার কারণে সত্যিকার অর্থেই পেটে পাথর বেঁধে ইলমে দীন অর্জনের সাধনা একদিকে যেমন ইলমের ভালোবাসা অন্তরে প্রবিষ্ট করে; অপরদিকে তাকওয়া, খোদাভীতি, ইহসান ও বিনয়ের মতো উচ্চ নৈতিকতায় অভ্যস্ত করে তোলে। সেখানে আরবী ভাষা সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎকর্ষ এতটাই যে, শানকীত মরুভূমিতে বসতির নারীরা পরস্পরে কাব্যিক শৈলীতে কথাবার্তা বলে এমনটা প্রসিদ্ধ রয়েছে। সেই সঙ্গে সেখানকার শিক্ষার্থীদের দুর্লভ স্মরণ শক্তির কথাও প্রসিদ্ধ। শায়খদের কাছ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ইজাযত (সার্টিফিকেট) পাননা, যতক্ষণ মূল গ্রন্থ মুখস্থ না শোনাতে পারেন।

শানকীত মরুভূমিতে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণকারী একজন আলেমে দীন এবং আল-কায়েদার শরীয়াহ বিভাগের সদস্য, আমাদের মুহতারাম উস্তাদ সালেম তারাবলুসী

85 রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন

85 লিবিয়ার ঐতিহাসিক শহর ত্রিপোলির আলেমে দ্বীন শাইখ সালেম
তারাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আলকায়দার ওলামা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। শানকীত মরুভূমিতে মালিকি মাযহাবের ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে তিনি একাডেমিক জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে আরব বিশ্ব ও হেজাজের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সান্নিধ্যে জ্ঞান লাভ করেন। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তথায় হিজরত করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতা দান করেছিলেন। তিনি মালিকি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন; কিন্তু হানাফি আইন শাস্ত্রের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ছিল। তিনি বলতেন, যদি আমি মালিকি মাযহাবের না হতাম, তাহলে অবশ্যই হানাফী হতাম। তিনি বলতেন, আব্বাসী খেলাফত ও ওসমানীয় খেলাফত আমলে হানাফি আইন শাস্ত্র অনুযায়ী এবং আন্দালুসের ইসলামিক খেলাফত আমলে মালিকি আইন শাস্ত্র মোতাবেক ইসলামী শাসনতন্ত্র পরিচালিত হতো। তাই উভয় মাযহাবেই জিহাদ, সন্ধি, শরিয়া রাজনীতি এবং ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে বিস্তারিত বিধি-বিধান পাওয়া যায়। তিনি পাকিস্তানের কতক দেওবন্দী শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি কট্টরপন্থী ও ঘরানাগত বিদ্বেষ বিস্তারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে ছিলেন। তাকফিরি মেজাজের লোকদের উপর অধিকাংশ সময় রাগান্বিত থাকতেন এবং মুজাহিদীনকে ইনসাফের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন। ২০০৯ সালে শাইখ সালেম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে ফিকহুল জিহাদ সম্পর্কিত বিস্তারিত দাওরা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। ২০০৯ সালে যখন দায়েশের ফিতনা সম্পর্কে তখনও কিছুই শোনা যায়নি, তখন থেকেই তিনি আমাদেরকে সতর্ক করতেন যে, ইরাকের কিছু কিছু মুজাহিদের মাঝে কট্টরপন্থী চিন্তাভাবনা, তাকফিরি মানসিকতা ও ঘরানাগত বিভেদের মনোভাব রয়েছে। এ বিষয়গুলো একটা সময় জিহাদের অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনবে এবং গোটা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেবে। এ কারণে তিনি মুসলিমদেরকে কাফের বলার বিষয়ে মুজাহিদীনকে কৌতুহল দেখাতে বারণ করেন। ওই সময়ের একটি মজার ঘটনা স্মরণ হলো। একজন কঠোর মেজাজের সাথী শাইখের কাছে বেরেলভীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। শাইখ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রজ্ঞাসুলভ অনিশ্চয়তার ভঙ্গিতে জবাব দেন: সম্ভবত উপমহাদেশে এই শ্রেণীর দেখা মেলে; আরবে নয়। যেহেতু উপমহাদেশে ওলামায়ে কেরামের প্রকৃত প্রতিনিধি ওলামায়ে দেওবন্দ রয়েছেন, এ কারণে বেরলভীদের ব্যাপারে তাদের যে রায়, আমাদেরও একই রায়।' তখন উপরোক্ত ভাই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: "ওলামায়ে দেওবন্দ তো তাদেরকে কাফের বলে না। সাহেব! মনে হচ্ছে আপনি বেরলভীদের আকিদা-

[545]

যে, যদি মরু অঞ্চলের তালেবুল ইলমদেরকে দেখেন, তাহলে আপনাদের পাগল মনে হবে। তিনি বলেন: শানকীতে থাকতে আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়া মুখস্থ করতাম। আমাদেরকে দেখলে পাগল মনে হতো। ক্ষুধার কারণে পেট কোমরের সঙ্গে লেগে যেত, কিন্তু তালেবুল ইলমগণ মুখস্থ করার নেশায় ক্ষুধা ভুলে যেতেন। মালিকি আইন শাস্ত্রের কাব্যাকারের সূত্রগুলো মুখস্থ করা অবসরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। শায়খ সালেম রহিমাহুল্লাহ বলেন, পৃথিবীতে এখনো শুধু মৌরিতানিয়ার মরু অঞ্চলে এবং পাক হিন্দুস্তানে সালফে সালেহীনের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং পশ্চিমাদের প্রভাব মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে। সেখানে শুধু কিতাব পাঠ দান করাই যথেষ্ট মনে করা হয় না; বরং গুরুজনদের সান্নিধ্যে বক্ষ হতে বক্ষে ইলম বিলানো হয়। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের

বিশ্বাস ও আমলের কুফরী শিরকী দিকগুলো সম্পর্কে অবগত নন।' তখন শাইখ সালেম রহমাতুল্লাহি আলাইহি জালালী মেজাজে (মহান ব্যক্তিদের প্রজ্ঞাসুলভ ক্রোধ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত) বললেন: "বেরেলভীদের সম্পর্কে ওলামায়ে দেওবন্দকে জিজ্ঞেস করুন কিন্তু জনসাধারণ যেভাবে অজ্ঞতায় ডুবে রয়েছে, তাতে আমরা লিবিয়ার কিছু গ্রাম্য অঞ্চলে লোকদেরকে জুমার দিন জুমার সালাতের পরিবর্তে কোন মাজারে তাওয়াফ করতে দেখি; কিন্তু আমাদের মালিকি ওলামায়ে কেরাম তাদের অজ্ঞতার ওজরের কারণে কাফের মুশরিক আখ্যা দেন না। সর্বত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরামের পন্থা হল: মুসলিমদের তাকফিরের ক্ষেত্রে তারা তাড়াহুড়ো করেন না; তাদেরকে সুযোগ দেন। মুসলিমদের কোন শ্রেণীর ব্যাপারে ঢালাওভাবে হুকুম প্রয়োগ করেন না; বরং ওই গ্রুপের প্রত্যেকের ব্যাপারে আলাদাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন'।

মুজাহিদীনকে কট্টরপন্থা ও বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচানো এবং উম্মাহর ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সালেম রহমতুল্লাহি আলাইহি'র সব সময়ের মিশন ছিল। ওয়াজিরিস্তানে স্থানীয় মাদ্রাসাগুলোতে যেতেন, আলেমদের দিকনির্দেশনা নিয়ে আল-ফিকহুল হানাফী'র গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতেন এবং ফতোয়া কিনে পাঠ করতেন। আমার মনে আছে, সর্বশেষ সাক্ষাতে তিনি আমাকে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, আমার কাছে ফিকহে হানাফির বিখ্যাত গ্রন্থ "হেদায়া'র দৃষ্টান্তহীন ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল কাদির' কিতাব আকারে রয়েছে। আমি এটি থেকে উপকৃত হচ্ছি।

মালদ্বীপের একজন তালিবুল ইলম মুজাহিদ ভাই আরব বিশ্বে গিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জনের ব্যাপারে তার কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি উপমহাদেশের ওলামায়ে দেওবন্দের কাছ থেকে ইলম অর্জনের পরামর্শ দেন। অতঃপর ওই ভাইয়ের পীড়াপীড়ির কারণে শানকীত মরু অঞ্চলের ওলামায়ে কেরামের পাঠদান পদ্ধতিরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। ওলামায়ে কেরামের পথনির্দেশনায় জিহাদের নসিহা করতেন। শরঈ বিষয়ে নিজ থেকে ইজতেহাদ গবেষণা এবং তাকফিরি বিষয়ে কৌতুহল থেকে বেঁচে থাকতে নসিহা করতেন। শাইখ সালেম রহমাতুল্লাহি আলাইহি শেষ প্রহরে আমাদের থেকে বিদায় নেন এবং ঐদিন সন্ধ্যায় মির আলী এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তায় পরিচালিত মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। এটা ২০১১ সালের গ্রীষ্মের কথা। আল্লাহ তাআলা এই আলেমে রব্বানীর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে আমাদেরকে তার সঙ্গ দান করুন আমীন!!

[546]

প্রতিও মনোযোগ দেয়া হয়। অথচ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বে সাধারণত ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট ডিগ্রী পর্যন্তই দীনী শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেখানে ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা সিলেবাস নির্ধারণ পর্যন্ত সকল কাজ সাধারণত এমন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে করা হয়, যাদের শিক্ষা সনদ ফিরিঙ্গি প্রাচ্যবিদদের কাছে গিয়ে মিলিত হয়। কখনও কখনও দেখা যায়, ইউনিভার্সিটির উলুমে শরীয়াহর অধ্যাপক না বাহ্যিকভাবে দীনদার, আর না দীনের মূল্যবোধ তার অন্তরে রয়েছে। এমন অবস্থায় ইউনিভার্সিটির কোনো শিক্ষার্থীর মাঝে যদি যোগ্যতা প্রতিভা জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা এবং অন্য কোনো মাধ্যমের সম্পৃক্ততার কারণে দীনের বিষয়ে পরিপক্কতা ও স্বচ্ছতা থাকে তাহলে তার যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ ইউনিভার্সিটিতে অবশ্যই থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে দীনদার সমাজের অভাব পূরণকারী, ইলমে নববীর প্রকৃত ওয়ারিস বা উত্তরসূরি আলেম তৈরির পরিবেশ সেখানে নেই। শায়খ সালেম রহিমাহুল্লাহর মতে, আফ্রিকার মরু অঞ্চলের উলামায়ে কেরাম বালাগাত বা আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার পর ফিকহ শাস্ত্রে উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী। এই শাস্ত্রটি কুরআন সুন্নাহের মর্ম উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়ক। তাকওয়া ও যোগ্যতার পাশাপাশি যদি ফিকহ শাস্ত্রে পরিপক্কতা থাকে, তাহলে আধুনিক বিশ্বের সমস্যাগুলো বোঝা এবং সেগুলোর সমাধান দেয়া খুবই সহজ হয়।

যাই হোক আমাদের আলোচ্য দুই আলেমে-দীনকে আল্লাহ তাআলা মৌরিতানিয়ায় ইলমে দীন অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন। তাকওয়া খোদাভীতি ইখলাস নিষ্ঠা বিনয় শিষ্টাচার ফিকহ, হাদীস হেকমত প্রজ্ঞা স্মরণশক্তি বালাগাত বয়ান বক্তৃতা ও লেখালেখির অঙ্গনে উভয়

[547]

হযরত-এর মাঝে এমন প্রতিভা দেখা গিয়েছিল, যার বিকাশ ঘটিয়ে আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্বের মুজাহিদীনকে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। মৌরিতানিয়া থেকে শিক্ষা সমাপন করে ফেরার পর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর কাছে সুদানে গমন করেন। অতঃপর তিনি শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর নির্দেশে আলজেরিয়ার জিহাদী নেতৃবৃন্দের কাছে শায়খের বার্তা নিয়ে যান, যার মাধ্যমে সেখানে চিন্তা গত ও আচরণগত বিচ্যুতির সংশোধন-প্রচেষ্টা সম্ভব হয়।

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং আলজেরিয়ার জিহাদ ১৯৮৯ সালে আলজেরিয়াতে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দাবিতে একটি রাষ্ট্রপ্লাবী আন্দোলন শুরু হয়। ওই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ— বিশেষ করে শায়খ আলী বালহাজ শরীয়ত বাস্তবায়নের ডাক দিলে এই দাবিতে গোটা দেশে আন্দোলন শুরু হয়। তার আবেগ ঘন বয়ান-বক্তৃতায় আলজেরিয়ার মুসলমানদের অন্তরে দীনের ভালোবাসা এতটা স্থান করে নেয় যে, তারা যে কোনো মূল্যে শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য উঠে দাঁড়ায়। ওই সময় গোটা দেশে সিটি নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। আলজেরিয়ার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে দল সিটি নির্বাচনে জয়লাভ করবে, অবশ্যই পার্লামেন্ট নির্বাচনে সে দল জয়ী বিবেচিত হবে। শায়খ বালহাজ কিছু সঙ্গী-সাথির পরামর্শ অনুযায়ী সিটি নির্বাচনে এ কারণে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন; যদি নির্বাচনের মাধ্যমে দীনদার শ্রেণি জয়ী হয়, তাহলে শরীয়ত বাস্তবায়নে কোনো বাধা থাকবে না। ১৯৯০ সালে সিটি নির্বাচনে গোটা দেশে শায়খ বালহাজের দল Islamic Salvation Front ৭০% এর অধিক

[548]

আসন লাভ করে। অতঃপর ১৯১৯ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্যায়েও তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এখন সরকার গঠনের শেষ পর্যায়ে তার দল ক্ষমতা গ্রহণের কথা ছিল। এমতাবস্থায় ১৯৯২ সালে ফ্রান্সের আলজেরীয় তাবেদার সেনাবাহিনী গোটা দেশে জরুরি অবস্থা চালু করে, মার্শাল ল' জারি করে। নির্বাচন মুলতবি করে এবং দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দলের শত শত নেতাকর্মীকে শহীদ করে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ ৪০ হাজারের অধিক নেতা কর্মীকে আফ্রিকার বড় মরুভূমিতে বন্দী করে। শায়খ বালহাজও গ্রেফতার হন এবং প্রায় ১৩ বছরের অধিক কাল জেলে কাটান। সেনাবাহিনী ক্রুসেডারদের ইশারায় শরীয়ত বাস্তবায়নের এই আন্দোলন জোরপূর্বক নির্মূল করে দেয় এবং বাহ্যিকভাবে ওই দল নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই সবকিছুই জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট করে দেয়, জালেম সেনাবাহিনী পশ্চিমাদের দালাল। তখন শীঘ্রই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের দাওয়াত ছড়াতে আরম্ভ করে। অপরদিকে মুসলিমদের কাছে ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবি মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্বিগ্ন ও বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ দলে দলে পাহাড়ে পর্বতে মরুভূমিতে এবং জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করে। তারা সুশৃঙ্খল গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। সেনাবাহিনী এবং সেনা সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে। দ্রুততার সাথে জিহাদ বিস্তার হতে থাকে। গোত্রের পর গোত্র মুজাহিদদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হয়। সেনাবাহিনীর মাঝে যাদের মধ্যে ঈমানী জযবা ছিল তারাও চাকরি ছেড়ে মুজাহিদিনের অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করেন।

[549]

আলজেরিয়ায় জিহাদ বেগবান হতে থাকলে সেখানকার মুজাহিদীন পরস্পরে ‘আল জামাতুল ইসলামিয়া আল মুসাল্লাহা’ তথা সশস্ত্র ইসলামী জামাত নামে দল গঠন করে। যেহেতু নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আকস্মিকভাবে জিহাদ আরম্ভ হয়, তাই বুঝ ও উপলব্ধির ওপর আবেগ প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু তবুও যোগ্য নেতৃত্ব, আফগানিস্তান জিহাদের সাবেক মুজাহিদীন ও উলামায়ে কেরাম আন্দোলনের এই জোয়ার সঠিক পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট থাকেন। এরই মধ্যে সরকার এক পরিকল্পনার মাধ্যমে নেতৃবৃন্দকে একের পর এক শহীদ করে। ১৯৯৪ সালে জামাআতের তদানীন্তন আমীর আবু আব্দুল্লাহ আহমদ সরকারি ফোর্স-এর সঙ্গে এক সংঘর্ষে শাহাদাত বরণের পর জামাল জায়তুনী নামক এক ব্যক্তি নেতৃত্বে আসে। সামরিক পারদর্শী জামাল জায়তুনী পড়াশোনা জানতো না। শুধু প্রতিশোধ স্পৃহা তার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতো। এই নতুন আমীর জামাল জায়তুনী এবং তার পরবর্তী আমীর আনতার যাওয়াবেরী মুসলিমদের রক্তপাতকারী ঘাতক প্রমাণিত হয়। সে এবং তার চাটুকাররা পূর্বের নেতৃবৃন্দের পলিসি পরিবর্তন করে। সেনাবাহিনীর পক্ষে থাকার অপবাদে অথবা শুধু মুজাহিদীনের সাথে না থাকার অপরাধে জনসাধারণকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। তারা জিহাদের নতুন দর্শন উপস্থাপন করে। সেই মতে সামরিক সরকারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের তুলনায় জনসাধারণের বিরুদ্ধে জিহাদ বেশি জরুরি বলা হয়, কারণ তারা মুজাহিদদের পক্ষাবলম্বন করেনি অথবা তাদেরকে নিজেদের এলাকা থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ করতে দেয়নি। এককথায় সে সময় মুসলিম জনসাধারণ চাকির দুই পাটায় নিষ্পেষিত হতে থাকে। একদিকে দীনের দুশমন জালেম সেনাবাহিনী অপরদিকে দীনের নামে অজ্ঞ হিংস্র দল। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ক্রুসেডারদের গোলাম সেনাবাহিনী তো গোটা

[550]

পৃথিবীতে কুফরী ধর্মহীনতা ও জুলুম-অত্যাচারের কারণে কুখ্যাত ছিলই। তারা পশ্চিমা প্রভুদের ইশারা ছাড়া কিছুই করতো না। কিন্তু বেদনাদায়ক বিষয় হলো ওই মজলুমদের অবস্থা যাদের প্রতিশোধ স্পৃহা তাদের সামনে আপন পরের পার্থক্য মুছে দিয়েছিল। এই মূর্খের দল নারী-পুরুষ শিশু কাউকে ক্ষমা করেনি। কিছু তথ্যসূত্র মোতাবেক, মুজাহিদীনের হামলায় জেল ভেঙে বন্দী মুক্তির সুযোগ নিয়ে কিছু সরকারি দালাল বন্দীদের ভেতর ঢুকে যায়। মুজাহিদদের নামে তারা জনসাধারণের রক্তপাত ঘটায়। এই গোপন এজেন্টরা শুরুতে সেনাবাহিনীর ব্যাপারে শত্রুতার মনোভাব দেখিয়ে মুজাহিদীনের আস্থা অর্জন করে এবং পরবর্তী তাদের পোশাকে জনসাধারণের উপর হামলা করে। যাই হোক, ওই দল অন্য দলের মুজাহিদীনের বিরুদ্ধেও হত্যাকাণ্ড ও গুপ্ত হত্যার মতো অপরাধ আরম্ভ করে।

জিহাদের নামে এই অজ্ঞতাপ্রসূত কর্মপন্থা প্রকাশিত হবার পর বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে সমস্ত মুজাহিদ আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা এবং উলামায়ে কেরাম তাদেরকে উপদেশ দেন। কিন্তু তারা এতটাই পাষণ্ড ছিল যে, উপদেশদাতারাই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে যায়। তাদের কাজে কেউ বাধা দিতে এলেই তাকে কাফের বলতে আরম্ভ করে এবং খারেজীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিরোধী সবাইকে কাফের বলে ফাতওয়া দেয়। এরপর উলামায়ে কেরাম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদেরকে প্রতারণা করে হত্যা করতে আরম্ভ করে। কেউ বিরোধিতা করলেই কাফের বলে আখ্যায়িত করে এবং তার জীবন সম্পদ ও সম্মান পদদলিত করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল—যারা আমাদের সাথে নেই, তারা সরকারের সাথে; আর সরকারের কুফরীর কারণে তারাও কাফের, এমন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তাদের

[551]

যুদ্ধ। অজ্ঞদলের কথা হলো, যে তাদের আমিরের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না, তাকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে ধর্মত্যাগী বলা হবে, মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি করা বৈধ হবে। যখন তারা কাউকে কাফের বলতো, তখন তার স্ত্রী সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি বৈধ মনে করতো।

অবশেষে খারেজীদের পথে চলে এই গ্রুপ নিজেদের মাঝে হানাহানি করে। নিষ্ঠাবান মুজাহিদীন তাদের থেকে আলাদা হয়ে সংঘবদ্ধ হবার পর তারা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে আরম্ভ করে। অবশেষে ২০০২ সালে কসাই আন্তার জাওয়াবেরি মারা যাওয়ার পর এই দলের বিলুপ্তি ঘটে।

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ ১৯৯৫ সালে আলজেরিয়ায় প্রেরণ করেন। সে সময় আলজেরিয়ায় জামাল জায়তুনী নেতৃত্ব লাভের পর আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর সংবাদ আসতে থাকে এবং বোঝা যেতে থাকে, এই জামাতের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজ থেকে বিচ্যুত।

শাখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আলজেরিয়ায় পৌছার পর যথাসম্ভব সংস্কারের চেষ্টা করেন। তাদেরকে বোঝান যে, জনসাধারণকে গণহত্যা করা জুলুম; শরীয়তে এর কোনো বৈধতা নেই, আর আমাদের বিরোধিতা করলেই কেউ কাফের হয়ে যাওয়া জরুরি নয়। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় তারা মাতাল হয়ে গিয়েছিল। তারা শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর হাতে প্রেরিত শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর উপদেশের জবাবে ঠাট্টা- বিদ্রূপ আরম্ভ করে দেয়। আনতার জাওয়াবেরীকে যখন শায়খ রহিমাহুল্লাহ শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর উপদেশমূলক পত্র প্রদান করলেন, তখন সে অট্টহাসিতে

[552]

ফেটে পড়ে বলে: (আমাদেরকে উপদেশ দানকারী) এই লোক কলম চালাতে পারে; জিহাদের কী জানে?

এক কথায় শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ লিবিয়ার কিছু সাথিকে নিয়ে তাদের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করেন। খুব দ্রুতই এই পথভ্রষ্ট গ্রুপ অনুভব করে, এভাবেই যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা হয় এবং উলামায়ে কেরাম তাদের কার্যক্রমকে শরীয়ত বহির্ভূত বলতে থাকেন, তাহলে তাদের কর্মীরা দল ছেড়ে চলে যেতে থাকবে। তাই তারা শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। শায়খ রহিমাহুল্লাহকে বন্দী করা হয় কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি জালিমদের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু তার অন্যান্য সাথি বন্দী থাকা অবস্থায় জালিমদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আলজেরিয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর জ্ঞান ও উপলব্ধিতে গভীরতা নিয়ে আসে। জিহাদী আন্দোলনকে নববী মানহাজ থেকে বিচ্যুত করার সকল চোরা পথ তিনি চিনে নেন। তিনি এমন ইলমী বিচ্যুতি অনুভব করার যোগ্যতা লাভ করেন, যা ব্যক্তিকে সীরাতে মুস্তাকীম থেকে দূরে সরিয়ে দিতে আরম্ভ করে। এক কথায় আলজেরিয়ার ইতিহাস শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে মুজাহিদীনের শিক্ষা দীক্ষা ও সংশোধনের কাজে যুগের ইমাম বানিয়ে দেয়।

মুজাহিদীনের সংশোধনকারী ও পথপ্রদর্শক
শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ জালেমদের থাবা থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় আফগানিস্তানে পৌঁছেন। সেখানে আমীরুল মুমিনীন

[553]

মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত ইমারতে ইসলামিয়ার শাসনকাল চলছিল এবং শরীয়তের বসন্ত যাচ্ছিলো। আফগানদের ভূখণ্ড গোটা পৃথিবী থেকে আগত দীন রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত মুহাজিরদের আশ্রয়স্থল ছিল। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে সেখানে জিহাদের নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে মুজাহিদীন এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আফগানিস্তানে নৃশংস মার্কিন হামলার পর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ্ রহিমাহুল্লাহ অপরাপর মুহাজিরদের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোতে গমন করেন। সেখানে একটা সময় পর্যন্ত আত্মগোপনে থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মুজাহিদীনকে দিকনির্দেশনা দিতে থাকেন। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ মুরুব্বী বা অভিভাবক ছিলেন আবার দাঈও ছিলেন। তিনি কট্টরপন্থা ও বাড়াবাড়ি যে সমস্ত পথ দিয়ে আন্দোলনের প্রবেশ করতে পারে, সেসকল পথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ বিষয়ে তার দৃষ্টি খুবই সূক্ষ্ম ছিল। আফগানিস্তানে ও ইরাকে মার্কিন হামলা ও জুলুম-নির্যাতনের নতুন যুগ কয়েকটি নতুন জিহাদী ময়দান তৈরি করে। আফগানিস্তানের মতো ইরাকেও একটি বড় জিহাদী আন্দোলন আবির্ভূত হয়। ফিলিস্তিনে বিপ্লবী আন্দোলন বেগবান হয়। আলজেরিয়ার নিষ্ঠাবান মুজাহিদীন নতুনভাবে সারিবদ্ধ হন এবং সত্য বিচ্যুত লোকদেরকে ছাঁটাই করে জিহাদ সাজিয়ে তুললে জাযিরাতুল আরব—বিশেষ করে ইয়ামেনের গোত্রগুলোতে তারা জিহাদের রশ্মি ছড়াতে আরম্ভ করেন। এই সময়ের ভেতর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এই সকল জিহাদী ময়দানের পথপ্রদর্শক ও অভিভাবক হয়ে ওঠেন। তিনি সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মুজাহিদের সংশোধন করতেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের

[554]

আলোকে জিহাদে শরঈ রাজনীতি এবং জিহাদী কার্যক্রমের মধ্যকার কল্যাণ-অকল্যাণ বোঝাতেন।

প্রান্তিকতা বিলোপকারী

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ যেমন ভারসাম্যচ্যুত কট্টরপন্থিদেরকে জিহাদের জন্য ধ্বংসাত্মক ব্যাধি মনে করতেন, একইভাবে কাফেরদের সামনে নত এবং জাগতিক তুচ্ছ সম্পদের জন্য দ্বীন বিক্রয়কারীদেরকেও মন্দ বলতেন। তিনি মুজাহিদীনের জন্য এমন সমাজ ব্যবস্থা বোঝার গুরুত্ব বর্ণনা করতেন, যে সমাজে তারা জিহাদ করছে। মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দকে তিনি বোঝাতেন যে, জিহাদ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ফোকাস করতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শাখাগত মতবিরোধ এই পথে যেন প্রতিবন্ধক না হয়। শায়খ রহিমাহুল্লাহ বারবার কতক মুজাহিদের দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন করে দিয়েছেন, যারা শুধু নিজেদেরকেই মুসলিম উম্মাহ মনে করতো। তিনি বলতেন, তারা যেন নিজেদেরকে উম্মাহর অংশ মনে করে এবং তাদের বাইরে উম্মাহর অন্য অংশের প্রতি সহনশীল ও স্নেহশীল থাকে।

একদিকে যখন কাফেররা সবদিকে জয়ী হচ্ছে, শতাব্দী কালের দাসত্বের প্রভাব মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে, অপরদিকে মিডিয়া ও সকল প্রচার মাধ্যম কাফেরদের এবং তাদের সহযোগীদের হাতে চলে গিয়েছে — এমন নাজুক অবস্থায় সংবেদনশীল কিছু বিষয় মুসলিম জনসাধারণকে বোঝানো খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই সে বিষয়ে মুজাহিদীনের কৌতুহল থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আমাদের উচিত সাইয়েদুনা আলী ইবনে আবি তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি আমলে নিয়ে

[555]

আমাদের দাওয়াত বেগবান করা। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : حدثوا الناس بما يفهمون أو يعرفون - অর্থাৎ "লোকদেরকে এমন পন্থায় সম্বোধন করো, যা তারা বোঝে।"

ইরাকের জিহাদে পথপ্রদর্শন

ইরাকে মার্কিন হামলার পর যখন সেখানে নতুন জিহাদী আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটে, তখন কিছু বিষয়ে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শুরু থেকেই আঁচ করতে পারেন। এ কারণেই মুহসিনে উম্মাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে ইরাকে মুজাহিদীনের পথ প্রদর্শনের জন্য নিযুক্ত করেন। ইরাকে আসাদুল ইসলাম (ইসলামের সিংহ) শায়খ আবু মুসআব যারকাবী রহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে মুজাহিদীন সংগঠিত হতে থাকেন। শায়খ যারকাবী শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর ইলমী মর্যাদার কারণে তাকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ইরাকি মুজাহিদীনকে এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে নসীহত করেন—বিশেষ করে জনসমাগমের স্থানগুলোতে পরিচালিত হামলায় মুসলিমদের রক্তপাতের ব্যাপারে অবহেলা এবং ইরাকি গোত্র ও উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান তিনি চিহ্নিত করে দেন, এসবের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করেন। এক প্রবন্ধে তিনি শায়খ যারকাবী রহিমাহুল্লাহ এবং ইরাকের মুজাহিদীনকে অত্যন্ত স্নেহ ও মায়া ভরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করেন। প্রথমটি ছিল হত্যাকাণ্ডে সতর্কতা অবলম্বন এবং শুধু রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের মাঝেই যুদ্ধের পরিসর সীমিত রাখার বিষয়ে... দ্বিতীয় উপদেশে বন্দীদেরকে জবাই করা এবং তার ভিডিও

প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল ... তৃতীয় উপদেশে বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে এমন দাবি পেশ করার কথা বলা হয়েছিল, যা মেনে নেয়া শত্রুপক্ষের জন্য সম্ভব। একইভাবে নিজের অন্যান্য চিঠিপত্র ও প্রবন্ধেও তিনি ইরাকি মুজাহিদদেরকে ধারাবাহিকভাবে শরীয়াহ অনুসরণ এবং জিহাদী কল্যাণ সমূহের প্রতি যত্নবান হবার নসীহত করেন। এটা ২০০৫ সাল থেকে ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা।

কিছু জযবাতি অনবহিত যুবক সেসময় শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে মিডিয়াতে ভুলভাল কথা বলে এবং তার নসীহতগুলোকে ইরাকের মুজাহিদীন এবং ইসলামের সিংহ আবু মুসআব যারকাবী রহিমাহুল্লাহর প্রতি বেয়াদবি গণ্য করে, শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে অনুচিত কথা বলে। সে সময় শায়খ যারকাবী রহিমাহুল্লাহ উচ্চতর বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি মুজাহিদীনের ওপর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর ইলমী ও জিহাদী মর্যাদা স্পষ্ট করে তার দুর্নাম করতে বারণ করেন। শায়খ যারকাবী রহিমাহুল্লাহর বিবৃতির শিরোনাম ছিল دعـــوا عطية الله فإنه أعلم بما يقـــول - অর্থ ‘আতিয়াতুল্লাহ'র ব্যাপারে কথা বলো না; তিনি যা বলছেন সে বিষয়ে তিনি ভালো জানেন’।

ওই বিবৃতির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর ইলমী ও জিহাদী মর্যাদা পাঠকবর্গ উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই সঙ্গে শায়খ যারকাবী রহিমাহুল্লাহর উচ্চতর নৈতিকতা ও বিনয় ফুটে উঠবে। শায়খ যারকাবী রহিমাহুল্লাহর বিবৃতির ভাষ্য এমন ছিল:

« শুরুতে স্পষ্ট করে নেয়া ভালো যে, মুজাহিদীনের জেনে রাখা উচিত এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি বিনয়ের

কারণে এ কথা বলছি না ; বরং এটা একটা বাস্তবতা ... ভাই আতিয়াতুল্লাহ্ আপনাদের এই ছোটো ভাইয়ের (আমার) বড় ভাই এবং তিনি একজন আলেম শায়খ; অথচ আমি এমন নই। আমি তো মুসলিম জনসাধারণের একজন এবং এই দীনের সেনাবাহিনীর এক সিপাহি। প্রশংসনীয় গুণাবলির চেয়ে আমার দোষ -ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি বেশি। আল্লাহর কাছে কামনা , তার সাক্ষাৎ লাভের আগ পর্যন্ত যেন তার দীনের সঙ্গে যুক্ত রাখেন এবং খাতেমা বিলখায়ের (উত্তম মৃত্যু) দান করেন ! কত পার্থক্য ... এক ব্যক্তি নিজের জীবন খেল তামাশায় নষ্ট করেছে আরেকজন যৌবনকাল থেকেই জিহাদের ভূখণ্ডে নিয়োজিত। এখন যা বলা হলো এগুলো আমার সামনের আলোচনার ভূমিকা। আসল কথা হলো, মুজাহিদীনের জেনে রাখা উচিত , আমাদের বড় ভাই শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বেশ কয়েকটি জিহাদী রণাঙ্গনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যার কারণে তাদের মাঝে গভীর পর্যবেক্ষণ , পরিপক্ক অভিজ্ঞতা এবং কাজের পরিণতি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি রয়েছে (— অন্তত তাদের ব্যাপারে এমনটাই আমাদের ধারণা , আল্লাহ তাদের ব্যাপারে ভালো জানেন এবং আমরা আল্লাহর হুকুমের বাইরে কারও পবিত্রতা ঘোষণা করি না)। তাই তিনি মুজাহিদীনের সামনে উপস্থিত ইস্যুতে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার যোগ্য।[86]

খোরাসানের ইমারত

ওয়াজিরিস্তানে মুজাহিদীন সমবেত হবার পর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহও তথায় গমন করেন। এখানে তিনি প্রথমে আফগানিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানে শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজীদ

---

86 خطاب الشيخ أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله المعنون ب دعوا عطية الله فإنه أعلم بما يقول وهو خطابه السادس والعشرين
শাইখ আবু মুসআব যারকাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ২৬ তম বিবৃতি।

রহিমাহুল্লাহর সহকারী এবং পরবর্তীতে শায়খ মুস্তফা রহিমাহুল্লাহ মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাতের পর আল-কায়েদায় শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর দ্বিতীয় নায়েব হন। ফিলিস্তিন আলজেরিয়া ইরাক ইয়ামেন পাকিস্তান সহ গোটা বিশ্বের মুজাহিদীনের মাঝে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব অনন্য ছিল। গোটা বিশ্বের মুজাহিদীন তার ইলমী অবস্থান ও গভীরতা স্বীকার করতেন। নিজেদের জটিল শরীয়তী বিষয় সমূহে তার শরণাপন্ন হতেন। সকলেই তার সিদ্ধান্তে আস্থা পোষণ করতেন। জিহাদী দায়িত্ব লাভের আগে এবং দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিভিন্ন বয়ান বক্তৃতা চিঠিপত্র প্রবন্ধ ব্লগ পুস্তক পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে দীন ও জিহাদের দাওয়াত বিস্তারের পাশাপাশি জিহাদী মানহাজ সংস্কার এবং নববী পন্থায় জিহাদ ঢেলে সাজিয়ে ভুল-ভ্রান্তি অপসারণে দৃষ্টান্তহীন ভূমিকা পালন করেন। আমার রায়, শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর পর মুজাহিদীনের আকায়েদ আখলাক আমাল তথা আকীদা- বিশ্বাস চারিত্রিক উৎকর্ষ ও আচরণবিধি নববী সীরাত ও শরঈ রাজনীতির আলোকে ঢেলে সাজাবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ এই ছিল যে, তিনি শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর মতো আলেমে রব্বানী, হেকমতওয়ালা, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমত্তা ও গভীর উপলব্ধির অধিকারী, দীন দুনিয়ার কল্যাণ অনুধাবনকারী এবং অপরকে বোঝাবার যোগ্যতা সম্পন্ন, সর্বজনপ্রিয় সহচর উপদেষ্টা ও সহকারী দান করেছিলেন। সমকালীন জিহাদী চিন্তাধারা এবং বিশেষভাবে আল-কায়েদার মানহাজ, কর্মপন্থা, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

[559]

বিন্যস্ত আকারে উপস্থাপনের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহই। এ সম্পর্কে তার বিস্তারিত সাক্ষাৎকার এবং সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা খুবই উপকারী।[87]

পাকিস্তান জিহাদে সংস্কার কর্ম

২০০১ সালে আফগানিস্তানে বর্বর মার্কিন হামলার পর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ অপরাপর হিজরতকারীদের মতো আফগানিস্তানের প্রতিবেশী কোনো দেশে গমনের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে যখন ইরাকে জিহাদী কার্যক্রম সংগঠিত হয়, তখন শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ ইরাকের মুজাহিদীনের পথ প্রদর্শনের জন্য তাকে ইরাকে প্রেরণ করেন। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ভ্রমণ জটিলতার কারণে ইরাকে প্রবেশ করতে পারেননি বটে; কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এবং ইরাকি মুজাহিদীনের পথ প্রদর্শন ও সংস্কারের দায়িত্ব চিঠিপত্র ও লেখালেখির মাধ্যমে পালন করতে থাকেন। অতঃপর যখন গোত্রীয় অঞ্চল এবং বিশেষ করে ওয়াজিরিস্তানের গোত্রগুলো হিজরত ও জিহাদের কেন্দ্রীয় ভূমি হয়ে ওঠে, তখন শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে তথায় প্রেরণ করে সেখানকার সংগঠনের সাধারণ দায়িত্বশীল শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহর সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলেন। এটা সেই সময়কার কথা, যখন এক দিকে আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন উত্তপ্ত ছিল এবং আল-কায়েদা আফগানি ভাইদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

---

[87] উদাহরণস্বরূপ আল -হিসবা ফোরামকে দেয়া তার শত পৃষ্ঠা সংবলিত সাক্ষাৎকার, انفذ على رسلك। গ্রন্থ এবং খারিজীদের জবাবে তার রচিত সংক্ষিপ্ত পকেট বুক ইত্যাদি। শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র সকল রচনা ও বয়ান বক্তৃতা الاعمال الكاملة। নামে ইনসাইক্লোপিডিয়া আকারে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে, যা পাঠ করা জিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মানহাজ বোঝার জন্য খুবই উপকারী।

শরীরে বারুদ বেঁধে আমেরিকানদেরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিলো, অপরদিকে লাল মসজিদ ও গোত্রীয় অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস ধারাবাহিক অপারেশনের পর আমেরিকানদের গোলাম পাক ফৌজ ও সরকারের বিরুদ্ধে মুজাহিদীন সক্রিয় ছিলেন। আল-কায়েদার সাথিরা একদিকে যেমন আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের রণাঙ্গনে ক্রিয়াশীল ছিল, অপরদিকে পাকিস্তানের ফ্রন্টে গোত্রীয় অঞ্চল ও অন্যান্য পাকিস্তানি ভাইদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ জিহাদে ব্যতিব্যস্ত ছিল। এমন পরিস্থিতিতে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ একজন আলেমে দীন ও জিহাদের মুরুব্বী হিসেবে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের— বিশেষ করে গোত্রীয় অঞ্চলের মুজাহিদীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকেন, তাদেরকে দিকনির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। আমার সঙ্গেও শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর প্রথম সাক্ষাৎ ২০০৮ সালের গ্রীষ্মকালের ওই সময় হয়েছে, যখন তিনি উত্তর ওয়াজিরস্তান ভানায় আহমদ যাঈ ওয়াজির গোত্রগুলোর মুজাহিদীনের আমন্ত্রণে নৈশ ভোজের আয়োজনে শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজীদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আগমন করেছিলেন।

যেহেতু পাকিস্তানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদী কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সেনাবাহিনীর জুলুম নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, এ কারণে সেটি প্রতিরোধ জিহাদ ছিল— যা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সুশৃঙ্খল পন্থায় সূচনা করা যায়নি; যার যখনই সুযোগ হয়েছে, আমেরিকার গোলাম বিশ্বাসঘাতক পাক-ফৌজ ও সরকারের ওপর হামলা পরিচালনায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতাহীনতা, ইলমে দীনে অপরিপক্কতা, শরঈ রাজনীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা এবং কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে পাক মুজাহিদীনের হাতে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা

[561]

ঘটে। এটা খুব সম্ভব ওই সময়ের কথা, যখন একদিকে শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজীদ রহিমাহুল্লাহ মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন, অপরদিকে গোত্রীয় অঞ্চলের মহান নেতা- আমীর বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এই অবস্থায় শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করেন এবং পাকিস্তানি ও গোত্রীয় অঞ্চলের মুজাহিদীনের সংশোধন, পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরি, শরীয়াহ বহির্ভূত কার্যক্রমে বারণ এবং মুসলিমদের প্রাণ ও সম্পদের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে গোত্রীয় অঞ্চলের অধিকাংশ মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার দীর্ঘ বৈঠক হয় এবং তিনি প্রজ্ঞা ও মহব্বতের সাথে শরীয়াহ বহির্ভূত, উপকারবিহীন ও ক্ষতিকর সামরিক কার্যক্রম বন্ধের চেষ্টা করেন। তিনি নিজের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আলজেরিয়ার জিহাদের মন্দ দিকগুলো চিহ্নিত করেন। পাকিস্তানি মুজাহিদদেরকে এমন সব বিষয় পরিহার করতে বলেন, যেগুলোর কারণে জিহাদের ভরডুবি হতে পারে। যখন দেশের কিছু এলাকায় জনসমাগমের স্থান— মসজিদ, মাজার, জানাযার স্থান, বাজার, সভা সেমিনার, খেলার মাঠ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত জনসাধারণকে মুজাহিদীনের নামে কিছু লোক হামলা করে, তখন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিকৃতি সংশোধনের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি সুস্পষ্ট আকারে অকাট্য ভাষায় পাকিস্তানি মুজাহিদীনকে দিকনির্দেশনা দেন। শরীয়তের আলোকে তাদের কার্যক্রমে সংস্কার সাধন, নিজ দলের বাইরের মুজাহিদদের সঙ্গে নম্রতা অবলম্বন, মুসলিম জনসাধারণের রক্তে হাত না রাঙানো এবং বিভিন্ন অজুহাতে মুসলিমদের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ না করার আদেশ দেন, অন্যথায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। জনসমাগমের

[562]

স্থানে ধামাকার ফলে মুসলিম জনসাধারণ নিহত হওয়াতে তিনি খুবই ব্যথিত ও বেদনাহত ছিলেন। তা বন্ধের জন্যই তিনি মুসলিমের রক্তপাত হারাম মর্মে এবং মুসলিমদের হত্যায় আনন্দ প্রকাশের ব্যাপারে নিন্দা জানিয়ে একটি বিশদ বিবৃতি প্রকাশ করেন।

তিনি শরীয়াহ মুখী উপলব্ধি ও জিহাদী অভিজ্ঞতার কারণে মুসলিমদের হত্যার ব্যাপারে সীমাহীন সচেতন ছিলেন এবং এ বিষয়কে দীন দুনিয়া ধ্বংসের পূর্ব প্রস্তুতি মনে করতেন। পাকিস্তানে ক্রমাগত বাজার খেলার মাঠ মাজার ও মসজিদে সংঘটিত রক্তপাতগুলোতে তিনি সীমাহীন অনুতপ্ত ও ব্যথিত ছিলেন। এসব ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানানো, নিজেকে এসব থেকে মুক্ত ঘোষণা করা এবং যোদ্ধাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে এসব হামলায় বাধা দেয়া তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন।

২০১১ সালের যে সময়ে পাকিস্তানে জিহাদী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের রক্তপাতে তিনি পেরেশান ছিলেন এবং এজাতীয় হামলা বন্ধের জন্য প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ মুসলিমদের রক্তের ব্যাপারে কতটা সতর্ক এবং জিহাদী কর্মবিধি এসব থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে কতটা সচেতন, ঐ ঘটনা দ্বারা তা অনুমান করা যায়। মূল ঘটনা হলো: শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ একজন আনসার ওয়াজিরিস্তানী ড্রাইভারের সঙ্গে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের প্রসিদ্ধ এলাকা দত্তা-খেয়লের কাছে তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু শায়খ ইবরাহীম আল মাগরিবি হাফিযাহুল্লাহর ঘরে গমন করেন। সে সময়ে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আমেরিকানদের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ছিলেন। আলকায়েদার নেতা হওয়ার পাশাপাশি খোস্তে মার্কিন সিআইএ'র শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ওপর পরিচালিত ডক্টর [563]

আবু দুজানা রহিমাহুল্লাহর ফিদায়ী হামলার তিনি মাস্টারমাইন্ড ছিলেন। যাই হোক যেইমাত্র শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর গাড়ি শায়খ ইবরাহীম আল মাগরিবি'র ঘরের বাইরে থামলো এবং তিনি গাড়ি থেকে বাইরে পা রাখলেন, অমনি নিকৃষ্ট কাপুরুষ আমেরিকানরা ড্রোন মিসাইল দিয়ে তার গাড়িতে হামলা করে। শায়খের গাড়ি ধ্বংস হয় এবং তার আনসার ড্রাইভার শহীদ হন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করেন। মেহমানখানায় প্রবেশ করা মাত্রই তিনি শায়খ ইবরাহীম হাফিযাহুল্লাহকে বলেন: আমার রেকর্ডিং শুরু করুন।' তখনই তার বিখ্যাত বিবৃতি রেকর্ড করাতে আরম্ভ করেন। সেই বিবৃতিতে পাকিস্তানে বসবাসরত মুসলিম জনসাধারণের রক্ত প্রবাহে তার নিজের এবং তার সংগঠনের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানি মুজাহিদীন এবং বিশেষ করে ফিদায়ী মুজাহিদীনকে মুসলিমদের রক্তের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার নসীহত করেন। এই বিবৃতি সে সময় রেকর্ড করা হচ্ছিলো, যখন সফরসঙ্গী শাহাদাত বরণ করেছিলেন, ড্রোন মিসাইল বর্ষণ করছিল এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন, পরের মিসাইলটি তার ওপর এসে পড়বে। কিন্তু যেই নাজুক মুহূর্তটি তার কাছে জীবনের শেষ মুহূর্ত বলে মনে হচ্ছিলো তখনও সত্যের পক্ষে সাক্ষী হতে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে তার দ্বারা সত্য প্রকাশিত হবে এই নেশায় তিনি মত্ত ছিলেন এবং আপন মুজাহিদ ভাইদেরকে অনাচার থেকে বাঁচানোর জন্য শেষ চেষ্টা করে যেতে চাচ্ছিলেন। এই ঘটনা মনে রেখে যদি কেউ শায়খের উক্ত ভিডিও দেখে, তাহলে শায়খের ওই মুহূর্তের বিশেষ ঈমানী অবস্থা ও মুহূর্ত অনুমিত হতে পারে। এটাই সেই বিবৃতি, যেখানে তিনি একটি ইলহামী (আসমানি ইশারায় প্রাপ্ত) বাক্য বলেছিলেন, যা মুজাহিদীনের কর্মপন্থা হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।

[564]

তিনি বলেছিলেন :

« “এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই ; শুধু মনে করিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য। এখানে আমরা নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করছি। এ বিষয়ে শরীয়াহ প্রমাণপঞ্জি ও নির্দেশনা কোন মুসলিমের কাছে গোপন নয়। একজন মুসলিমের প্রাণের মূল্য ও রক্তের হুরমত (সম্মানের কারণে রক্তপাত হারাম হওয়া) বোঝার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসখানা যথেষ্ট : «لَـزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْـوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْـلِ رَجُـلٍ مُسْـلِمٍ» অর্থ : গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো মুসলিমের হত্যার চেয়ে তুচ্ছ [সুনানে তিরমিযী]

অতএব চাই আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাক , আমাদের সংগঠন ও দল ভেঙে যাক ; চাই আমাদের সকল পরিকল্পনা ভেস্তে যাক , কিন্তু তবু আমাদের হাতে অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত না হোক। এটা খুবই সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। ” [শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর ভিডিও বিবৃতি تعظيم حرمة دماء المسلمين যার অনুবাদ : ‘মুসলিমের রক্তের মর্যাদা ’ থেকে সংগৃহীত]

যাহোক শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর জিহাদী নাম ‘মাহমুদ ’-এর মতো আসলেই তিনি মাহমুদ তথা প্রশংসনীয় ছিলেন। সর্বজনপ্রিয় এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন , যাকে এক ঝলক দেখে অথবা একবারের সাক্ষাতে মন থেকে ভালো লেগে যায়। তার নসীহত সচেতন হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করতো এবং তার উপদেশে বহু লোক সঠিক পথের দিশা লাভ করতো। উক্ত ড্রোন হামলায় আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে যান এবং কিছুক্ষণ পর স্থানীয় আনসারগণ তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। তিনি নির্বাহী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। অবশেষে আরও কিছুদিন পর ২০১১ সালে

বিশ্বাসঘাতক পাক ফৌজের সহায়তায় এক ড্রোন হামলায় সালফে সালেহীনের স্মৃতিচিহ্ন, আফ্রিকা- ভূখণ্ডের আলেমে রব্বানী, মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর দুর্লভ "আতিয়া' বা দান শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ১৪ বছরের পুত্র ইসামের সঙ্গে জীবনদানকারীর কাছে প্রাণ উৎসর্গ করেন। আল্লাহ তার পবিত্র আত্মার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আম্বিয়া ও সিদ্দিকীনের সঙ্গে হাশরের দিন তাকে মিলিত করুন এবং তার হত্যাকারীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিন, আমীন।

এখন পাঠকের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করতে চাই। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ জীবনের শেষ বছরগুলোতে ‘মাহমুদুল হাসান' সাংকেতিক নাম ব্যবহার করতে শুরু করেন। আমার জানা নেই, এটা ঘটনাক্রমে হয়েছে নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহিমাহুল্লাহর নাম নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন। অবশ্য শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর মাঝে উলামায়ে দেওবন্দের ভালোবাসা থাকার কারণে তিনি ইমামে জিহাদ শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর নাম নিজের জন্য বেছে নেয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। এই নামটাই শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত নিজের সকল চিঠিপত্রে এবং সাংকেতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। এ বিষয়টি উম্মাহর উলামায়ে কেরামের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট।

অসি ও মসির অধিকারী শায়খ, ফকীহ আবু ইয়াহিয়া হাসান কয়েদে লীবী রহিমাহুল্লাহ
শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর পর খোরাসানে আল-কায়েদার নেতৃত্বভার শায়খ আবু ইয়াহিয়া লিবি রহিমাহুল্লাহ গ্রহণ করেন। তিনিও [566]

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর মতো রুশ বিরোধী জিহাদের শেষ সময়ে হিজরত করে আফগানিস্তানে আসেন। রাশিয়ার পরাজয়ের পর গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে তিনি আলাদা হয়ে ইলমে দীন অর্জনে মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্যে মৌরিতানিয়া গমন করেন এবং দুই বছর সেখানকার মাশায়েখে কেরামের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। ইলম অর্জনের জন্যই পরবর্তীতে সুদানে এবং তারও পরে পাকিস্তান গমন করেন। পাকিস্তান থেকে তিনি ১৯৯৯ সালে বেফাকুল মাদারিস থেকে শিক্ষা সমাপনী সনদ অর্জন করেন। পরবর্তীতে ইমারতে ইসলামিয়ার আমলে পুনরায় আফগানিস্তানে হিজরত করেন। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর করাচি চলে যান এবং সেখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। সে সময়ে শীর্ষস্থানীয় একদল পাকিস্তানি আলেমের দ্বারা তিনি উপকৃত হ,ন যাদের মাঝে হযরত মাওলানা মুফতী নিজাম উদ্দিন শামযাঈ শহীদ রহিমাহুল্লাহর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। করাচি থেকেই মীরজাফর ও মীর সাদেকের উত্তরসূরি আইএসআই'র এজেন্টরা তাকে গ্রেফতার করে এবং অল্প কিছু ডলারের বিনিময়ে মার্কিন মনিবদের কাছে দিয়ে দেয়। আফগানিস্তানে তিনি কুখ্যাত মার্কিন কারাগার বাগরাম জেলে বন্দী জীবন যাপন করেন। সেখানে আল্লাহ তাআলা তার এবং তার তিনজন সহচরের হাতে এক মহান কারামত প্রকাশ করেন। বাগরাম জেলে যেখানে আমেরিকানরা গ্রাউন্ড, ইলেকট্রনিক, এয়ার — সব ধরনের সেফটি ব্যবস্থা করে রেখেছিল, সেখানে আল্লাহ তাআলা এই কারাগার তাদের সামনে ভেঙে দেন। কারাগারের দরজা খুলে গেলে তিনি তিন সাথিসহ পলায়ন করেন। অতঃপর আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশ অতিক্রম করে ওয়াজিরিস্তানে আপন সাথিদের কাছে পৌঁছেন। পুরানো বন্ধু এবং লিবিয়ার মহান নেতা শায়খ আবুল লাইস কাসেমী রহিমাহুল্লাহর

[567]

নেতৃত্বে জিহাদী যাত্রা করেন। কিছুকাল পর যখন শায়খ আবুল লাইস কাসেমী[৪৪] বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের নেতা শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর হাতে রীতিমতো বায়আতবদ্ধ হন, তখন শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহও আল-কায়েদার শামিল হয়ে যান। তিনি আল-কায়েদার উলামা কমিটির সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তীতে জিম্মাদার নিযুক্ত হন। তিনি নিজের ক্লাস ও দাওরার মাধ্যমে শত শত মুজাহিদকে দীক্ষিত করেছেন। জিহাদী বিভিন্ন বিষয়ের উপর পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ, ছোট্ট পুস্তিকা লিখেছেন, যার মাঝে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শরীয়ার হুকুম সম্পর্কে حد السنان في قتال حكومة وجيش باكستان - পুস্তিকাটি খাপমুক্ত তরবারি নামে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের

---

[৪৪] শাইখ আবুল লাইস কাসেমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরব মুজাহিদীনের এমন নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা আশির দশকে রুশ বিরোধী জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তানে হিজরত করেছিলেন। রাশিয়ার পরাজয়ের পর লিবিয়ায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য লিবিয়ার জিহাদী জামাত 'আল জামাতুল ইসলামিয়া আল-মুকাতিলা'য় যুক্ত হয়ে আল্লাহর দ্বীনের শত্রু ধর্মহীন চিন্তাধারার অধিকারী মুআম্মার গাদ্দাফির দুর্নীতিবাজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হিজাজ ভূখণ্ডে গমন করেন এবং সৌদি রাজ পরিবারের কারাগারে বন্দি থাকেন। মুক্তি পাওয়া মাত্রই ইমারতে ইসলামিয়ার আমলে আফগানিস্তানে হিজরত করেন। তিনি মুজাহিদীনের প্রশিক্ষক ও সামরিক নেতা ছিলেন। ইমারতে ইসলামিয়ার পতনের পরপরই উত্তর ওয়াজিরিস্তানকে কেন্দ্র ধরে নিয়ে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ সংগঠিত করতে আরম্ভ করেন। বিশেষকরে আফগানিস্তানের খোস্ত, পাকতিকা, পাকতিয়া প্রদেশগুলোতে প্রাথমিক জিহাদী কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে তিনি এবং তার সাথীরা মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। সেই সঙ্গে তিনি শত শত আরব অনারব মুজাহিদের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন এবং রীতিমতো আমেরিকানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করান। সমকালীন আফগান জিহাদে মাইন ও বারুদের ব্যবহার, আত্মঘাতী হামলার নিয়ম নীতি এবং শহুরে ও পার্বত্য যুদ্ধের বিন্যাস তারই কৃতিত্ব। আফগান মুজাহিদীনের প্রতি তার বিশেষ মনোযোগ থাকতো এবং তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কতক আফগান মুজাহিদ ইমারতে ইসলামিয়ার অধীনে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদী কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন। ২০০৭ সালে তার পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে মুজাহিদীন বাগরাম এয়ারপোর্টে হামলা করে— যখন মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি ডেকচিনি বাগরামের এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিল। এছাড়াও আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রথম দিকের কিছু অপারেশনে তিনি নেতৃত্ব দেন। যদিও শুরু থেকেই তিনি ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে আলকায়দার শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে জিহাদী কাজ করতেন, কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলেমে রব্বানী শাইখ আবু ইয়াহিয়া লিবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগরাম জেল থেকে মুক্তির পর ২০০৭ সালে তিনি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে রীতিমতো বাইয়াতবদ্ধ হয়ে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনে শামিল হয়ে যান। ২০০৮ সালে ওয়াজিরিস্তানের মির আলী এলাকায় পাক ফৌজের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মার্কিন ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন আমিন!!

মাঝে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। এছাড়াও তার ফিকহুল জিহাদ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা ও ফাতওয়া রয়েছে। ফিকহ, উসুলে ফিকহ শাস্ত্রে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

ফিকহে হানাফীর উপর পারদর্শিতা তার একটি বৈশিষ্ট্য। হানাফী উলামায়ে কেরামের সঙ্গেও তার নৈকট্য ছিল। এ বিষয়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি বলতেন, ফিকহে হানাফী সম্পর্কে শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহর অবগতির কারণে আমাদেরকে অনেক শরীয়াহ বিষয় বোঝানো বেশ সহজ হত।

শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ একজন অগ্নিঝরা বক্তা ছিলেন। তার কথায় আল্লাহ তাআলা অসম্ভব প্রভাব রেখেছিলেন। জিহাদী মিডিয়াতে তার বয়ান বক্তৃতা কত শত অন্তরে জিহাদের অনুপ্রেরণা জাগ্রত করেছিল এবং শাহাদাতের ব্যাকুলতা তৈরি করেছিল! তার আলোচনাভঙ্গি এতটা চিত্ত প্রভাবক ছিল যে, শায়খকে চেনে না এবং আরবী ভাষা জানে না এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে: “ভিডিওতে এ ব্যক্তিকে যখন দেখি, তখন বুঝে না আসা সত্ত্বেও অন্তরে জিহাদের আগ্রহ তৈরি হয় এবং তার নিষ্ঠার প্রতি আস্থা চলে আসে।”

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ যখন খোরাসানে সংগঠনের আমীর হলেন, শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহকে তার সহকারী নিযুক্ত করেন। অতঃপর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ আল-কায়েদার প্রধান নিযুক্ত হন। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ যখন আল-কায়েদার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ তার সহকারী নিযুক্ত হন ।

[569]

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ দুজনই গোত্রীয় অঞ্চলে মুজাহিদীনের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংশোধনকর্মে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ওয়াজিরিস্তানে যে সময়টাতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ওপর ক্রমাগত হামলা আরম্ভ হয়, তখনো এই উভয়ে হযরত (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা) মুজাহিদীনের সংশোধন ও নসীহতের জন্য সেফটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সাক্ষাতে বেরিয়ে পড়তেন এবং কাজ করতেন। শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ দাওয়াতী ও ইলমি ব্যক্তিত্বের কারণে গোটা বিশ্বের মুজাহিদীনের আশ্রয়স্থল ছিলেন। উভয়ই আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড ছিলেন। একের পর এক তার উপর ড্রোন হামলা হয় কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাযত করেন। অবশেষে জুন ২০১২ সালে এক হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন, আমীন।

জিহাদী অঙ্গনের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জ্ঞান অর্জন
আলোচনা চলছিল ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর।
এরই মাঝখানে এত বিশদভাবে জিহাদী উলামা ও মাশায়েখে কেরামের আলোচনার উদ্দেশ্য হল-ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জামাত, তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার মাশায়েখ মুরুব্বী ও গুরুজনদের সঙ্গে পরিচিত করা। কোনো ব্যক্তির জীবন ও কর্ম তুলে ধরার জন্য তার শিক্ষকবৃন্দ ও মুরব্বিদের আলোচনা খুবই কার্যকরী। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ওপর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহর বেশ প্রভাব ছিল। তাদের সান্নিধ্য ও সংস্রব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্ব শাণিত করেছিল। এমনিতেই তাঁর মাঝে

[570]

ইলমে দীনের আগ্রহ ছিল, কিন্তু এই উভয় হজরতের নৈকট্য ইলমে দীনে তার গভীরতা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি যত বিষয়ের সম্মুখীন হতেন; অথবা নিজে সম্মুখীন না হলেও অন্য কারও কাছে শুনতেন; মুজাহিদীনের কেউ যদি কোনো শরীয়াহগত প্রশ্নের সম্মুখীন হত, তিনি সেগুলো নোট করে নিতেন এবং দীর্ঘ সাক্ষাতে এই উভয় হযরতের কাছ থেকে সেগুলোর শরঈ সমাধান করিয়ে নিতেন। সূক্ষ্ম বিষয় হোক কিংবা সর্বজনগোচরে আসার মতো বিষয় হোক, সবকিছুই তিনি এই হযরতদের কাছে গিয়ে সমাধান করতেন। তিনি একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করেন জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামাবাদ থেকে। ইসলামাবাদের ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে উলূমে শরীয়াহর রেজাল্ট ও সার্টিফিকেটে তিনি পুরো ইউনিভার্সিটিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। আধুনিক ইউনিভার্সিটি হিসেবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার উদ্দেশ্য সাধারণত ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন এবং চাকরি-বাকরির দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া; যেখানে বর্তমানে সাধারণত শরীয়াহ বিভাগে এমন অধ্যাপকদের দেখা যায় বা শোনা যায়, যারা নিজেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দীনের সত্যতার প্রবক্তা বলে মনে হয় না। কাফের গোষ্ঠী এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি দ্বারা তারা প্রভাবিত। কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যে সময়ে ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন, সে সময় অধ্যাপকদের অধিকাংশই ছিলেন আরব অনারব সৎকর্মশীল মুত্তাকী উলামায়ে কেরাম।

ইসলামী ইউনিভার্সিটি থেকে চলে আসার পর এমনিতে তিনি জ্ঞানযাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে আরবের এই দুই শায়খের নৈকট্য লাভের পর দ্বিতীয়বার জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা হয়। জিহাদ ও লড়াইয়ের অঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার মতই ইলম চর্চার স্থল। সেখানে যদি উলামায়ে

[571]

রব্বানীর উপস্থিতি থাকে, তাহলে দৈনন্দিন জিহাদী জীবনে শরঈ দিকনির্দেশনা ও জিহাদী ফিকহ জানার এত তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয় যে, জ্ঞানপিপাসুরা উলামায়ে জিহাদের পাশে জড়ো হতে শুরু করেন। অতঃপর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক হলো: ইলমে দীনের প্রতি ভালোবাসা— যেটাকে ইশক বলা যায়। তিনি এই মাশায়েখে কেরামের সান্নিধ্য ও শিষ্যত্ব লাভ করে ইলমে দীনের স্তরগুলো কিভাবে অতিক্রম করেছিলেন, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

০১. বিভিন্ন বৈঠকে, শায়খদের বিভিন্ন ক্লাসে তাঁর অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। সে সমস্ত ক্লাসে আকীদা ফিকহ থেকে তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি সবকিছুর আলোচনা হত। সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ক্লাস স্বয়ং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আবেদনের প্রেক্ষিতে হয়েছে, এমনকি তিনি নিজে সেগুলোতে অনুবাদ করতেন। মুজাহিদীনের সাধারণ বেশ কিছু বৈঠকেও তার অংশগ্রহণের সুযোগ হয়।

০২. ওই শাহখদের সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পরিচয় হয়েছে একজন তালিবুল ইলম হিসেবে। এজন্য প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাদের দিকনির্দেশনায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে কিতাব পড়তে শুরু করেন। ওই কিতাবগুলোর গুরুত্ব ও সারমর্ম শায়খদের কাছ থেকে সরাসরি বুঝে নিতেন। অতঃপর নিজেই অধ্যয়ন শুরু করতেন এবং ওই গ্রন্থগুলোর জটিল জায়গাগুলো নোট করে রাখতেন। পরবর্তী সাক্ষাতে সেগুলো তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে সমাধান করতেন। এভাবেই তিনি তাদের তত্ত্বাবধানে জ্ঞানযাত্রা চালিয়ে যান।

০৩. পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাঁর মনে কোনো চিন্তা এলে, পড়াশোনার সময়ে জটিল কোনো বিষয়ে এলে, জিহাদী অঙ্গনে কোনো সমস্যা বা প্রশ্নের

[572]

মুখোমুখি হলে; এক কথায়, যেকোনো বিষয় ডায়েরিতে নোট করে রাখতেন এবং যখন শায়খদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো, তখন শরীয়তের আলোকে সেগুলোর সমাধান জেনে নিতেন। তিনি নিজের মনের সকল প্রশ্ন তাদের সঙ্গে উপস্থাপন করতেন।

০৪. মাশায়েখে জিহাদের সাক্ষাতে সবচেয়ে মূল্যবান যে নেয়ামতটিকে ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ ইলমে দীনের মগজ বলেছেন; যা ব্যতীত ইলমের উদ্দেশ্য হাসিল হয় না, তা হলো তাযকিয়া ও সুলুক তথা আত্মশুদ্ধি। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ওই হযরতদের সান্নিধ্যে আত্মশুদ্ধির বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করেছেন। শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহ, আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ এমন মহান হযরতগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মাহফিল ও মজলিসগুলোতে আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা হতো। এই হযরতগণ এমন নমুনা ছিলেন, যাদের সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটালেও তাদেরকে অনুসরণের আগ্রহ তৈরি হতো। তাকওয়া, খোদাভীতি, ইখলাস, নিষ্ঠা, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ, তাওয়াক্কুল, ভরসা, আস্থা, মুহব্বত, আল্লাহর সামনে অক্ষমতা প্রকাশ ও বিনয়, মুসলিমদের ব্যাপারে সুধারণা, গীবত ও পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা, অধিক তিলাওয়াত ও নফল ইবাদত, হিংসা-বিদ্বেষ ও দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে মুক্তি, মুসলিমদের কল্যাণকামিতা, রিয়া ও লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকা, নিজের জন্য প্রতিশোধ না নেয়া —এক কথায় আত্মশুদ্ধির সকল বিষয়ে তাদের কাছে দীক্ষা পাওয়া যেত এবং তাদের চলাফেরা আচার-উচ্চারণ ও চলনে বলনে এ বিষয়গুলো ফুটে উঠতো। তারা কখনও নিজেদের আমল দিয়ে, কখনও উপদেশ দিয়ে, আবার কখনও ক্লাসের মাধ্যমে

[573]

ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করতেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তাদের সৌরভময় সান্নিধ্য দ্বারা দীর্ঘ সময় উপকৃত হন এবং নিঃসন্দেহে তিনি নিজের ঐ সমস্ত আকাবির হযরতের সর্বাধিক আস্থাভাজন শাগরেদ ও শিষ্য ছিলেন। তার উস্তাদ ও গুরুজনরাই তার ব্যাপারে এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন।

বুঝমান, সুসভ্য, উচ্চ মনোবল সম্পন্ন ও নিয়মানুবর্তী ব্যক্তিত্ব
কারও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তার গুরুজন ও শিক্ষকদের রায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যদি কারও ব্যাপারে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর মতো ইলমের গভীরতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, দুর্লভ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, জিহাদী পথ প্রদর্শক প্রশংসা করেন, তাহলে এমন ব্যক্তির মর্যাদা অনুমান করা যায়। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ একদিকে যেমন সুবিবেচক ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, অপরদিকে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর একান্ত সহকারী ছিলেন। নানা আন্দোলন ও ব্যক্তি যাচাই করা, তাদের সংশোধন, মন্দ দিক চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার বিশেষ যোগ্যতা ছিল। তিনি শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর কাছে পাঠানো এক পত্রে ফারুক রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে যে বাক্য লিখেছেন, তা অনবহিত ব্যক্তিদেরকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মর্যাদা বোঝাতে যথেষ্ট। এই পত্র শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর তার ঘর থেকে আমেরিকানদের হাতে যায় এবং তারা পরবর্তীতে প্রকাশ করে। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ঐ পত্রে শায়খ উসামাকে লিখেছেন:

[574]

وهناك أخ باكستاني اسمه أحمد فاروق مسؤول السـحاب اوردو وهو رجل فاضل ويعرف العربية بشكل جيد وصــاحب إدارة وعقل وثقافة وهمة ولعلنا ندخله معنا في الشورى هذه المرة

« এখানে একজন পাকিস্তানি ভাই রয়েছেন যার নাম আহমদ ফারুক; আস-সাহাব উর্দুর প্রধান দায়িত্বশীল ; তিনি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। আরবী ভাষা ভালোভাবে জানেন। একজন বুঝমান , নম্র ভদ্র উচ্চমনোবল সম্পন্ন এবং নিয়মানুবর্তী ব্যক্তি তিনি। এবার তাকে আমাদের শুরা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। »

জিহাদী বিভিন্ন বিষয় বোঝার জন্য আহমদ ফারুকের শরণাপন্ন হন

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর কাছে একবারে আমি কিছু সাথি ভাইয়ের প্রতিনিধি হিসেবে চলমান পরিস্থিতি , মুজাহিদীনের কার্যনির্বাহ এবং বিশেষ করে পাকিস্তান জিহাদ বিষয়ে আল -কায়েদার অবস্থান বোঝার জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রেরণ করি। এটা শায়খ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের কিছুদিন আগের কথা। তিনি ওই প্রশ্নের জবাব কয়েক কিস্তিতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর চিঠিপত্র ও অডিও বার্তার মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করেন। তিনি যেহেতু সে সময় আমেরিকার বিশেষ টার্গেট ছিলেন এবং তার উপস্থিতি ধারণা করে আমেরিকা কয়েকটি ড্রোন হামলা করেছিল , এ কারণে তার চলাফেরা পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল এবং শুধু চিঠিপত্রের মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তখন তিনি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জিহাদী বিষয়াদি বোঝার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন , তন্মধ্যে প্রথম পরামর্শটি কিছুটা এমন ছিল :

الأول أدلك أنت شخصيا على شيء مفيد جدا ولكن لابد أن تقبله بصـــدر رحب وهو أن تجلس مع الأخ أحمد فـــاروق فإنه من أكـــثر الأخوة الباكستانيين الذي جلوسا معنا ومخالطة لنا وحـديثا فهو قد نـاقش معنا معظم المسـائل المهمة وحـتى الصـغيرة وطبعا هـذا راجع إلى أنه يعرف العربية جيدا وربما لأسباب أخرى فـالأخ أحمد فاروق موثوق عندنا ومعتمد وأرجو أن تجلس معه وتساله عن كل المســـائل وتتحـــدث معه وهو ينقل لك جـــزءا كبـــيرا من آرائنا وقناعاتنا وما لا يعرفه هو فحينها تراسلوني فيه

(অর্থ :) প্রথম বিষয় : আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে চাই। কিন্তু এটি উন্মুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি হলো , আপনি আহমদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে বসবেন। পাকিস্তানি ভাইদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশি ওঠা বসা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন কি অনেক ছোটো ছোটো বিষয়েও আমাদের সঙ্গে তার বিস্তারিত কথাবার্তা হয়েছে। এটা প্রকাশ্য বিষয় যে , আরবী ভালো জানার কারণেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। অথবা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। অতএব আহমদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাদের আস্থাভাজন এবং নির্ভরযোগ্য। আমি আশাবাদী , আপনি তার সঙ্গে বসবেন এবং সকল বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান পেতে চেষ্টা করবেন। তিনি আমাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বড় অংশ আপনাদেরকে জানাবে। তবে যে বিষয়ের জবাব তার জানা নেই , সে বিষয়ে আপনি আমার কাছে চিঠিপত্র লিখবেন। »

উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের একজন সদস্য আহ্বায়ক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ কারণে উক্ত অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন এবং এর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আহ্বায়কদের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। সে সঙ্গে ওই আন্দোলনের এবং তার

শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ফারুক ভাইয়ের সম্পর্ক নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর আকাবির ব্যক্তিবর্গের চেষ্টা প্রচেষ্টা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে নবুওয়াতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করে দিন এবং কাফেরদের বৈশ্বিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটান, আমীন।

দশম অধ্যায়: একক গুণাবলি স্বভাব চরিত্র ও অভ্যাস
আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ স্বভাব চরিত্র ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন। জীবনের সর্ব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। প্রশংসনীয় গুণাবলি ও উন্নত স্বভাব চরিত্রে তিনি সমকালীনদের মাঝে বিশিষ্ট ছিলেন। তার বৈঠকগুলো ইলম প্রজ্ঞা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হতো। তার সান্নিধ্য তাকওয়া খোদাভীতি লিল্লাহিয়াত ও নিষ্ঠার প্রতীক হতো। তার সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো ঈমান জাগরণের কারণ হতো। সাথিদের সঙ্গে স্নেহ মমতায় রেশমের মতো নম্র এবং আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলায় তিনি ইস্পাত শক্ত ছিলেন। তার সকল গুণাবলি তুলে ধরা কঠিন বিষয়; কিন্তু কিতাবের এই অংশে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কিছু বিশেষ গুণ স্বভাব চরিত্র ও বিশেষ অভ্যাস আলোচনা করা হবে।

[577]

শওকে জান্নাত

** জান্নাত লাভের জন্য এক দরজা দিয়ে চলা জরুরি

একদিন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বলতে লাগলেন:

« আমাদের উদ্দেশ্য জান্নাত না? আমরা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না? এবং এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই ইবাদত বন্দেগি এবং অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে থাকি তাই তো? কিন্তু হে প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহর সাক্ষাৎ ও জান্নাত লাভের একটাই পথ আর তা হলো মৃত্যু। এছাড়া এই উদ্দেশ্য লাভ করা যেতে পারে না। অতএব আমাদের মৃত্যু আমাদের জান্নাত। কারণ মৃত্যু ছাড়া জান্নাত সম্ভব নয়; আর জান্নাত ছাড়া আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। এ কারণে আমাদের জন্য আমাদের মৃত্যু অর্থাৎ শাহাদাত কাঙ্ক্ষিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি মৃত্যু ছাড়া সম্ভব নয়। »

** আমি কেন বঞ্চিত থাকবো এই সৌভাগ্য থেকে!

আমি তার শেষ দিনগুলোতে এক পত্রে জোরালোভাবে তাকে বলেছি, আপনি নিরাপদ কোথাও চলে যান এবং ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা থেকে শিগগির বেরিয়ে পড়ুন। তিনি জবাব দিয়েছেন:

« আমার প্রতি খেয়াল রাখার এবং আমার কথা চিন্তা করার কারণে আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কিন্তু হে প্রাণপ্রিয় ভাই! আমাদের আরব হযরতগণকে এবং অন্য সাথিদেরকে নিরাপদে না রেখে আমি কিভাবে অন্য কোথায় যাবো? আমি তো জানি, এখানে হোক ওখানে হোক শাহাদাত আমার চাই। তাহলে কেন আমি ধৈর্যের পথে থাকবো না? আল্লাহ সুযোগ দিলে বেরিয়ে আসবো

[578]

অন্যথায় إحـــدى الحســـنيين তথা দুই কল্যাণের এক কল্যাণ তো অবশ্যই লাভ করবো ইনশাআল্লাহ! »

অতঃপর মায়া ভরে এই কবিতা লিখেছেন:

اوليس موتي في حياتي مرة　　لم لا يكون ختامها استشهادية

অর্থ: মৃত্যু কি আমার জীবনে একবারই আসবে না? তাহলে কেন জীবনের অবসান শাহাদাত দিয়ে হবে না?

নফসে মুতমাইন্নাহ

নফসে মুতমাইন্নাহর আসল অর্থ আগে আমি বুঝতাম না। কিন্তু শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নিশ্চিন্ততা স্থিরতা ও প্রশান্তি দেখে বুঝে আসে, নফসে মুতমাইন্নাহ কাকে বলে! নফসে রাজিয়া (নিজে সন্তুষ্ট) মারজিয়া (অন্যে যার প্রতি সন্তুষ্ট) কাকে বলে! সর্বাবস্থায় রবের প্রতি সন্তুষ্ট... আল্লাহর দীনের পথে সকল বিপদ-আপদ সহ্যকারী! অবস্থা যতই নাজুক হোক, আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করে সকল কঠোরতা নিমিষে পানি হয়ে যাওয়া। যেমন জিহাদী অঙ্গনের কবি শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

بہاروں سے پہلے جو انکھوں پہ گزری۔ وہ اتنی کٹھن تھی کہ مشکل بیاں ہے

دلوں پر مگر ایک سکینہ تھی طاری۔ تمہیں کیا خبر وہ بعید از گماں ہے

অর্থ: বসন্তের আগে যা দেখা গিয়েছিল, তা এতটাই কঠিন ছিল যা অবর্ণনীয়

কিন্তু অন্তরে এমন প্রশান্তি ছিল... তোমরা সেটা কি বুঝবে.. যা অকল্পনীয় »

এমন প্রিয় ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কেন সন্তুষ্ট হবেন না? অথচ তিনি বান্দাদের প্রতি অতি মায়াশীল।

আমি ভালো আছি

রবের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ এবং তার ভালোবাসা ও মহত্ববোধ থেকেই তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা তৈরি হয়। জীবনের শেষ সময়ে আমাদেরকে ধমক দিয়ে দিয়ে বলতেন —বহু সংখ্যক ড্রোন খুব নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে .. বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেট বিমানগুলো খুব কাছে থেকে চক্কর দিচ্ছে .. নিরাপদ খন্দক বা গুহায় ঢুকে যান আপনারা। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য ভাইয়েরা নিরাপদ গুহায় না ঢুকতেন , ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি যেতেন না। সাথিদেরকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে তবেই তিনি গুহায় প্রবেশ করতেন। এরপর যখন বিপদ কেটে যাবার ইঙ্গিত পাওয়া যেত , তখন সর্বপ্রথম তিনিই বাইরে এসে সংবাদ সংগ্রহ করে অন্যদেরকে জানাতেন। যখন তাকে বলা হতো , আপনি আগে গুহায় যান , তখন তিনি বলতেন: "আমি ভালো আছি আপনারা আগে নামুন।" নিঃসন্দেহে তিনি সত্যই বলতেন। ঈমানের পর শাহাদাতের চেয়ে বেশি ভালো থাকা আর কি হতে পারে ?

মোবারক ইনসান

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর জীবনের যেই দিক আলোচনা করি, তা পূর্ণাঙ্গ ও বরকতপূর্ণ ছিল। তিনি যে কাজেই হাত দিতেন , তাতেই সোনা ফলতো। যেদিক নিয়ে আলোচনা করি , তিনি সকল দিকেই সর্বাগ্রে ছিলেন। আমি জীবনে তার পেছনে অনেক ঘুরেছি , যেন এক অঙ্গনে হলেও তার কাছাকাছি থাকতে পারি ; কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তিনি অনেক আগে ছিলেন। তার পিছু পিছু হাঁটতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু তিনি অনেক আগে ছিলেন এবং খুব দ্রুত চলতেন। তিনি তো وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِــــرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ [অর্থ : আপন রবের পক্ষ থেকে

মাগফিরাত অর্জনের জন্য একে অপরের চেয়ে দ্রুত চলো] আয়াতের উপর আমল করে সৎকর্মের দিকে দৌড়াতে থাকতেন। সম্ভবত এই কারণেই তার সকল কাজের মাঝে বরকত ছিল। তেমনটাই আমার মুরুব্বী, আমার গুরু, আলেমে রব্বানী, জাহেদ, আবেদ, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ শায়খ খালেদ আল হুসাইনান বলেন: « যখন মানুষ ইবাদত বন্দেগি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মতো আমলগুলো অধিক মাত্রায় করে, তখন আল্লাহর মাহবুব ও প্রিয় হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তার সকল কাজে বরকত দেন; সে বরকতময় হয়ে যায়। যে কাজ করে, তাতেই বরকত দেখা দেয়। »

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বরকতময় ছিলেন। শাহাদাতের বরকতময় মর্যাদা অর্জন করেছেন। আল্লাহ বরকতের সম্ভার জান্নাতের অধিবাসী হিসেবে তাকে কবুল করুন, আমীন।

সালাত যার চক্ষু শীতলকারী ছিল
যৌবনের শুরু থেকেই তার নামায ছিল ঈর্ষণীয়।
মনে হতো, নামাযের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে গোপন আলাপ হচ্ছে। নামায পড়তে পড়তে কখনও তার চেহারায় তীব্র চিন্তার ছাপ দেখা যেত; মনে হতো, তিনি কাঁদছেন এবং কারও কাছে মিনতি জানাচ্ছেন; আবার কখনও হঠাৎ মনে হতো, তিনি এতটাই আনন্দিত যেন হাসছেন; আনন্দে তার চেহারা ঝলমলিয়ে উঠতো। আযাবের আয়াত পড়ে চিন্তিত এবং পুরস্কারের আয়াতসমূহ পরে আনন্দিত হতেন। এতটা একাগ্রতার সাথে পরবর্তীতে আর কাউকে নামায পড়তে দেখেছি কিনা সন্দেহ আছে। তার নামাযের মধ্যে তার একাগ্রতা বোঝা যেত ওই সময়, যখন কেউ মসজিদে সাক্ষাতের জন্য আসতো, এসে দেখতো, তিনি ফরয নামাযের পর নফলে ডুবে গিয়েছেন। সাক্ষাৎপ্রার্থী বারবার এসে দেখতো, নফল শেষ [581]

হয়েছে কিনা। কিন্তু তিনি তো দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে নফলে ডুবে আছেন। অতঃপর যখন আমি সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সীরাত পড়তাম , তাদের নামাযের ঘটনা পড়তাম এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নামায তাদের সঙ্গে মেলাতাম , তখন খুবই ঈর্ষা হতো যে , আমার নামায যেন আল্লাহ এমন বানিয়ে দেন। আমি যখন ফারুক ভাইয়ের রহিমাহুল্লাহকে নামায পড়তে দেখতাম , তখন মনে হতো, তিনি নামাযের স্বাদ পাচ্ছেন , প্রশান্তি পাচ্ছেন। তখন তার অবস্থা দেখে আমার বুঝে আসতো , নামায কেমন করে ঈমানদার বান্দার চক্ষু শীতলকারী হতে পারে। ভর যৌবনেও তার নামাযের মধ্যে এমন নেশা লেগে থাকতো, মনে হতো , তার অন্তর মসজিদে আটকে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো , নামাযের এই অবস্থা শুধু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। কোনো সাথি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মজলিসে যাতায়াত শুরু করলে নামাযের মধ্যেই সর্বপ্রথম তার প্রভাব দেখা যেত।

কুরআনে কারীমের সঙ্গে তার সম্পর্ক

কুরআনের সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্পর্ক .. আহ! এটা আশেক মাশুকের দাস্তান ! প্রেমিক প্রেমাস্পদের উপাখ্যান। তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল কুরআনে কারীম। তিনি কুরআনের প্রেমিক ছিলেন। একে জীবন্ত গ্রন্থ মনে করতেন —যেখানে আমাদের জন্য সর্ব বিষয়ে পথনির্দেশনা রয়েছে। তিনি কুরআনের তিলাওয়াত حق تلاوته করতেন তিলাওয়াতের যথার্থ পন্থায়। এক এক আয়াত নিয়ে চিন্তা করতেন এরপর সামনে যেতেন। যখন কুরআন পড়তেন তখন যেন অন্য কোনো জগতে চলে যেতেন। তিলাওয়াতের মাঝখানে ভাবতেন আল্লাহ তাআলা আমাকে

কি বলেছেন ! তিনি আমার কাছে কি চান ! অধিকাংশ কাজ-কর্ম এবং জিহাদী দায়িত্ব হিসেবে দেখা -সাক্ষাৎ শেষ হবার পর তার একটাই ব্যস্ত থাকতো —কুরআন তিলাওয়াতে ডুবে যাওয়া। যেন তিনি নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তব চিত্র ছিলেন: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

অর্থ : "এ কারণেই যখন তুমি অবসর পাও তখন ইবাদতের মাঝে নিজেকে ক্লান্ত করো এবং নিজের রবের প্রতি মনোনিবেশ করো। "

কুরআনের সঙ্গে ভালোবাসাই বন্ধুত্বের মাপকাঠি

যদি এমন কতিপয় সাথির দৃষ্টান্ত দেয়া হয় , যাদের ওপর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আমল আখলাক ও সান্নিধ্যের প্রভাব পড়েছিল , তাহলে তাদের আমলের সৌন্দর্য দেখে ফারুকের রহিমাহুল্লাহর গুণাবলি সহজেই অনুমান করা সম্ভব হবে। যখন কোনো মুরুব্বির সান্নিধ্যে থাকার কারণে কোনো সাথির শুধু তিলাওয়াতে কুরআনই বৃদ্ধি পায় না বরং সারাক্ষণ সে কুরআনে কারীমে ডুবে যায় , তখন অনুভব হয় এবং প্রমাণিত হয় যে , অন্তরে এমন ঈমানী উত্তাপ ছড়িয়ে দেবার অবদান তার মুর্শিদেরই হবে। জিহাদী অঙ্গনের পুরো সময়ে যদি এমন তিনজনকে নির্বাচন করা যায় , যারা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর চলন -বলন আদব-আখলাক সবকিছুতে সাদৃশ্য বহন করেন ; যাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পীর মুরিদের মতো ছিল ; যাদের চরিত্র গঠনে পিতা -মাতার পর সবচেয়ে বড় অবদান ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ছিল , তবে সহজেই আমরা সর্বশীর্ষ তিনজনকে পেয়ে যাই।

এই তিন নওজোয়ান ইসলামাবাদের অধিবাসী। জীবনের শুরু থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অধীনে

দীক্ষায় লাভ করতে আরম্ভ করেন। শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত তাঁর হাত ধরে জান্নাতের পথে চলেন। এই তিনজনের সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সম্প্রীতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব একজন শায়খ মুর্শিদ ও স্নেহশীল পিতার সম্পর্কের চেয়ে আমার কাছে বেশি বলে মনে হয়। এই তিন যুবকের সঙ্গে যদি কেউ সময় কাটায়, তাহলে সাক্ষ্য দেয়, সে নিজের জীবনে তাদের মতো অন্য কাউকে দেখেনি। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ র সেই তিনজন শাগরেদ হলেন হিশাম (সাংকেতিক নাম হাসান) রহিমাহুল্লাহ, জাওয়াদ আরিফ (সাংকেতিক নাম মুয়াওয়াজ) রহিমাহুল্লাহ এবং মুহাম্মদ হামজা (সাংকেতিক নাম আব্দুর রহমান) শহীদ রহিমাহুল্লাহ।

হিশাম রহিমাহুল্লাহ ঈমান-আমলের নমুনা এবং জমিনে হাঁটাচলাকারী জীবন্ত শহীদ হিশাম রহিমাহুল্লাহ হলেন প্রথম যুবক, যার চরিত্র গঠনের দায়িত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ গ্রহণ করেছেন। তার খুব অল্প বয়স থাকতেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার ঘরে কিশোরদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। সমবয়সীদের সঙ্গে হিশাম রহিমাহুল্লাহ ক্লাসের মধ্যেই খেলা এবং বাচ্চাদের সঙ্গে দুষ্টুমিতে মগ্ন থাকতো। বয়স অল্প হবার কারণে প্রথমে ক্লাসগুলোতে তার আগ্রহ ছিল না; কিন্তু তার চোখে তখন থেকেই ঈমানী ঝলক দেখা যেত। অবশ্য কুরআনের ক্লাসের দিন বাকি সাথিদের সঙ্গে তাকেও মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়তে হতো। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ হিশামের ওপর মেহনত জারি রাখেন। তার চরিত্র গঠনের জন্য সচেষ্ট থাকেন। সেই চেষ্টা প্রচেষ্টা কিরূপ ছিল? তাহলো কুরআনের ভালোবাসা ওই কিশোরদের অন্তরে ছড়িয়ে দেয়া। অবশেষে হিশামের ওপর কুরআনের রঙ

[584]

ছড়িয়ে পড়ে। আমার জানা নেই, এই সবকিছু কিভাবে হলো? কিন্তু এটা ঠিক ফারুক ভাইয়ের রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যের কারণে বেপরোয়া বাচ্চা হিশাম রহিমাহুল্লাহ কুরআনের আশেক বনে যায়। কয়েক মুহূর্ত কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত ছাড়া কাটানো তার জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। তাজবীদের সঙ্গে কুরআন শেখার প্রতি এতো মনোযোগ আসে যে, ধীরে ধীরে কারীদের চেয়েও সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে আরম্ভ করে। কুরআনে কারীমের অনেকটা হেফজ করে নেয়। অতঃপর যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জিহাদের যাত্রা করতে মনস্থ করেন, তখন ওই কুরআনের নির্দেশ আমলে নেয়ার জন্য এক মুহূর্ত চিন্তা না করে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে হিজরতের জন্য তৈরি হয়ে ওঠে। বয়স তখনও ১৭-১৮ বছর ছিল। সে সময় সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে মুজাহিদীনের প্রশিক্ষক হয়ে ওঠেন এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ইবাদত বন্দেগির এত আগ্রহ ছিল যে, রাতে যখনই কেউ জাগ্রত হত, হিশামকে নামাযের স্থানে বসে থাকতে দেখতো। দিনে তিনি জিহাদী দায়িত্বে ব্যস্ত থাকতেন। অবশেষে কিতাবুল্লাহর এই পিপাসু মার্চ ২০০৮ সালে ডক্টর আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ভানা ওয়াজিরিস্তানে এক প্রশিক্ষণকালে মার্কিন ড্রোন হামলায় শহীদ হন। শাহাদাতের সময় হিশামের বয়স ছিল ১৯ বছর।

হামজা রহিমাহুল্লাহ হামজা শহীদ রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর খুবই স্নেহভাজন এবং প্রকৃতই ছোটো ভাই ছিলেন। খুবই মেধাবী ইবাদতগুজার এবং শাহাদাত পিপাসু ছিলেন। যখন থেকে তিনি শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন, তার বয়স

[585]

তখনো ১৬ বছর হয়নি। এত অল্প বয়সেই রণাঙ্গনে যেতে চেষ্টা করতেন। কুরআনে কারীম খুবই মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত, ধীরে ধীরে সম্মানের সঙ্গে তিলাওয়াত হামজা শহীদ রহিমাহুল্লাহ ও বিশেষ গুণ ছিল। সুযোগ পেলেই কুরআন খুলে বসে যেতেন। হামজা রহিমাহুল্লাহর সবচেয়ে দুর্লভ গুণ ছিল তিলাওয়াতের সময় জাহান্নামের আলোচনায় হেঁচকি তুলে ক্রন্দন করা। হামজা শহীদ রহিমাহুল্লাহ হাফেজে কুরআন ছিলেন এবং খুবই সুন্দর করে তাজবিদের প্রতি খেয়াল রেখে তিলাওয়াত করতেন। এ কারণে সাধারণত সাথিরা তাকেই ইমামতি করতে বলতেন। কিন্তু তিনি যথাসম্ভব বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু যখনই নামাযে তিলাওয়াত অবস্থায় জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা অথবা জিহাদের আলোচনা সংবলিত আয়াত আসতো, তখন কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে যেত এবং নামায শেষ করা কঠিন হয়ে যেত। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ পাক তাকে এমন মেধা শক্তি দান করেছিলেন যে, ধর্মীয় বিষয় হোক, বৈশ্বিক পরিস্থিতি হোক, বিশ্ব রাজনীতি হোক— সবকিছুই তার কথায় পাওয়া যেত। ১৫-১৬ বছরের বাচ্চার মুখে এত বড় বড় কথা শুনে শ্রোতারা বিস্মিত হয়ে উঠতো। হামজা রহিমাহুল্লাহ বড়দেরকে শ্রদ্ধা করতেন। যা তার কাছে ভালো লাগতো, সাথিদেরকে তা শিখিয়ে দিতেন। ঈমানের সুবাসিত এই গোলাপ খুব অল্প বয়সেই ওয়াজিরিস্তানে পৌঁছেন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ান এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে রকেট হামলায় অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালে আঙ্গুর আদার এক জায়গায় মার্কিন ড্রোন হামলায় শহীদ হন।

[586]

জাওয়াদ আরিফ রহিমাহুল্লাহ
এই তিন যুবকের ভেতর তৃতীয়জন ছিলেন আল্লাহর বিশেষ সৃজন। তার নাম জাওয়াদ আরিফ। জিহাদী সাংকেতিক নাম ছিল মুআওয়ায ও মুসআব। আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথম যখন তিনি হিজরত করে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন তখনও বয়স খুব বেশি হয়নি—খুব সম্ভব পনেরো বছর হবে। এলাকা কাছাকাছি হবার সুবাদে শৈশবকাল থেকেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দীক্ষা লাভ করেছিলেন। সুন্নতের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। মেধা শক্তির দিক থেকে সমবয়সীদের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। আমল আখলাকে এত উঁচু মাপের ছিলেন যে, তাকে বড় কোনো শায়খ মনে হতো, অথচ তার বয়স তখনও ১৭-১৮ বছর ছিল। কুরআনে কারীমের প্রতি ভালোবাসা অন্যদের চেয়ে কম ছিল না। ঘরে সফরে যখনই সময় পেতেন, কুরআন হিফজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তার নামাযের উদাহরণ শুধু ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর সালফে সালেহীনের আলোচনার মাঝে পাওয়া যায়। খুবই সাহসী উচ্চ মনোবল সম্পন্ন ছিলেন। ১৮ বছর বয়সেই কয়েকটি হামলার নেতৃত্ব দেন। অবশেষে ২০১১ সালে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে Azam Warsak সিটিতে বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনীর এক এজেন্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

ঈমানের আলোকচ্ছটা মহান এই ব্যক্তিদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ও কর্ম লিপিবদ্ধ করা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মূল ভিত্তি কুরআনে কারীমের সঙ্গে সম্পর্কের একটি ঝলক দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। এই চার প্রিয় ব্যক্তির যৌথ গুণ এবং তাদের পারস্পরিক ভালোবাসার ভিত্তি ছিল কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক। সত্যিই তাদের এই সম্পর্ক দেখার মতো ছিল। তারা সকলেই কুরআনের আশেক ছিলেন। তাদের তিলাওয়াতে উত্তাপ ছিল। মনে হতো, তিলাওয়াতের [587]

সময় তারা দুনিয়ার বাইরে অন্য জগতে চলে গিয়েছেন। তারা সকলেই তাজবিদে দক্ষ এবং সুললিত কন্ঠের তিলাওয়াতে পারদর্শী ছিলেন। এ কারণেই সকল সাথি তাদের পেছনে নামায পড়তে চাইতেন। যেহেতু পিতা-মাতা এবং পারিবারিক সূত্রেই তারা কুরআনের মুহব্বত লাভ করেছিলেন, এ কারণে আমি পার্থক্য করতে পারি না, ফারুক ভাইয়ের সান্নিধ্য তাদের মাঝে কুরআনে পাকের এই ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিল নাকি কুরআনের ভালোবাসা তাদের মাঝে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা তৈরি করেছিল? কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাদের সম্পর্কের মূল ভিত্তি ছিল কুরআনে কারীম।

জটিল অবস্থায় কুরআন থেকে পথনির্দেশনা লাভ কুরআনের আয়াত থেকে দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষা নেয়া ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর স্বভাব ছিল। তিনি কুরআন খুলতেন এবং অদ্বিতীয় অংশীদার বিহীন আল্লাহর মান মর্যাদা ও কুদরত বয়ান করে কঠিন অবস্থায় আমাদেরকে সান্ত্বনা ও পথনির্দেশনা দিতেন। যখন ক্রুসেডার ও জায়নবাদী শক্তি পাকিস্তানি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মিলে আল-কায়েদা উপমহাদেশের কেন্দ্রগুলোকে এবং সাথিদেরকে ড্রোন বিমান দিয়ে হামলা করতে আরম্ভ করে, আমাদের বহু সাথি শহীদ হওয়াতে আমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাই। আমাদের প্রিয় নেতা, বুযুর্গ, আজিমত ও হিম্মতের পাহাড়, দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চ মনোবলের অধিকারী, অবিচলতার মূর্ত প্রতীক হাজী অলিউল্লাহ ইমরান সিদ্দিকী রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের সংবাদ পাই, তখন দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবে যাওয়া স্বাভাবিক বিষয় ছিল। তখন তিনি আমাকে পত্র লিখে বললেন: আপনি নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন এবং দেখুন আয়াতের উদ্দেশ্য কী:

[588]

فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ

অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক , যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীণ হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। সূরা আলে ইমরান (০৩:১৫৩)]

এই আয়াতে "শোকের উপর শোক" অংশের নিচে দাগ টেনে বলেন: দেখুন ভাই , আল্লাহ তাআলা এক কষ্টের পর আরেক কষ্ট পাঠাচ্ছেন , যেন আমরা আল্লাহর তাকদীরের প্রতি রাজি হয়ে যাই এবং আমাদের মাঝে কোন দুঃখ কষ্ট না থাকে। দুনিয়াতে কোনো কিছুর প্রতি ভালো লাগা যেন শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। আল্লাহ আমাদেরকে যখন যেভাবে রাখেন , তাতেই যেন আমরা সন্তুষ্ট থাকি। ' ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহর জন্য বিলীন হয়ে যাবার আবেগ ও সংবেদনশীলতার স্তরে তিনি উন্নীত ছিলেন। সুলুক সম্পর্কে আমার মতো অজ্ঞ লোক কি বুঝবে কিন্তু ক্রুসেডারদের বোমাবর্ষণ অবস্থায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে আল্লাহ তাআলার একত্বের মহিমা এবং প্রকৃত ইশকে ইলাহী আমার বুঝে এসেছিল।

আমরা তো কুরআন থেকেই জযবা ও আবেগ শিখেছি

২০০৭ সালের কথা। আফগানিস্তান বর্ডারে আমেরিকা এবং তাদের গোলাম আফগান আর্মির উপর একটি হামলা করার জন্য ফারুক রহিমাহুল্লাহ যাচ্ছিলেন। আফগান আর্মির ক্যাম্পের একেবারেই কাছে একটি সড়ক ছিল, যা দিয়ে কখনও কখনও জনসাধারণের গাড়ি যাতায়াত করতো। প্ল্যান মোতাবেক ওই সড়ক দিয়ে জনসাধারণের গাড়ি হিসেবে একেবারেই ক্যাম্পের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার কথা ছিল। এরপর তিনি গাড়ি থেকে নামার পর স্থানীয়

রাহবার গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা ছিল। এক কথায় আফগান আর্মির একেবারে নাকের ডগা দিয়ে অতিক্রম করা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তিনি টেপ রেকর্ডারে সূরাতুল আনফালের তিলাওয়াত প্লে করলেন এবং বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যের আয়াতসমূহ শুনে শুনে নিজের ঈমানী জোশ জযবা ও সাহসিকতা জাগ্রত করছিলেন। সহজ সরল স্থানীয় রাহবার এ অবস্থা দেখে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে বললেন, ‘ভাই এগুলো চালাচ্ছেন কেন? আবেগপূর্ণ জযবা ওয়ালা কিছু প্লে করুন’! স্থানীয় সাথির কথার উদ্দেশ্য হলো: যুদ্ধে যেতে এমন কোন গজল ছাড়ুন, যা আবেগ অনুপ্রেরণা বাড়িয়ে দেবে। তখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মুচকি হেসে বললেন: ‘ভাই আমাদের তো কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত থেকে আবেগ জযবা ও উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়!’ এ কথা বলে তিনি স্থানীয় সাথি ভাইয়ের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিলাওয়াত বন্ধ করে দেন।

কুরআনকে সময় দিন
তিলাওয়াতে কুরআনে তার একাগ্রতা এভাবেও অনুমান করা যায় যে, একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করেন? আমার গড়ে যতটুকু পড়া হয়, তা বলে দিই। তখন তিনি বললেন, পরিমাণ বা পৃষ্ঠাকে মাপকাঠি বানাবার চেয়ে উত্তম হলো, সময়কে মাপকাঠি বানানো। অর্থাৎ আপনি একটি সময় নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ আধা ঘণ্টা অথবা ১ ঘণ্টা.. সে সময়ে আপনি তিলাওয়াতে মশগুল থাকবেন। এর ভেতর ধীরে ধীরে থেমে থেমে তাজবিদ সহকারে সুললিত কন্ঠে প্রতিটি আযাবের আয়াতে আল্লাহর কাছ থেকে আশ্রয় চেয়ে এবং রহমতের আলোচনায় তার অনুগ্রহ তলব করে তিলাওয়াত করবেন।

[590]

তার বিপরীতে যদি আপনি পৃষ্ঠা সংখ্যা অথবা পরিমাণ নির্ধারণ করেন, তাহলে খুব দ্রুত ১০ মিনিটের ভেতর পুরোটা খতম করা হয়ে যাবে; অথচ কাঙ্ক্ষিত পন্থায় সম্ভবত এক ঘণ্টার ভেতরে আপনি অল্প কয়েকটি রুকু করতে পারবেন। দ্রুত পড়ার দ্বারা না আপনার অন্তরে কুরআন পাকের আজমত মহব্বত মাহাত্ম্য ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, আর না কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণের অভ্যাস হবে। তাই অল্প পড়ুন কিন্তু কুরআনের সঙ্গে সময় দিয়ে পড়ুন।

মুচকি হাসি
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর চেহারার দৃষ্টিনন্দন মুচকি হাসি এমন একটি বিষয় ছিল, যে ব্যাপারে আমি তাকে অনুসরণের অনেক চেষ্টা করেছি; কিন্তু পারিনি। তার চেহারার মুচকি হাসি এবং সেই হাসি উপহার দিয়ে প্রিয় অথবা ভাইয়া বলে ডাক যে কারও অন্তরে তার জন্য জায়গা করে দিতো। এক ভাই আমাকে বলেন, তার মুচকি হাসি অনেক সুন্দর, মন কেড়ে নেয়। শুধু তাই নয়; বরং সাথিদের মাঝে তার মুচকি হাসি প্রবাদ হয়ে যায় এবং কোনো সাথির মুচকি হাসিকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অভ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

আমি যতদূর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে জানি, তাতে আমি নিশ্চিত, তার চেহারা জোড়া মুচকি হাসি শুধু সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের জন্যই। চলাফেরা থেকে শুরু করে বাচনভঙ্গি সবকিছুতে সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং নিজেকে নববী ধাঁচে ঢেলে সাজানোর জন্য তিনি আলাদাভাবে চেষ্টা করতেন।

[591]

ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন :

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

অর্থ "আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অন্য কাউকে অধিক মুচকি হাসতে দেখিনি। ।"

সহনশীলতা ও পরোপকার

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ তাআলা সহনশীলতা ও মনোবল অনেক বেশি দান করেছিলেন। অনেক বড় কিছু হয়ে গেলেও তিনি কিছু বলতেন না। আমি নিজেও তার সঙ্গে কত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছি। জবাবে তিনি শুধু বলেছেন — 'আমার প্রিয় ভাই! বেচারার কথা একটু শুনুন' শেষবার যখন আমি তার পক্ষ থেকে সফরে বের হই এবং পরবর্তীতে সফরের মাঝে কিছু ঘটনার কারণে আমি অজ্ঞতাবশত পত্র লিখে তাকে কঠোর ভাষায় অভিযোগ করি, তখন তিনি জবাবে লিখেন : 'প্রিয় ভাইজান আপনার পত্র পেয়েছি। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি ডান বামের সকল অভিযোগ আমার উপর তুলে দিলেন! ভালো গরীবদের সঙ্গে এমনই হয় আল্লাহ ভালো করবেন'। তিনি বড় ছিলেন। সবাই তার কাছেই অভিযোগ নিয়ে যেত। তার কাছে দুঃখ বেদনা পেশ করতো। কিন্তু তার সহনশীলতা সুবহানাল্লাহ! কারও কথা শুনে তার মেজাজ বিগড়ে যাবে অথবা কারও অভিযোগে তিনি রাগান্বিত হবেন, তা অসম্ভব।

পবিত্র হাদীস মোতাবেক সহনশীলতা ও ধৈর্য এমন গুণ, যা আল্লাহ তাআলার পছন্দ। এক বর্ণনায় এসেছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন :

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ "

অর্থ : “আপনার মাঝে দুটি গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার অনেক প্রিয়: সহনশীলতা এবং পরের বোঝা বহন (ধৈর্য)।” (সুনানে তিরমিযী)

আল্লাহ তাআলা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে এই গুণের বড় অংশ দান করেছিলেন। অভিযোগকারী তার ব্যাপারে যা কিছু বলুক, তিনি যখন ভালোবেসে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করতেন, তখন অভিযোগকারী নিজের কঠোরতার ব্যাপারে লজ্জিত হতো।

আমাদের মুহতারাম ভাই ও বন্ধু, আজিমত ও হিম্মত তথা দৃঢ় সংকল্প ও মনোবলের অধিকারী শহীদ কমান্ডার খাত্তাব মনসুর রহিমাহুল্লাহ[89] একবার আমাকে বলেন: « আমরা তিন সাথি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে কার্যনির্বাহগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ

---

[89] ডেরা ইসমাইল খানের শহীদ কমান্ডার খাত্তাব ইমরান মনসুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহসিকতা ও অবিচলতার শক্তিশালী পাহাড় ছিলেন। অল্প বয়সেই কাশ্মীর জিহাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের ওপর পরিচালিত প্রথম দিকের বড় মুখোমুখি হামলাগুলোতে তিনি কমান্ডার বদর মনসুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন। লাল মসজিদে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর হামলার পর শহীদ বদর মনসুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে ডেরা ইসমাইল খান এবং আশপাশের জেলাগুলোতে মার্কিন জোট ভুক্ত সেনাবাহিনীকে হামলার দায়িত্ব দেন। তিনি অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে ক্রুসেডারদের গোলাম সেনাবাহিনী এবং তাদের অধীন বিভিন্ন সংস্থার ওপর কয়েকটি সফল হামলার পরিকল্পনা করেন। ২০১৩ সালে তার নেতৃত্বে মুজাহিদীন ডেরা ইসমাইল খানের সেন্ট্রাল জেল ভেঙে কয়েক ডজন মজলুম মুজাহিদকে মুক্তি দেন। তার এমন সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ শত্রুপক্ষকে চিন্তিত করে তোলে। মুজাহিদীনের মাঝে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়া এবং সাথীদের মাঝে মিল মহব্বত তৈরি করার অবদান ছিল তার। কমান্ডার ফরমান শিনওয়ারি রহমাতুল্লাহি আলাইহির শাহাদাতের পর আব্দুল্লাহ আযযাম ব্রিগেডের দায়িত্ব তিনি লাভ করেন। আলকায়দা উপমহাদেশ গঠিত হবার পর তাকে গোত্রীয় অঞ্চলে জিহাদের সামরিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাই উত্তর ওয়াজিরিস্তানের অপারেশনে মুজাহিদীনকে সুশৃংখল রাখতে নিযুক্ত থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সাহসিকতার পাশাপাশি উন্নত আখলাক দান করেছিলেন। নিজের অধিকার ছেড়ে দিতেন এবং সাথীদের সঙ্গে খুবই স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। তার উন্নত চরিত্র ও বিনয় আমাকেও তার অনুরাগী করে তোলে এবং পরস্পরে এক বিশেষ ভালোবাসা ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি করে। গোত্রীয় অঞ্চলে বিশেষভাবে মুজাহিদীনের সর্বজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কুরআনে কারিমের খুবই চমৎকার তেলাওয়াত করতেন, যা উত্তাপ ছড়াতো। আল্লাহর রাস্তায় রাত্রি জাগরণকারী গুণের অধিকারী মুজাহিদ ছিলেন। ২০১৭ সালে এক দীর্ঘ সফরে যাবুল অতিক্রম কালে তিন সাথী সহ মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে আপন সন্তুষ্টি দান করুন!! আমীন!!!

করতে যাই। আমরা খোলাখুলিভাবে তার কাছে অভিযোগ পেশ করি। কেউ কেউ কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। কুধারণার কারণে মনের ক্রোধ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি চুপ করে সবকিছু শোনেন এবং মুচকি হাসতে থাকেন। সবশেষে তিনি বলেন, আমিও কিছু কথা বলি? অতঃপর তার এক একটি বাক্য আমাদের অন্তরের স্বচ্ছতা এবং আমাদের মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও গুণগ্রাহীতার কারণ হয়। বাস্তবেই তিনি অনুপম আদব-আখলাকের অধিকারী। »

একদিন তিনি আমাকে বলতে লাগলেন: « প্রিয় ভাই আপনার মনে আমার প্রতি কোনো অসন্তুষ্টি রয়েছে? আমি চিন্তা করে ভদ্রতা করে কিছু বলেছিলাম। কিন্তু তিনি খাতা পেন্সিল নিয়ে নোট করতে বসেছিলেন। বারংবার বলে যাচ্ছিলেন এবং আমাকে চিন্তা করতে বলছিলেন যে, তার প্রতি কোনো অসন্তুষ্টি রয়েছে কিনা? আমি খুব একটা চিন্তা করতে পারলাম না। অতঃপর বলতে লাগলেন: আচ্ছা আমার প্রতি অন্য কোনো সাথির অসন্তুষ্টি রয়েছে? খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এবং যখন আমি দেখলাম, কিছু না বললে তিনি ছাড়বেন না, তখন এক সাথির ব্যাপারে অভিযোগ করেই বসলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি সেটা নোট করলেন। ওই সাথির কাছ থেকে নিজেও ক্ষমা চাইলেন এবং পরবর্তীতে আর ভুল হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর আমি দেখি, যেই সাথির ব্যাপারে আমার অভিযোগ তৈরি হয়েছিল, ওই দিনের পর থেকে তার শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত আমার সঙ্গে এমন সদাচরণ তিনি করতেন, যা অভিযোগ করার কারণে আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল।

তিনি ব্যক্তিগত কারণে রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু যদি শরীয়তের কোনো হুকুমে অবহেলা হয়, আল্লাহর কোনো ওলী অথবা আলেমে দীনের গীবত করা হয়, তখন তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারতেন না; সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সুন্নত অনুসরণে তিনি [594]

নিজের ভাইয়ের পক্ষে জবাব দিয়ে দিতেন। গীবত পরনিন্দা.. তাও যদি হয় উলামায়ে কেরামের কারও.. অথবা তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা.. কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। তার সামনে এমন কিছু হলে তার চেহারার রং বদলে যেত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির হয়ে বসতে পারতেন না, যতক্ষণ অভিযোগকারীর কথার পাল্টা জবাব না দিতেন। অবশ্য অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায়ও কখনও তার মুখে কোনো গালাগালি বা অশ্লীল কথা শোনা যায়নি।

জবানের হেফাযত
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার দায়িত্বে থাকা সাথিদের মাঝে যখন দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে প্রসিদ্ধ হলেন, তখন থেকে বিশেষভাবে মুখের অন্যায় ব্যবহার হতে নিজেকে এবং নিজের সাথিদেরকে বাঁচিয়ে রাখতেন। কোনো হারাম কথা বের হওয়া তো দূরের কথা, অর্থহীন বৃথা কথাও তার চেহারার রং বদলে দিতো এবং তার সামনে কোনো হালকা কথারও (loose talk) সাহস কারও হতো না।

ভাষা ও মুখের আপদ থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল তার কাছে মুসলিমদের গীবত বা পরনিন্দা থেকে বাঁচা। এগুলো থেকে তিনি নিজেই বিরত থাকতেন না; তার মজলিসে কারোই সাহস হতো না কোনো মুসলিমের ব্যাপারে শরীয়তী প্রয়োজন ছাড়া নেতিবাচক কিছু বলার। আমার মনে পড়ে, ওয়াজিরিস্তানে এক সময় হিজরতের জীবন যাপনকারী একজন আলেমে দীন; যিনি পরবর্তীতে পাকিস্তানের শহর এলাকায় গিয়ে জিহাদের দাওয়াতী কাজে মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন— তার ব্যাপারে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে আমি বলি: ‘মুজাহিদীনের প্রতি তার বিশ্বস্ততা সন্দেহপূর্ণ; মনে হয় তার উপর আস্থা রাখা উচিত নয়!’ জবাবে তৎক্ষণাৎ তিনি খুবই সরল [595]

ভাষায় শুষ্কতা মিশ্রিত রাগত ভাবে জবাব দেন : আমার জানাশোনা অনুযায়ী তার ব্যাপারে এমন কথা সঠিক নয় ; প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি শীর্ষস্থানীয় আলেমদের কাছে তাঁর প্রশংসা শুনেছি এবং জিহাদী অঙ্গনের শায়খগণ তাকে নিজেদের মাঝে গণ্য করেন ’ খালি চোখে দেখলে খুবই সাদাসিধে ছিল তার বাক্য। কিন্তু তার ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ ও উচ্চারণ ভঙ্গি যাদের জানা আছে , তারা খুব সহজেই বুঝবে , তার কথার মাঝে রাগ লুকিয়ে ছিল। তার এমন জবাবের পর ওই আলেমে দীনের ব্যাপারে তার সামনে কোনো নেতিবাচক কথা বলার সাহস আমার আর হয়নি।

অন্য এক মজলিসে অপর এক ব্যক্তির ব্যাপারে কথা হচ্ছিলো। তখন আমি তার ব্যাপারে কিছু কঠোর ভাষা ব্যবহার করি , যা অতিশয়তা থেকে মুক্ত ছিল না। মজলিসে নানান কথা হচ্ছিলো। কেউ এ বিষয়টা তেমন খেয়াল করলো না। কিন্তু কিছুদিন পরেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর স্নেহমাখা চিঠি আমার কাছে পৌঁছে। আমার সেই কথায় ধমক দিয়ে আমাকে বোঝান : ‘মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি কথার জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। আপনার এই কথার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। যদি এই ব্যক্তি আল্লাহর মাহবুব হয়ে থাকেন এবং তার কোনো আমল আল্লাহর পছন্দের হয় , তাহলে কিয়ামতের দিন আপনার কি হবে ? হাদীসে কুদসীতে এসেছে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

"مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ"

অর্থ “যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলী বা বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে , আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিই। ” [সহীহ আল বুখারী] »

অতঃপর তিনি আরও যা লিখেছেন, তার সারসংক্ষেপ হলো : « স্মরণ রাখবেন , মানুষের ব্যাপারে কোনো কথা বা পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করছেন মানে আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন। সাক্ষ্যের বিষয়টা খুবই ভয়াবহ এবং

এটার কারণে হিসাব হবে। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ভুল করা অনেক বড় গুনাহ। কিয়ামতের দিন এমন অজুহাত কাজে আসবে না যে, বৈঠকের অবস্থা দেখে অথবা মুখ সামলাতে না পেরে কারও ব্যাপারে হালকা কিছু বলে দিয়েছি। »

তাঁর বৈঠকে কোন আলেমে দীনের গীবত কল্পনাও করা যেত না; তিনি তো ইসলামের শত্রু কারও ব্যাপারেও অপ্রয়োজনে কঠোর ভাষা ব্যবহার করা পছন্দ করতেন না। তার একজন ঘনিষ্ঠ সাথি একবার বলেছেন:

« একবার রেডিওতে সংবাদ শোনার সময় একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদের (যার ইসলাম বিদ্বেষ কারও কাছে গোপনীয় নয়) ব্যাপারে আমি মন্দ কথা বলি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে বাধা দেন। আমি বললাম, তিনি তো ইসলাম বিদ্বেষী এবং তার এই দোষ সকলেরই জানা। তখন বলতে লাগলেন, তার বিরুদ্ধে কথা বলার উদ্দেশ্য দুই রকম হতে পারে: তাকে সংশোধন করা অথবা সাথিদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করা, যেন তার অনিষ্ট থেকে তারা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু আপনার কথা এই দুই উদ্দেশ্যের কোনোটাই পূরণ করছে না। তাই শুধু মনের ক্লেদ উগড়ে মুখ কেন নষ্ট করছেন? »

উপর্যুক্ত সাথি ভাই আরও বলেছেন: গীবতের জঘন্যতা বোঝানোর জন্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলছিলেন:

« আমরা কয়েকজন সাথি শায়খ ইবরাহীম মাগরিবি হাফিযাহুল্লাহর সঙ্গে এক বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। মুজাহিদীনের মধ্যে এমন একজনের কথা আলোচনা হচ্ছিলো, যার কারণে জিহাদের ক্ষতি হচ্ছিলো। ওই ব্যক্তির ব্যাপারে বৈঠকে প্রয়োজন অতিরিক্ত কিছু কথা চলে আসে। শায়খ ইবরাহীম কথা বলতে বলতে নিজের ল্যাপটপের স্ক্রিন বন্ধ করেন। একটা আওয়াজ হয়ে ল্যাপটপের স্ক্রিন ভেঙে যায়। দেখা গেল, ল্যাপটপের উপর একটা ইউএসবি রাখা ছিল। বন্ধ করার [597]

সময় চাপ লেগে ল্যাপটপের স্ক্রিন ভেঙে যায়। তিনি বলেন, আমরা সকলেই ভয় পেয়ে গেলাম। শায়খ ইবরাহীম মাগরিবি হাফিযাহুল্লাহ এবং আমরা —সকলেই ইস্তেগফার করতে শুরু করি। শায়খ হাফিযাহুল্লাহ তখন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেনঃ একজন মুসলিমের গীবতের কারণে এমনটা হয়েছে। »

উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা
উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর
এবং তাদেরকে সম্মান করার প্রতি জোর আরোপ করতেন। আমাকে তিনি বলেন: « অনেক সাথি উলামায়ে কেরামকে সম্মান করেন না। আলেমদের নামের সঙ্গে শুধু ভাই যুক্ত করে ডেকে থাকেন। তাদের নামের সঙ্গে শ্রদ্ধা-সম্মান নির্দেশক কিছু ব্যবহার করেন না। » অনেক সাথি অল্প বয়সী আলেমদেরকে শুধু মৌলভী বলেন। তিনি বলছিলেন যে, « এটা আমার একদমই ভালো লাগে না। বেতমিজ আচরণ বলে মনে হয় » আর কিছু না হোক অন্তত মাওলানা বলা তো জরুরি। কেউ বলে উঠলেন: « ভাই! নতুন নতুন দাওরা হাদীস সমাপনকারী সাথিদেরকে মাওলানা বলতে অদ্ভুত লাগে। কারণ এখনও তাদের মাঝে অপরিপক্কতা রয়েছে। তাছাড়া মাদরাসার শিক্ষা সমাপনকারী অনেকেই শুধু সনদধারী হয়। » তখন তিনি বলেন: ‘আমি একজনের সংশোধন করতে চাই, অথচ এটাই জানি না, ইলমে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারীদেরকে কিভাবে সম্মান জানাতে হয়? তিনি যতই কম পড়ুন এবং তার বয়স যেমনই হোক না কেন, আমাদের মতো অজ্ঞ

90লোকদের চেয়ে
তো তিনি অনেক উচ্চ অবস্থানে রয়েছেন এবং তাকে সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। আমরা নিজেদেরকে যতই পুরানো ও বুঝমান সাথি মনে করি না কেন, কিন্তু

90 আলেমে রাব্বানী উস্তায আহমদ ফারুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অজ্ঞ লোকদের জন্য "আমরা" সর্বনাম ব্যবহার করতেন শুধুমাত্র নিজের বিনয় হিসেবে

[598]

যারা দীনী ইলম বহনকারী , আমরা তাদের বরাবর হতে পারি না।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : “আপনি বলে দিন , যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি বরাবর হতে পারে ?” [সূরা যুমার ৩৯ :০৯]

নেতৃত্ব তো আসলে উলামায়ে কেরামেরই কাজ

শাহাদাতের কয়েক মাস আগে শেষ সাক্ষাতে আমাকে মোটামুটি এমন কিছু কথা বলেছেন :

« আধুনিক কলেজের শিক্ষিত অনেক সাথি অনুভব করেন না যে, নেতৃত্ব আসলে উলামায়ে কেরামের কাজ। সকলেই নিজেকে নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের যোগ্য মনে করে। এই যে বর্তমানে আমাদের দায়িত্বে কত কাজ পড়ে আছে, এসব কিছু প্রতিকূল অবস্থা , কুফরী শাসন ব্যবস্থার চাপ এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে সাময়িক একটা বিষয়। অন্যথায় এ বিষয়টা সকলের বুঝে রাখা উচিত , নেতৃত্ব আসলে উলামায়ে কেরামের কাজ। আমাদের সমাজ পরিবর্তনের কার্যকরী পন্থা হলো , আমরা ধর্মহীন ও বেদীন শ্রেণির কাছ থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে উলামায়ে কেরামের হাতে অর্পণ করা। যে ব্যক্তি নিজে শরীয়তের অনুশাসন সম্পর্কে অবগত নয় , সে অন্যদেরকে কিভাবে পরিচালনা করবে ? এ কারণে আমরা নির্যাতন -নিপীড়নের শিকার উলামায়ে কেরামের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করতে চাই , যেন তারা শরীয়ত অনুযায়ী আমাদেরকে পরিচালিত করেন। »

আদব আছে যার, সফলতা তার

উলামায়ে কেরাম, জিহাদী অঙ্গনের শীর্ষ স্থানীয় আলেমদের ব্যাপারে বেয়াদবি এবং অশোভনীয় ভাষা ব্যবহার তাকে খুবই ব্যথিত করতো। অনেকেই উলামায়ে কেরাম এবং জিহাদী আমীরদেরকে কোনো সম্মানসূচক উপাধি ছাড়া শুধু নাম ধরে ডাকতো। একদিন আমি ঠাট্টা করে তাকে বিরক্ত করে বললাম: 'কিছু কিছু হযরত বলছেন বড়দেরকে নাম ধরে ডাকলে অসুবিধা কোথায়? সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন বর্ণনার সনদ উল্লেখ করতে গিয়ে সোজা নাম ব্যবহার করতেন — যেমন ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত ইত্যাদি.. তাদের মধ্যে কে হযরত মাওলানা আল্লামা শাল্লামা উপাধি লাগাতেন?' এ কথা শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন:

« এমন ব্যক্তি শরীয়তের মেজাজ বোঝে না। তারা অনেক হাদীসের বিরোধিতা করে। » এরপর বলতে লাগলেন: « তারা কি নিজের পিতাকেও কোনো উপাধি ছাড়া শুধু নাম বলে উল্লেখ করে? তারা কি এই হাদীস শোনেনি?:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

(অর্থ:) "ওই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না।" [মুসনাদে আহমাদ]

এই হযরতদেরকে কারা বড়দেরকে সম্মান না করতে শেখালো? এরপর তো হাদীসে বিশেষভাবে একথা এসেছে — وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا - অর্থ: "আমাদের আলেমদের সম্মান করে।" [পূর্বোক্ত সূত্র (মুসনাদে আহমাদ)]

অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন: « আমাদের উলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত আমীরদের কি এতোটুকু অধিকার নেই যে, পিতা-মাতাকে যতটুকু সম্মান করা হয়, তারা ততটুকু

সম্মান লাভ করবে। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম বড়দেরকে সীমাহীন শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। তাদের সামনে চলতেন না এবং বড়দের কথা বলার সময় কথা বলতেন না। আকাবিরদের ঘরের বাইরে অপেক্ষায় থাকতেন, তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য দরজায় আওয়াজ পর্যন্ত করতেন না। সাইয়েদেনা হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ভাই ছিলেন, বন্ধু ছিলেন এবং অনেক সাহাবীর সমবয়সী ছিলেন। কিন্তু তিনি আমীর হওয়ার পর যখনই কেউ তাকে স্মরণ করেছেন, তখন আদব ইকরামের সঙ্গে আমীরুল মুমিনীন বলেছেন। আসলে বেয়াদবি মূলক বাচনভঙ্গি কোনো ধর্মীয় কারণে (ধর্মীয় মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের কারণে) নয়; বরং অন্তরের রোগের কারণে দেখা দেয়। অন্তরে যখন অহমিকা থাকে, তখন তখন তা বড়দের প্রতি আদব সম্মান নষ্ট করে দেয়। »

সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা লাভ: যে কারও থেকে

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ খুবই খোলা মনের মানুষ ছিলেন। দীন ও জিহাদের নামে যখনই কেউ তার কাছ থেকে কিছু নিতে আসতো, তার সাথে থাকলে অবশ্যই দিয়ে দিতেন। নিজে সহযোগিতা করতে না পারলে অন্য সাথিদেরকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করতে বলতেন। যখনই দীনের জন্য কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হতো, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর হাত সবচেয়ে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হতো। আল্লাহ তার মাঝে বরকত দিয়েছিলেন। আমার মনে পড়ে না যে, আমি অথবা অন্য কেউ তার কাছে কোনো প্রয়োজনের কথা বলার পর সাধ্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি না করে দিয়েছেন। কখনও কখনও এমনও হতো যে, তাঁর ভীষণ প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কেউ [601]

যদি দীনের কাজের জন্য তার কাছে সাহায্য চাইতেন, তাহলে তিনি আগের সব কিছু ভুলে উন্মুক্ত মনে এগিয়ে আসতেন।

অন্যান্য মুহাজির মুজাহিদীনের সাহায্য-সহযোগিতার জন্যও সদা প্রস্তুত থাকতেন। যখনই কোনো মুজাহিদের অভাব-অনটনের কথা জানতেন, যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। ঋণগ্রস্ত ভাইদের ঋণ পরিশোধে এগিয়ে আসতেন। কারও ভালো কাজের কথা জানলে সাধ্যে থাকা অবস্থায় কখনোই পিছিয়ে থাকতেন না। একই মেজাজ তার ব্যবস্থাপনা পরিষদের অন্য ভাইদের মাঝেও ছিল । তারা যেখানেই থাকতেন; গোত্রীয় অঞ্চলের আনসার মুজাহিদীন হোন কিংবা মুহাজির মুজাহিদীন—সকলের জন্য আশ্রয়স্থল হয়ে থাকতেন।

শহীদ কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য
এই গুণ তার মাঝে এবং তার সফরসঙ্গী বন্ধু, ইসলামের বীর, বীরত্ব ও সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক, দুনিয়া ভোলা সাধক, বিনয় ও নম্রতার উদাহরণ শহীদ কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহর মাঝে পূর্ণমাত্রায় ছিল। সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সহযোগিতার এই গুণ এই উভয় পাকিস্তানি মুজাহিদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। তার সঙ্গে বদর মনসুর শহীদ রহিমাহুল্লাহর বড় মিল ছিল। জিহাদের কয়েকটি বিষয়ে এবং ঘরে সফরে তারা একসঙ্গে ছিলেন। শুরা পরিষদের বৈঠকেও শহীদ বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহর রায় অধিকাংশ সময়ে ফারুকী রহিমাহুল্লাহর রায়ের অনুকূল হতো। শহীদ বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহর ওপর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ অনেক নির্ভর করতেন এবং তিনিও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর উপর আস্থা রাখতেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ২০০৬ সালে শহীদ বদর মানসুর [602]

রহিমাহুল্লাহর পরিচয় লাভ করেন। উভয়ের মাঝে এমন বন্ধুত্ব ও আস্থার সম্পর্ক ছিল, মনে হতো, দুই দেহে একই প্রাণ। পারস্পরিক সহযোগিতা এমনই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, বদর মনসুর ভাই রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কয়েকটি ব্যবস্থাপনাগত বিষয় সামলাতে আরম্ভ করেন এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বদর মনসুর ভাই রহিমাহুল্লাহর সাথিদের দীনী ও শরঈ দীক্ষা দানের কাজ করেন। আসলে তাদের মধ্যকার সখ্য সম্প্রীতি ও আস্থার সম্পর্কের মাধ্যমে পাকিস্তানি দলগুলোর সামনে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

বদর মনসুর একজন কায়েদে জিহাদ
সীমান্তবর্তী টাংক জেলা শহীদ বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহর পিতৃ এলাকা। কাশ্মীর জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য হরকতুল মুজাহিদীন সংগঠনের সদস্য হন। সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর ইমারতের আমলে কাবুল এবং উত্তর আফগানিস্তানে কাফেরদের এজেন্ট উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে তালেবানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন। আফগানিস্তানে বর্বর মার্কিন হামলার পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া মুহাজিরদেরকে সাহায্য করা নিজের দায়িত্ব বানিয়ে নেন। অতঃপর প্রথম বছরগুলোতে ‘সালারে মুজাহিদীন’ (সেনাপতি) খলীফা সিরাজ উদ্দিন হাক্কানী হাফিযাহুল্লাহকর কাতারে শামিল হয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কয়েকটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। হরকাতুল মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে তিনি গোত্রীয় অঞ্চল এবং আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। কাবায়েলি অঞ্চল এবং বিশেষ করে ওয়াজিরিস্তানের কাবায়েলি এলাকায় তার ভক্ত অনুরাগীদের একটি বড় সার্কেল বিদ্যমান ছিল। এভাবেই আল-কায়েদার আরব

[603]

মুজাহিদীনের সঙ্গে বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ ও যৌথ সামরিক প্ল্যানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের শহরগুলোতে আরব ভাইদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা আগে থেকেই করে আসছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি আল-কায়েদার বিভিন্ন কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। ২০০৭ সালে যখন লাল মসজিদের ঘটনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রীতিমতো জিহাদ আরম্ভ হয়, তখন কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ নিজের সাথিদেরকে নিয়ে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর কাছে রীতিমতো বায়আতবদ্ধ হয়ে আল-কায়েদায় শামিল হয়ে যান। আল-কায়েদার শীর্ষ নেতারা আব্দুল্লাহ আযযাম ব্রিগেড নামে একটি দল গঠন করে এবং তাকে সে দলের দায়িত্বে নিযুক্ত করে। গোত্রীয় অঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পাশাপাশি করাচি ও পাঞ্জাব থেকে শত শত মুজাহিদ তাকে আনুগত্য জানিয়ে ক্রুসেডার এবং তাদের মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের ওপর যত বড় হামলা হোক, গোত্রীয় অঞ্চলে বর্বর সেনাবাহিনীর অন্যায় অপারেশন প্রতিরোধ হোক অথবা পাকিস্তানি শহরগুলোতে আমেরিকার গোলাম সেনাবাহিনী ও মিত্র সংস্থাগুলোর উপর কোনো অপারেশন হোক—সবখানেই শহীদ বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথিদেরকে প্রথম সারিতে দেখা গিয়েছে।

বিনয় অক্ষমতা প্রকাশের সঙ্গে যদি সাহসিকতা ও বীরত্ব মিলে যায়, তবেই একজন ব্যক্তি নেতা হয়ে ওঠেন। বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ সর্বদিক থেকে একজন নেতা ছিলেন। ভালোবাসা ছড়াতেন। ভাইদের মাঝে মীমাংসা করতে চাইতেন। কেউ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তিনি সম্পর্কে জুড়ে দিতেন। কেউ তাকে মন্দ বললে তার প্রশংসা করতেন। নিজে ক্ষুধার্ত

[604]

থাকতেন কিন্তু অন্যকে খাওয়াতেন। কুরবানী ত্যাগ এবং নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার দৃষ্টান্ত ছিলেন। এই গুণাবলির কারণে তিনি মুজাহিদীনের সর্বজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জিহাদী নাম বদরের মতোই সমুজ্জ্বল ছিলেন। দ্যুতি ছড়াতেন, আলো বিলাতেন। ২০১২ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুপ্তচর সংস্থার সাহায্যে ক্রুসেডাররা ড্রোন হামলায় রাতের শেষ প্রহরে তার নামাযরত অবস্থায় শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তাকে সন্তুষ্টি দান করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমীন।

একবার ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাকে ডেকে বললেন: « ভাইয়া বদর মনসুর ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে সোয়াত থেকে কিছু পরিবার মুহাজির হয়ে এসেছে। তাঁর ওপর তো আগে থেকেই অনেক ফ্যামিলির বোঝা চেপে আছে। আপনি কি কিছু ফ্যামিলির খরচ বহনে সহায়তা করতে পারেন? » এভাবে যখনই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কারও প্রয়োজন সম্পর্কে জানতেন, অস্থির হয়ে তার প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করতেন। একইভাবে কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ খোদায়ী খেদমতগার (আল্লাহর বান্দাদের সেবায় নিবেদিত প্রাণ) ছিলেন। যেখানে যার যেকোনো ধরনের প্রয়োজন হতো—ব্যক্তিগত হোক কিংবা জিহাদী কাজে— বদর ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যেত না। আমি নিজে কয়েকবার তা প্রত্যক্ষ করেছি। একবারে মিরানশাহের জেলাগুলোতে কয়েকটি ঘর ভাড়া করার জন্য আমরা যাই। ওখানে কিছু প্রতিবেশী অভিযোগ করেন। অতঃপর স্থানীয় হযরতগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যদি কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ তাদের কাছে এসে আমাদের ব্যাপারে সুপারিশ করেন তাহলে তারা এই ঘর ভাড়া দেবেন। ওই রাতেই বদর মনসুর ভাই রহিমাহুল্লাহকে বাজারে দেখা

[605]

যায়। তিনি নিজের কোনো কাজে ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে বিষয়টি জানালে তিনি হেসে আমাকে বললেন, আমি ওখানে যাওয়ার দ্বারা যদি কোনো কাজ হয়ে যায়, তাহলে বিসমিল্লাহ চলুন! তৎক্ষণাৎ আমার পেছনে মোটর সাইকেলে বসে উক্ত সমস্যার সমাধানে চলে আসেন। বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ সকল মুজাহিদের মাঝে সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, আমীন।

পাকিস্তানি মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দের মাঝে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ছিল শহীদ বদর মানসুর রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি নিজের অসিয়ত বাণীতে একথা এভাবে বলে গিয়েছেন:

« যারা আমার সমবয়সী এবং বন্ধুবর্গ, তাদের মধ্যে এবং শহীদ ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুহব্বত বদর মানসুর ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ছিল। আল্লাহ জান্নাতে তার সঙ্গী হিসেবে কবুল করুন! »

আরব মুজাহিদীনের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত মুহাজিরদের প্রতি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অশেষ ভালোবাসা ছিল। যেভাবেই তাদের খেদমত ও সেবা যত্ন সম্ভব, তা নিজের জন্য কর্তব্য মনে করতেন। কত মুহাজিরকে গোপনভাবে সাহায্য করতেন, যারা নিজেরাও জানতেন না, কে তাদেরকে সাহায্য করছেন। আরব মুহাজিরদের খেদমত নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন। এতটা গুরুত্ব মনোযোগ দিয়ে কেউ মুহাজিরদের খেদমতের হক আদায় করতেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। এই খেদমত ও সেবা যত্নের জন্য তিনি অন্য সকল কাজকে বিলম্ব করা উপযুক্ত মনে করতেন।

[606]

আরব মুজাহিদীন এবং বিশেষভাবে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে তিনি জিহাদের বড় পুঁজি মনে করতেন। তাদের নিরাপত্তা, সাহায্য-সহযোগিতা এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ অগ্রগণ্য রাখতেন। তিনি জানতেন, গোটা বিশ্বে জিহাদের বিস্তার, সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা উম্মাহর মাঝে ব্যাপকায়ন এবং গোটা বিশ্বের জিহাদ বেগবান করার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরব মুজাহিদীনের এবং বিশেষভাবে তাদের উলামায়ে কেরাম ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের। এ কারণে তিনি উম্মাহর এই পুঁজি সংরক্ষণ এবং এই হযরতদের সহযোগিতার জন্য সময়, মাধ্যম এবং যোগ্যতা ব্যয় করা অন্য সকল জিহাদী দায়িত্বের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করতেন।

প্রতিটি নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে হিংসা করা হয়
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ইলম, আমল, লেখালেখি, বয়ান, বক্তৃতা, উন্নত চরিত্র, প্রশংসনীয় গুণাবলি, বীরত্ব, উচ্চ মনোবল, প্রতিভা, যোগ্যতা এবং আমীর ও শায়খদের পক্ষ থেকে তার প্রতি আস্থা ও নৈকট্যের কারণে হিংসুকদের একদল আবির্ভূত হয়, যারা তার ব্যক্তিত্বকে পিছিয়ে দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল অপচেষ্টা চালায়। নিন্দনীয় সেসব অপচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হলো, যে কোনোভাবে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের যেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রতি কুধারণা তৈরি হয়ে আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে নির্জলা মিথ্যা অপবাদ, গালাগালি সহ সম্ভাব্য সকল পন্থা হিংসুকেরা ব্যবহার করে। কিন্তু কোথায় তার ইখলাস, লিল্লাহিয়াত, নিষ্ঠা, তাকওয়া, কুরবানী ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত আর

[607]

[illegible]

[illegible]:

«فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ»

“[illegible]” [[illegible]]

[illegible]

[illegible]:

يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا

[illegible]: “[illegible]” » [[illegible]]

[illegible]

কার্যনির্বাহ যোগ্যতা, বয়ান বক্তৃতা, লেখালেখির প্রতিভা, দাওয়াতী কার্যক্রম, মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা, উত্তম সঙ্গী-সাথিদের সান্নিধ্য, বড়দের পক্ষ থেকে তার প্রতি আস্থা-বিশ্বাস, গুরুত্বপূর্ণ কর্মব্যস্ততা এবং এমনই আরও বিভিন্ন গুণ এমন ছিল, যেগুলোর কারণে হিংসুটে কিছু লোক তার ব্যাপারে কুধারণা ও ভুল কথা ছড়াতে আরম্ভ করে। মিরান শাহ এলাকার মেইন বাজারে এমন অনেকেই ঘোরাঘুরি করতো, যারা ফারুক রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা ছড়াতো। তাকে চেনে না জানে না এমন লোকদের কাছে এবং ওয়াজিরিস্তানে নতুন এসেছে এমন লোকদের কাছে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে ভুলভাল কথা প্রচার করতো। এমনই একটা ঘটনা আমাদের মাহবুব, প্রিয়ভাজন বুযুর্গ ব্যক্তি, স্নেহশীল নেতা হাজী অলিউল্লাহ (ভাই ইমরান সিদ্দিকী)

91 রহিমাহুল্লাহর সামনেই
ঘটেছে। ঘটনাটা মোটামুটি এমন ছিল: হাজী অলিউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ২০১২ সালে প্রায় এক দশক কারাগারের প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে সাথিদেরকে নিয়ে মিরান শাহে হিজরত করেন। করাচির সেন্ট্রাল জেলে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর চেতনা উদ্দীপক বয়ান বক্তৃতাগুলো তার কাছে পৌঁছেছিল এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রতি অদেখা ভালোবাসা জন্ম নেয়া ছিল। অপরদিকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহও অন্য মুজাহিদদের কাছ থেকে হাজী অলিউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং তার সঙ্গী-সাথিদের মহান কীর্তি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ঘটনা শোনেন। ফলে তার অন্তরেও 91ভাই ইমরান সিদ্দিকী মুজাহিদীনের মাঝে হাজী অলিউল্লাহ সাহেব নামে
প্রসিদ্ধ। প্রবীণ মুজাহিদীনের একজন তিনি। কমিউনিস্টদের শাসনামলে আফগানিস্তানে জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তালেবানের আমলে আফগানিস্তানে হিজরত করেন। করাচি শহরে জিহাদের দাওয়াত বিস্তারে মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি এবং তার সাথীরা ১১ই সেপ্টেম্বরের পর পর আমেরিকা এবং তার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তানে জিহাদ সূচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ২০০২ সালে করাচি থেকে গ্রেপ্তার হন এবং ১০ বছর পর ২০১২ সালে মুক্তি লাভ করেন। মুক্ত হবার পরপর ওয়াজিরিস্তানে চলে আসেন এবং এখানে মুজাহিদীনকে নেতৃত্ব দেন। তিনি আলকায়দা উপমহাদেশের নৈতিক শিক্ষা বিভাগের প্রধান এবং শুরা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বরাবরই অবিচলতা মহানুভবতা স্নেহশীলতা ও উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে আপন সন্তুষ্টি দান করুন আমীন!!

[609]

হাজী অলিউল্লাহ সাহেবের ভালোবাসা স্থান করে নেয় এবং তার সাক্ষাতের আগ্রহ তৈরি হয়। কিন্তু যখন হাজী অলিউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ মিরান শাহ এলাকায় পৌঁছেন, সে সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কিছু কাজে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের প্রাণকেন্দ্র ভানা মহল্লায় অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করছিলেন। এই উপস্থিতি এবং ব্যবস্থাপনাগত কিছু কারণে তখন পর্যন্ত উভয় হযরতের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সে সময় মিরানশাহ বাজারে ঘোরাফেরা করা কিছু লোক হাজী সাহেব রহিমাহুল্লাহকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক ভুলভাল কথা শুনিয়ে দেয়, যার কারণে হাজী সাহেব রহিমাহুল্লাহ স্বভাবতই কিছুটা চিন্তিত হয়ে ওঠেন। চিন্তার কথা তিনি আমার কাছে উল্লেখ করেন এবং বলেন: ‘ফারুক রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে লোকেরা অনেক নেতিবাচক কথা বলে এবং তার সঙ্গে এখনও আমার সাক্ষাৎ হয়নি। তার ব্যাপারে আপনার কি রায়?’ আমি বললাম আপনি বড় মানুষ এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অধিকারী। যতক্ষণ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ না হবে, কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন না। হাজী সাহেব রহিমাহুল্লাহ একমত হলেন। কিছুকাল পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মিরান শাহে ফিরে আসেন এবং হাজী সাহেব রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তখন হাজী সাহেব রহিমাহুল্লাহ সাক্ষাতের জন্য যাবার আগে আমার কাছে আসেন এবং মুচকি হেসে বলেন: ‘ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি আল্লাহ কল্যাণকর কিছু করবেন। মানুষের কাছে অনেক কিছু শুনেছি তার ব্যাপারে। এবার দেখি তিনি কেমন?’ দীর্ঘ সাক্ষাতের পর হাজী সাহেব রহিমাহুল্লাহ সোজা আমার কাছে আসেন এবং সাক্ষাতের পর যা যা হলো সবকিছু এভাবে উল্লেখ করেন: ‘আমাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে

[610]

আলহামদুলিল্লাহ। তিনি একজন কামেল (পূর্ণাঙ্গ) মানুষ। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। খুবই আদব রক্ষাকারী। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনেক আনন্দিত হয়েছি। তিনি উচ্চপর্যায়ের মানুষ। তার ব্যাপারে বাজারে যেই মন্দ কথা শুনেছি সবই বকওয়াস। ভাই! এই সবকিছু হিংসা, হিংসা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। লোকেরা তাকে হিংসা করে। তিনি তো উচ্চ মাপের মানুষ।’

ঠিক এমনই একটা ঘটনা আরব যুবক আবুল-বারা কুয়েতি রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ঘটে। তাকে আল-কায়েদার অধীনে একটি বিশেষ পাকিস্তানি গ্রুপ আশ-শুহাদা ব্রিগেডের পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনিও ইতিপূর্বে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নাম শুনেছিলেন কিন্তু কখনও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। অবশ্য মিরান শাহ বাজারে কিছু লোকের কাছে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা ও প্রোপাগান্ডা তাকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করতে বাধ্য করে। তিনি আমার কাছে আসেন এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক বিভিন্ন কথা বলেন। তিনি চুপ হলে আমি বললাম: আপনি কখনও ফারুক ভাইকে দেখেছেন অথবা আপনাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয়েছে? তিনি বললেন: না.. তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।’ তখন আমি বললাম: একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন! এরপর আমরা এ বিষয়ে কথা বলবো’। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, অল্প দিনের মাঝেই তাদের সাক্ষাৎ হলো। সাক্ষাতের পর আবুল বারা ভাই রহিমাহুল্লাহ আমার কাছে এলেন। যারা তার কাছে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছিল, তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তিনি কাঁপছিলেন। তিনি কিছুটা এমন কথা বলতে আরম্ভ করলেন: ‘ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মহান মানুষ। তিনি জিহাদের দাঈ ও মুরুব্বী। তিনি আহ্বায়ক, আবার অভিভাবক। তিনি নিজের সাথিদের দীনী ও নৈতিক

[611]

শিক্ষা দিয়েছেন। জিহাদী দলের বিভাগগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। উন্নত চরিত্রের অধিকারী তিনি। খুবই আদব শিষ্টাচারের অধিকারী এবং আলেমে দীন ব্যক্তিত্ব। অথচ তার ব্যাপারে যারা মন্দ কথা বলেছে, তারা নিজেরাই বেকার লোক; কোনো কাজের নয়। যে লোকেরা তার ব্যাপারে দুর্নাম করতো, তাদেরকে আমি বলে দিয়েছি, আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করো এবং যুদ্ধ ফ্রন্টে গিয়ে মুজাহিদীনের খেদমত করো। বাজারে ঘোরাঘুরি করে ফিতনা বিস্তার করো না।’

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে এমন যা যা ঘটেছে, ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, আল্লাহর দীনের দাঈদের অধিকাংশের সঙ্গেই এমন হয়েছে। স্বয়ং ফখরে উম্মাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহকে আঘাত করতে কত ব্যক্তি ও সংস্থা চেষ্টা করেছে! সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও এমন হয়েছে। আরও পেছনে গেলে ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে দেখা যায়, সব যুগেই ইসলামের মহান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও নেতিবাচক কথা বলার জন্য সমাজে একটা গ্রুপ বিদ্যমান ছিল। দুর্নাম অপবাদ মিথ্যাচার তারা বরাবরই করে গেছে। তবে নবীদের পরে ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে কোনো মানুষ নেই। আমরাও আমাদের আকাবির ও মহান ব্যক্তিদেরকে ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করি না। কিন্তু নসীহত ও সংশোধন প্রচেষ্টার সঙ্গে বিশৃঙ্খলা মিথ্যাচার অপবাদ ও ঘৃণামূলক পন্থার যোজন যোজন ফারাক রয়েছে। একটা প্রশংসনীয় ও কাঙ্ক্ষিত অপরটা নিন্দনীয় ও জঘন্য। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহকে লোকেরা সিআইএ'র এজেন্ট বলতো। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহকে মোসাদের এজেন্ট বলতো। সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে এক ব্যক্তি শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহকে বলেছে,

[612]

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

(17)

‘বয়ানুল কুরআন’ তাফসীর গ্রন্থে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন:

« এই দুটি উদাহরণের মাঝে দুটো বিষয় রয়েছে: একটি হলো কার্যকরী বস্তু—যা আসল পানি এবং আসল সম্পদ; আর অন্যটা হলো অর্থহীন বস্তু—যা খরকুটা এবং ময়লা জিনিস। সারাংশ হল, উদাহরণ দুটিতে যেমন সাময়িকভাবে ময়লা জিনিস আসল জিনিসের উপরে দেখা যায় কিন্তু পরিণতিতে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং আসল জিনিস থেকে যায়, একইভাবে বাতিল ও মিথ্যাকে সাময়িকভাবে সত্যের ওপর দেখা যায় কিন্তু পরিণতিতে মিথ্যা পরাজিত হয় এবং সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে যায়। »

অপরদিকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মনোবল ও সহনশীলতা ছিল অদ্ভুত ধরনের। আল্লাহ তাআলা তাকে যেই মনোবল দান করেছিলেন, সেটাও তার দীনের অংশ ছিল। তিনি তার ব্যাপারে মিথ্যাচারী ও অপবাদ রটনাকারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতেন। তাকে যারা খারাপ বলতো তাদের জবাবে এই আয়াতের উপর আমল করতেন ادفع بالتي هي أحسن (অর্থ: উত্তম পন্থায় জবাব দাও) তিনি মনে করতেন, যার স্বভাব যেমন, সে তো তেমনই আচরণ করবে। তিনি যথাসম্ভব এমন ব্যক্তিদের সংশোধনের চেষ্টা করতেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। যে মানুষগুলো বিভিন্ন বৈঠকে তার ব্যাপারে বিষ ছড়াতো, তিনি বছরের পর বছর তাদেরকেও ভাতা প্রদান করতেন এবং খরচ পাঠিয়ে দিতেন। প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তিনি এমন ভাবে কাজগুলো করতেন, ওই ব্যক্তি জানতেও পারতো না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টা তার ব্যক্তিগত হতো তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন এবং এই আয়াতের উপর আমল করতেন فاصفح الصفح الجميل অর্থ: “আপনি খুবই উত্তম পন্থায় তাদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন।” [সূরা হিজর ১৫:৮৫]

কিন্তু যখন জিহাদের পথে বাধা দানকারীরা উম্মাহর মাথার মুকুট হযরত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহিমাহুল্লাহ এবং কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর মতো উম্মাহর নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য জিহাদী নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে এজাতীয় মিথ্যাচার করতে আরম্ভ করে, তখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এমন ব্যক্তিদের খারাপ দিক স্পষ্ট করার দিকনির্দেশনা দেন এবং তাদের অনিষ্ট থেকে সকলকে বাঁচানোর পদক্ষেপ নেন। তিনি বলেন: ‘মুজাহিদীনের ব্যাপারে যারা প্রোপাগান্ডা ও দুর্নাম ছড়ায়, নেতৃবৃন্দকে অপবাদ দেয়, শত্রুপক্ষের ভয় আমাদের মনে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং মুজাহিদীনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলো বলে বেড়ায়; জিহাদের পথে এমন বাধা দানকারীদের তালিকায় যারা রয়েছে, ফুকাহায়ে কেরামের রায় অনুযায়ী তাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত নয়। »

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ তাদের সম্পর্কে একথা পর্যন্ত বলেছেন যে, « শরীয়তের নির্দেশনা এমনই, এমন ব্যক্তিরা যদি জিহাদে অংশগ্রহণ করতেও চায়, তাহলেও তাদেরকে দূরে রাখা আমীরের দায়িত্ব। » [শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ রচিত ‘তাফসীর ফী জিলালি সূরা আত তওবা’]

অতএব বিষয়টা যখন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না থেকে আকাবির ব্যক্তিদের পর্যন্ত গড়ায়, তখন তিনি এমন দুষ্কৃতিকারী গ্রুপকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন।

পরবর্তীতে সেটাই হয়েছে। যেই মানুষগুলো শুরুতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল, তার ব্যাপারে মিথ্যাচার করে বেড়াতো, পরিশেষে তাদের মাঝে অধিকাংশই কট্টরপন্থি বিশৃঙ্খলা

[615]

সৃষ্টিকারী তাকফীরি দায়েশ গ্রুপে চলে যায়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বলতেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আল্লাহর দীনের সর্বোচ্চ চূড়া। আল্লাহ নিকৃষ্ট বিষয় এখানে রেখে দেন না। তিনি মন্দ অপসারণ করেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একই পন্থায় অপছন্দনীয় লোকদেরকে আল্লাহ দূরে সরিয়ে দেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন, আমীন। তখন তিনি ‘মুজাহিদীনের সামনে এক গুরুতর ফিতনা’ নামে মুজাহিদীনের মাঝে বিশৃঙ্খলা বিস্তারকারী দায়েশের পথভ্রষ্টতা স্পষ্ট করে কিছু বিষয় উল্লেখ করার পর লিখেন: « একথা ভালোভাবে বুঝে রাখা উচিত, এটা একটা বিদআতী চিন্তা এবং এই চিন্তা লালনকারীরা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে ভয়াবহ সীমালঙ্ঘনের শিকার। এই বিদআতের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক হাদীসে সতর্ক করেছেন এবং এই কট্টরপন্থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ববর্তী উম্মাহর ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। স্পষ্ট থাকা চাই, বিদআতপন্থিদের মধ্যে যারা এসবের দাওয়াত দেয় এবং অন্য মুসলিমদেরকে নিজেদের দিকে ডাকে, তাদের সঙ্গে করণীয় আচরণের ব্যাপারে শরীয়তের কিছু সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সর্বসম্মত নির্দেশনা হলো: বিদাতপন্থিদের সঙ্গে ওঠাবসা করা যাবে না, তাদেরকে সালাম দেয়া যাবে না, তাদের সঙ্গে কথা বলা হবে না এবং তাদের কথাও শোনা হবে না; তাদের বইপত্র পাঠ করা হবে না, তাদের দাওয়াত কবুল করা হবে না, তাদের খাবার খাওয়া যাবে না, তাদের দেখা সাক্ষাতে যাওয়া যাবে না এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা করা যাবে না। তবে উলামায়ে কেরামের মাঝে যারা তাদের দলীল-প্রমাণ খণ্ডনের যোগ্যতা রাখেন, তারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে অথবা তাদের পথভ্রষ্টতা

[616]

স্পষ্ট করার জন্য তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করলে কোনো অসুবিধা নেই। »

অল্পতুষ্টি ও পরনির্ভরহীনতা
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজের প্রয়োজনে অল্পতেই তুষ্ট হয়ে উঠতেন। তিনি অল্পতুষ্ট ছিলেন, অমুখাপেক্ষী ছিলেন। অন্যদেরকে বেশি দিয়েছেন কিন্তু নিজের জন্য অল্প ব্যয় করতেন। তার কাছে শুধু তিন জোড়া কাপড় থাকতো। তীব্র গরমের সময় জুন জুলাই মাসে মোটা খদ্দরের পোশাক পরিধান করতেন। যখনই সাক্ষাৎ করতেন, একই পোশাকে দেখা যেত। আস-সাহাব মিডিয়ার একজন দায়িত্বশীল ভাইয়ের কাছে আমি মজা করে বলি: ‘আপনাদের ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে তো ভিডিওতে দামি কটনের কাপড় পরিহিত দেখা যায়’, তখন ওই ভাই বলতে লাগলেন: ‘সেটা তো কটনের একটা কুর্তা, যা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ শুধু বয়ান রেকর্ড করানোর জন্য পরিধান করতেন। কারণ উলামায়ে কেরাম বলেন, দাঈদের দাওয়াত দেয়ার সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ মজলিসগুলোতে পোশাক ও গঠন গাম্ভীর্যপূর্ণ রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ক্ষেত্রগুলোতে কখনও কখনও বিশেষ পোশাক পরিধান করতেন। তবে সাধারণ অবস্থায় তার নিকট ওই দুটি কাপড়ই থাকে, যা সাধারণত তিনি পরিধান করতেন’।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার মুহাজির জীবনে বাইতুল মাল থেকে কোন অজীফা গ্রহণ করেননি। তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে পরিবারের খরচ চালিয়েছেন, খুবই সাদাসিধেভাবে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে। তার সম্মানিতা স্ত্রী বলেছেন:

‘আপনাদের ভাই ব্যক্তিগত সম্পদ থেকেই খরচ চালাতেন। তখন আমি বললাম, বায়তুল মাল থেকে কিছু ঋণ

[617]

নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু তিনি রাজি না হয়ে বললেন, যদি ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি মর্যাদা সম্পন্ন কোনো মুজাহিদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে নেবো। কিন্তু বায়তুল মাল থেকে কখনোই নেব না। একবার তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কিছু অর্থ তার কাছে আসে। তিনি তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ বায়তুল মালে রাখেন এবং বলেন, ‘বায়তুল মালের হিসাবে কিছু না কিছু এদিক সেদিক হয়েই থাকে এটা যদিও অনেক কম তবু কাফফারা হিসেবে আমি রাখছি আল্লাহ কবুল করে নিন!’

জিহাদের নেতৃবৃন্দের অল্পে তুষ্টি ও সাদাসিধে জীবন
এমনিভাবে একদিন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাকে বলতে লাগলেন: মহান আলেম, পরিচালক, আমিরে জিহাদ হযরত শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

« যখন আমি (শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ) ওয়াজিরিস্তানে গমন করি এবং মুজাহিদীন আমাকে ঘর তৈরি করে দেন, তখন পুরানো ও সংকীর্ণ হওয়ার কারণে আমার মনে খেয়াল এলো, সম্ভবত এর চেয়ে ভালো ঘর পাওয়া যেত; সাথিরা সম্ভবত আমার জন্য ঘর ঠিক করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করেনি’। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, অতঃপর একদিন আমার আমীর, খোরাসানে জিহাদের নেতা, গোটা গোত্রীয় অঞ্চলকে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি সহকারে জিহাদের জন্য প্রস্তুতকারী, ইবাদতগুজার শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহর ঘরে যাই। শায়খ মুস্তফা রহিমাহুল্লাহ এমন ব্যক্তি ছিলেন, যার একটি সাক্ষরে ওয়াজিরিস্তানের কয়েকটি পরিবার নিজেদের ঘর অর্ধেক করে এবং আলিশান কক্ষ ছেড়ে মুহাজিরদের বসবাসের জন্য দিয়ে দিতে প্রস্তুত [618]

হয়ে যায়— শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন আমি এই মহান নেতার দারিদ্র্য অবস্থা সাদাসিধে জীবন এবং পুরানো ঘর দেখলাম—যা আসলে বকরি রাখার কামরা ছিল; পরিষ্কার করে বসবাসের উপযুক্ত করা হয়েছিল; তার একটি দেয়াল খুবই শোচনীয় অবস্থায় ছিল—এ অবস্থা দেখে আমি খুবই লজ্জিত হই এবং অনুভব করি, আমি তো এর চেয়ে অনেক ভালো ঘরে বসবাস করি।’

এখানে এই ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, নববী সুন্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে অল্পে তুষ্টি ও দরবেশ সুলভ জীবন যাপন করতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সম্ভবত শিখেছিলেন তার আকাবিরদের সান্নিধ্যেই।

ওয়াজিরিস্তান গোত্রগুলো সাহায্য-সহযোগিতার দাবি যথার্থ পূরণ করেছে
এখানে স্মরণ রাখা চাই, উম্মাহর এই মহান নেতৃবৃন্দের দারিদ্র্যাবস্থা ও সাদাসিদে জীবন তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিলেন। অন্যথায় খোরাসানের গোত্রগুলোতে মহান আনসারগণ—যারা মদীনার আনসারী সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের স্মৃতি জাগ্রত করেছিলেন— মুজাহিদীনের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা এমনকি শৌখিন আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিছু কিছু জিনিস এমন ছিল, যেগুলো সাধারণত শহুরে জীবনেও তেমনটা দেখা যেত না; কিন্তু আনসার ভাইয়েরা আমাদের জন্য সেগুলো প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এটা গোত্রগুলোর আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমদের মহানুভবতা ছিল যে, তারা মুহাজির ভাইদের খেদমতে এমন ভদ্রতা দেখাতেন এবং এতসব কষ্ট সহ্য করতেন যে, বস্তুবাদী জগতে টাকা পয়সা ও স্ট্যাটাসের নিরুপায় সমাজে বসবাসকারী আমাদের ভাইয়েরা কল্পনাও করতে পারবেন না, আনসার [619]

ভাইয়েরা নিজেদের ঘর অর্ধেক করে মুহাজির ভাইদের বসবাসের জন্য দিয়ে দেন, সম্পদের উৎকৃষ্ট অংশ মুহাজির ভাইদের জন্য খরচ করেন, নিজেরা সারারাত জেগে পাহারা দিয়ে মুহাজির ভাইদের নিরাপদ আরামদায়ক নিদ্রার ব্যবস্থা করেন। তারা দিনের বেলা পাহাড়ে গিয়ে কাঠ কুড়াতেন এবং সন্ধ্যায় সেগুলোর মাধ্যমে মুহাজিরদের রুম গরম করার ব্যবস্থা করতেন। নিজেরাই ক্ষুধার্থ থাকতেন। বিবি বাচ্চাদেরকে শুকনো রুটি অথবা শুধু শুধু দুধ দিয়ে খাবার খেতে দিতেন; কিন্তু দীনের তরে আত্মীয়তাকারী মেহমান হিজরতকারীদেরকে বকরির গোস্ত এবং অন্যান্য ভদ্রতা সূচক ভালো খাবার পরিবেশন করতেন। নিজেরা ঠাণ্ডায় থাকতেন কিন্তু মুজাহিদীনের জন্য নরম ও উষ্ণ শয্যার ব্যবস্থা করতেন। ড্রোন হামলা যখন বেশি মাত্রায় হতো, ড্রোন বিমানগুলো যখন খুব নিচ দিয়ে যেতো, তখন আনসার ভাইয়েরা মুহাজিরদের সকল কাজ নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিতেন, যেন ঝুঁকির মধ্যে মেহমানদের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়। বিপদের সময় তারা নিজেরা বের হতেন আর মুহাজির মেহমানদেরকে ঘরের ভেতর নিরাপদে রাখতেন। আল্লাহ এই মহান আনসারদের প্রতি সন্তুষ্ট হন যারা মদীনার আনসারদের মতোই يــؤثرون على أنفســهم ولو كــان بهم خصاصة অর্থ: "তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়, চাই নিজেরা অভাব অনটনের মধ্যে থাকুক।" [সূরা হাশর ৫৯:০৯] আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই মহান ব্যক্তিদেরকে তার সন্তুষ্টি দান করুন! আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতে তাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন— যা তাদের মর্যাদার উপযুক্ত! এই মহান সন্তানদের লক্ষণ কুরআনে কারীমে এসেছে, তারা বলে:

لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

অর্থ: "আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর না কোনো কৃতজ্ঞতা।" [সূরা ইনসান ৭৬:০৯]

পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য এবং ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদীন ও মুহাজিরদের সঙ্গে ভালোবাসার একটি ঝলক দেখাতে একটি ঈমানী ঘটনা উল্লেখ করছি।

** আমরা শুধু আপনাদের দোয়া চাই

এটা ২০০৮ সালের গ্রীষ্মকালের কথা। ভানা (ওয়ানা) ওয়াজিরিস্তানের ‘স্পিন’ নামক এলাকায় এক বসতিতে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ করে। বেশ কয়েকটি ঘর ধূলিস্যাৎ করে ঘরের লোকদের সম্মান নষ্ট করে। জনসাধারণকে সড়কে একত্রিত করে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। জনসাধারণের জীবন ভিক্ষার সুপারিশ করার জন্য স্থানীয় একজন ডাক্তার অগ্রসর হলে শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বর্বর বাহিনী তাকেও হত্যা করে। সেই স্থানে অত্যাচারী জালেম, দাম্ভিক, দীন ও জাতির শত্রু সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দ আমাদের কয়েকজনকে ওয়াজিরিস্তানের খুব দূরের পাহাড় সারিতে শত্রুর উপর হামলার পরিকল্পনা দিয়ে পাঠান।

আমার জন্য গর্বের বিষয় হলো, ওই সফরে আমার সফরসঙ্গী ছিলেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাথি জাওয়াদ আরিফ শহীদ রহিমাহুল্লাহ। যাই হোক সফরের ভেতর তীব্র বৃষ্টি বর্ষণ হয়। গাড়ি যখন একটি দুর্গম পাহাড়ি স্রোতের মধ্যে দিয়ে যেতে শুরু করে, তখন স্রোতটি ফুলে ওঠে। বৃষ্টির কারণে তাতে পানি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি ছিল। এমন সময় কিছু লোককে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের দিকে আসতে দেখি। তারা দৌড়াচ্ছিলো এবং হাত দিয়ে আমাদেরকে থামানোর

[621]

জন্য ইশারা করে যাচ্ছিলো। সেই সঙ্গে তারা চেঁচিয়ে আমাদেরকে থামতে বলছিল। তারা কাছে এসে আমাদের গাড়ি ঘিরে নেয় এবং আমাদেরকে সামনে যেতে বারণ করে। কারণ স্রোতের পানি বেড়ে যাওয়ার কারণে সামনে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা বারবার বলেছি, এই পথ আমরা চিনি এবং পানি খুব বেশি একটা নেই, রাতের মধ্যেই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। তখন স্থানীয়রা তাদের ঐতিহ্যগত নাটকীয় ভঙ্গিতে স্রোতের ভয়াবহ চিত্র আমাদের সঙ্গে তুলে ধরে বলে: এই স্রোত পার হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের পীড়াপীড়ির কাছে পরাজিত হয়ে এবং তাদের অভিজ্ঞতা বেশি মেনে নিয়ে তাদের মেহমান হিসেবে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমাদের সম্মতি জেনে স্থানীয়দের চেহারা আনন্দে ঝলমল করে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ তারা উচু আওয়াজে আত্মীয়-স্বজনকে এবং বাচ্চাদেরকে ডাকতে শুরু করে। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, এরা আমাদের মেহমান! তাদের সেবা-যত্ন করতে শুরু করো তোমরা! দেখতে দেখতে চারদিক থেকে শত শত বাচ্চা এসে আমাদের জিনিসপত্র কাঁধে তুলে সামনে চলতে শুরু করে এবং আমাদেরকে তাদের কক্ষে নিয়ে যায়। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের আহারের জন্য তারা ছাগল জবাই করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা তাদের এমন সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে বলি, ভাই! ছাগল জবাই করার প্রয়োজন নেই, ডাল তরকারি যা আছে সেগুলোই খেয়ে নেব। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এদিকে আজকে আমরাও ছাড় না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম; কখনও কপট রাগ দেখিয়ে আবার কখনও বুঝিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। আমাদের ঝগড়া দীর্ঘ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সাথিকে সমঝোতাকারী স্থির করা হয় এবং তিনি সিদ্ধান্ত দেন: ছাগলের পরিবর্তে দুটো দেশি মোরগ জবাই করা হবে। ভালো! এই

[622]

সিদ্ধান্তে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। রাতে আমাদের মেহমানদারী এত শানদার ছিল যে, আজও তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। তারা কাবাব টুকরো টুকরো করে এগিয়ে দেন এবং আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে যাবার পরও জোর করে মুখে ঢুকিয়ে দেন। খাবার শেষে জোর করে আমাদের পা টিপে দিতে শুরু করেন। আমাদের ব্যাগ খুলে সেখান থেকে ময়লা জামাকাপড় বের করেন রাতেই ধুয়ে দেয়ার জন্য। এরপর যখন সকাল হয় এবং আমরা তাদের ভদ্রতা সূচক নাশতার পর বের হবার প্রস্তুতি নিই, তখন স্রোতের দিকে তাকিয়ে দেখি এত পরিমাণ পানি রয়েছে যা সন্ধ্যার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বলে মনে হচ্ছে। তখন স্থানীয় ওই ভাইয়েরা তাদের ঐতিহ্যগত নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, স্রোতের রাস্তা একেবারেই পরিষ্কার, কোনো সমস্যা নেই, গাড়ি আরামে চলে যাবে। আমরা হতবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমরা বলি: গত সন্ধ্যায় পানি তো আরও কম ছিল আর আপনারা বলেছিলেন যাওয়া অসম্ভব; আর এখন পানি বেড়ে গিয়েছে আর আপনারা বলছেন, রাস্তা ঠিক আছে, এটা কেমন যুক্তি?' ক্রুসেড যুদ্ধে ইসলামের অগ্রসেনা দলের এই মুসলিম ভাইগণ তখন নিষ্পাপ চেহারা করে বলেন: "সন্ধ্যায় রাস্তা ঠিক ছিল কিন্তু আমরা আপনাদেরকে মেহমান বানাতে চাচ্ছিলাম, এ কারণে সন্ধ্যায় আপনাদেরকে বাধা দিয়েছি।" এইসব কিছুর পর তাদের চেহারায় নিম্নোক্ত আয়াতের আলো ফুটে উঠেছিল:

لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

অর্থ: "আপনাদের কাছে আমরা কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।" তাদের শুধু একটাই কথা ছিল, আমাদের জন্য এবং আমাদের পরিবারের জন্য আপনারা দোয়া করবেন। সাইয়েদুনা হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করে বলেছেন:

اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَـاءِ الْأَنْصَـارِ، وَاغْفِـرْ لِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ

[illegible]: “[illegible]” [[illegible]]

[illegible]

[illegible]

[illegible] وَيُـؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِـهِمْ وَلَـوْ كَـانَ بِهِمْ خَصَاصَـةٌ [illegible] ([illegible]: “[illegible]”) [illegible]

পায়। কিন্তু আমার মনের মাঝে প্রিয় মুরব্বী আমার গুরু আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সে সময় বৃদ্ধি পায়, যখন আমি তার গৃহের কক্ষ দেখতে পাই।

গুপ্ত সংস্থাসমূহের টর্চার সেলগুলোও সাধারণত আরও বেশি প্রশস্ত হয়ে থাকে বললে একটুও বাড়াবাড়ি হবে না। এ কক্ষে যদি আড়াআড়িভাবে কেউ শোয়, তাহলে পা ছড়াতে পারবে না। দৈর্ঘ্যও এর চেয়ে তত বেশি নয়। তাতে প্রবেশ করে প্রথমে মনে হয়েছিল, হয়তো দেয়ালে কোনো দরজা আছে, যা দিয়ে আমরা পাশের অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করতে পারবো, আর সেটাই হয়তো আসল কক্ষ; এই কক্ষটি শুধু দেয়ালের জন্যই হয়তোবা। কিন্তু কোনো দরজা আসলে ছিল না। তার কক্ষ দেখে পবিত্র সীরাতের গ্রন্থগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কক্ষের আলোচনা মনে পড়ে যায়।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন: « শায়খ আবু ইয়াহইয়া লিবি রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ ইবরাহীম মাগরিবি হাফিযাহুল্লাহকে আমি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কক্ষে এমন সময় নিয়ে যাই, যখন তিনি এবং তার পরিবার ঘরে ছিলেন না। শায়খ ইবরাহীম হাফিযাহুল্লাহ অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন, এটা ফারুকের কক্ষ? শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ কক্ষের আয়তন ও ধরন দেখলেন। তার চোখ চমকে উঠলো এবং তিনিও একই ভঙ্গিতে বললেন: আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা যে, তিনি এমন বান্দাদের সঙ্গ দান করেছেন।

[625]

দৃঢ় বিশ্বাস ও ধৈর্য : নেতৃত্বের জন্য দুটি শর্ত

আল্লাহ তাআলার নেয়ামত সমূহ ও জান্নাতের প্রতি ঈমান ছাড়া এতটা অল্পে তুষ্টি ও অমুখাপেক্ষী জীবন বেছে নেয়া কঠিন। আল্লাহর নেয়ামত সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাকওয়াই কঠিন থেকে কঠিন অবস্থায় মানুষের সঙ্গী হয় এবং বিপদ-আপদ সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থার পাশাপাশি যদি ধৈর্যের গুণ থাকে, তাহলে একে দীনের ক্ষেত্রে ইমামত বলা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

অর্থ : "এবং আমি তাদের মধ্যে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এমন কিছু লোককে ঈমান বা অনুসরণীয় বানিয়ে দিয়েছি যারা আমার নির্দেশে লোকদের পথপ্রদর্শনের কাজ করবে আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী।" [সূরা সাজদা ৩২ :২৪]

ধৈর্য ও দৃঢ়বিশ্বাসের মাধ্যমে দীনের ক্ষেত্রে ইমামাহ বা নেতৃত্ব লাভ হয়। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াদা সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, জান্নাতের নেয়ামত সমূহ এবং জাহান্নামের কঠোরতা ও শাস্তি সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ পাকের শক্তি এবং তার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, জিহাদী পথ সঠিক পথ হবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, ক্রুসেডারদের মিত্র সেনাবাহিনীর কুফরী এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই সত্য হবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, শাহাদাতের মিষ্টতা ও নেকীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস—এক কথায় আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের যত দিক রয়েছে, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সকল দিক নিজের জীবনে প্রতিফলিত

করতে সচেষ্ট ছিলেন। লোকেরা ক্লান্ত হয়ে উঠতো কিন্তু তিনি ক্লান্ত হতেন না। লোকেরা নিরাশার শিকার হতো কিন্তু তিনি নিরাশ হতেন না; নব উদ্যমে তিনি অগ্রসর হতেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইসলাম বিজয়ী হওয়ার যে লক্ষ্য আমরা স্থির করেছি, সেখানে অবশ্যই পৌঁছুবো এবং এই পথেই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব। তিনি ফেরাউন নমরুদ এবং আবু জাহেলের কর্তৃত্বের অবসানের মধ্য দিয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের এবং তার অনুসারীদের সাফল্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। এক কথায় আল্লাহ তাআলার এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। খুব সম্ভব অন্তরের এই দৃঢ়তা স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জিত হয়েছে একাগ্রতা সহকারে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে।

ইমামাহ'র দ্বিতীয় শর্ত ধৈর্য
নেতৃত্ব গুণের দ্বিতীয় শর্ত ধৈর্যের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রসর ছিলেন। পথের জটিলতায় ধৈর্য, গন্তব্য দূরবর্তী ও পথ দীর্ঘ হওয়াতে ধৈর্য, প্রিয় ভাইদের শাহাদাত ও গ্রেফতারিতে ধৈর্য, ক্ষুৎপিপাসা ও ঠাণ্ডা গরমে ধৈর্য, সুবিধা বঞ্চনা ও জটিলতার কারণে ধৈর্য, প্রিয় মানুষদের বিচ্ছেদে ধৈর্য, শত্রুর পক্ষ থেকে নির্যাতন-নিপীড়নে ধৈর্য, রাত-দিন হামলা ও বোমাবর্ষণে ধৈর্য, যুদ্ধে শত্রুর মোকাবেলায় ধৈর্য, অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার বঞ্চনায় ধৈর্য, অভদ্র ও বেয়াদব লোকদের অভদ্রতা ও বেয়াদবীতে ধৈর্য, কুরআনের তিলাওয়াত ও দীনী ইলম অর্জনের পথে ধৈর্য, আমীরের পক্ষ থেকে কঠিন নির্দেশ পালন করতে গিয়ে [627]

ধৈর্য , যুদ্ধ অবস্থায় আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় আটকে রাখার ক্ষেত্রে ধৈর্য , তীব্র পেট ব্যথা , দাঁত ও কোমর ব্যথায় ধৈর্য এক কথায় ধৈর্যের যত পথ রয়েছে , সবকটি পথেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে দেখা যায়।

নিম্নোক্ত হাদীসের উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তিনি এই হাদীস দিয়ে অন্যদেরকে নসীহত করতেন :

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ

অর্থ “যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন ”। [সহীহ বুখারী]

তার কাছে এমন অজুহাত চলতো না যে , কেউ বলবে, আমার মাঝে ধৈর্য নেই। তিনি বলতেন , যে ধৈর্য ধরতে চায় , আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। তার অধিকাংশ চিঠিপত্রে নিম্নোক্ত হাদীসের অংশটি অবশ্যই থাকতো:

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ

অর্থ : “জেনে নাও , নুসরত বা বিজয় ধৈর্যের সঙ্গেই বেঁধে দেয়া হয়েছে। ” [তাবারানী প্রণীত আল মুজামুল কাবীর]

তিনি বলতেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীর সারাংশ হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ধৈর্যের সঙ্গে সমান্তরালে রয়েছে। এখানে আরবী শব্দ مع الصبر অর্থাৎ ধৈর্যের সঙ্গে ; বলা হয়নি যে , بعد الصبر - ধৈর্যের পরে অর্থাৎ ধৈর্যধারণের সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর সাহায্য শুরু হয়ে যায় এবং ওই ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা ও সঙ্গ লাভের কারণে যে প্রশান্তি লাভ করে , সেটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রাথমিক সাহায্য বলে প্রমাণিত হয়।

যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে…
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর দীনের জন্য তার ঘর-বাড়ি ছেড়েছেন এবং খোরাসান ভূখণ্ডে হিজরত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি হিজরতের সুন্নাহের একজন বড় দাঈ ছিলেন। তিনি মনে করতেন, হিজরত ছাড়া জিহাদ সঠিকভাবে বুঝে আসে না এবং কোনো ব্যক্তি হিজরত ছাড়া সঠিক পন্থায় কাঙ্ক্ষিত শ্রম ব্যয় করতে পারেনা। অতঃপর শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর মতো তিনিও কখনও সাময়িক বড় উদ্দেশ্য হাসিলের পরিবর্তে সঠিক চেতনার অধিকারী দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রজন্ম তৈরি করাকে হিজরতের বিশেষ লক্ষ্য বলে মনে করতেন। অপরদিকে ভারত উপমহাদেশে দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে বড় মোবারক আন্দোলন ছিল হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহর তাহরিকুল মুজাহিদীন। তিনি সাইয়েদ রহিমাহুল্লাহকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক এবং সমকালীন জিহাদী আন্দোলনকে ওই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা মনে করতেন। সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ হিজরতের পথ অবলম্বন করে খোরাসান অভিমুখে হিজরত করেছিলেন। তার হিজরত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের একটি বড় শুদ্ধি ও সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটে, যার বরকত আজ পর্যন্ত চলমান রয়েছে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহও হিজরতকেই জিহাদ ও উম্মাহর প্রতিরক্ষার স্বভাবজাত পন্থা মনে করতেন। তিনি বলতেন, হিজরত ছাড়া মুজাহিদ নিজের সর্বস্ব আল্লাহর দীনের পথে ব্যয় করতে পারে না। কারণ সে একাগ্রতা সহকারে জিহাদ ও জিহাদী শিল্প-যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে না। তিনি সীরাতে নববী থেকেও হিজরত ও মুহাজিরদের তাৎপর্য বর্ণনা করতেন। রুশ বিরোধী জিহাদের পর জিহাদ অব্যাহত থাকার ব্যাপারেও তিনি ঐ মুহাজিরদের অবদানই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন, যারা সে সময়ে খোরাসান অভিমুখে পরিবার-

[629]

পরিজন সহকারে হিজরত করেছিলেন এবং সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।

বিপ্লবী প্রজন্ম গড়ে তোলা
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আরব মুজাহিদীনকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। এর কারণ হলো, জিহাদের সবকটি অঙ্গনে তাদের বিশেষ মহান অবদান এবং প্রতিটি জিহাদী শিল্পে তাদের দক্ষতা ছিল। আরব মুজাহিদীনের জিহাদের পথে এই বরকতকে তিনি হিজরত ও মাতৃভূমি ত্যাগের সুফল মনে করতেন। তিনি চাইতেন, পাকিস্তানিরাও যেন এই মর্যাদা থেকে পিছিয়ে না থাকে। তিনি পাকিস্তানিদের মাঝে সৎকর্মশীল যোগ্যতা সম্পন্ন যুবকদেরকে বাছাই করে দারুল হিজরতে বসবাসের ব্যবস্থা করতেন। তিনি চাইতেন, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা যেন পুরো সময় ব্যয় করে। তিনি মনে করতেন, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে অবস্থান করা দুনিয়ার ভোগবিলাস ও বস্তুবাদী পরিবেশ থেকে বের হয়ে পুরোপুরি সালফে সালেহীনের জীবন পন্থা অবলম্বন করার দ্বারা অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা বের হয়ে যায়। এর ফলে তারা দীনের জন্য উৎসর্গিত হতে প্রস্তুত হয়। তাদের অন্তর থেকে তাগুত গোষ্ঠী ও শাসকবর্গের ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। জিহাদের সামরিক যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকশিত হয়। এক কথায়, যদি আমাদের হাতে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি হয়, তবেই আমরা সফল হবো। আমরা আমাদের কাজ করে দিয়েছি। এবার আমাদের হাতে গড়ে ওঠা প্রজন্মের পালা। তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা নিজ নিজ অঞ্চলে বিস্তার করবে।

কোনো কোনো সাথি বলতেন, এভাবে হিজরত করার দ্বারা সাথিরা সরকারের দৃষ্টিতে পড়ে যায় এবং ফিরে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়’। কিন্তু উম্মাহর একটি [630]

মহান বিশুদ্ধ প্রজন্ম তৈরির জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন। তিনি পরিস্থিতিকে সময়ের বিপরীত বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন: সময় সবসময় একরকম থাকে না; অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা যেভাবে রাত দিন পরিবর্তন করেন, মৌসুম পরিবর্তন করেন, তেমনিভাবে রাজা-বাদশা ও সরকারেরও পরিবর্তন ঘটান। তাই এসবের ভয়ে আমরা আমাদের আসল কাজ ছেড়ে দিতে পারি না। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের পদাঙ্ক অনুসরণকারী, তাকওয়া সাহসিকতা বীরত্ব বদান্যতা পর্বত প্রমাণ মনোবল ধৈর্য সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী একটি প্রজন্ম গড়ে উঠুক, যারা নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবে, উম্মাহর হাল ধরে তাদেরকে বাঁচাবে— ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর মতো তিনি এমন প্রজন্মের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। তিনি আত্মশুদ্ধি উন্নত নৈতিকতা বিস্তারের জন্য বয়ান বক্তৃতার মাধ্যমে এই প্রজন্মকে ইহসান শেখাতেন। তিনি শরীয়াহর ক্লাসগুলোর মাধ্যমে আকীদা- বিশ্বাস ও ফিকহুল জিহাদ তাদেরকে বোঝাতেন। তাদের উপলব্ধি পরিপক্ক করতেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত সমূহ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের উক্তি তাদেরকে শোনাতেন, যেন জিহাদের অঙ্গনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রজন্ম তাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তিনি সবর ও তাওয়াক্কুল শেখাতেন। তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি শেখাতেন। এক কথায় তিনি চাইতেন, পাকিস্তানের সকল অঞ্চল থেকে অমূল্য রতনেরা বেরিয়ে এসে গোত্রীয় অঞ্চলের প্রতিকূল জীবনে ধৈর্যের পরীক্ষার মাধ্যমে এমন যোগ্যতার অধিকারী হোন, যারা দীনের ইমাম হবেন, দাঈ হবেন; সুযোগ পাওয়া মাত্রই নিজ নিজ সমাজে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দাঁড় করাবেন।

[631]

গোলামির আলামত থেকে বেরিয়ে আসা

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বলতেন, সমাজের নিম্ন স্তরে বসবাস করে অনেক বাস্তবতা বোঝাই প্রায় অসম্ভব হয়ে থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতি, আমাদের সমাজে তার মন্দ প্রভাব, আমাদের দেশগুলোতে কাফেরদের কর্তৃত্ব এবং সেগুলোর বাহ্যিক প্রভাব চিনতে পারা, কাফেরদের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা ভাব, বীরত্ব সাহসিকতা তৈরি, নিন্দার পরোয়া না করে দীনের প্রতি আস্থাশীল থাকা ইত্যাদি অনেক জটিল বিষয় শুধু স্বাধীন পরিবেশে শ্বাস নেয়া এবং দীনের জন্য হিজরত করার বরকতেই বুঝে আসে। আল্লামা ইবনে খালদুন রহিমাহুল্লাহ বনী ইসরাঈলের জিহাদে অস্বীকৃতির খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। বনী ইসরাঈল দীর্ঘ সময় যাবৎ ফেরাউনের দাসত্বের শৃঙ্খলে বসবাস করেছিল। তারা নিজেদের চোখ দিয়ে আল্লাহর সাহায্য এবং নবী মূসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক বিষয়গুলো দেখেছিল। এত কিছুর পরেও যখন আল্লাহ তাআলা জিহাদের নির্দেশ দেন তখন তারা অস্বীকৃতি জানায়; পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। মূসা আলাইহিস সালামকে বলে:

فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

অর্থ: "(যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হয়) তাহলে আপনি যান এবং আপনার রব যান এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন আমরা এখানেই বসে আছি।" [সূরা মায়েদা ০৫:২৪]

এই ঘটনার পর তাদেরকে মরুভূমিতে বিচরণের শাস্তি দেয়া হয়। ৪০ বছর পর্যন্ত তারা মরুভূমিতে বিচরণ করে। দুঃখ কষ্ট ও প্রতিকূলতায় অভ্যস্ত হওয়ার দ্বারা এমন এক প্রজন্ম গড়ে ওঠে, যারা দৃঢ় মনোবল ও পরিপক্ক ইচ্ছা শক্তির অধিকারী ছিল। [ইবনে খালদুন রহিমাহুল্লাহ রচিত ইতিহাস গ্রন্থ মুকাদ্দামা থেকে সংগৃহীত] তাই পরবর্তীতে ওই

প্রজন্ম জিহাদ করে। একইভাবে আজও হিজরত ও জিহাদের কঠিন স্তর অতিক্রমকারী প্রজন্মও সমাজের পরিবর্তন এবং পৃথিবীর পরাশক্তি বিরুদ্ধে লড়াই অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। শুধু শহরে বন্দী থেকে দাওয়াতী কাজ করার দ্বারা সম্ভবত এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনের একটি সৎকর্মশীল জামাতকে হিজরত ও রিবাতের জীবনে অভ্যস্ত করে তুলতে চাইতেন। তা এমন গ্রুপ হবে, যাদের অন্তর ও মন মস্তিষ্ক থেকে দাসত্বের সংক্রামক ভাইরাস পুরোপুরি বের হয়ে যাবে। সমাজের সিকিউরিটি এজেন্সির ভয়-ভীতি তাদের চিন্তা-চেতনা প্রভাবিত করতে পারবে না এবং সর্বদা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের জীবন সম্পদ সবকিছু আল্লাহর দীনের জন্য বিলিয়ে দিতে তারা প্রস্তুত থাকবে।

কিন্তু তার অর্থ এই নয়, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর চিন্তা ছিল সমাজের সকল মানুষকে গোত্রীয় অঞ্চলে অথবা আফগানিস্তানে নিয়ে আসা। কখনোই নয়; বরং তিনি চাইতেন, এই সমাজের কিছু সৎকর্মশীল যোগ্যতা সম্পন্ন মুত্তাকী ব্যক্তিকে যদি হিজরত করে সমাজে দীন বাস্তবায়নের ভিতি স্থাপন করা হয়, তাদের হিজরতের দ্বারা মুজাহিদীনের সর্বাঙ্গন ঠিকভাবে পরিচালিত হবে; এর চেয়ে বেশি কারও হিজরতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু শুরুতে কোনো আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের জন্য কিছু প্রদীপ জ্বলতে হয়। এর দ্বারাই সমাজের বাকি অংশের স্থবিরতা দূর হয় এবং দীন বাস্তবায়নের পথ নির্মিত হয়।

[633]

এক পবিত্র প্রজন্ম গড়ে তোলা
যাহোক, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর এক দশকের অধিককাল যাবৎ চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি হয়, যারা হিজরত, জিহাদ ও ধৈর্যের আগুনে পুড়ে নিখাদ স্বর্ণ হতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাথিরা জিহাদের ভূমিতে অনন্য ছিলেন। যারা তাঁর সান্নিধ্যে সময় কাটিয়েছেন, তারা যেখানেই যেতেন সুবাস ছড়াতেন। এ বিষয়ে তিনি খুবই প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, আমরা আমাদের কাজ যথেষ্ট করেছি। যদি আমাদের একজন সাথিও অবশিষ্ট থাকেন তবু আমরা সফল হবো। আমাদের থেকে যা কিছু শিখেছে, ওই একজনই পৃথিবীতে সেগুলোর বিস্তার ঘটাবে। ওই একজনই এ হৃদয়ের মিটিমিটি আগুন আবারও প্রজ্জ্বলিত করবে। এই সাথিদেরকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন, যারা তার হৃদয় নিংড়ানো রক্ত পানি করা পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠেছিলেন। এই প্রজন্মের সুরক্ষাকে তিনি অগ্রগণ্য মনে করতেন। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। খুব কম জিহাদী আমীর এমন ছিলেন, যারা নিজের সাথিদের সুরক্ষার এতটা খেয়াল রাখতেন। নিজের শেষ চিঠিপত্রে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

« আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হওয়া উচিত গোত্রীয় অঞ্চল ও খোরাসানে আমাদের বুনিয়াদি সাথিদের নিরাপত্তা। তারা কঠিন অবস্থায়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বছরের পর বছর জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। আমি শুধু জিম্মাদার ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কথাই নয়; বরং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাধারণ সাথিদের কথাও বলছি। তাদেরকে সুরক্ষিত রাখা আমাদের প্রথম কাজ। »

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, বর্তমান সময়ে আমীর ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের ব্যাপারে মুজাহিদীনের মাঝে অবহেলা দেখা যায়। এর

[634]

কারণে একদিকে যেমন জিহাদের ক্ষতি হয়, অপরদিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টিরও আশঙ্কা রয়েছে। এমনিতেও তিনি জিহাদী কাজে শরীয়তের বিরোধিতা কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। আমীরের আনুগত্যে দুর্বলতা তেমনি শরীয়ত বিরোধী একটি বিষয়। একাধিক হাদীসে আমীরের আনুগত্যকে আল্লাহ আনুগত্য বলা হয়েছে এবং আমীরের অবাধ্যতাকে আল্লাহর অবাধ্যতা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মনে পড়ে ২০০৭ সালে একবার আমরা তাঁর সঙ্গে আমেরিকার কাঠের পুতুল আফগান আর্মির এক ক্যাম্পে হামলার উদ্দেশ্যে যাই। এক রাতে কয়েক ঘণ্টা পায়ে হাঁটার পর অপারেশন ছাড়াই আমাদের ফিরে আসতে হয়। তিনি সেখানে আমীর ছিলেন না। পরবর্তী দিন সকালে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমীরের আনুগত্যের শরীয়তের হুকুম বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি সাথিদেরকে মনে করিয়ে দেন, রাতে চলার সময় আমীর সাহেব যখন নীরব থাকতে বলেছিলেন, সে সময় যে সাথি কথা বলছিলেন তিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে অনেক বড় ভুল করেছেন; আমীর সাহেব যখন আলো জ্বালাতে নিষেধ করেছেন তখন কেউ একজন কেন আলো জ্বালিয়েছে?’ এভাবেই তিনি মায়া ধমকি মিশ্রিত করে সাথিদেরকে বোঝাচ্ছিলেন যে, স্মরণ রাখতে হবে, জিহাদে আমীরের আনুগত্যেই প্রতিদান নিহিত রয়েছে এবং তার অবাধ্যতায় শক্ত গুনাহের আশঙ্কা। তিনি উদাহরণ দিয়ে দিয়ে আমীরের আনুগত্যের বিপরীত কাজের বিভিন্ন ধরন স্পষ্ট করে সেগুলো থেকে বাঁচার নসীহত করেন। তিনি আরও বলেন, এমন বিষয়গুলোতে আমীরের আনুগত্য জরুরি যা শরীয়তে জায়েয। তার উপদেশ বাণীগুলো আজও আমার কানে বাজছে।

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ খোরাসানে আল-কায়েদার আমীর থাকাকালে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, শায়খ আতিয়াতুল্লাহ [635]

রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রয়েছে? আমি কিছুটা অনির্ভরতা দেখিয়ে বললাম, জি হ্যাঁ সালাম ও দোয়ার সম্পর্ক রয়েছে; কাজের ব্যাপারে বলবো, তিনি কখনও আমাকে কোনো কাজ করতে বলেননি আর আমাদেরও তাকে প্রয়োজন হয়নি। এ কারণে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়নি তার সঙ্গে।’ তিনি এরপর মায়া ভরে বোঝাতে লাগলেন, ‘দেখুন আমীরের আনুগত্যের উদ্দেশ্য নিজেকে তার কাছে অর্পণ করা। আপনি তো মুখে আনুগত্যের বাণী উচ্চারণ করেছেন কিন্তু যতক্ষণ আপনি পুরোপুরিভাবে তার কাছে সমর্পণ না করবেন, তিনি কিভাবে আপনাকে নির্দেশ পাঠাবেন?’ অতঃপর বলতে লাগলেন: ‘আপনারই শুরু করতে হবে। আপনি আমীরকে আশ্বস্ত করলে তিনি আপনার প্রতি আস্থা রাখবেন এবং আপনাকে দিয়ে কাজ করাবেন। আপনি যদি দূরে দূরে থাকতে পছন্দ করেন, তাহলে তিনিও আপনার থেকে দূরে থাকবেন। এক কথায় আমীরের সঙ্গে দৃঢ় আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা ছাড়া জিহাদী কাজ অগ্রসর করা যেতে পারে না। এ কারণে আপনি আমীরদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করুন।’ তাঁর এই উপদেশে অনেক উপকার পাই। তার পীড়াপীড়ি ও সহায়তার কারণে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আমার দৃঢ় সম্পর্ক ও যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়।

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তাকে মান্য করার জন্য এই কথাগুলো বলতেন না বরং তিনি নিজেও আমীরদের আনুগত্যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন। অথচ তিনি নিজেই একটি বড় জিহাদী জামাআতের দায়িত্বশীল ও আমীর ছিলেন। কিন্তু যখন তার আমীরগণ তাকে পরামর্শের আদলে কোনো নির্দেশ পাঠাতেন, তিনি নিজের সকল কাজ স্থগিত করে আমীরের নির্দেশ মান্য করতেন। তিনি বলতেন, আমীরের পরামর্শ নির্দেশেরই নামান্তর। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, কোথাও তার সফরে যাবার অথবা কারও সঙ্গে সাক্ষাতের কথা, কিন্তু আমীরদের

[636]

পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা অথবা তাদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনার বিরোধিতা হবার আশঙ্কায় তিনি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করতেন। এ বিষয়েও তিনি সমসাময়িক অন্য আমীরদের মাঝে অনন্য ছিলেন। এখানে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার আনুগত্যের পেছনে কোনো স্বার্থ অথবা জাগতিক ভয়-ভীতির স্থান ছিল না। যা কিছুর লোভ-লালসা থাকতে পারে, আল্লাহ তাকে সেই সব কিছুই দান করেছিলেন। মানুষকে দিয়ে স্বার্থ হাসিলের ইচ্ছা থেকে সর্বদাই তাকে আমি দূরে দেখেছি। তিনি শুধু শরীয়তের নির্দেশ সঠিকভাবে পালনের জন্যই এমনটা করতেন।

বীরত্ব ও সাহসিকতা
জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর নেতৃবৃন্দের উল্লেখযোগ্য একটি গুণ হলো বীরত্ব ও সাহসিকতা। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বীরত্বও আল্লাহর নির্দেশের অনুগামী আর তার সতর্কতাও শুধু আল্লাহর হুকুমেরই অধীন। তিনি যেহেতু দাওয়াত ও প্রচার মিডিয়ার সিপাহসালার ছিলেন, এ কারণে সাধারণত তার সামরিক যোগ্যতা সম্পর্কে লোকেরা কমই জেনে থাকে এবং তার দাওয়াতী গুণাবলির দিকেই মনোযোগ আকৃষ্ট থাকে। আল্লাহ তাআলা আমার মতো অক্ষমকে কয়েকটি রণাঙ্গনে তাঁর সান্নিধ্যের সৌভাগ্য দান করেছেন। রণাঙ্গনে তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হতেন। এখানে তার বীরত্বের কিছু ঘটনা পাঠক বর্গের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি।

[637]

ক্রুসেদারদের গোলাম আফগান আর্মির <(((৩৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায়)))> ... ক্যাম্পে হামলা
২০০৭ সালে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের বর্ডারে অবস্থিত আমেরিকার গোলাম আফগান আর্মির ক্যাম্পে মুজাহিদীন ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একটি সুশৃঙ্খল হামলা চালায়। অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম করে এই হামলা চালানো হয়। ঝিলাম শহরের কমান্ডার ফয়সাল আব্দুল হাদী রহিমাহুল্লাহ

92 এই
হামলায় নেতৃত্ব দেন। ওই হামলায় শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী প্রায় ১০ জন শত্রু সেনা নিহত হয়।

ওই হামলায় RR 82 MM তোপবাহী একটি দলের দায়িত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে দেয়া হয়। ঘটনাক্রমে আমিও সে দলে থাকি। আমরা শত্রুপক্ষের অনেক কাছাকাছি ছিলাম এবং শত্রুর পক্ষ থেকে তীব্র পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। খুব কাছেই উক্ত এলাকার সবচেয়ে বড় মার্কিন ক্যাম্প ছিল, যেখান থেকে আফগান আর্মির প্রতিরক্ষায় তৎক্ষণাৎ মর্টার শেলের লোকদের আসার আশঙ্কা ছিল। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ফায়ারিং দিয়ে অপারেশন শুরু হয়। বুলেটের গন্ধ পাওয়া মাত্রই শত্রুপক্ষের দিক থেকে গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হয় এতে সাথিদের মাটিতে শুয়ে পড়তে হয়; কিন্তু তিনি তখনও অবিচল থাকেন এবং অন্য সাথিদেরকে সাহস দিয়ে ফায়ারিং শেখাতে থাকেন। তীব্র গুলি বর্ষণের কারণে বাকি সাথিরা মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি

92 কমান্ডার ফয়সাল আব্দুল হাদী ঝিলাম শহরের অধিবাসী ছিলেন। রুশ
বিরোধী জিহাদের সময়ে আফগানিস্তানে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কাশ্মীর জিহাদে আত্মনিয়োগ করে কাশ্মীরের প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ সালে ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন এবং পাকিস্তানি একটি গ্রুপের নেতৃত্বদান করেন। উন্নত চারিত্রিকতা, বীরত্ব, মেধা ও সাদাসিধে জীবনের কারণে তিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ২০০৮ সালে আফগান আর্মির এক ক্যাম্পে হামলার সময় আমেরিকার বোমাবর্ষণে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন আমিন!!

[638]

দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঠিক করেন এবং একেক জন সাথিকে ডেকে তাকে দিয়ে ফায়ারিং করান।

অপারেশনে রেকি বা শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল শহীদ ডক্টর সার বুলন্দ যুবায়ের রহিমাহুল্লাহর। তাকে একটি উঁচু পাহাড়ে বসানো হয়েছিল। সেখান থেকে ওয়ারলেসের সাহায্যে অবশিষ্ট সাথিদেরকে তিনি গোলার আঘাতস্থল সম্পর্কে বলছিলেন। অপারেশনের কিছু সময় পর আমেরিকান সৈন্যরা শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে আমাদের ওয়ারলেস সিস্টেম জ্যাম করে দিতে শুরু করে। শব্দ তরঙ্গের কারণে ডক্টর সাহেবের আওয়াজ তেমন বোঝা যাচ্ছিলো না— যখন তিনি বলে যাচ্ছিলেন, আমাদের গোলাগুলো শত্রু শিবিরে কোথায় আঘাত হানছে? অগত্যা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ অনুমান করে গোলা বর্ষণ করতে থাকেন। অবশ্য তিন চার গোলা ফায়ারিং করার পর ডক্টর সাহেব রহিমাহুল্লাহর এতটুকু আওয়াজ বোঝা যায়, deadly accurate (এককদম ঠিক) এরপর ওয়ারলেস সংযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আমাদের পক্ষ থেকে অল্প কিছু গোলা বর্ষণের পরেই আমেরিকান সেনারা আর্টিলারির মাধ্যমে বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। আমরা কল্পনাও করতে পারিনি, বোম্বিং এতটা তীব্র হবে। মনে হচ্ছিলো, আকাশ থেকে মর্টার শেলের বৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি দুই কদম পরপর গোলা ফাটতে থাকে, গাছের ডাল ভাঙতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুজাহিদীনকে হেফাযতে রাখেন। তারা নিশ্চিন্তে কাজ সম্পন্ন করে আমীর সাহেবের নির্দেশে ফেরার প্রস্তুতি নেন। এখন সমস্যা দেখা দেয়, ফিরতি পথে যখন পাহাড়ে চড়তে হবে, তখন আমরা শত্রুর ক্যাম্পের একেবারে বরাবর হয়ে যাই। যদিও পরিকল্পনা ছিল, আমরা মাগরিবের পর ফিরতি পথ ধরবো, যেন অন্ধকারে শত্রুপক্ষ আমাদেরকে দেখতে না পায়; কিন্তু শত্রুরাও জেনে গিয়েছিল, ফেরার পথ একটাই। [639]

এ কারণে তারা অস্ত্র তাক করে ওই পথে ফায়ার ও বোমা বর্ষণ করতে থাকে। তখন হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের পাহাড়ে উঠতে হয়। সে সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে সাহস দিতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে পেছাতে থাকেন। এক জায়গায় গিয়ে তিনি থেমে যান এবং বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বাকি সাথিরা না আসবেন এবং সবাই ভালো আছেন কিনা জানতে না পারবো, ততক্ষণ আমি ফিরে যাবো না। কিছু ভাই বারবার বললেন ফিরে যাওয়ার জন্য, এখানে দাঁড়িয়ে কি লাভ? কিন্তু তিনি বোমা বর্ষণের ভিতরেও সেখান থেকে সরতে চান না; বলেন— যদি কোন সাথির আমাদেরকে প্রয়োজন হয়, এজন্য আমি এখানেই থাকবো। ফেরার সময় পথেই অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত বোম্বিং হয়। এর মধ্যেই ভাইয়ের প্রিয় সাথি ভাই দাউদ গৌরী হাফিযাহুল্লাহ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সংবাদ আসে। অপারেশন ক্যামেরা বন্দী করার জন্য তাকে শত্রুপক্ষের কাছাকাছি একটি পাহাড়ে বসানো হয়েছিল; কিন্তু ফেরার সময় অন্ধকারের কারণে তিনি সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারেননি। সে সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ পুনরায় ক্যাম্পের কাছাকাছি সাথিদেরকে খোঁজার জন্য যাত্রার প্রস্তুতি নেন। সাথিরা তাকে বাধা দিতে চায় কিন্তু তিনি কারও কথা শুনতে চান না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ওই ভাই তখনই রাস্তা খুঁজে খুঁজে আমাদের কাছে চলে আসেন।

টিয়ারজা কেল্লায় প্রথম হামলা
২০০৯ সালে ওয়ানায় সেনাবাহিনীর অপরাধ এবং তাদের সাহায্যে পরিচালিত ড্রোন হামলাগুলোতে মুজাহিদীনের শাহাদাতের পর ওয়ানা ডেরা ইসমাইল খান রোডের উপর একটি স্কুলে স্থাপিত নাপাক আর্মির টিয়ারজা নামক ক্যাম্পে হামলার পরিকল্পনা করা

[640]

হয়। এই অপারেশনের আমীর ছিলেন মাহবুবুল মুজাহিদীন উসামা আজমরায়ে কেনী রহিমাহুল্লাহ।

অপারেশনে মুজাহিদীন সফলভাবে ক্যাম্পের অন্তর্গত মোর্চাগুলো ধ্বংস করেন এবং আক্রমণকারী প্রথম দল ক্যাম্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ইনগিমাসী (ফেরার আশা ছেড়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে যারা হামলা চালায়) ওই দলে পাঁচজন ছিলেন। শায়খ আজমরায়ে রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি পাগলের মতো ক্যাম্পের ভেতর ফায়ার করতে করতে ভেতরে ঢুকে যান এবং কাপুরুষ কয়েক পয়সার ভাড়াটে সৈন্যরা দৌড়ে দৌড়ে ভূগর্ভস্থ বাংকারে ঢুকে যেতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘযুদ্ধের ফলে তখন পর্যন্ত তাদের সকলের কাছে অস্ত্রের মজুদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তাই এক ভাই তার গ্রেনেড বাংকারের দিকে নিক্ষেপ করে কিন্তু ঘটনাক্রমে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাহিরে পড়েই ফেটে যায়। এর ফলে পাঁচজন সাথি মারাত্মক আহত হন এবং অগত্যা তাদের ফিরে আসতে হয়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজেও আহত ছিলেন। তিনি সম্ভবত পায়ে এবং কোমরে আঘাত পেয়েছিলেন। এই অপারেশনে তিনি পুরোপুরি ফিদায়ী পন্থায় যুদ্ধ করেছিলেন।

টিয়ারজায় দ্বিতীয় হামলা
প্রথম হামলার কিছুদিন পর এক মার্কিন ড্রোন হামলায় মাহবুবুল মুজাহিদীন শায়খ আজ-মরায়ে কেনী রহিমাহুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। তারপরে সৌদি আরবের মুজাহিদ শায়খ ফাতেহ শাহরী রহিমাহুল্লাহ তানজীমের পক্ষ থেকে সামরিক দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। শায়খ ফাতেহ রহিমাহুল্লাহ আসামাত্রই দ্বিতীয়বার ওই ক্যাম্পে হামলার প্ল্যান করেন। ওই হামলায় একটা ফিদায়ী ট্রাক ব্যবহারের [641]

সিদ্ধান্ত হয়। প্ল্যান ছিল প্রথমে রাতের অন্ধকারে মুজাহিদীন ক্যাম্পের দেয়ালের কাছে গিয়ে বসে পড়বে। তখন একজন ফিদায়ী সাথি বারুদভর্তি ট্রাক নিয়ে দীনের দুশমন সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের দেয়াল ভেঙে ঢুকে যাবে। এরপর আক্রমণকারী মুজাহিদীন কেল্লায় প্রবেশ করে অবশিষ্ট সেনাদেরকে নির্মূল করবে।

প্ল্যানিং থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত এই অপারেশনে শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। লাল মসজিদে নিষ্পাপ বাচ্চাদের হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার নেশা তার ওপর ভর করে। ক্যাম্পের কাছাকাছি ঘর-বাড়ির লোকদেরকে সন্ধ্যার সময় ঘর থেকে বের করে আনা হয়, যেন বারুদ বিস্ফোরণে তাদের কোনো ক্ষতি না হয়। অপরদিকে মুজাহিদীন রাতের অন্ধকারে রওয়ানা করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আগে আগে চলছিলেন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে সাথিদেরকে পথ প্রদর্শন করতে থাকেন। তার সঙ্গে তার প্রিয়ভাজন মুয়াওয়াজ (জাওয়াদ আরিফ) রহিমাহুল্লাহও চলছিলেন। চাঁদনী রাতে তার চেহারা উদ্দীপনা ও সাহসিকতার দরুন চমকাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিলো। তিনি সাথিদেরকে অধিক মাত্রায় যিকির করতে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নসীহত করে যাচ্ছিলেন। শায়খ ফাতেহ শাহরী রহিমাহুল্লাহ অপারেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সকলের মনোবল চাঙ্গা ছিল এবং জবানে আল্লাহর যিকির ও দরূদ জারি ছিল।

মুজাহিদীন যথাস্থানে পৌঁছে যান কিন্তু ফিদায়ী ট্রাক তখনও পৌঁছায়নি। যোগাযোগের দায়িত্ব ছিল ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর। তিনি বারবার জোর দিয়ে ট্রাকের ভাইদেরকে বলে যাচ্ছিলেন দ্রুত করুন কিন্তু তারা বিলম্ব করে। পরবর্তীতে জানা যায়, স্থানীয় কেউ সূত্রহীন তথ্য দিয়েছে যে, শত্রু অপারেশনের কথা টের পেয়ে গেছে। শত্রুরা [642]

প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে, এ কারণেই ট্রাক প্রেরণের দায়িত্বে থাকা ভাইয়েরা ট্রাক পাঠাচ্ছেন না। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাদের সামনেই ওয়ারলেসে সাথিদেরকে বললেন এটা গুজব আর কিছু নয়। আপনি সাহস করুন এবং কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু স্থানীয় সাথিরা অস্বীকৃতি জানায়। ফেরার পথে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, সাথিরা কেন ট্রাক পাঠালেন না? পরবর্তীতে জানা যায়, ওই তথ্যের কোনো বাস্তবতা নেই, সেটা গুজব ছিল। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তাই সাথিদের ওপর খুবই রাগান্বিত হন। পরের দিন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য একটি বৈঠক হয়। সেখানে এক ভাই সরল মনে বলেন, রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, যা এভাবে বিশ্লেষণ করেছি যে, আমরা বিপদে পড়তে যাচ্ছিলাম কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করেছেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আগে থেকেই সাথিদের ভুলে বিরক্ত হয়ে বসে ছিলেন। তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, হযরত স্বপ্নের ভিত্তিতে সামরিক সিদ্ধান্ত চলে না। পরিষ্কার বলা উচিত, কেউ কেউ ভয় পেয়ে গেছেন, যার কারণে মিশনটি সফল হলো না।’ উপস্থিত সাথিদের মধ্যে যুদ্ধের উত্তেজনায় সবচেয়ে উদ্বেলিত ছিলেন ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং মিশন ব্যর্থ হবার কারণে তিনি সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। সেদিনই আমরা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সাহসিকতা ও বীরত্ব সঠিকভাবে অনুমান করতে পেরেছিলাম।

[643]

একাদশ অধ্যায়: দাওয়াতী ও
মিডিয়া কার্যক্রম

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের অনন্য দিক হলো: তিনি একজন দীনের প্রচারক ও জিহাদের দাঈ ছিলেন। তিনি ১৫ বছর বয়স থেকে শাহাদাতের আগ পর্যন্ত দীন প্রচারের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তার অন্তরে দীনের একজন দাঈর অস্থিরতা এবং এ কাজের জন্য বাস্তবেই প্রাণ উৎসর্গের অনুপ্রেরণা ছিল। জিহাদের দাওয়াত বিস্তারের জন্য বিভিন্ন উপায় মাধ্যম ব্যবহার করে নিজ বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতেন তিনি। সকল দাওয়াতী কাজের পর মধ্যরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে এই দাওয়াত আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার এবং মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য হবার দোয়া করতেন। আমার মতে ওই সময়ে উর্দু ভাষায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সবচেয়ে বড় দাঈদের তিনি একজন ছিলেন।

উস্তাদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রমের বিস্তারিত আলাপ ছাড়া আমাদের শহীদ ভাইয়ের জীবনী পূর্ণাঙ্গতা পেতে পারে না। অতঃপর এই মিডিয়াই শহীদ উস্তাদ রহিমাহুল্লাহর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারকারী অবদান। তাই এই পর্যায়ে বিশদভাবে শহীদ রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রম আলোচনা করা উচিত।

এরপর মনে রাখতে হবে শহীদ ভাই শুধু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দাঈই ছিলেন না; বরং এই অঙ্গনের সংস্কারক অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। এজন্য তার মিডিয়া অঙ্গনের অবদান শুধু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দাওয়াতের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং মুজাহিদীনের সংশোধন ও নৈতিক দীক্ষার জন্য

[644]

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের বিষয়গুলো নিয়েও তিনি দাওয়াতী কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এছাড়াও মুজাহিদীনের শরীয়াহ শিক্ষা প্রসঙ্গেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল মিডিয়া ক্ষেত্রে। এ কারণে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এ অংশগ্রহণের পর তাঁর দাওয়াতী দিকগুলোকে এক নজরে আমরা এভাবে দেখতে পাই:

** জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দাওয়াত

** মুজাহিদীনের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক গঠন

** মুজাহিদীনের শরীয়াহ ও চিন্তাগত গঠন

** শত্রুদের প্রোপাগান্ডার জবাব

এক কথায় শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জিহাদী দাওয়াতের সব অঙ্গেই অবদান রাখেন। একদিকে যেমন তিনি জিহাদ বিমুখ হযরতদেরকে দাওয়াত দেন, অপরদিকে তিনি মুজাহিদীনকেও দীনী বিধি-বিধান ও জিহাদের আদব শিষ্টাচার শেখাতে অবদান রাখেন।

আকাবিরদের দিকনির্দেশনা: দাওয়াত ও মিডিয়া অঙ্গনে
শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যৌবনের শুরু থেকেই দাওয়াত ইল্লাল্লাহর কাজে মশগুল ছিলেন। জিহাদে অংশগ্রহণের পর বিভিন্ন কেন্দ্রে সাথিদের মাঝে ও আনসারদের কাছে তিনি ইনফিরাদী (ব্যক্তিগতভাবে) দাওয়াতী কাজ করেন। কিন্তু দাওয়াতের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা, মিডিয়াতে এসে পাকিস্তানের মুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো এই কাজগুলো জিহাদী অঙ্গনের নেতৃবৃন্দের নির্দেশেই তিনি শুরু করেন। মিডিয়াতে এসে পাকিস্তানে দাওয়াতী দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে শুরুতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত

[645]

ছিলেন। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তিনি না নিজেকে মুজাহিদীনের প্রতিনিধিত্বের যোগ্য মনে করেন, আর না তার এই আগ্রহ ছিল। তিনি শুরুতে বড়দের এই নির্দেশের ব্যাপারে টালবাহানা করতে থাকেন। অবশেষে কায়েদে জিহাদ, মুজাহিদীনের রাহবার শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ এবং আমীরুল মুজাহিদীন শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে মিডিয়ায় এসে মুজাহিদীনের প্রতিনিধিত্ব করার এবং উর্দু ভাষায় জিহাদের দাওয়াত বিস্তারের অকাট্য নির্দেশ দেন। এই অবস্থায় তাঁর আর পিছু হটার কোনো পথ ছিল না। কায়েদে জিহাদ আইমান রহিমাহুল্লাহ এক চিঠিপত্রে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে মুজাহিদীনের মিডিয়া সংগঠিত করার এবং দাওয়াতের জন্য নিজেকে উপস্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে বলেন: « জনসাধারণের মাঝে দাওয়াত বিস্তার সীমাহীন জরুরি। এমনিভাবে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এমন ধারাবাহিক বয়ান জারি রাখা জরুরি, যা এই শাসন ব্যবস্থার জুলুমের পর্দা ছিন্ন করবে; স্পষ্ট করে দেবে, তাওহীদের আকীদা ও একত্বের বিশ্বাস লঙ্ঘন করা এবং শরীয়তের শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করাই এই শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এভাবে জনসাধারণের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা জরুরি। আপনি জানেন না, জনসাধারণ কবে বিপ্লবে ফেটে পড়বে? বিপ্লব ইন্ধন ডিপোর মতো, যা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় থাকে। কখনও কখনও এমন হয়, আপনি জ্বালানি ডিপোতে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কিছু নিক্ষেপ করলেন কিন্তু ডিপো বিস্ফোরিত হলো না। আবার কখনও সাধারণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারাই গোটা ডিপো আগুনে ভরে যায়। মিশরে যা কিছু হয়েছে তা এ বিষয়ের বড় উদাহরণ। কেউ চিন্তা করতে পারছিল

[646]

না, ২৫ শে জানুয়ারির বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তীকালের এত বড় ধামাকার কারণ হবে। এ কারণে ধারাবাহিক উৎসাহ দান জরুরি। স্কুলে থাকতে ফরাসি বিপ্লব বিশ্লেষণে একটি বাক্য আমি মুখস্থ করেছিলাম: “অত্যাচার বিপ্লব জন্ম দেয় না বরং অত্যাচারের অনুভূতি বিপ্লব জন্ম দেয়।” মুজাহিদীনের জন্য পাবলিক স্পিকিং-এর যোগ্যতা অর্জন করা অতি জরুরি। এতে বিপ্লবী মহান দৃষ্টিভঙ্গি সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা যাবে, যা সকলেই বুঝবে। আহলে বালাগাতদের (ভাষা অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ) মতে একে সাবলীল ও অকাট্য শৈলী বলা হয়। »

শায়খ আয-যাওয়াহিরী তার এক পত্রে আরও লিখেছেন:

« আমি আবারও প্রশ্ন করতে চাইবো, পাকিস্তানি জনসাধারণের মাঝে জাগরণ তৈরি, নৈতিকতার উন্নতি সাধন, বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিতকরণ ইত্যাদি কাজে মুজাহিদীনের অবদান এত দুর্বল কেন? কি কারণে এখন পর্যন্ত দাওয়াতী উপাদান সমৃদ্ধ ধারাবাহিক ক্লাস সামনে এলো না? কেন এমন দাঈ দেখতে পাই না, যারা দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য প্রকাশ্যে আবির্ভূত হবে? এই দাঈগণ শুরু থেকে প্রসিদ্ধ না হলেও কমপক্ষে টকশো'র মাধ্যমে মস্তিষ্ক বিহীন আয়োজক ও সেকুলার সাংবাদিকদের চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী তথ্য প্রমাণ দিয়ে কথা বললে এবং সঠিক চেতনা বিশ্বাসের অধিকারী হলে ধীরে ধীরে তারা পরিচিতি লাভ করবে। মুজাহিদীন এমন তিনজন চারজন দাঈ কেন তৈরি করতে পারলেন না, যারা নিরাপত্তার চিন্তা বাদ দিয়ে দাওয়াত পেশ করবেন এবং পাকিস্তানি মুসলিমদের সামনে বাস্তবতা তুলে ধরবেন? এমন কেন হলো না যে, মুজাহিদীন মাসে একটা হলেও তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক দাঈর বয়ান রিলিজ করবে, যেখানে

[647]

বাস্তব অবস্থা, তথ্য-প্রমাণ ও ঘটনা প্রবাহের সাহায্যে সরকার ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সমালোচনা করবে। স্মরণ রাখতে হবে, সর্বব্যাপী বিপ্লবের জন্য উত্থিত কোনো জিহাদী আন্দোলনের সামরিক কার্যক্রমের আগে দাওয়াতী ও চিন্তাগত রণাঙ্গন দখলে নিতে হয়। অতঃপর উভয় যুদ্ধক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। »

জিহাদী আমীরদের নির্দেশ পালনে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ২০১০ সালে পাকিস্তানে দাওয়াত ও মিডিয়া অঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও এর আগেই তার বিভিন্ন বয়ান বক্তৃতা ও ক্লাস রিলিজ হতে শুরু করেছিল।

উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রমের পর্যালোচনার জন্য আমরা তার কীর্তিগুলো দুইভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম অংশে ঐ সমস্ত বুনিয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার পরিচয় পেশ করতে পারি, যা তার দাওয়াতের সারবস্তু ছিল।

দ্বিতীয় অংশে ঐ সমস্ত উপায় মাধ্যমের আলোচনা যেগুলো ব্যবহার করে তিনি দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রম বেগবান করেছেন।

ক - দাওয়াতের বুনিয়াদি বিষয়বস্তু

দীনের একজন প্রচারক হিসেবে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে ছিল কুরআন হাদীসের দাওয়াত। তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে দীনে প্রবেশের আহ্বান জানাতেন। কিন্তু বিশেষভাবে যেহেতু তিনি জিহাদের আহ্বায়ক ছিলেন, তাই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ওই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলা উচিত, যা তার বুনিয়াদি বিষয়বস্তু ছিল। সমস্ত [648]

বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা কঠিন , কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ -এ অংশগ্রহণের দাওয়াত

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী কার্যক্রমের বুনিয়াদি পয়েন্ট ছিল মুসলিম উম্মাহকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রতি আহ্বান করা। তিনি সেই মহান কাজ করতে চাইতেন , যার নির্দেশ আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ

অর্থ “হে নবী ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করুন। ” [সূরা আনফাল, ০৮: ৬৫]

তিনি যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের মহান কাজে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয ’ পুস্তকখানা অনুবাদ করেন। অনুবাদটি আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে কবুল করেন এবং জিহাদের দাওয়াতে এই কিতাব খুব দ্রুতই অবদান রাখে। কত যুবক জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে অংশগ্রহণ করে ফিদায়ী হামলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন , যারা এই কিতাবের মাধ্যমেই এ পথে এসেছেন!

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন , জিহাদের জন্য বের হওয়া আমাদের উপর ফরয এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য জরুরি যে , আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব আমরা পালন করবো। তিনি মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের দাওয়াত দিতে গিয়ে এই আমলের সুফলগুলো গণনা করে লিখেন :

« জিহাদ গাফিল মুসলিমদের দিশা লাভের উপায়। জিহাদ পরিবার গোত্র ও সমাজে অকল্পনীয় পরিবর্তনের মাধ্যম। জিহাদ কাফেরদের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর কার্যকরী মাধ্যম। জিহাদ নৈতিক গঠন ও উন্নয়ন সাধনের বিদ্যালয়। জিহাদ ও রিবাতের ভূমিতে বসবাসকারীদের পথপ্রদর্শনের মাধ্যম জিহাদ। জিহাদ হারানো অধ্যায়গুলো পুনর্জীবনের উপায়।

93 »

তিনি একটি অডিও বয়ানে মুসলিমদের অধিকৃত ভূখণ্ড ফিরিয়ে এনে সেগুলোতে পবিত্র শরীয়ত বাস্তবায়নে জিহাদ ফরয হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

« আমরা বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন নয় যে, জিহাদ বর্তমানে ফরযে আইন নাকি ফরযে কেফায়া? মুসলিমদের টুকরো টুকরো ভূমি শুধু নয়; শত শত বর্গমাইল ভূমি কাফেরদের দখলে, শুধু আজ থেকে নয় কয়েক শতাব্দী ধরে এমনটা চলে আসছে; ঠিক সে সময় থেকে যখন আন্দালুস (স্পেন) থেকে পূর্ব তিমুর পর্যন্ত আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে; ইথিওপিয়া থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এই সকল ভূমি যতদিন পর্যন্ত পুনরুদ্ধার হবে না; যতদিন পর্যন্ত এসব ভূখণ্ডে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়িত হবে না, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন। এটা শুধু আফগানিস্তান ইরাক বা অন্য কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং বার্মা এক সময় মুসলিমদের অঞ্চল ছিল আজ কাফেরদের দখলে। গোটা হিন্দুস্তান ইসলামের অধীনে ছিল আজ কাফেরদের দখলে; এটা শুধু কাশ্মীরের সমস্যা নয়; এটা গোটা ভারতবর্ষের প্রশ্ন। এমনিভাবে ফিলিপাইনের কিছু এলাকা মুসলিমদের ছিল, আজ

93 উস্তায আহমদ ফারুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ‘এক হাতে কুরআন এক হাতে তলোয়ার’]

[650]

কাফেরদের দখলে। পূর্ব তিমুর আমাদের চোখের সামনে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। মুসলিমদের থেকে নিয়ে কাফেরদের হাতে দেয়া হয়েছে। এই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা ফরযে আইন। এমনিভাবে আফগানিস্তান পুনরুদ্ধার করাও ফরযে আইন। শিশান কাফেরদের দখলমুক্ত করা ফরযে আইন। অর্ধেক ফ্রান্স পর্যন্ত ইউরোপের পুরা অংশ পুনরুদ্ধার করা ফরযে আইন। বসনিয়া এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করা ফরযে আইন। মুসলিম শাসনাধীনে থাকা আফ্রিকার ওই পুরো অংশ— বিশেষভাবে উত্তরাংশ পুরোটুকু পুনরুদ্ধার করা ফরযে আইন। এই সকল ভূখণ্ড যতদিন পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা না হবে ; মস্কো যতদিন পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্যকে জিযিয়া না দেবে ; যতদিন পর্যন্ত গোটা আন্দালুস পুনরুদ্ধার করা না হবে , ততদিন পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন। » [সূত্র : আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর অডিও বয়ান : [illegible]- حـتى لا تكـون فتنة অর্থ : যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা নির্মূল না হয় ..]

পাকিস্তানে জিহাদ ফরয ...

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রমের বড় অংশ পাকিস্তান জিহাদের দাওয়াত নিয়ে। পাকিস্তান জিহাদের সঙ্গে তার গভীর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তার দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু প্রিয় মাতৃভূমির উপর চেপে বসা বাতিল শাসকবর্গের পতন ঘটিয়ে পবিত্র শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল। এই লক্ষ বাস্তবায়নে তিনি নিজের ক্লাস ও দাওরাগুলোর মাধ্যমে সুস্পষ্ট করেছেন যে , আমাদের শাসকবর্গ শরীয়ত বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং কাফেরদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার কারণে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। তাই এই শাসকবর্গকে হটিয়ে

সৎকর্মশীল প্রকৃত মুসলিমদের হাতে শাসন ক্ষমতা দেয়ার জন্য বাস্তবেই জিহাদ করা পাকিস্তানিদের দায়িত্ব। তিনি তার অধিকাংশ দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রমে পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার এবং শাসকেরা আল্লাহর দীনের বিদ্রোহী জালেম অত্যাচারী হবার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

ওঠো, জালিমকে প্রতিহত করো
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে শরীয়াহ শাসন ব্যবস্থার দাওয়াত দিয়ে এক বয়ানে বলেন:

« সময় হয়ে এসেছ। এখন আমরা চোখ খুলবো। বাস্তবতার মুখোমুখি হবো। পশ্চিমা বিশ্বের প্রদত্ত অত্যাচারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে তদস্থলে শরীয়তের ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা চালু করবো। মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবো। এই শাসন ব্যবস্থায় কোনো মানুষ কোনো মানুষের গোলাম নয়। সাধারণ মানুষ থেকে খলীফা পর্যন্ত সকলেই আল্লাহর আইনের সামনে নতজানু। সকলেই জবাবদিহিতা করতে বাধ্য। এই ব্যবস্থায় সকলের শরীয়াহ প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষিত। দুর্বল শ্রেণি এখানে নিরাপদ। অভাবগ্রস্তের খেয়াল রাখা এখানে বিহিত। ঈমানদার সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ এখানে সম্মানিত এবং পাপাচারী চোর লুটেরা শ্রেণি এখানে বিচারের মুখোমুখি। এই ব্যবস্থার নাম শুনে আমেরিকা নিজেও এবং তার স্থানীয় গোলামেরা প্রকম্পিত। » [সূত্র অধ্যাপক আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর অডিও বয়ান, শিরোনাম: বাদশাহদের নয় আল্লাহর এই জমিন]

[652]

পাকিস্তান জিহাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন

শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ প্রিয় মাতৃভূমি জবরদখলকারী শাসকবর্গের পতন ঘটানোর দাওয়াত দিতেন। এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রিয় মাতৃভূমির মুসলিমদেরকে বলতেন, যেন তারা মুজাহিদীনকে সম্ভাব্য সর্বপন্থায় সাহায্য করে।
তিনি বলেন :

« ভয় -ভীতির চাদর থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য। আখিরাতকে দুনিয়ার চেয়ে প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে আমাদের অন্তর কাঁপিয়ে প্রশ্ন করেছেন

أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

অর্থ : “তোমরা তাদেরকে ভয় পাচ্ছো অথচ আল্লাহ বেশি হকদার যে , তোমরা তাকে ভয় করবে — যদি তোমরা ঈমানদার হও। ”

তাই এই দেশের প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য হলো , আমেরিকার গোলামদের থেকে মুক্ত হয়ে শরীয়ত বাস্তবায়নের পবিত্র আন্দোলন ও সংগ্রামে মুজাহিদীনকে পৃষ্ঠপোষকতা করা , নিজেদের ঘরের দরজা তাদের জন্য খুলে দেয়া , অর্থ সম্পদ দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করা , নিজেদের সন্তানদেরকে এই পথে উৎসর্গ করা, শত্রুর ব্যাপারে মুজাহিদীনের কাছে তথ্য সরবরাহ করা, পরামর্শ , জ্ঞান -বিজ্ঞান , শিল্প দক্ষতা দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করা এবং নিজেদের দোয়াতে তাদেরকে শামিল রাখা। এই অঞ্চলের প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হলো , পাকিস্তানের মুসলিমদের কাঁধে চাপানো ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা পতনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা , যেন বিগত ১০ বছরে গোটা বিশ্বের মুহাজির মুজাহিদীনের সঙ্গে , আরব-অনারব মেহমানদের কারণে আমাদের অঞ্চলে যেই আধিক্য দেখা দিয়েছে , যে কষ্ট হয়েছে , তার ক্ষতিপূরণ যেন সাধিত হয়। এই ভূখণ্ড পুনরায় যেন গোটা বিশ্বের

মুসলিমদের জন্য, সমস্ত অঞ্চলের মুজাহিদীনের জন্য ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের জন্য একটি নিরাপদ কেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল হতে পারে। » [সূত্র অধ্যাপক আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর অডিও বয়ান, শিরোনাম: বাদশাহদের নয় আল্লাহর এই জমিন]

পাকিস্তান জিহাদ আফগানিস্তান জিহাদেরই পরিশিষ্ট
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে দিনের আলোর
মতো পরিষ্কার বিষয় ছিল এই যে, পাকিস্তান জিহাদ আফগানিস্তান জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি মনে করতেন, পাকিস্তানিদের জন্য আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহ ও তালেবানকে সহায়তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হচ্ছে পাকিস্তানি বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। কারণ এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে সরকার প্রতিবার আফগানিস্তানের মুসলিমদের পিঠে ছুরিকাঘাত করে এবং দীন ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তিনি মনে করেন, পাকিস্তানি ইসলাম বিদ্বেষী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সফল জিহাদের দ্বারাই আফগানিস্তানে একটি শক্তিশালী ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন কক্ষে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখুন্দের বেদনাদায়ক ঘটনার বয়ানে বলেন: « বাস্তবতা হলো, ফৌজি জেনারেলরা আফগানিস্তানে জিহাদরতদের প্রতি ততটাই বিদ্বেষ পোষণ করে, যতটা করে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের প্রতি। পাকিস্তান অথবা পাকিস্তানিদের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। পাকিস্তানি জনসাধারণের দীন দুনিয়ার কল্যাণ নিয়ে তাদের

[654]

কোনো চিন্তা নেই। তাদের শত্রুতা এমন ব্যক্তিদের প্রতি, যারা আল্লাহ ব্যতীত কারও সামনে নত হতে তৈরি নয় এবং ফিরিঙ্গিদের আইন-কানুন ও গণতান্ত্রিক অসার শাসন ব্যবস্থার বদলে যারা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন আল্লাহর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অতএব মুজাহিদ আফগানি হোক অথবা পাকিস্তানি, আরব হোক কিংবা শিশানি —সকলকেই এই জেনারেল শত্রু মনে করে এবং তার মনিব আমেরিকা হোক অথবা ব্রিটেন, চীনা হোক, অথবা রাশিয়া —সকল কাফের গোষ্ঠীর সহায়তা করা ও স্বার্থ রক্ষা করাকে এই সেনাবাহিনী নিজেদের কর্তব্য মনে করে। » [মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখুন্দ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর বিবৃতি]

পাকিস্তানি সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখুন্দ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন: « এই ঘটনায় এই শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, পাকিস্তান জিহাদ আফগানিস্তান জিহাদেরই পরিশিষ্ট, একটি অপরটির সম্পূরক। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পরাজিত করা না হবে এবং ফিরিঙ্গিদের এই নিকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা মূলোৎপাটন করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আফগানিস্তানে একটি বিশুদ্ধ নির্মল শরঈ ইমারা প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে থাকবে। তারা ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। তাই পাকিস্তানের এই শাসন ব্যবস্থার শিকড়ে হানা প্রতিটি আঘাত প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানের জিহাদকে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান ও প্রতিরক্ষার মাধ্যম হবে » [মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখুন্দ রহিমাহুল্লাহর

[655]

শাহাদাতে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর বিবৃতি]

তিনি বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান জিহাদ আফগানিস্তান জিহাদেরই সহায়তার মাধ্যম। তিনি বলতেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোতে ক্রমাগত হামলার পরেই পাক সরকার বাধ্য হয়েছে আফগানিস্তানের মুজাহিদীন থেকে অত্যাচারী হাত তুলে নিতে। এভাবেই পাকিস্তানের জিহাদ আফগানিস্তান জিহাদের অংশ বলে প্রমাণিত হয়। এক ইন্টারভিউতে তিনি বলেন: « মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্তের কারণে পাক সেনা কর্তৃক ইমারত ইসলামিয়াকে দুর্বল করার অপচেষ্টা প্রথমবারের মতো বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে দুই আড়াই বছর পর আজ আমরা প্রথমবার এই বাস্তবতা লক্ষ্য করছি যে, পাকিস্তানি সরকারের এখন বুনিয়াদি চিন্তার বিষয় হচ্ছে— করাচি, লাহোর পিন্ডি ও ইসলামাবাদের গোপন সংস্থাগুলোর কেন্দ্রগুলোতে, সেনাবাহিনীর অধিদপ্তরে এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের ওপর হামলা কিভাবে বন্ধ করা যায়। এখন তার চিন্তা জগত থেকে সাময়িকভাবে আফগানিস্তানকে কোণঠাসা করার অভিলাষ দূর হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ সকলেই এই বিষয়ের সাক্ষী যে, বিগত দুই বছরে কত দ্রুততার সাথে আফগানিস্তানে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ এগিয়েছে, সেখানকার জিহাদে কতটা ঊর্ধগতি এসেছে। তাই এমনটা বলা সঠিক হবে না যে, এখানে ফ্রন্ট খোলার দ্বারা ওখান থেকে মনোযোগ সরে গিয়েছে। মনোযোগ সরেনি বরং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের কারণে আফগানিস্তানে জিহাদ শক্তিশালী হয়েছে এবং মুসলিম শিবিরের পেছন দিক নিরাপদ হয়েছে। আল্লাহর দয়া অনুগ্রহে এই লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে অর্জন হয়েছে বলে আমরা অনুভব করছি। » [উস্তাদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বয়ান: ‘পাকিস্তানে জিহাদ কেন?’]

[656]

পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের দাওয়াত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে সেনাবাহিনীর পরিবেশ পরিচিত। তিনি এমন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, যা সেনাবাহিনী গঠনকারী অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল। সেখানে শৈশবকাল থেকেই সমাজে বিদ্যমান শত শত সদস্যের কারণে সেনাবাহিনীর পরিবেশের সঙ্গে সকলেই পরিচিত হয়ে উঠতো। অতঃপর ক্যাডেট কলেজে শিক্ষা গ্রহণের কারণেও সেনাবাহিনী ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন আচারে ইংরেজ প্রভাব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। এ কারণে শুরু থেকেই তিনি নিশ্চিত ছিলেন, এরা আর যাই হোক ইসলাম ও মুসলিমদের সেনাবাহিনী নয়। »

সকল অনাচারের জন্য সেনাবাহিনী দায়ী
উস্তাদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে স্পষ্ট ছিল, পাকিস্তানে কার্যত ক্ষমতাসীন হল সেনাবাহিনী। রাজনীতিবিদদেরকে তিনি সেনাবাহিনীর সেবক মনে করতেন কিন্তু মুসলিমদের আসল শত্রু ও সাপের মাথা এই সেনাবাহিনীকে বিবেচনা করতেন। তিনি বলতেন, এরাতো ওই বাহিনী, যারা আমেরিকা, ব্রিটেন ও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যিক চুক্তি করে, করায়। যুদ্ধ, যুদ্ধ বিরোধী শান্তিচুক্তি, সন্ধির পলিসি সেনাবাহিনী তৈরি করে এবং পরবর্তীতে রাজনীতিবিদগণকে শুধু স্বাক্ষর করার জন্য একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে ডাকা হয়। মুসলিমদের অধিকাংশ দেশে সেনাবাহিনী সরাসরি পশ্চিমাদের স্বার্থ রক্ষা করে যায় এবং তারাই মুসলিম দেশগুলোতে ক্রুসেডার জায়নবাদী স্বার্থের প্রকৃত রক্ষক। কারা সমুদ্রে মার্কিন নৌবহর, স্থলে মার্কিন ও ন্যাটো সাপ্লাই এবং আকাশপথের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাহায্যকারী? কারা পূর্ব পাকিস্তান ভেঙেছে? কারা বস্তাবন্দী

[657]

লাশ ও বিচার বহির্ভূত এনকাউন্টারের নাটক সাজায়? কারা দেশের নিষ্পাপ ভদ্র যুবকদেরকে গুম করে? কারা জাতীয় সম্পদের ৯০% রক্ষার নামে আত্মসাৎ করে জাতির অবশিষ্ট বড় অংশের দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের কারণ হয়? কাদের সংস্কৃতি হলো নাচ গান ঢোল বাজানো, মেয়ে নাচানো, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েদের সঙ্গে ড্যান্সিং নিজেদের স্ত্রীদেরকে সহকর্মীদের সঙ্গে বসতে দিয়ে গর্ব করা—এককথায় নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার আবিষ্কারক ও রক্ষক কারা? কারা নিজেদেরকে ছাড়া জনসাধারণ সকলকে বেওকুফ ও ‘ব্লাডি সিভিলিয়ান’ মনে করে? কারা নিজেদেরকেই দেশ ও রাষ্ট্র মনে করে এবং নিজেদের স্বার্থকেই দেশের স্বার্থ অভিহিত করে লুটপাট চালায়? কারা জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করে? কারা জনসাধারণের পয়সা লুট করে এবং নিজেদের দেশ উজাড় করে দেয়? কোন সমস্ত সংস্থার পাশবিক অমানবিক চরিত্রের কারণে সৌজন্যতা ও ভদ্রতার না কোনো আলাপ শোনা যায় তাদের মুখে, না কোনো চিহ্ন দেখা যায় তাদের আচরণে? কাদেরকে শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও প্রতারণা করতেই দেখা যায়। এক কথায় মুসলিম দেশগুলোতে সাধারণভাবে এবং প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তানে বিশেষভাবে সকল অনাচার ও অনিষ্টের জন্য দায়ী সশস্ত্র সেনাবাহিনী।

উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানি ফৌজ এবং সিকিউরিটি সংস্থাগুলোর অপরাধ গণনা করে বলেন: কথাবার্তা ও আবেগের স্থলে কাজ দেখাবার সময় এসেছে। পাকিস্তানি ফৌজ এবং গোপন সংস্থাগুলো এই দেশে মুসলিমদের মাথার উপর চেপে বসা খুবই নিকৃষ্ট কদাকার এক কলঙ্ক। তারা এই অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিমদের রক্ষক নয়; বরং তাদের রক্ত পিপাসু, অর্থ আত্মসাৎকারী এবং মান সম্মান পদদলনকারী। তারাই ওই দুর্ভাগা, যারা বাংলায় হাজার হাজার মুসলিম নারীর সম্মান পদদলিত করে। লাইনে দাঁড়

[658]

করিয়ে বাঙালি যুবকদেরকে গুলি করে হত্যা করে। ঢাকা সহ কত শহরে ভারী কামান দিয়ে গোলা বর্ষণ করে। বেলুচিস্তানের মুসলিমদের ওপর তারা জেট বিমান হেলিকপ্টার সহ এমন সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা করে, যেগুলো নিয়ে কোনো নিয়ম তান্ত্রিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়। সেগুলো তারা বেসামরিক নাগরিকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। তারা গোত্রীয় অঞ্চলের ঈমানী মর্যাদাবোধ সম্পন্ন জাতিগুলোকে নিঃশেষ করার জন্য আইপি ফকির রহিমাহুল্লাহর সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহুবার গোত্রগুলোর ওপর সৈন্যবাহিনী নিয়ে চড়াও হয় এবং তাদের এলাকাগুলো ধ্বংস করে দেয়। মালাকান্দ ও সোয়াতের উপত্যকা থেকে শরীয়ত বাস্তবায়নের যে আওয়াজ উঠেছে, তা নিস্তব্ধ করার জন্য বিগত তিন বছরে সময়ে সময়ে জুলুম-অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের এমন দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছে, যা নিকট অতীতে খুঁজে বের করা মুশকিল। তারা লাল মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, আজিমুশশান কুরআনের সম্মান পদদলিত করেছে, উলামায়ে কেরাম ও দীনি শিক্ষার্থীদেরকে হত্যা করেছে, নিষ্পাপ হিজাব পরিহিতা বোনদের রক্ত প্রবাহিত করেছে। তারা এই জাতির একজন পবিত্র কন্যা আফিয়া সিদ্দিকীকে সন্তান-সন্ততি সহকারে কাফেরদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা মোল্লা আব্দুস সালাম জয়ীফ, উস্তাদ ইয়াসির মোল্লা আব্দুল লতিফ হাকিমী এবং মোল্লা বেরাদার সহ ইমারতে ইসলামিয়ার একাধিক কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করেছে। এই হতভাগারা সুযোগ পেলেই পাকিস্তানের মুসলিমদের আশ্রয়ে বসবাসকারী মুহাজিরদেরকে ফিরিঙ্গি মুনিবদের সন্তুষ্টির জন্য গ্রেফতার করে শহীদ করে দিয়েছে।” [শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর বিবৃতি]

[659]

চেহারা নয়; সিস্টেম পরিবর্তন করো
ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ছিল যে, পাকিস্তানের কতক ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা না করার প্রশ্ন নয়; বরং এখানে সমষ্টিগতভাবে শাসন ব্যবস্থা ও সিস্টেম পরিবর্তনের প্রশ্ন। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজদের রোপিত এই নিকৃষ্ট বৃক্ষমূল উপড়ে ফেলা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দীন প্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টা সফল হতে পারবে না।

তিনি বলেন: “অতএব খুব ভালোভাবে অনুধাবন করা চাই, এটা সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ পরিবর্তনের প্রশ্ন নয়। কয়েকজন জেনারেলকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্যদেরকে ক্ষমতায় বসানোর দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। এখানে চেহারা ও বেশভূষা পরিবর্তনের প্রশ্ন নয় বরং মৌলিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রশ্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সিস্টেম হিসেবে এই শাসন ব্যবস্থা- ক্লাউসউইটজ (Clausewitz) এবং অন্যান্য কাফের চিন্তাবিদের কুফরী মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা সূরা তওবা ও সূরা আনফালের কুরআনী রূপ এবং হাদীস গ্রন্থগুলোতে জিহাদ ও সিয়ারের অধ্যায়গুলোর পরিবর্তে ইংরেজদের বই-পুস্তক থেকে গ্রহণ করা হবে, ততদিন পর্যন্ত এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থেকে ধারাবাহিকভাবে এমন সেনাবাহিনী ও অফিসার বের হবে, যারা দেশকে দীন ইসলামের উপর, বেতন ভাতাকে ঈমানের ওপর, প্রমোশনকে আত্ম মর্যাদার উপর এবং অফিসারদের হুকুমকে আল্লাহর হুকুমের উপর প্রাধান্য দেবে। তারা এই উম্মাহর নাজুক মুহূর্তে এভাবেই আল্লাহর দীনের ক্ষতি করবে —যেমনিভাবে তাদের বাপ দাদারা খেলাফতে উসমানিয়া পতনের সময় এবং ইমারতে

[660]

ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সময় করে এসেছে।” [শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর বিবৃতি]

এ সেনাবাহিনী ফিরিঙ্গিদের উপমহাদেশীয় রেজিমেন্টের ধারাবাহিকতা
উস্তাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানি মুসলিমদেরকে এ বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইতেন যে, পাকিস্তানি ফৌজ প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের জালিম সেনাবাহিনীরই ধারাবাহিকতা। এ বিষয়ে তিনি যুগান্তকারী গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যার শিরোনাম হচ্ছে ‘এ্যা কিস কি ফৌজ হ্যায়?’ (এরা কাদের সেনাবাহিনী?) সে প্রবন্ধে তিনি পাকিস্তানি সমাজে এই অপবিত্র সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কলমে লিখিত এই প্রবন্ধ ইতিহাস নিয়ে তার বিস্তারিত ও গভীর গবেষণা, তার আলোকে সমকালীন ঘটনা প্রবাহের সঠিক বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণে তার বিকশিত প্রতিভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পুস্তিকায় উপমহাদেশে ইংরেজদের হাতে গঠিত উপমহাদেশীয় সেনাবাহিনীর ভয়ানক ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। এ থেকে আরও জানা যায়, ইংরেজ গোষ্ঠী বাহ্যিকভাবে পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দেয়ার পরেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের মনিবদের প্রকৃত সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদাই চেষ্টা রত থাকে। ‘এরা কাদের সেনাবাহিনী’ প্রবন্ধটি নিরপেক্ষভাবে উদার মনে পাঠ করার দ্বারা ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবে, এই সেনাবাহিনী দীন প্রতিষ্ঠার যেকোনো আন্দোলনকে এতটা নিষ্ঠুর-নির্মম ও হিংস্রভাবে কেমন করে দমন করতে পারে? সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ জেনে পাঠক প্রথমে আশ্চর্য হয়ে যাবে। মুসলিম

[661]

ঘরের সন্তান হয়েও এবং বাহ্যিকভাবে ইসলামের কিছু ইবাদত ও আচার পালন করেও কেমন করে তারা এমন হতে পারে? শুধু তাই নয় তারা সরল মনে ইসলাম বাস্তবায়নকে কামনা করা এবং দীন ইসলামের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও কি কারণে লাজ লজ্জার পরোয়া না করে, সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ থেকে মুক্ত হয়ে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নির্মূল করতে পারে? এই বিষয়ের পর পাঠকবর্গ যখন প্রবন্ধ পাঠ করে, তখন বুঝতে পারে, খোদ ইংরেজরাই এই সেনাবাহিনীর ভিত্তি স্থাপন করেছে। তাদের সিলেবাস, শিক্ষা-দীক্ষা ও বেড়ে ওঠার সার্বিক পরিবেশ ইংরেজ আইন-কানুন রক্ষা এবং ইসলাম বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরির লক্ষ্যেই সাজানো হয়েছে। এ বিষয়গুলো জেনে পাঠকের বিস্ময় কাটে। এ সেনাবাহিনীকে ওই সফটওয়্যারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যার ডেভলপার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তা তৈরি করেছে। যেমন হিসাব-নিকাশের সফটওয়্যার শুধু হিসাব-নিকাশের কাজ করতে জানে। ছবি বা পিকচারের সফটওয়্যার পিকচার দেখাতে জানে। একইভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একটা সফটওয়্যার। ইংরেজরা তাদেরকে প্রোগ্রামিং করেছে। ইংরেজ আইন-কানুন রক্ষা এবং ইসলামের বিজয় ঠেকানোর জন্যই এই সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং করা হয়েছে। এ কারণে ইতিহাসের শিক্ষার্থী একথা জেনে আশ্চর্য হয় না যে, এই সেনাবাহিনী ইংরেজদের নেতৃত্বে আরব ভূখণ্ডে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে এবং বাংলার বুকে হাজার হাজার বাঙালি নারীর সম্ভ্রমহানি করেছে। তারা সোয়াত এলাকায় ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে কাতারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। অ্যানকাউন্টারে শুধু মুসলিমদেরকেই সন্ত্রাসবাদের অপবাদ দিয়ে হত্যা করেছে। ইতিহাসের শিক্ষার্থী তো তখনই বিস্মিত হতো, যদি

[662]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এইসব না করতো। এই সেনাবাহিনী নিজ অবস্থা থেকে সরে আসায় তখন সেটা আশ্চর্যের বিষয় হতো। অতএব যে উদ্দেশ্যে ইংরেজরা এ সেনাবাহিনী দেড় শতাব্দী আগে গঠন করেছে, আজ পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তারা পথ চলছে। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ উক্ত প্রবন্ধে সেনাবাহিনীর অপরাধ নামা উল্লেখ করার পর লিখেন:

“এই সমস্ত ঘটনা মিডিয়াতে আসার পর বুদ্ধিজীবী, বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষক মহলের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন; যেন সেনাবাহিনীর হাতে এই সমস্ত অপরাধ সংগঠিত হওয়াটা আহামরি বিষয়। অথচ বাস্তবতা হলো, এই অঞ্চল —বিশেষ করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ইতিহাস সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান আছে এমন যে কেউ বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষক মহলের এই বিস্ময় দেখে নিজেরা বিস্মিত না হয়ে পারে না।” [ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ লিখিত ‘এ্যা কিস কি ফৌজ হ্যায়?’]94

সেনাবাহিনীর নিম্ন স্তরে দাওয়াত

কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে, ইংরেজদের বিশ্বস্ত ভৃত্য মূলত সেনাবাহিনীর উচ্চ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং অফিসার শ্রেণিই জেনারেল উচ্চপদস্থ অফিসাররাই। তারাই আমেরিকা এবং ইহুদীদের তত্ত্বাবধানে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এ কারণে তিনি যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন দাতা নিম্ন পদের সিপাহি শ্রেণিকে জেনারেলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর

94
“এরা কাদের সেনা?”- উস্তায আহমদ ফারুক

[663]

এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের পক্ষ থেকে আসা মুসলিম গণহত্যার নির্দেশ অমান্য করার দাওয়াত দিতে চাইতেন। তাই তিনি ফৌজের নিম্ন শ্রেণিকে সম্বোধন করে বলেন: “আমি এই পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সিপাহি এবং নিম্ন পদস্থ অফিসারদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, তারা কি কখনও চিন্তা করেনি, কাদের অধীনে তারা কাজ করছে? মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন ইসলামের সঙ্গে যাদের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই তাদের অধীনে? পাকিস্তানের গোটা সেনাবাহিনী প্রত্যেক সিপাহি এবং অফিসার আফগান মুজাহিদীনের সঙ্গে কৃত অন্যায় ও জুলুমের ব্যাপারে রাজি? সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য কি আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইকারীদেরকে নিজেদেরও শত্রু মনে করে? ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কি সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের কাছেই এত বড় অপরাধ যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছু হতে পারে না? যদি এমনটা না-ই হয়, তাহলে কেন এই সেনাবাহিনীর নিম্নস্তরের সদস্যরা তাদের ওপর চেপে বসা হতভাগা নেতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলেছে না? তারা কি আল্লাহর আযাবের চেয়ে কোর্ট মার্শালকে বেশি ভয় করছে? তারা কি আল্লাহর আদেশের চেয়ে অফিসারদের আদেশ অধিক পালনীয় মনে করে? তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অফিসারদেরকে রিযিক দাতা মনে করে? সরল রাখা চাই, যে মহান রব আপনাদেরকে মায়ের পেটে রিযিক দিয়েছেন তিনি যে কোনো অবস্থায় আপন বান্দাদের কাছে রিযিক পৌঁছাতে সক্ষম। কিন্তু এর জন্য এই রবের উপর তাওয়াক্কুল করে তার খাঁটি বান্দা হতে প্রস্তুত তো হতে হবে।” [মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখন্দযাদার শাহাদাতের প্রেক্ষিতে বিবৃতি, উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর]

95

95
“এরা কাদের সেনা?”- উস্তায আহমদ ফারুক

[664]

ফেরাউনের লোকদের মাঝে একজন ঈমানদার
এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। সেনাবাহিনী কাফেরদের বাহিনী হওয়ার দ্বারা ওই সমস্ত মহান ব্যক্তিদেরকে খাটো করার সুযোগ নেই, যারা ঠিক সেভাবেই সেনাবাহিনীর মাঝে অবস্থান করে যেভাবে ফেরাউনের দরবারে ছিলেন একজন ঈমানদার সভাসদ। সেনাবাহিনীর ওই মহান ব্যক্তিদের কথা বলছি, যারা এই কাফের বাহিনীতে থেকেও ইসলামের সাহায্যে কাজ করেন, মুজাহিদীন ও মুহাজিরদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেন, সেনাবাহিনীর অফিসার ও ক্রুসেডারদের সেবকদেরকে নিঃশেষ করার জন্য মুজাহিদীনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সংস্কারের চেষ্টা করেন, সেনাবাহিনীর অপরাধের তালিকা তুলে ধরেন। এমন ব্যক্তিরা তো জিহাদের অগ্রসৈনিক দল। তারা ঈমানদারদের হৃদয়ের শীতলতা। তারা এমন ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের নিদর্শন ও গায়েবী নুসরত হিসেবে বাছাই করেছেন (ঈমানদারদের জন্য তারা আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্য)। পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর কাছে আমরা এমন ব্যক্তিদের বিরাট প্রতিদান, জিহাদের দ্বিগুণ পুণ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির দোয়া করি। এমন ব্যক্তিদের মাঝে লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাহেদ আজীজ শহীদ রহিমাহুল্লাহ, জেনারেল মুজাফফর হোসাইন উসমানী রহিমাহুল্লাহ, মেজর জেনারেল জহিরুল ইসলাম আব্বাসী রহিমাহুল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার মুস্তানসির বিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, মেজর আদেল আব্দুল কুদ্দুস শহীদ রহিমাহুল্লাহ, মেজর ডক্টর তারেক শহীদ রহিমাহুল্লাহ, পাকিস্তান নৌ বাহিনীর মহান অফিসার রফিক শহীদ রহিমাহুল্লাহ, নৌ অফিসার ওয়াইস যখরানী শহীদ রহিমাহুল্লাহ এবং তাদের অধীন শত শত নৌ সদস্য, ইসলামের শত্রু পারভেজের ওপর হামলাকারী মুজাহিদীনকে সাহায্য সহায়তাকারী বিমান বাহিনীর

[665]

বিশ জন সদস্য সহ শত শত এমন অজ্ঞাতনামা মুজাহিদ রয়েছেন, যারা ইখলাস লিল্লাহিয়াত দীন প্রতিষ্ঠার চেতনার কারণে ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর মাঝে থেকেও দীনের সাহায্য-সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তাদের সকলের উপর তার রহমত অবতীর্ণ করুন এবং তার দীনের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন। আমীন।

পাকিস্তানি নৌ বাহিনীতে জিহাদের দাওয়াত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রমের বরকতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মাঝেও দাওয়াতের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। ব্যথিত হৃদয় নিঃসৃত তার কথাগুলো কাফেরদের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের অন্তরেও ঈমানের আলো জ্বালিয়ে দেয়। অনেক সৈন্য তওবা করে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেয়। অনেকেই কাফেরদের সাহায্যকারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পাকিস্তানি নৌ বাহিনীর মাঝে দাওয়াতের কথা। তাঁর লেখালেখি, দরস ও বয়ান শুনে পাকিস্তানি নৌ বাহিনীর শত শত অফিসার ও সিপাহির সামনে সেনাবাহিনীর বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। এমনকি পূর্বের জীবনের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে তারা ফিদায়ী হামলা করতে, আমেরিকার সেবক বড় অফিসারদেরকে ভূপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। পাকিস্তানি নৌ বাহিনীর এই হৃদয়বান অফিসারগণ বারবার ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে বার্তা পাঠিয়ে বলেন, পাকিস্তানি নৌ বাহিনীর নেতৃবৃন্দকে শেষ করা আমাদের জন্য একেবারেই সহজ

[666]

কাজ। কিন্তু তিনি তার ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের পরামর্শে তাদেরকে আমেরিকা ও ভারতের নৌ বাহিনীর উপর হামলার নির্দেশ দেন। সে লক্ষ্যে ইসলামের এই সিংহদল কাফনের কাপড় গায়ে জড়িয়ে এবং মুজাহিদীনকে বায়আত দিয়ে পাকিস্তানি নৌ বাহিনীর ‘পিএনএস জুলফিকার’ জাহাজ কাবু করার চেষ্টা করেন। এই কাজের প্রাণভোমরা জিসান রফিক এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াইস জাখরানী ফিদায়ী হামলা করে শাহাদাতের পেয়ালা মুখে তুলে নেন।

শহীদ লেফটেন্যান্ট জিসান রফিক রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদীনকে বলেনঃ “যখন ২০১১ সালে করাচির মেহরান বেসে মুজাহিদীন হামলা করেন, তখন সেখান থেকে খুব কাছে আমাদের ডিউটি ছিল। আমরা এবং আমাদের অন্য অফিসারগণ কাছ থেকে ওই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করি। কিছু যুবক দুঃসাহসীভাবে পৃথিবীর সপ্তম শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলো। তা দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাই। অপরদিকে আমাদের অফিসার ও সিপাহিদের কাপুরুষতাও আমাদের পেরেশানি বাড়িয়ে দেয়। অবশেষে আমরা এবং আমাদের বন্ধু আরও ২০ জন অফিসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আক্রমণকারীদের হামলার উদ্দেশ্য বোঝার জন্য তাদের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করবো। অতঃপর আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর কিছু দরস ডাউনলোড করি। উস্তাদজির পাঠগুলো শুনে বাস্তবতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি আমেরিকানদের সুরক্ষায় নিয়োজিত একটা সংস্থার চাকরি করছি আমরা; আমরা তো ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইরত বাহিনীর অগ্রসৈনিক দল। অতঃপর আমরা কায়েদে জিহাদ মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর কিতাবগুলো পাঠ করতে শুরু করি। তখন আমাদের চক্ষু আরও খুলে যায়। এ বিষয়গুলো বোঝার পরপর আমরা এবং আমাদের শত শত সৈনিক চাকরি ছেড়ে

[667]

দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। শুধু তাই নয় কাফেরদের মিত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদীনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়েরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।”

এমনিভাবে নেভি ডকইয়ার্ডে শাহাদাত বরণকারী ইসলামের বাহাদুর শহীদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াইস জাখরানী রহিমাহুল্লাহ বলেন: “ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দরসগুলো শুনে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার ভয়াবহতা যখন আমিও উপলব্ধি করতে পারি তখন চাকরি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তখন আমাকে আমার একজন প্রিয় মানুষ হযরত মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাহুল্লাহর কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, এই যুবক নৌ বাহিনীর অফিসারের চাকরি ছেড়ে দিতে চায়। তাকে বোঝানো হোক। হযরত মুফতী সাহেব তখন আমাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি বলি: “পাকিস্তানি নৌ বাহিনী মার্কিন সামুদ্রিক জোটের অংশ। ২০০১ সাল থেকে বিশেষভাবে এই বাহিনীর আসল কাজ হচ্ছে নৌ পথে আমেরিকার স্বার্থগুলোকে সুরক্ষা দেয়া। সেই সঙ্গে আফগানিস্তানে আমেরিকার রসদ সরবরাহকে সুরক্ষা দেয়াটাও পাকিস্তানি নৌ বাহিনীর দায়িত্ব। একইভাবে শান্তি মিশনে উপসাগরীয় অঞ্চলে নৌপথে আমেরিকার স্বার্থের জন্য আমাদের বাহিনীর জাহাজ নিয়োজিত।..’ আমার এই আলোচনা শুনে হযরত মুফতী সাহেব হাফিযাহুল্লাহ হতভাগ ও পেরেশান হয়ে যান। বিস্ময় ভরে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করে: « আসলেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সমুদ্র পথে মার্কিন জোটের অংশ? » আমি মাথা ঝাঁকাবার পর তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলেন: « আপনি যা বলেছেন তা যদি সঠিক হয়; পাকিস্তানি নৌ বাহিনী যদি সমুদ্রপথে আমেরিকার প্রতিরক্ষার জন্য কাজ করে, তাহলে আপনার জন্য এই চাকরি করা কখনোই জায়েয হবে না।” »

হযরত মুফতী সাহেবের ফাতওয়া শুনে শহীদ ওয়াইস জাখরানী রহিমাহুল্লাহ নৌবাহিনীতে ইস্তফা দেন। [668]

দীনী আত্মমর্যাদাবোধের কারণে নৌবাহিনীতে অন্যান্য অফিসার ভাইদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ওয়াজিরিস্তানে এসে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর খেদমতে উপস্থিত হন।

মুজাহিদীন মধ্যমপন্থার ওপর অটল রাখা মুজাহিদীনকে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যমপন্থি মতাদর্শের ওপর অবিচল রাখা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মিডিয়া ও দাওয়াতী কার্যক্রমের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তিনি শরীয়াহর দরস বয়ান বক্তৃতা ও লেখালেখির মাধ্যমে মুজাহিদীনকে শরীয়তের সীমারেখার প্রতি যত্নবান হবার এবং কাফেরদের প্রতি কঠোরতার পাশাপাশি ঈমানদারদের প্রতি মুহব্বত ও নম্রতা অবলম্বনের শিক্ষা দিতেন।

মুসলিমের রক্তপাতের নিষিদ্ধতা
জিহাদী কার্যক্রমের সময় সাধারণ মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে অবহেলা এবং উদাসীন থাকাকে তিনি কঠোরভাবে নিন্দা জানাতেন। মুসলিমদের রক্তপাত কবীরা গুনাহ—এ কথা বলে তিনি মুজাহিদীনকে সতর্ক করতেন। এই লক্ষ্যে আমর বিন মারূফ নাহী আনিল মুনকারের সকল পন্থা তিনি অবলম্বন করতেন। যে কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টির লেশমাত্র থাকবে, সে কাজের ব্যাপারে চুপ থাকা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যারা মুসলিমদের রক্তপাত ঘটিয়ে গর্ব করে; মুসলিমদের রক্তের মর্যাদা পদদলিত করে, এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করতেন। ২০১৩ সালে যখন মর্দান শহরের শেরগড়ে একটা জানাযা কেন্দ্র করে [669]

ধামাকা হয়, যার ফলে ২০ জন সাধারণ মুসলিম নিহতের তথ্য পাওয়া যায়, তখন সাধারণ মানুষের এই প্রবাহিত রক্ত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে অস্থির করে তোলে। তিনি শক্ত ভাষায় এমন কাজের নিন্দা করেন এবং পুরোপুরি ভাবে এমন কাজের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করেন। এতে কিছু দুষ্কৃতিকারী লোকের পক্ষ থেকে তাকে হুমকি দেয়া হয়; কিন্তু তিনি নিজ অবস্থায় অটল থাকেন। এই ট্রাজেডির পর তিনি মুজাহিদীনকে সম্বোধন করে বলেন: “নিঃসন্দেহে এই জুলুমকে জুলুম বলা এবং তার প্রতিহতের জন্য চেষ্টা করা আমাদের ওপর ফরয। যখন হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে কিছু মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত হয়, তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর তরবারি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাজের সঙ্গেও তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করেছেন। তাহলে এতো জন মুসলিমের অন্যায়ভাবে নির্মম শাহাদাত, এতোগুলো পরিবার অসহায় হওয়া, এতো জন মুসলিমের ক্ষয়ক্ষতিতে কেমন করে নীরব থাকা যেতে পারে? নিঃসন্দেহে আপনারা সকলেই অন্তরের গভীর থেকে এই কাজ অপছন্দ করেছেন। অতএব এই অপছন্দ, ঘৃণা ভাব পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করুন, যেন দুনিয়াবাসীর কাছে আপনার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। ঈমানদারগণ যেন জানতে পারে, এমন কাজের সঙ্গে আপনার কিছু মাত্র সম্পর্ক নেই।” [উস্তাদ আহমদ ফারুকের বিবৃতি: ‘শেরগড়ের শহীদগণও আমাদের শহীদ’]

একইভাবে পাকিস্তানের বাজারগুলোতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন ক্রমাগত অন্যায় হামলা হয়, মুজাহিদীন নামধারী কিছু গ্রুপের সঙ্গে যখন এ হামলার সম্পৃক্ততার কথা জানা যায়, তখন তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। এক সাক্ষাতে তিনি আমাকে বলেন: “এই হিংস্র কাজ নিষিদ্ধ। আমাদের নাহী আনিল মুনকার

[670]

তথা অসৎ কাজে বারণ করতে হবে। এ কারণে যেকোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। নাহী আনিল মুনকার করতে গিয়ে শহীদ হওয়া অনেক সম্মানের বিষয়। যদি আমরা ন্যাটো জোটের প্রায় ৫০ টা দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি, তাহলে এমন গ্রুপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমরা ভয় করি না, যারা শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন করতে তোয়াক্কা করে না।”

তিনি মুসলিমের রক্তের মর্যাদা এবং এ সম্পর্কে তার চিন্তাভঙ্গি প্রকাশ করে এক প্রবন্ধে লিখেন: “আমরা মুসলিমদের রক্তের এক একটি ফোঁটার ব্যাপারেও চিন্তিত ও ব্যথিত। অন্যায়ভাবে প্রবাহিত রক্তের প্রতিটি ফোঁটা আমাদেরকে পীড়া দেয়। মুসলিমদের দুর্দশার কথা শুনে অস্থির হয়ে আমরা ঘর থেকে বের হয়েছি। তাদের দীন, সম্মান ও অর্থ সম্পদ সুরক্ষার জন্য আমরা বের হয়েছি। মুসলিমদের রক্তপাত চূড়ান্ত পর্যায়ে নিষিদ্ধ— এই ঈমান ও বিশ্বাস আমরা পোষণ করি। এই নিষিদ্ধতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এতে সংশয় সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। দুর্বল দলীলের ভিত্তিতে মুসলিমদের রক্ত হালাল মনে করা, তাতাররুস (বা একদল মুসলিমকে কাফেররা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলে কাফেরদের পর্যন্ত আঘাত পৌঁছাবার স্বার্থে ব্যবহৃত মুসলিমদেরকে হত্যা করার মাসআলা) বিষয়ে নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের কিতাবে উল্লেখিত শরীয়াহ মূলনীতি পেছনে ফেলে ঢালাও আচরণ করা অথবা প্রমাণ ছাড়া মুসলিমদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করা— এজাতীয় কর্মপন্থার ব্যাপারে কঠোরভাবে আমরা হুঁশিয়ারি জানাই। কোনো জিহাদী জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে কোনো মুসলিমকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করাকে আমরা জায়েয মনে করি না। [‘হাম সারাপা খায়ের বান

[671]

জায়ে ’ (আমরা যেন আপাদমস্তক কল্যাণ হয়ে যাই) — উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর রচিত]

মুসলিমকে তাকফীরের ক্ষেত্রে সতর্কতা

তিনি মুসলিমের রক্তের মর্যাদা ও রক্তপাতের নিষিদ্ধতার স্পর্শকাতর বিষয়ের মতো মুসলিমদেরকে ভাসা ভাসা যুক্তির কারণে কাফের ঘোষণা করতেও শক্তভাবে বারণ করতেন। তিনি বলতেন : “কোনো মুসলিমকে তার কাজ-কর্মের কারণে কাফের ঘোষণা করা খুবই নাজুক ও স্পর্শকাতর বিষয়। এ কারণে এই বিষয়কে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহের বড় বড় উলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করা ছাড়া , নিজেদের পক্ষ থেকে কাফের আখ্যায়িত করা অনেক বড় ফিতনার কারণ। আপনাদের মতোই মুজাহিদ দাবিদার কিছু নির্বোধ মানুষের তাকফীরের (কাফের আখ্যায়িতকরণের) মতো ভয়াবহ বিষয়ে দায়িত্বহীন আচরণ দেখে অনেকেই কষ্ট পায় এবং তাদেরকে সংশোধনের জন্য সকল পন্থায় চেষ্টা করে। আরবী ভাষায় লিখিত অসাধারণ প্রবন্ধের শিরোনাম তিনি উর্দুতে তরজমা করেছেন : “আমরা যেন আপাদমস্তক কল্যাণ হয়ে যাই ”। আরবী হলো : فلنكن كالنحلة - এর শাব্দিক অনুবাদ হলো “ আমরা যেন মৌমাছির মতো হয়ে যাই। ” যাই হোক উক্ত প্রবন্ধে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ লিখেন :

“কুফরীর ফাতওয়া আমরা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ হুকুম বলে মনে করি। কারণ এটা ইসলাম এবং ইসলামের পরিচয়বাহী বিষয়গুলোকে সুরক্ষা দেয়। এই ফাতওয়ার দ্বারা ইসলাম ও কুফরীর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। ইসলাম এবং কুফরীর মাঝে কিছু মাত্র মিশ্রণ ও তালগোল পাকাবার পথ বন্ধ করে এই ফাতওয়া। কিন্তু সেই সঙ্গে কাফের আখ্যায়িতকরণের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করা খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। এ বিষয়ে আমরা পুরোপুরি

সতর্কতার উপর জোর আরোপ করি। এই বিষয়ে সালফে সালেহীন উলামায়ে কেরামের মতো সতর্ক অবস্থান গ্রহণে আমরা জোর দিই। গণিতের মূলনীতির মতো এই জাতীয় বিধি -বিধান কে আমরা সকল ব্যক্তির হস্তক্ষেপে ছেড়ে দিতে পারি না ; শরীয়াহর ইলমে আরবী বর্ণমালাও যার জানা নেই , এমন ব্যক্তিকেও আমরা উক্ত মাসায়েল গবেষণার অনুমতি দেব , তা হতে পারে না। অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরা এসব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে; যার ওপর যেভাবে ইচ্ছা বিধান প্রয়োগ করবে ; উলামায়ে কেরাম যে সমস্ত শরীয়াহ মূলনীতি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছেন সেগুলো নিয়ে খামখেয়ালি করবে , সেটা কিছুতেই মেনে নেয়ার মতো নয়। এ কারণে আমরা কুফরীর ফাতওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করি এবং মূলনীতির প্রতি যত্নবান থাকি। এ কারণে প্রান্তিকতার শিকার কিছু মানুষ আমাদেরকে মুর্জিয়া অপবাদ দেয়। আবার প্রকৃত মুর্জিয়া গোষ্ঠী আমাদেরকে কট্টরপন্থি বলে অপবাদ দেয়। এই অপবাদ ও মিথ্যাচারের অভিযোগ আমরা আল্লাহর কাছে পেশ করি। ”

[উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর বিবৃতি م سـراپا خـير بن جـائيں ‘আমরা আপাদমস্তক কল্যাণ হয়ে যাই ’]

• তিনি ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকে মুজাহিদীনের ধ্বংসের কারণ মনে করতেন। তিনি বর্ণনা করতেন , হাদীস অনুযায়ী পূর্ববর্তী জাতির ধ্বংসের কারণ ছিল ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি। তিনি আরও বর্ণনা করতেন , নিকট অতীতে আলজেরিয়া , পাকিস্তান এবং ইরাকসহ অন্যান্য শহরে মুজাহিদীনের মাঝে কট্টরপন্থা ও প্রান্তিকতার ব্যাধির কারণে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি মনে করতেন , কাফের গোষ্ঠী এবং তাদের মিত্রদের জুলুম -অত্যাচার ও হিংস্রতার

প্রতিক্রিয়ায় কখনও কখনও মুজাহিদীনের মাঝে কট্টরপন্থা ছড়িয়ে পড়ে। পরিণতি বিচারে এমন কট্টরপন্থি চিন্তা-ভাবনাকে তিনি জিহাদের জন্য ক্ষতিকারক মনে করতেন। তিনি বলতেন, কাফের ও মুনাফিকদের জুলুম-অত্যাচারের জবাবে আমরা তো ইসলামের সুউচ্চ আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা পরিত্যাগ করতে পারি না। মুজাহিদীনকে তিনি শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর বই-পুস্তক পাঠের উপদেশ দিতেন। কারণ সে সমস্ত রচনায় কট্টরপন্থা ও সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মুজাহিদীনের জন্য অনেক উপকারী ও সহায়ক বিষয় রয়েছে। বিশেষ করে যুগের খাওয়ারিজদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রচিত “প্রতিরক্ষা জিহাদের ব্যাপারে একটি প্রশ্নের জবাব” এবং আলহিসবা ফোরামকে দেয়া শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর হেকমত প্রজ্ঞা ও সারগর্ভ ইন্টারভিউ পাঠ করার নসীহত করতেন।

২০১৩ সালে ইরাক ও সিরিয়াতে আদ দাউলাতুল ইসলামিয়া বা দাউলা নামে প্রসিদ্ধ গ্রুপ বিস্তৃত এলাকা দখল করে রাষ্ট্র ঘোষণা করে। ঘোষণা করা মাত্রই মুজাহিদীনকে হত্যা করা, তাদের অর্থ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, বিরোধী সকলকে কাফের আখ্যায়িত করা, কেউ বায়আত প্রদান না করলে হত্যা করা, উম্মাহর উলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করা—এজাতীয় এমন সব কর্মকাণ্ড ওই গ্রুপের দ্বারা সংঘটিত হতে থাকে, যা তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যমপন্থা থেকে বিচ্যুত করে। এমন পরিস্থিতিতে প্রথম প্রথম উম্মাহর উলামায়ে কেরাম ওই গ্রুপের সংস্কার সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হন। কিন্তু এই সংশোধন প্রচেষ্টার ফলাফল যখন এই হয় যে, যতই চিকিৎসার চেষ্টা করা হবে ততই রোগের জীবাণু ছড়াবে, তখন জিহাদী নেতৃবৃন্দ ওই গ্রুপের সঙ্গে

[674]

তাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তাদের চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিতভাবে অপনোদন করতে শুরু করেন। মুজাহিদীন যেন এই ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে পারে সে উদ্দেশ্যেই নেতৃবৃন্দ ওই গ্রুপের বিরুদ্ধে কলম ধরেন।

সেই ধারাবাহিকতায় জিহাদী বড় বড় উলামায়ে কেরামের মতো তিনিও নিজ দায়িত্ব পালন করে মুজাহিদীনের মাঝে চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রসিদ্ধ আরবী প্রবন্ধ রচনা করেন যার শিরোনাম হচ্ছে : فلنكن كالنحلة - শাব্দিক অর্থ : 'আমরা যেন মৌমাছির মতো হয়ে যাই'। আরব বিশ্বে এই প্রবন্ধ অনেক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সিরিয়ার উলামায়ে কেরাম প্রজ্ঞা ও সারগর্ভ এই প্রবন্ধ মুজাহিদীনকে পাঠ করার উপদেশ দেন। একইভাবে ফারুক ভাই উর্দু ভাষায়ও দায়েশ নামক ফিতনার ব্যাপারে সাথিদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং এই গ্রুপের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক না থাকার কথা মুসলিম উম্মাহকে জানানোর জন্য বেশ কিছু লেখালেখি করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, দায়েশ শুধু একটি গ্রুপের নাম নয়; বরং এটা একটা কট্টরপন্থি চিন্তাধারা এবং সীমালঙ্ঘনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির নাম। পৃথিবীর যেকোনো জামাআত এই দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হতে পারে। এ কারণে নিজেদের মাঝে এই ব্যাধির চিকিৎসা জারি রাখা এবং সকল মুজাহিদকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অটল রাখা নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব।

এক লেখায় তিনি দায়েশ গ্রুপের পরিচয় তুলে ধরে বলেন: "প্রিয় ভাইয়েরা! খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, উম্মাহর ইতিহাসের এই নাজুক পর্বে 'দাওলাতুল ইসলাম ফিল ইরাক ওয়াশ শাম' নামক

জামাতের নেতৃবৃন্দ তাদের সংগঠকদের পবিত্র পথ ছেড়ে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতির পথে চলছে। এই পথভ্রষ্টতা এতটাই বেড়েছে যে , সকল প্রকার সংশোধন প্রচেষ্টা এখানে ব্যর্থ। ভুল শোধরাবার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ”

[উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর বিবৃতি مجاہدین کو درپیش ایک اہم فتنہ ‘মুজাহিদীন কো দার পেশ এক আহাম ফিতনা’ (মুজাহিদীনের সামনে একটি গুরুতর ফিতনা)]

আরেক লেখায় তিনি দায়েশ নামক গ্রুপের অপরাধ গণনা করে লিখেন , তারা মুসলিমদের সর্বসম্মত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহিমাহুল্লাহর বিপরীতে নতুন আমীর ঘোষণা করেছে , তাকফীর বা কাফির আখ্যায়িতকরণের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে , মুসলিমদের রক্তের মর্যাদা অবহেলা করেছে , তাদেরকে বায়আত দেওয়া সকলের জন্য জরুরি ঘোষণা করেছে , বিরোধীদের রক্তপাত যেকোনো অজুহাতে বৈধ সাব্যস্ত করেছে , জিহাদী প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে তুচ্ছ -তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছিত করেছে , সকল প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য জিহাদী অঙ্গনের উলামায়ে কেরামের ফাতওয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে , মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কের পরিবর্তে তাদের ব্যাপারে লাঞ্ছনা মূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে , নিজেদেরকে গোটা উম্মাহর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেছে , দল প্রীতি ও দলান্ধতায় ডুবে গিয়ে মুজাহিদীনের ঐক্য বিনষ্ট করেছে, মুজাহিদীনকে শাখাগত ও ঘরানাগত তাআসসুব (সংকীর্ণ মানসিকতার পক্ষপাতিত্ব) এর মাধ্যমে বহু দলে বিভক্ত করেছে এবং আদব -আখলাক শিষ্টাচার ও ভদ্রতার ধর্মীয় মানদণ্ডের পুরোপুরি বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। » ওই লেখায় তিনি এ বিষয়টিও স্পষ্ট করেন যে , দায়েশ নামক গ্রুপটা আহলে

সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত হবার কারণে বিদআতপন্থিদের অন্তর্ভুক্ত। আর সাধারণ মুসলমানের উচিত বিদাতপন্থিদের থেকে দূরে থাকা।

একইভাবে তিনি ‘আমরা আপাদমস্তক কল্যাণ হয়ে যাই’ শিরোনামের লেখায় মুজাহিদীনের দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। জিহাদী অঙ্গনের মাশায়েখ ও উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ঐ সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি তিনি শিখেছেন। জিহাদী দৃষ্টিভঙ্গির এই উজ্জ্বল দিগন্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাধারণ মানহাজের সার নির্যাস। তিনি সকল মুজাহিদকে আহলে সুন্নাহের ঐ সমস্ত পয়েন্টগুলো কেন্দ্র করেই ঐক্যবদ্ধ হবার দাওয়াত পেশ করেছেন। পয়েন্টগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে:

০১. মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা। সকল মুসলিমের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করা এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভের পর উম্মাহর সমর্থন লাভের চেষ্টা করা।

০২. তাকফীর বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা থেকে বেঁচে থাকা।

০৩. উলামায়ে কেরামকে কদর (যথার্থ মূল্যায়ন) করা। জিহাদী অঙ্গনের ব্যক্তিদের সঙ্গে উলামায়ে কেরামের যেকোনো রকমের দূরত্ব মেটাতে চেষ্টা করা।

০৪. মুসলিমদের রক্তের মর্যাদা রক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং দুর্বল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে কথা বলতে সতর্ক থাকা।

০৫. উম্মাহর বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থা বিবেচনায় রেখে মুসলিমদের সঙ্গে নরম আচরণ করা এবং তাদেরকে দাওয়াত প্রদানে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা।

০৬. উম্মাহকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক পয়েন্টের উপর ঐক্যবদ্ধ করা। এর মধ্যে তালিকার [677]

শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই।

০৭. দাওয়াতী বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং জিহাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দাওয়াতের ওতপ্রোত সম্পর্ক মাথায় রাখা।

০৮. মুজাহিদীনের মাঝে গুরুত্বের সঙ্গে শরীয়াহ রাজনীতির বুঝ তৈরি করা।

০৯. মতপার্থক্য করার শরীয়াহর আদব ও ভদ্রতা রক্ষা করা।

১০. সমাজে পবিত্র শরীয়াহ বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি দলের মধ্যেও শরীয়তের বিধি-বিধান গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা।

১১. শাসক নির্বাচনে অবশ্যই শুরা তথা পারস্পরিক পরামর্শের নীতি অবলম্বন করা। এমন পরামর্শক তথা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা, যেখানে শরীয়তের দাবি ও শর্তাবলী উপস্থিত থাকে। উম্মাহর পরামর্শ দানের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করা।

১২. সাধ্যের ভেতর সকল উপায় অবলম্বন, যেটুকু না হলেই নয় ততটুকু ভূমি বিজয় ও শক্তি অর্জনের আগেই ইমারত বা রাষ্ট্র ঘোষণা করতে তাড়াহুড়া না করা।

১৩. দল প্রীতি বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আস্থা বিশ্বাস পোষণে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা।

১৪. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামের পারস্পরিক ইলমী মতপার্থক্যগুলো জিহাদের ময়দানে টেনে না আনা।

১৫. ভালো কাজে আমীরের আনুগত্যের প্রতি যত্নবান হওয়া।

[678]

১৬. ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কথা ও কাজ দিয়ে ইমারতকে সাহায্য সমর্থন করা।

১৭. তাযকিয়ায়ে নফস, আত্মশুদ্ধি ও অন্তর পরিশুদ্ধ করার প্রতি মনোযোগী হওয়া।[96]

জিহাদের আদব সমূহ এবং কাজ -কর্মের পরিশুদ্ধি

মুজাহিদীনকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর শরীয়াহগত আদব শিষ্টাচার শেখানোটা ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। তিনি মনে করতেন, জিহাদে আমরা যত বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ করবো, ততই আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের নিকটবর্তী হতে পারবো। মুজাহিদীনকে তিনি এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাস থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ। শুধু বাহ্যিক আমল সংশোধনের প্রচেষ্টাই নয়; সাধারণভাবে মুজাহিদীনের আত্মিক পরিশুদ্ধির ব্যাপারেও তিনি মনোযোগী ছিলেন।

তিনি আখিরাতের ভয়, সবর, ধৈর্যধারণ, অবিচলতা, সততা, আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা, জিহাদের প্রস্তুতি, শাহাদাতের ফযীলত ও মর্যাদা, আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা ইত্যাদি শিরোনামে অনেক দরস প্রদান করেন। তিনি অন্তরের পরিশুদ্ধি, গুনাহ পরিত্যাগ, নিয়তের পরিশুদ্ধির মতো বিষয়গুলোর প্রতিও মনোযোগ দেন। তিনি অন্তর পরিশুদ্ধি বিষয়ে এক দরসে বলেন: “অনেক বড় মাপের

---

[96] উস্তায আহমদ ফারুক রহমতুল্লাহি আলাইহির বিবৃতি م سراپا خیر بن جائیں

লোকও পিছলে গিয়েছে —নিকট অতীতেও আবার দূর অতীতেও। কারণ তাদের অন্তরে কিছু ব্যাধি ছিল।
প্রিয় ভাইয়েরা! এ কথাগুলো আমাদেরকে কাঁপিয়ে দেয়ার মতো, আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই উচিত নিজের অন্তরের খোঁজখবর নেয়া। দুনিয়াবাসী তাকে যা কিছুই মনে করুক, একজন মুজাহিদ মনে করে, একজন আলেম মনে করে, একজন নেককার সৎকর্মশীল মনে করে। কিন্তু তার অন্তরে কোন্ সব ব্যাধি রয়েছে, সেটা আল্লাহ তাআলা জানেন নাকি সে নিজে জানে? (আল্লাহ ঠিকই জানেন কিন্তু সে নিজে জেনেও না জানার ভান করে থাকে) এ কারণে এদিকে মনোযোগ দিলেই চিকিৎসা করানো সম্ভব হবে। আর যদি সে ব্যক্তি উদাসীন থাকে, তাহলে ওই রোগগুলো ধরা সহজ ব্যাপার নয়। মানুষের মন অনেক ধোঁকাবাজ। আর শয়তানকে তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন غرور - অর্থাৎ সে আপাদমস্তক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমরা বুঝতে পারলাম এরা সকলেই প্রতারক। তারা আপনার নিজেকে নিয়ে ভাবতে দেয় না। আপনার অন্তর থেকে আপনার প্রতি মনোযোগ তারা সরিয়ে দেয় এবং এমন কাজে ব্যস্ত রাখে, যেন মানুষ নিজের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। অন্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর মৌলিক তিনটি পথ রয়েছে: একটি হল শ্রবণ, একটি হল দর্শন এবং তৃতীয়টি হল কথন। এই তিনটি মৌলিক পথ। আল্লাহ তাহলে কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

অর্থ: “নিঃসন্দেহে কান চোখ এবং অন্তর সবকিছুর ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করা হবে।” (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৩৬) [উস্তাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর আলোচনা — ‘কলব কি হেফাযত’]

তিনি এক দরসে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ভরসা এবং তার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা পোষণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেন: “সর্বাবস্থায়

দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখার নামই তাওয়াক্কুল। কোনো বাহ্যিক উপায় -উপকরণ থাকুক কিংবা না থাকুক। বাহ্যিক উপায় -উপকরণ ছিনিয়ে নেয়ার পরও মানুষ নিরাশ হবে না বরং মনে করবে , এই সব কিছু আল্লাহ তাআলার হাতে রয়েছে। আজও যদি আল্লাহ তাআলাকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি এবং তিনি যে মুহূর্তে যা ঘটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন , কে আছে আল্লাহর হুকুমে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে ? আল্লাহ যদি কাউকে উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন ; কোনো ব্যবস্থা , কোনো রাজত্ব বা রাষ্ট্রকে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেন ; আল্লাহ যদি তার তিনজন চারজন বান্দার কোনো গ্রুপকে বিজয়ী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন , তাহলে কোন জিনিস আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে ? فلا راد لفضله - আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ দান করতে চান , কেউ তা ব্যাহত করতে পারে না .. لا معقب لحكمه - আল্লাহ তাআলা যে সিদ্ধান্ত নেন , সেটার উপর অন্য কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অতএব আল্লাহর সিদ্ধান্ত , নির্ধারণ , ইচ্ছা , হুকুম ও নির্দেশ সব কিছুর উপর বিজয়ী।
পূর্বেও আমরা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী ছিলাম , এখনও আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকবো। যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক, দেয়ালে যদি আমাদের পিঠ ঠেকেও যায় , তখনও আমরা আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখবো “تؤتي الملك من تشـاء وتـنزع الملك ممن تشـاء - আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেন ” (সূরা আলে ইমরান ০৩ :২৬) [আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর আলোচনা : বিবৃতি اللہ کے وعدوں پر یقین ‘আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সমূহের প্রতি আস্থা ’]

খ - দাওয়াতী ও মিডিয়া কার্যক্রমের উপায় উপকরণ

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মিডিয়া কার্যক্রমের উপায় মাধ্যম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে ওই সমস্ত মিম্বর নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, যেগুলো নির্মাণ করে তিনি মুসলিম উম্মাহ পর্যন্ত নিজের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। নূরের ওই সমস্ত মিম্বরের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

ক – আস-সাহাব উর্দু

২০০৭ সালে সৌভাগ্যপূর্ণ শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত এই মিডিয়া সংস্থা দেখ ভালের দায়িত্ব ছিল ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ওপর। এই মিম্বরের মাধ্যমে তিনি ডজন ডজন জিহাদী ভিডিও তৈরির কাজ করেছেন এবং তত্ত্বাবধান করেছেন। এই মিডিয়া তাঁর অডিও দরস ও বিবৃতি প্রকাশের কাজও করতো। পরবর্তীতে এই সংস্থার নাম রাখা হয় আস-সাহাব উপমহাদেশ।

খ - ইদারা হিত্তিন

শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহর নির্দেশে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ ২০০৬ সাল থেকে এই ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহ আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজের শাহাদাতের আগ পর্যন্ত এই ম্যাগাজিনের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ের মধ্যে হিত্তিন ম্যাগাজিনের মোট আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এটি পাকিস্তানের গুরু গম্ভীর ইলমী অঙ্গনে বেশ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। প্রমাণ উপস্থাপনের ধরন এবং ইলমী মাপকাঠি বিচারে এই ম্যাগাজিন জিহাদী দাওয়াতের জন্য সত্যিই একটি আদর্শ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেহেতু এই ম্যাগাজিনে প্রবন্ধগুলো স্থান পেত সবিস্তারে, এ কারণে এটি

[682]

প্রকাশে কোনো নির্ধারিত তারিখের প্রতি লক্ষ্য রাখা হত না।

এছাড়াও নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ, ইন্টারনেটের কিছু ফোরাম ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও তিনি নিজ দাওয়াত প্রচার করেন।

দাওয়াত ও মিডিয়া কার্যক্রমের জন্য তিনি ওই সময়ের সকল বৈধ মাধ্যম ও উপকরণ যথাযথ ব্যবহার করেন। তিনি কর্মদক্ষতা কর্মকৌশল ও বিন্যাস-প্রতিভা ব্যবহার করে দাওয়াতী কাজগুলো সুবিন্যস্ত করেন। সমস্ত কাজে সুচারু রূপ নিশ্চিতের ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। তার মিডিয়া উপকরণ ও উপায় মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করলে তালিকাটি এমন হবে:

০১. কিতাব ও পুস্তক পুস্তিকা

০২. অনুবাদ

০৩. দরস ও বয়ান বক্তৃতা

০৪. জিহাদী ভিডিও

০৫. দাওয়াতী চিঠিপত্র

এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এ কথাও স্মরণ রাখা চাই, এই তালিকায় থাকা উপায় মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনায় তার সকল মিডিয়া কার্যক্রমের উল্লেখ সম্ভব নয়। এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

কিতাব ও বই পুস্তক ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ে কিতাব, বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করেন। সেগুলোর মাঝে কিছু হিত্তিন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় আর কিছু হিত্তিন মিডিয়া থেকে আলাদা বই [683]

হিসেবে প্রকাশিত হয়। ওই সমস্ত বই পুস্তক এবং প্রবন্ধ নিবন্ধের তালিকা কিছুটা এমন :

০১. ‘এ কিস কি ফৌজ হ্যায়’ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে ইংরেজ বাহিনীর ক্রমধারা, সে বিষয়টা বিস্তারিত আলোচনার জন্য তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সঙ্গে এখানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জুলুম-নির্যাতনের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়। বইয়ের দ্বিতীয় অংশে বেলুচিস্তান বিষয়ে সারসংক্ষেপ আলোচনা করা হয়। তাতে প্রমাণ করা হয়, বেলুচ জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধের কারণে ইংরেজ বাহিনী এবং তাদের উত্তরসূরি পাকিস্তানি আর্মি সর্বদাই তাদের অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে এসেছে।

০২. ‘শয়তানি মুসাল্লাস’ এই গ্রন্থ আসলে ইংরেজ লেখকের The Garrison State গ্রন্থের অনুবাদ ও সারসংক্ষেপ। সেই সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মন্তব্য-নোটগুলো এই গ্রন্থের তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে দেয়। এই গ্রন্থ দ্বারা স্পষ্ট হয়, কেমন করে উপমহাদেশে কিছু শ্রেণি ইংরেজদের সেবা করেছে। পাশাপাশি এই গ্রন্থে উপমহাদেশীয় ইংরেজ বাহিনীর জরায়ু থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্ম গ্রহণের ইতিহাসও তুলে ধরা হয়।

০৩. ‘হাম সারাপা খায়ের বন জায়ে’ উস্তাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ আরবী فلنكن كالنحلة□□□□□□ - নামে যে পুস্তিকাটি রচনা করেছেন, তারই অনুবাদ এটি। আল-কায়েদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানহাজ বর্ণনার জন্য এটি রচনা করা হয়েছে। কট্টরপন্থি ও সীমা অতিক্রমকারীদের সঙ্গে মতপার্থক্যের আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে।

০৪. ‘পাকিস্তান মেঁ জিহাদ জারি রেহনা চাহিয়ে’ শাহাদাত লাভের কিছুদিন আগে তিনি এই পুস্তিকা শেষ করেন। এতে তিনি পাকিস্তানে জিহাদ জারি রাখার শরঈ,

ঈমানী, সামরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল প্রমাণ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

০৫. ‘মুজাহিদীন কো দর পেশ এক আহাম ফিতনা’ এতে আদদাওলাতুল ইসলামিয়া নামক গ্রুপের সঙ্গে মুজাহিদীনের মতবিরোধ এবং এই গ্রুপের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

০৬. ‘এহি হামারা রাস্তা হ্যায়’ এইমাত্র যে গ্রুপের আলোচনা করা হলো, তাদের বিপরীতে মুজাহিদীনের মানহাজ ও কর্মপন্থা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

০৭. ‘দুশমনকে খেলাফ তাইয়ারি: ঈদাদ কি হাইসিয়াত’

০৮. ‘আম্নিয়াত, কিয়া আম্নিয়াত তাওয়াক্কুল কে মুনাফি হ্যায়?’ এই বিস্তারিত আলোচনায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সতর্কতা অবলম্বন ও নিরাপত্তা কৌশলের শরঈ গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

০৯. ‘আওর ফাতাহ কি খবারেঁ আনে লাগি’ মুজাহিদীনের বিজয়ের এবং কাফের গোষ্ঠীর পরাজয়ের বিভিন্ন লক্ষণ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. ‘চেহরুঁ কি নেহি কুফরি নেজাম কি তাবদিলি মাকসুদ হ্যায়’

১১. ‘কিয়া আপ ইস জাঙ্গ মেঁ পারচামে শরীয়ত তালে খাড়ে হ্যাঁ’

১২. ‘কুফফারকে মোকাবালে মেঁ মুসলমানুঁ কি পাস্ত হাতমী আওর মারঊবিয়াতকে আসবাব আওর উনকা এলাজ’

১৩. ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মেঁ শিরকাত ও তাআউন কে চালিস তরীকে’

১৪. ‘চীন এক ‘দোস্ত’ মুলক হ্যায়’ এই আলোচনায় তিনি চীনের ইসলাম বিদ্বেষ এবং উইঘুরের মুসলিমদের উপর চীনের জুলুম-অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেছেন।

[685]

১৫. ‘আহলে পাকিস্তান ফায়সালা কুন দো রাহে পার ’-এই আলোচনায় পাকিস্তানি মুসলিমদেরকে পবিত্র শরীয়তের বরকত সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

১৬. ‘ও শের ফের হুশিয়ার হোগা ’-এই আলোচনা গোটা বিশ্বে জিহাদের বিস্তার ঘটা এবং আরব বিশ্বে নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে।

১৭. ‘খোরাসান কে জিহাদ মেঁ আল্লাহ কি নিশানিয়াঁ ’

১৮. ‘জিনহেঁ দেখকার আল্লাহ ইয়াদ আয়ে ! শায়খ সাঈদ (মুস্তফা আবূ ইয়াজিদ) রহিমাহুল্লাহ ’

১৯. জিহাদী মানহাজ ও কর্মপন্থা সবিস্তারে সুবিন্যস্তভাবে আলোচনার জন্য একটি গ্রন্থ আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। তবে গ্রন্থখানার খসড়া অনেকটাই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

২০. ‘শামশিরে বে নিয়াম ’ পাকিস্তান জিহাদ সম্পর্কে শরঈ মূল্যায়ন তুলে ধরার জন্য ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অনুরোধে শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ এই কিতাব রচনা করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর তত্ত্বাবধানে মাওলানা মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী আব্দুস সামাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ উক্ত গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজে তাতে কিছু পয়েন্ট যুক্ত করেন। গ্রন্থখানার আরবী নাম — حد السنان في قتال حكومة وجيش باكستان

২১. এক হাথ মেঁ তলোয়ার আওর এক হাথ মেঁ কুরআন (নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ ম্যাগাজিনের জন্য প্রবন্ধ)

তরজমা ও অনুবাদ

শহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ জিহাদে অংশগ্রহণ করা মাত্রই সর্বপ্রথম আরবী ভাষা থেকে উর্দুতে জিহাদী কিতাব, বই-পুস্তক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও দরস অনুবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার অনূদিত কিছু কিতাব নিম্নরূপ:

০১. صليبى صيہونى فساد اور صرف تيرے ليے اللہ اور عالمى تحريک جہاد - এই দুটি পুস্তিকা মুহসিনে উম্মাহ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর কিছু দরসের অনুবাদ নিয়ে তৈরি।

০২. اشتہارى مجرموں کى فہرست مرتب کيجئے - এটা আসলে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর প্রবন্ধের অনুবাদ। শায়খের প্রবন্ধটি হচ্ছে: قوائم محمد بن مسلمة

০৩. خلافت کن صفات کے حامل لوگوں کے ہاتھوں قائم ہوتى ہے؟ - এটিও শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর الخلافة كيف ومتى؟ প্রবন্ধের তরজমা।

০৪. جہاد کى فضيلت کے بقدر احکامات جہاد کا علم بھى حاصل کيجئے - শায়খ আবু ওয়ালিদ আল আনসারী হাফিযাহুল্লাহ এর فقه الجهاد على قدر فضله - প্রবন্ধের অনুবাদ নিয়ে তৈরি।

০৫. ايمان کے بعد اہم ترين فرض عين এটা শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর যুগান্তকারী গ্রন্থ دفاع عن أراضي المسلمين من أهم فروض الاعيان - এর অনুবাদ।

০৬. شريعت يا شہادت এটা শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে পাকিস্তানে জিহাদ ঘোষণার অনুবাদ।

[illegible]. مجاہدین کے لیے جہادی عمل سے متعلق عمومی ہدایات [illegible] التوجيهات العامة للعمل الجهادي - [illegible]

[illegible]. نصرت اسلام کی پکار [illegible] وثيقة نصرة الاسلام [illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم

[illegible]. سلسلہ دروس حديث توحيد باری تعالی - [illegible] ([illegible])

[illegible]. [illegible]

[illegible]. اپنے دين پر فخر کيجيے

[illegible]. اعداد اور نصرت الہی

[illegible]. اللہ کے وعدوں پر يقين کيجئے

[illegible]. بے مقصديت اور اس کا علاج

[illegible]. جہاد کی قبوليت کی شرائط

[illegible]. حتي لا تكون فتنة

[illegible]. حقيقت دنيا اور اخرت

[illegible]. حمد اور شکر

[illegible]. شہادت اور صبر

[illegible]. صبر ايک عظيم عبادت

[illegible]. صدق کی حقيقت

[illegible]. قلب کی حفاظت

১৬. مسلمان خاتون سے قران کو مطلوب کردار

বয়ান বক্তৃতা :

০১. ‘پاکستان میں جہاد کیوں’ - ২০১০ সালে সাহাব মিডিয়ার সঙ্গে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর ইন্টারভিউ

০২. ‘وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر’ - ২০১১ সালে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে প্রদত্ত বিবৃতি

০৩. ‘شہید ہو کے ہاں مگر نشاط دل میں بھر گیا' -২০১২ সালের শায়খ আহসান আজীজ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে শোক বিবৃতি

০৪. ২০১২ সালে কমান্ডার বদর মনসুর রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতে শোক বিবৃতি

০৫. ‘قومی مفاد اور ملکی سلامتی کی قربان گاہ پر ایک اور چڑھاوا' - ২০১২ সালে ন্যাটো ও আমেরিকান সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহে সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃতি

০৬. “برما امت مسلمہ کے سینے پر ایک اور زخم” - দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে জাতিগত নিধনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালে প্রদত্ত বিবৃতি

০৭. “بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین” - ২০১২ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্রোত এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃতি

০৮. “عجیب شخص تھا کہ جو قلم کی لاج رکھ گیا” - ২০১২ সালে মাওলানা নাসির নসীব খান রহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা আসলাম শাইখপুরী রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে বিবৃতি

০৯. “قــران کی پکــار”- ২০১২ সালে আফগানিস্তানে আমেরিকান সেনাবাহিনীর হাতে কুরআন পাকের সম্মানহানির প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান বাসীর প্রতি বার্তা

১০. ২০১২ সালে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নেতা মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখন্দযাদা রহিমাহুল্লাহ আইএসআই ’র টর্চার সেলে শাহাদাত বরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃতি

১১. “پاکستان؛ مسائل اور حل” - ২০১৩ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক হালচাল তুলে ধরে প্রদত্ত বিবৃতি

১২. “معــرک□ اســلام و جم□وریت میں فتح حق کی □وگی” - ২০১৩ সালে মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত এবং দেশে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত বিবৃতি

১৩. “حــاجی شــریعت اللّٰ□ کی زمین پر اللّٰ□ کی شــریعت س□ بغـاوت”- ২০১৩ সালে ধর্মীয় দলগুলোর বিরুদ্ধে সরকারি ক্র্যাকডাউনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি জনসাধারণের প্রতি বার্তা

১৪. “ل□و میں بھیگی ایک اور عید مبــارک □و”- ২০১৪ সালে ضرب عضب - নামক অপারেশন চলাকালে ঈদবার্তা

১৫. “اب □ی تو قتال کا وقت ایا ہے” - ২০১৪ সালে ضرب عضب - নামক অপারেশনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত বিবৃতি

১৬. ২০১৪ সালের শায়খ ইমরান আলী সিদ্দিকী (হাজী অলিউল্লাহ) রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে শোকবার্তা

জিহাদী ভিডিও

আস-সাহাব উর্দু মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারিত প্রায় সকল ভিডিও প্রকাশ , সেগুলোর বিষয়বস্তু রচনা এবং সুদীর্ঘ ডকুমেন্টারি ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লেখার দায়িত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ পালন করেন। নিম্নে আমরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতী বিষয়বস্তু বিবেচনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওর তালিকা তুলে ধরছি যেগুলো ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় :

** "امام برحق"- গাযী আব্দুর রশিদ রহিমাহুল্লাহ এবং লাল মসজিদ নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম (১৪২৯ হিজরী)

** " پاسبان حرم" - (শাহাদাত বরণকারী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে পরিচিতি মূলক ধারাবাহিক ফিল্ম ; তিনটি ফিল্ম : উস্তাদ মুহাম্মদ আফজাল রহিমাহুল্লাহ , মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহ (১৪২৯ হিজরী)

** "سات سال□ صلیبی جنگوں ک□ نتائج"- মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধের সাত বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় আস-সাহাব মিডিয়ার ডকুমেন্টারি ফিল্ম অনুবাদ (১৪২৯ হিজরী)

** " پھر س□ غز□ کی تبا□ی کی □میں تاب ن□یں" - ইসরাইল কর্তৃক গাজায় হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় আস-সাহাব মিডিয়ার ডকুমেন্টারি ফিল্মের অনুবাদ (১৪৩০ হিজরী)

** "مغرب کا تاریک مستقبل" - ২০০৭ সালে আমেরিকায আসন্ন অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে কেন্দ্রীয় আস -সাহাব মিডিয়ার ডকুমেন্টারি ফিল্মের অনুবাদ (১৪৩০ হিজরী)

** " ک□ خون صد □زار انجم س□ □وتی ہے سحر پیدا" - গোটা বিশ্বে মুসলিমদের উপর নির্যাতন -নিপীড়ন বিশেষ

করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতন - নিপীড়ন নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম (১৪৩১ হিজরী)

** "یہ جہاد فرض عین ہے پھر تردد کیسا" - ২০১০ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন সিআইএ'র ঘাঁটিতে আত্মউৎসর্গী হামলাকারী জর্ডানি মুজাহিদের অসিয়ত অনুবাদ (১৪৩১ হিজরী)

** "بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے" - পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপরাধসমূহ নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম (১৪৩৩ হিজরী)

** "جاء الحق وزهق الباطل" - কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ডকুমেন্টারি ফিল্ম (১৪৩৩ হিজরী)

** " شریعت یا جمہوریت " - গণতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচনের জন্য একটি ছোট তথ্যচিত্রের সিরিজ

দাওয়াতী চিঠিপত্র

উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিপত্র

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আল-কায়েদার পাকিস্তানি দায়িত্বশীল হিসেবে পাকিস্তানের বড় বড় উলামায়ে কেরাম এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতি দাওয়াতী চিঠিপত্র প্রেরণ করেন। সাধারণভাবে তার চিঠিগুলোর ইতিবাচক উত্তর এসেছে এবং উলামায়ে কেরাম তার আবেগ উদ্দীপনাকে মূল্যায়ন করেছেন। ওই চিঠিপত্রের দ্বারা তার দাওয়াতী গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে , উলামায়ে কেরামের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ও মুহব্বতের

দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। এই ধারাবাহিকতায় যে সমস্ত চিঠিপত্র তিনি প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কিছু বিস্তারিত আলোচনা সংবলিত এবং কিছু সংক্ষিপ্ত। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ লিখিত এই চিঠিপত্র তার একনিষ্ঠতা লিল্লাহিয়াত ও অন্তরের অস্থিরতার কথা তুলে ধরে। চিঠিপত্রগুলো তার মাঝে থাকা হিকমত প্রজ্ঞা বুদ্ধিমত্তা দাওয়াতী আদব ও ভদ্রতার রুচিবোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কারণে শুধু নমুনা হিসেবে শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাহুল্লাহ-এর খেদমতে প্রেরিত ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর একটি পত্র এই কিতাবে তুলে ধরা হলো:

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাহুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রবিউস সানী ১৪৩৩ হিজরী

মুহতারাম জনাব মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাহুল্লাহর খেদমতে

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে দোয়া করি, এই পত্রটি যেন আপনি সর্বোত্তম ঈমানী ও দৈহিক সুস্থ অবস্থায় হাতে পান। আল্লাহ তাআলা আপনার ইলমি ব্যস্ততা, সময়, আমল, পরিবার-পরিজন এবং অর্থ সম্পদে আরও অধিক বরকত দান করুন। আপনাকে দেখা- অদেখা সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাযত রাখুন। আপনার সৎকর্ম এবং উত্তম প্রচেষ্টাগুলো কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। তিনি আমাদের প্রতি এবং আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, আমীন।

[693]

মুহতারাম মুফতী সাহেব!

আজ ১৪৩৩ হিজরীর রবিউস সানী মাসের এই সময়ে অধম বান্দা আপনার কাছে কিছু লাইনের মাধ্যমে সম্বোধন করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমরা নিজেরা আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আপনার পায়ের কাছে বসে দোয়া-নসীহত ও দিকনির্দেশনা লাভ করবো। মসজিদ মাদরাসার নূরানী পরিবেশে বসে অন্তর জগতের কিছু পাথেয় গ্রহণ করবো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাক্ষী, মনের এই তীব্র বাসনা সত্ত্বেও আমাদের অবস্থা এ কাজের অনুকূল নয়। এ সময়ে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং একাকী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধানাবলী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা এমন অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে অভিযুক্ত হলে আল্লাহর অক্ষম দুর্বল মুজাহিদ বান্দাদেরকে প্রথমে শহর ছেড়ে জঙ্গল ও পাহাড় পর্বতে চলে যেতে হয় এবং সেখানেও মাথার ওপর ড্রোন বিমান এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত স্থল বাহিনী ছুটে চলে। এভাবেই তারা আল্লাহর বান্দাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। এটাতো আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি কারাগারের ছোটো কুঠুরিতেও কোনো মুজাহিদকে প্রশান্তি ও মানসিক স্থিরতা দান করেন এবং পৃথিবীর সকল নেয়ামত কাছে থাকা সত্ত্বেও বদ দীন কাফেরের জীবন সংকীর্ণ করে দেন। এজন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সংকীর্ণতার মাঝে আজব রকমের প্রশস্ততা রয়েছে। এই হিজরতের জীবনেও এক বিস্ময়কর প্রশান্তি রয়েছে। এই ক্লান্তি ও কষ্টের মাঝেও এক অবর্ণনীয় স্বাদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ফিতনা-ফাসাদের যুগে ঈমানের ওপর অটল রাখুন এবং ঈমানের ওপরেই আমাদের দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটান আমীন। অতএব আপনি আমাদের অপারগতা কবুল করে নিন। মুজাহিদীনের

[694]

এই প্রতিকূলতা এবং শত্রুপক্ষের শক্তি খর্ব করার জন্য দোয়া করুন।

আমার মুহতারাম মুফতী সাহেব!

অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল মনের উদ্দীপনা ও অনুভূতিগুলো উপযুক্ত কারও মাধ্যমে আপনার কাছে পৌছাবো, কিন্তু কোনো মাধ্যম বা পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সর্বদাই মনে হয়েছে অপরিচিত কারও মারফত চিঠি পাঠালে সম্ভবত আপনি সত্যতার ওপর ভরসা না করায় জবাব দেবেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে আল্লাহ তাআলা একটি পথ দেখান। তাই আল্লাহর সাহায্যে এই কয়েকটি লাইন আপনার সম্মুখে রয়েছে।

হে আমার শ্রদ্ধেয় অভিভাবক এবং স্নেহশীল গুরু!

আপনার গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করে আমি অধম বান্দা সরাসরি না হলেও এক মাধ্যমে আপনার শিষ্যত্বের মর্যাদা অর্জন করে। তিরমিযী শরীফের শরাহগুলো (দরসে তিরমিযী এবং তাকরিরে তিরমিযী) উভয় কিতাবের চমৎকার চমৎকার লেখাগুলো পাঠ করেছি। তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়নের তাওফীক হয়েছে। জিহাদ ও ইমারত সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো আলাদা মনোযোগ দিয়ে পড়া হয়েছে। খুবই উপকার পেয়েছি। এখন বুখারী শরীফের ব্যাখা গ্রন্থ ইনআমুল বারি'ও দেখতে শুরু করেছি। কিতাবুল ইলম অধ্যায়ের কিছু অংশ চোখে পড়েছে। এমনিভাবে ইসলাহী খুতুবাত, জাহানে দিদাহ, সিয়াসাতে শারঈয়্যাহ, তাকলীদ কি শারঈ হাইসিয়াত সহ আরও কিছু কিতাব পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে। কোনো লৌকিকতা কিংবা কৃত্রিমতা ছাড়াই বলতে চাই, নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এই সমস্ত কিতাব অনেক উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে ফাতহুল মুলহিম পাঠ করার দ্বারা তো প্রত্যেকবারই

[695]

এক বিস্ময়কর বক্ষ উন্মোচন অনুভূত হয়েছে। আমি মুজাহিদ সাথিদেরকেও দৈনন্দিন জীবনের আদব-আখলাক সম্পর্কিত কয়েকটি অধ্যায় সেই সঙ্গে জিহাদ ও ইমারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ফাতহুল মুলহিম থেকেই পড়াই। নিঃসন্দেহে এটি ভারতবর্ষের উলামায়ে কেরামের লেখা সর্বোৎকৃষ্ট হাদীস-ব্যাখ্যা গ্রন্থের মাঝে গণ্য। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থকে উম্মাহর জন্য উপকারী প্রমাণিত করুন এবং আপনার মর্যাদা উন্নতির কারণ বানিয়ে দিন, আমীন।

হে আমার প্রিয় মুহতারাম!

এই পত্র লেখার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা আরজ করা যে, মিডিয়া এবং কিছু ফিতনাবাজ লোক সোয়াত উপত্যকা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্রীয় অঞ্চলের মুজাহিদীনের ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলে বেড়ায়। সরাসরি যোগাযোগ না থাকার কারণে কখনও কখনও উলামায়ে কেরামের মাঝে কেউ কেউ সে সমস্ত কথা বিশ্বাস করে নেন। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে আমাদেরই ত্রুটি, আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হইনি। কিন্তু এর কারণ পূর্বেও হযরতের কাছে তুলে ধরেছি; পরিস্থিতির প্রতিকূলতার কারণে বিগত দশটা বছর উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করা আমাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপরেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যোগাযোগ উন্নয়নের প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়েছি এবং আলহামদুলিল্লাহ উল্লেখযোগ্য উলামায়ে কেরামের দোয়া ও সমর্থন হাসিল করার সৌভাগ্য হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আপনার কাছে চিঠিপত্র প্রেরণ।

হযরতের কাছে আমাদের বুনিয়াদি দরখাস্ত হলো, আপনি আমাদেরকে আপনার থেকে পৃথক মনে করবেন না। আমরা আপনারই সন্তান। আপনি মিম্বর মেহরাবের মাধ্যমে শরীয়তের যে সমস্ত হুকুম আহকাম ও বিধি-বিধান উম্মাহর কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, সেগুলো বাস্তবে

[696]

প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করার জন্যই আমরা প্রচেষ্টারত। প্রকৃতপক্ষে তাওফীকদাতা তো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। নাউযুবিল্লাহ আমরা কখনোই দীন ইসলাম ও স্বদেশের শত্রুদের এজেন্ট নই। শুধু আবেগ উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে ফিতনা বিস্তারকারী কোনো গ্রুপও নই। আমাদের দাওয়াত এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট। সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ যে দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাদেরও সেই একই দাওয়াত। আমাদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৬৫ বছর পরেও এই দেশ ফিরিঙ্গি দালালদের থেকে মুক্ত হতে পারেনি এবং এই অঞ্চলে ইসলামের কোনো একটি শাস্তি বিধানও কার্যকর হয়নি। আমাদের লক্ষ্য আল্লাহর ভূখণ্ডে আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; এছাড়া অন্য কিছু নয়। বিক্ষিপ্ততা, বিভক্তি, জাতীয় ও ভাষাগত বিরোধ, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের শিকার আমাদের এই রাষ্ট্র, যেই কালিমায়ে তাইয়্যেবার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই মহান কালেমা যেন এখানে বাস্তবায়িত হয়। শরীয়তী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দাবি করার অপরাধে আমাদেরকে নিজেদের গৃহ থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছে। আমাদের গোত্রীয় অঞ্চলের ভাইদের বসতি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের গোপন এজেন্সির জেলে আমাদের সাথি ভাইয়েরা; এমনকি আমাদের উলামায়ে কেরাম ও দাওয়াতী অঙ্গনের সাধকদেরকে নগ্ন করে নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হয়েছে। আমাদের মা-বোনদেরকেও এই জুলুম-অত্যাচার থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। তারাও জেলে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে, তাদের সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় আমরা আশ্রয় পেয়েছি সেখানকার শত শত মসজিদ শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ড্রোন হামলার মাধ্যমে আমাদেরকে শিকার করার জন্য

[697]

আমেরিকার সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করা হয়েছে। একদিকে আমেরিকা এবং তার মিত্র জোট তাদের টেকনোলজি নিয়ে আমাদের উপর হামলা করেছে, অপরদিকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারতকে বন্ধু রাষ্ট্র অভিহিত করে ভারত সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। আজ আমাদের সঙ্গে ঠিক সেই আচরণ করা হচ্ছে, যেমনটা আসহাবে কাহাফের ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে:

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَـــرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُـــوْكُمْ اَوْ يُعِيْـــدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا

তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। (20)

আমাদের সামনে শুধু দুটি পথ খোলা রাখা হয়েছে — ফিরিঙ্গিদের চাপিয়ে দেয়া শাসক শ্রেণির আদর্শ মেনে নিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদী ধারায় ফিরে আসা অথবা জীবন বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। কিন্তু ইনশাআল্লাহ যেই প্রভু এখন পর্যন্ত ইস্তিকামাত তথা অবিচলতা দান করেছেন, প্রতিটি নাজুক মুহূর্তে সাহায্য করেছেন, তিনি সামনেও আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। যিনি ইরাকে আমেরিকাকে মাটিতে নাক ঘষে পালাতে বাধ্য করেছেন, ইনশাআল্লাহ তিনি আমেরিকা এবং তার সকল আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মিত্র বাহিনীকে খোরাসানেও পরাজিত করবেন।

আপনার কাছে শুধু এতোটুকুই আবেদন, আমাদেরকে আপনার দোয়া থেকে মাহরুম করবেন না। অন্তরে আমাদের ব্যাপারে যদি কোনো দ্বিধা সংশয় থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে সেটা দূর করে নিন। আমরা আপনার সন্তান ও শিষ্য। ইনশাআল্লাহ সময় এ কথা প্রমাণ করে দেবে, এই অঞ্চলে উলামায়ে কেরাম এবং দীনদারদের প্রকৃত নিরাপত্তার পেছনে আল্লাহ তাআলার সাহায্য -

সহযোগিতার পর এই মুজাহিদীনেরই ভূমিকা ছিল, থাকবে। সেই সঙ্গে আমাদের আরও দরখাস্ত হচ্ছে, আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ইলমি দিকনির্দেশনা। আমাদের সামনে পাহাড়ের মতো এত বড় বড় মাসায়েল আসে, যেগুলো সমাধান করার জন্য উলামায়ে কেরামের কমিটি বসতেও কেঁপে যায়। সে সমস্ত বিষয়ে সমাধানের জন্য আপনার ইলমি দিকনির্দেশনা খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি আপনার বক্ষকে আমাদের জন্য উন্মোচন করে দিন এবং আমাদের মাথার উপর আপনার ছায়া দীর্ঘায়িত করুন, আমীন।

এই জিহাদী আন্দোলন আপনারই আন্দোলন। এখানে যখনই কোনো ত্রুটি, অসঙ্গতি, দুর্বলতা আপনার চোখে পড়বে, তখনই আপনার ভদ্র সন্তান মনে করে আমাদেরকে সংশোধন করে দেবেন এবং কান ধরে ভুল শুধরে দেবেন। ইনশাআল্লাহ আপনি দেখবেন, আল্লাহর সীমারেখা আমরা কিছুতেই লঙ্ঘন করবো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার ইলম, মাল-দৌলত সন্তান-সন্ততি সময় ও কাজ-কর্ম— সব কিছুর মাঝে বরকত দান করুন এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আপনাকে হেফাযত করুন, আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

উলামা ও মুজাহিদীনের খাদেম

আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ

[আল-কায়েদা পাকিস্তানের দাওয়াত ও প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বশীল]

[699]

দ্বাদশ অধ্যায়:
সৌভাগ্যময় শাহাদাত

উম্মাহর বড় বড় আল্লাহ ওয়ালাদের মতো ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শেষ জামানা ঈমানী আবেগ উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সিঁড়ি অতিক্রমের সময় ছিল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন আখিরাতের সফরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ওই সময়টাকে তিনি এমন কিছু ইঙ্গিত দান করেন, যা দ্বারা বোঝা যায়, তার কাজ পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে এবং পরের জগতে পাড়ি জমানোর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। নির্যাতন-নিপীড়নের প্রবাদ হয়ে ওঠা, দীন ও জাতির শত্রু সেনাবাহিনীর উত্তর ওয়াজিরিস্তান অপারেশন দিয়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের ঘটনা শুরু হয়।

জরবে ওজব অপারেশন
২০১৪ সালে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমেরিকার সাহায্য-সহযোগিতায় বিরাট অপারেশন আরম্ভ করে। হাটে- বাজারে এবং ঘর-বাড়ির ওপর জেট বিমান দিয়ে কয়েক টন ওজনের গোলা বর্ষণ করা হয়। সেই সঙ্গে গোটা

[700]

উত্তর ওয়াজিরিস্তানের অধিবাসীদেরকে বান্নু ও শহরতলিতে চলে যেতে বলে। উত্তর ওয়াজিরিস্তানের অধিবাসীদের একটা বড় অংশ পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দেখানো পথ দিয়ে লাঞ্ছিত অবস্থায় নিজেদের অঞ্চল ত্যাগের চেয়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ে গিয়ে হিজরতের জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশিষ্ট অংশ এক মাস সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে অপমানিত অবস্থায় পাকিস্তানের অন্যান্য জেলায় চলে যায়।

ক্রুসেডার এবং তাদের সহযোগীদের কৌশল
উত্তর ওয়াজিরিস্তানে অপারেশনের পরিকল্পনা আমেরিকা এবং তাদের তাবেদার পাকিস্তানি আর্মি যৌথভাবে তৈরি করে। পরিকল্পনা এমন ছিল—সর্বপ্রথম ওয়াজিরিস্তানের বসতির ওপর নির্মমভাবে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করা হবে। ফলে গোত্রীয় এলাকার জনসাধারণ সে জায়গা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এভাবেই উক্ত অঞ্চল খালি হয়ে যাওয়ার দ্বারা মুজাহিদীন জনসাধারণের সহায়তা ও আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে একা হয়ে যাবে। অপরদিকে অপারেশনের ঘোষণা করে এজেন্সিতে দীর্ঘ কারফিউ জারি করা হবে এবং বান্নু জেলার দিক থেকে স্থল হামলা শুরু হবে। ফলে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুজাহিদীন ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে আফগানিস্তান-বর্ডারের পাহাড়ি এলাকায় জড়ো হতে বাধ্য হবে।

এভাবে অবরুদ্ধ জায়গায় মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দকে খোঁজ করা আমেরিকার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে এবং তারা বেছে বেছে নেতৃবৃন্দের উপর হামলা করতে পারবে।

[701]

মুজাহিদীনের কর্ম পন্থা কর্মকৌশল
কোনো গেরিলা আন্দোলনে যে পক্ষের শক্তি সামর্থ্য ও সরঞ্জামাদি কম, তাদের জন্য কোনো দেশের রেগুলার আর্মির সরাসরি মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার সমীচীন নয়। অ্যাম্বুশ সিস্টেমের যুদ্ধে মূলনীতি হলো: শত্রু যখন ছড়িয়ে পড়ে, মুজাহিদীন তখন এক জায়গায় সরে আসে; আর শত্রুপক্ষের তুফান যখন বন্ধ হয়ে যায় এবং কোনো অঞ্চল দখল করে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে যায়, তখন গেরিলা বাহিনীর দায়িত্ব শুরু হয়; তারা গুহা থেকে বের হয়ে শত্রুর একেকটা শিরার ওপর হামলা করে। শত্রুর বড় হামলার সময় ভূমি রক্ষার জন্য এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকা গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধের মূলনীতি নয়। বরং পিছু হটে নিজেদের সরঞ্জাম ইত্যাদি বাঁচিয়ে স্থান ও কৌশল পরিবর্তন করে যুদ্ধ করা শুরু থেকেই গেরিলা বাহিনীর নেতৃবৃন্দের কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। আধুনিক যুদ্ধগুলোর ইতিহাস এ কথার সাক্ষী—বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আফগানিস্তান জিহাদে মহান তালেবান মার্কিন হামলার সময় যেভাবে পিছনে সরে এসেছে এবং পুনরায় সারিবদ্ধ হয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে, সে যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যে আজ আঠারো বছর পরে তালেবান ইতিপূর্বে যেকোনো সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত এবং আফগানিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল তাদের দখলে।

কিন্তু তার অর্থ এই নয়, শত্রুপক্ষের হামলার সময় মোটেও প্রতিরোধ করা যাবে না; বরং একেবারে পিছনে সরে আসার চেয়ে ধীরে ধীরে শত্রুর ক্ষয়-ক্ষতি করতে করতে পেছনে সরে আসা উচিৎ। একে সমর শাস্ত্রের পরিভাষায় ট্যাক্টিক্যাল উইথড্রয়াল বলা হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে করতে ধীরে ধীরে পেছন দিকে সরে আসা। এটাও সে সময় সম্ভব যখন মুজাহিদীনের কোমরের দিকে দীর্ঘ পাহাড়ের সারি অথবা নিরাপদ এলাকা [702]

থাকে। কৌশল অনুযায়ী পেছনে সরে আসার সময় শত্রু পক্ষের উপর ভারী অস্ত্র দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করা, শত্রু কাফেলার ওপর আঘাত হানা, মাইন বিস্ফোরণে শত্রুপক্ষের গাড়ি উড়িয়ে দেয়া এবং বড় রেঞ্জের বন্দুক দিয়ে শত্রুর সৈন্যদেরকে ঘায়েল করার নিয়ম রয়েছে। সেই সঙ্গে পেছনে সরে এসে শত্রুকে সুযোগ দেয়া হয়, যেন তারা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং মুজাহিদীনের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। এরপর শত্রু পক্ষের এমন অবস্থা হয় যে, হামলা তো নিজ ইচ্ছায় করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে নিজ ইচ্ছায় সে অঞ্চল থেকে সরে আসার সুযোগ তাদের হয় না।

মুজাহিদীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ওয়াজিরিস্তানে অপারেশন আরম্ভ হওয়ার পর মুজাহিদীন উপর্যুক্ত মূলনীতি সামনে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করে আমেরিকার আজ্ঞাবহ সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের পরিকল্পনা তৈরি করে। পরিকল্পনা মোতাবেক মুজাহিদীনের একটা দল ওয়াজিরিস্তানের পূর্ব দিকে চলে গিয়ে সেনাবাহিনীকে ফাঁদে ফেলে আক্রমণের দায়িত্ব পান। ওই পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্র ছিল মীর আলী। সেখানে মুজাহিদীন একদিকে সেনা কাফেলাকে আঘাত হানায় এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য বিস্ফোরণে রত থাকেন; অপরদিকে নিজেদের সরঞ্জাম ও পরিবার-পরিজনকে নিরাপদে পশ্চিম দিকে আফগান বর্ডারের পাহাড়ের গুহায় সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে থাকেন। অপারেশন আরম্ভ হবার প্রায় দুই মাস পর্যন্ত মীর আলী, খাইসুর, স্পিনওয়াম এলাকায় সেনাবাহিনীকে কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়।

[703]

পরবর্তীতে ওই অঞ্চল থেকে জনসাধারণ সরে যাবার পর মুজাহিদীনকেও পশ্চিম দিকের সীমান্তবর্তী এলাকায় ডেকে আনা হয়। তারা এখানে ডায়াগন دیگون ک□ علاق□ میں دفــاعی مراکز قــائم کــی□ >(((৪২১ নম্বর পৃষ্ঠার ৯ /১০ নম্বর লাইন)))> এলাকায় প্রতিরক্ষা কেন্দ্র তৈরি করে। আনসার মুহাজির সকলে মিলে ইংরেজদের তাবেদার সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের লক্ষ্যে লড়াই শুরু করেন। কিন্তু এরই মধ্যে আমেরিকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুপ্তচরদের মাধ্যমে মুহাজিরদের সামরিক কেন্দ্র টার্গেট করে ড্রোন হামলা করে। এতে আরব ও উপমহাদেশীয় মুজাহিদীনের কেন্দ্রে মুহাজিরদের স্থল ভাগের কয়েকজন নেতা শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মাঝে আল - কায়েদার একজন সামরিক দায়িত্বশীল শহীদ মাহদি কুর্দি রহিমাহুল্লাহ , শহীদ তাজ মাক্কি রহিমাহুল্লাহ , পাকিস্তানিদের মধ্যে করাচির ইঞ্জিনিয়ার সুহাইল রহিমাহুল্লাহ , গুজরাটের আযযাম রহিমাহুল্লাহ এবং কাশ্মীরের উস্তাদ ইঞ্জিনিয়ার হাফেজ সাআদ রহিমাহুল্লাহ সহ বেশ কিছু মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

এরপর থেকে আমেরিকার ড্রোন হামলা অনেক বেড়ে যায় এবং ক্রমাগত ড্রোন হামলা চলতে থাকে। এই অপারেশনে আমেরিকা প্রধানত আল-কায়েদার মুজাহিদীনের সামরিক কেন্দ্রগুলোতে এবং দায়িত্বশীলদেরকে টার্গেট করে হামলা করতে শুরু করে।

এই অবস্থায় আল -কায়েদা -নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে , ড্রোন হামলা থেকে নিরাপত্তার জন্য আমাদের সাথিদেরকে , নেতৃবৃন্দকে এবং সরঞ্জামের বড় অংশ আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের নিরাপদ অঞ্চলে স্থানান্তর করাই উপযুক্ত। সেই সঙ্গে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য আমাদের একদল সাথি ওয়াজিরিস্তানে থেকে স্থানীয় ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাবেন।

এটা খুবই দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। হাজার হাজার মুজাহিদ নারী-শিশুদেরকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াজিরিস্তান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। কারণ জায়গায় জায়গায় সেনাবাহিনী বসে থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছিলো। আকাশে মার্কিন ড্রোন ও মিসাইল যুদ্ধের জন্য ঘোরাঘুরি করছিল। অপরদিকে মুজাহিদীনের জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের বিরাট বোঝা নিরাপদে অন্যত্র স্থানান্তর করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্যেই মুজাহিদীনের স্নেহশীল মহান নেতা, ধৈর্য অবিচলতা ও বীরত্বের পাহাড়, করাচির হাজী ওলীউল্লাহ ইমরান সিদ্দিকী রহিমাহুল্লাহ তার কিছু সাথি সহচরসহ ওয়াজিরিস্তান থেকে বের হবার পথে আমেরিকার ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন।

শেরে খোদা সাইয়েদুনা আলী মুর্তাজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো কীর্তি
হিজরতের সফরে বিশ্ব জগতের সরদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় ব্যক্তি শেরে খোদা আলী মুর্তাজা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফেলে যাওয়া কাজ ও আমানতগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে মদীনায় আসেন। হযরত আলী হায়দার রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই কাজ খুবই বিপজ্জনক ও আত্মঘাতী ছিল। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের জীবন হাতে নিয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সফরকে নিরাপদ করতে সাহায্য করেন। এভাবেই তার এই কাজ কিয়ামত পর্যন্ত উচ্চ মনোবল সম্পন্ন যুবকদের জন্য নমুনা

[705]

হয়ে যায়। যুদ্ধের এই বিশেষ পর্যায়ে আমাদের প্রিয় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহও সাইয়েদুনা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো ভূমিকা পালন করেন।

আল-কায়েদা-নেতৃত্ব মুজাহিদীন, তাদের পরিবার এবং নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধের এলাকা থেকে নিরাপদে বের করে দেয়ার দায়িত্ব ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে প্রদান করে। সেই সঙ্গে সামানপত্র এবং প্রতিরক্ষা যুদ্ধে নিয়োজিত অবশিষ্ট সাথিদের পরিচালনার দায়িত্বও প্রদান করা হয়। তার সঙ্গে অচলতার পাহাড় সাহসিকতার প্রতীক মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ ইমরান রহিমাহুল্লাহকে এই কাজে সহকারী নিযুক্ত করা হয়।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে এজাতীয় কাজ ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদ ঘেরা। কিন্তু এতটা কঠিন অবস্থাতেও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মতো নেতার উপস্থিতির খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। অবস্থার ভয়াবহতা তার অবিচলতা ও মনোবলকে কিছু মাত্র কমিয়ে দিতে পারেনি। উল্টো তিনি অধিক আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করেই সকল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

শাওয়াল উপত্যকায় অবস্থান
এ সময় তিনি শাওয়াল উপত্যকার এক গৃহে কেন্দ্র স্থাপন করেন। শাওয়াল এলাকা একদিকে আফগানিস্তানের সীমান্তের সঙ্গে মিলে যায় অপরদিকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ওয়ানা (ভানা) এলাকায় যাওয়ার পথও সেটা। এখানে বসে উভয় দিকে মুজাহিদীনকে গাইড দেয়া তার জন্য সম্ভব ছিল।

তিনি এই সময়ে সাথিদের সফরের পরিকল্পনা করতেন। তাদের পথের খরচ এবং ভবিষ্যতের জন্য জিনিসপত্র

[706]

দিয়ে দিতেন। সাথিদেরকে পরস্পরে সংযুক্ত রাখার জন্য ব্যবস্থা বলে দিতেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই বিপদে সর্বাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন, আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আস্থা এবং অটলতা অবিচলতার উপদেশ দিতেন। অপরদিকে ওই জায়গাটাতে তার অবস্থান অন্যান্য সাথি বিশেষ করে যুদ্ধফ্রন্টের সাথিদের জন্য আশা ও মনোবল বৃদ্ধির বাতিঘর ছিল।

শাওয়াল উপত্যকায় নিচ দিয়ে ড্রোন ফ্লাই এরই মধ্যে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কেন্দ্রে সাথিদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। রোজই সামানপত্র এবং মানুষ বোঝাই গাড়ি ওখানে আসতো এবং দিকনির্দেশনা নিয়ে সামনের দিকে বিদায় হয়ে যেত। এদিকে শাওয়াল উপত্যকায় অস্বাভাবিক রকম বেশি মাত্রায় ড্রোন বিমান নিচে দিয়ে ফ্লাই করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তিনি জিদ ধরেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল সাথি —বিশেষভাবে আরব দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ না বের হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও বের হবো না।

ওই সময় আমি অধম খাইবার এজেন্সি অভিমুখী সফরে যাওয়ার পথে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে পৌঁছি। এভাবেই ভাইয়ের শেষ জীবনের কিছু সময় তার সঙ্গে কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়। তিনি আমাদের সফরের আগাগোড়া পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করে দেন এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। সে সময় আমি জোরালোভাবে আবেদন করি, অনুগ্রহ করে তিনি যেন এখান থেকে বের হয়ে নিরাপদ কোথাও চলে যান। এখানে অনেক সাথি রয়েছেন এবং যে কেউ কাজগুলো করে দিতে পারবেন। কিন্তু তিনি মুচকি হেসে আমাকে জবাব দেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু আরব বুযুর্গ এখানে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদে এখান থেকে তাদের রওনা হওয়া সম্ভব না হবে, আমিও [707]

কিছুতেই বের হবো না। ” আসলে ওই সময় খুব বেশি মাত্রায় ড্রোন বিমানের কারণে কিছু আরব হযরতের রওনা হতে দেরি হচ্ছিলো। কিন্তু কিছু সাথি অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় তিনি নিজে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চাচ্ছিলেন না। তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই গুণের কথা স্মরণ হয় :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ

অর্থ : “তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয় যদিও নিজেরা অভাবের মধ্যে থাকে। ” [97]

সাথি ভাইদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয়া

ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যে গৃহে থাকতেন সেখানে একটি মজবুত পরিখা বানানো হয়েছিল। যখনই আকাশে বিমানের আওয়াজ শোনা যেত তৎক্ষণাৎ তিনি সকল সাথিকে গুহায় ঢুকে যেতে বলতেন। কিন্তু তাঁর উপর শাহাদাতের আগ্রহ এমনভাবে ছেয়ে যায় , তিনি নিজের জীবনের কোনো পরোয়া না করে অন্য সাথিদেরকে সতর্কতা অবলম্বন এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে অবহেলা না করার জন্য দিকনির্দেশনা দিতে থাকতেন। সাথিদের সফরের ব্যাপারে , বেশভূষার ব্যাপারে - এক কথায় বিস্তারিতভাবে সকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন। কিন্তু কয়েকবার এমন হয়েছে যে , আকাশে জেট বিমান ঘুরছে এবং সামনে - পেছনে বোম্বিং চলছে কিন্তু তিনি নিশ্চিন্তে কাজে ব্যস্ত। বাধ্য হয়ে কখনও যদি পরিখায় নামতেও হতো তাহলেও সবার শেষে নামতেন এবং সবার আগে বেরিয়ে আসতেন।

আমার মনে হয় তার এই দৃষ্টিভঙ্গি তার পূর্বের রুচি প্রকৃতির বিপরীত ছিল। এর আগে তিনি

[97] সূরা হাশর , আয়াত নং: ০৯

নিরাপত্তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। সতর্কতা অবলম্বনকে ঐশী নির্দেশনা মনে করতেন এবং জিহাদী কাজের পূর্ণতার জন্য একে আবশ্যকীয় জানতেন। কিন্তু এই শেষ সময়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধু এক বিশেষ অনুভবের কথাই বোঝা যায়। তার কাজ-কর্ম দিয়ে যেন তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, আমি আমার কাজ সম্পূর্ণ করেছি। এখন আমার যাত্রার সময় এসেছে। » এ কারণে আমি ওই সময়ের আগে তাকে এতটা নিশ্চিন্ত ধীর স্থির সম্ভবত কখনোই দেখিনি। শেষের এই গোটা সময়টাতে আমি তার মধ্যে দুশ্চিন্তার কোনো চিহ্ন দেখিনি।

মার্কিন ফাঁদের গুজব ইত্যবসরে স্থানীয় সূত্রে একটা তথ্য পাওয়া যায়। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ঘর যে এলাকায়, সেখানে নাকি আমেরিকানরা কোনো বিশেষ টার্গেটের উপর হামলা করার পরিকল্পনা করছে। বাহ্যিকভাবেই ওই এলাকায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কেন্দ্র ছাড়া মুজাহিদীনের অন্য কোনো কেন্দ্র ছিল না। সেজন্য সাথিরা তাঁকে ওই ঘর ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেয়। সে সময় ওই ঘরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহান চিন্তাবিদ মুবাল্লিগে জিহাদ আযযাম আমরিকী

98রহিমাহুল্লাহ। সিদ্ধান্ত হয়, এই
দুই হযরত পৃথক পৃথক জায়গায় চলে যাবেন। কিন্তু বাইরে ড্রোন বিমান ঘোরাঘুরি করায় সে সময় বের হওয়াটাও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

98 আমেরিকার নাগরিক আদম ইয়াহিয়া গাদান। তিনি আযযাম আমরিকী নামে পরিচিত। তিনি ১৯৯৫ সালে আমেরিকায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তালেবানের শাসনামলে হিজরত করে আফগানিস্তানে আসেন। হিজরতের পর তিনি আরবি ভাষা শিক্ষা ও শরিয়া জ্ঞান অর্জনে মনোযোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি আস সাহাব মিডিয়াতে যুক্ত হয়ে ইংরেজি ও আরবি ভাষায় দ্বীনী দাওয়াতের কাজ করতে থাকেন। অসামান্য মেধা এবং শরিয়া ইলমের পরিপক্কতায় তিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ফারুক ভাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাহাদাতের কিছুদিন পর জানুয়ারি ২০১৫ সালে তিনিও মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমীন!!

[709]

এরই মধ্যে মিডিয়াতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের সংবাদ প্রচার হয়। সাংবাদিকরা এ নিয়ে বিরাট রিপোর্ট করে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ ছিলেন। এ ঘটনায় তিনি বুঝে যান, এভাবে গুজব রটিয়ে শত্রুপক্ষ তাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। শত্রুরা একথা ভাবাতে চাচ্ছে, তারা তাঁর ঠিকানা জানে না, অথচ তারা জানে।

মেহসুদ পাহাড়-সারি: ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শেষ নির্বাচন এক সপ্তাহে যখন ড্রোন কম দেখা যাচ্ছিলো, তখন তিনি ওখান থেকে বের হয়ে অন্য একটি স্থানে চলে যান। স্থান পরিবর্তনের পর তার কাছে দুটো অপশন ছিল: আফগানিস্তানে নিরাপদ অঞ্চলে বের হয়ে যাওয়া অথবা পুনরায় ওয়াজিরিস্তানের আরও ভেতরে মেহসুদ ডেরায় চলে যাওয়া। তিনি সে সময় মেহসুদ অঞ্চলের মাকিন এলাকার দূরবর্তী ডেরায় চলে যাওয়ার অপশন বাছাই করেন। মৌলিকভাবে এই বাছাইয়ের কারণ ছিল: মেহসুদ মুজাহিদীনের সঙ্গে আস্থা পূর্ণ সম্পর্কে। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি ওই সময়টাতে ওয়াজিরিস্তানের যুদ্ধ ফ্রন্টে অবস্থানকারী ভাইদের থেকে বেশি দূরে যেতে চাচ্ছিলেন না। মেহসুদ অঞ্চলের বরফ ঢাকা পাহাড় থেকে বের হয়ে দীর্ঘ ডেরা মাকিন শহর পর্যন্ত যায়। উল্লেখ্য যে, মেহসুদ অঞ্চলে চলে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন মুজাহিদীনের বুযুর্গ চিন্তাবিদ মেহসুদ মুজাহিদীনের একজন স্নেহশীল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতা মাস্টার আজম তারেক মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ-কমান্ডার খালেদ সাঈদ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর পরামর্শে। যদিও তিনি ওয়াজিরিস্তানে তার আট বছর অবস্থানকালে সেখানকার চারটা বড় বড় গোত্র অর্থাৎ আহমদ যাঈ

[710]

ওয়াজির, ইতমান যাঈ ওয়াজির, মেহসুদ ও দাওয়ারী উপজাতির এলাকা দিয়ে সময়ে সময়ে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং এই চার গোত্রের বড় বড় মুজাহিদ ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, দাওয়াত, সংস্কার, সামরিক বিষয়ে তাদের পরামর্শ সভায় তিনি থাকতেন, যথাসম্ভব সকল মুজাহিদের সঙ্গে সহযোগিতা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ করতেন। কিন্তু এসব কিছুর ভেতরে মেহসুদ গোত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক মুহব্বত ভালোবাসা ও আস্থা সবচেয়ে বেশি ছিল। যেহেতু তিনি নিজের জীবনের শেষ দিনগুলো এখানে কাটিয়েছেন, তাই এ সম্পর্কে কিছু আলোচনায় তাঁর সঙ্গে মেহসুদ গোত্রের মুজাহিদীনের বিশেষ সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরবো।

২০০৬ সাল থেকেই মেহসুদ গোত্রে তার যাতায়াত শুরু হয়। শুরুতে আরব হযরতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরামর্শ কিংবা নৈতিক প্রশিক্ষণের ক্লাসগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য এখানে আসতে হতো। কিন্তু ২০০৮ সালে যখন তার সাথিদের ওপর দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ভানাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুপ্তচরবৃত্তির ফলে ক্রমাগত কিছু আমেরিকান ড্রোন হামলা হয়, তখন তিনি তার আমীর শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ রহিমাহুল্লাহর নির্দেশে মেহসুদ অঞ্চলে চলে যান। এই স্থানান্তরের পেছনে একদিকে যেমন তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উদ্দেশ্য ছিল অপরদিকে সেখানে যাওয়ার ফলে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নৈকট্য ও পরামর্শে অংশগ্রহণের সুযোগও অনেক বেড়ে যায়। ওই সময় মহান কায়েদে জিহাদ আমীরুল মুজাহিদীন বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। তারা উভয়ে দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হন। তাতে সামরিক, মনস্তাত্ত্বিক, আত্মশুদ্ধি মূলক বিষয় নিয়ে এবং পাকিস্তানি রাজনীতির হালচাল সম্পর্কে বিস্তারিত

[711]

মতবিনিময় করেন। এই বৈঠকগুলোতে শহীদ ডাক্তার আবু খালেদ রহিমাহুল্লাহও উপস্থিত ছিলেন। সেই সাথে শহীদ বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর কঠোর ন্যায়পরায়ণতার কারণে ডাক্তার সাহেব রহিমাহুল্লাহ তার চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করেন। এই সাক্ষাৎগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও সাহায্য-সহযোগিতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে মেহসুদ মুজাহিদীনের অন্যান্য নেতা ও উলামায়ে কেরামের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়।

সুকৌশলী আমীর মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে…
২০০৯ সালে আমীর বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করার পর মেহসুদ মুজাহিদীনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আলেমে রব্বানী সুকৌশলী আমীর মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ। মেহসুদ গোত্রে জিহাদের ময়দান নির্মাতাদের তিনি একজন ছিলেন এবং ইমারতে ইসলামিয়ার সময়কাল থেকেই জিহাদের ময়দানে ছিলেন। জামিয়া ইমদাদিয়া ফয়সালাবাদ থেকে দাওরা হাদীসের সনদ লাভ করার পর কিছুদিন তিনি ইলমে দীন শিক্ষাদানে রত থাকেন। আফগানিস্তানে আমেরিকার বর্বর হামলার পর জিহাদী কর্মকাণ্ড এবং মুহাজিরদের সাহায্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মুহাজিরীনের সাহায্য-সহযোগিতা এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করার জন্য তিনি নিজের কিছু সঙ্গী-সাথিকে জড়ো করে মেহসুদ গোত্রের মুজাহিদীনকে সাংগঠনিক রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পুনরায় তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তানে গমন করে মোল্লা বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহকে মুজাহিদীনের নেতৃত্বভার

[712]

গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তার চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে মেহসুদ গোত্রের মুজাহিদীন এক বিপ্লবী দল রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হন আর তিনি আমীর বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর মেহসুদ গোত্রের উত্তরসূরি হন। মাওলানা অলিউর রহমান রহিমাহুল্লাহ নেতৃত্ব সামলে নিতেই মুজাহিদীনের মেহসুদ গোত্র পুরোপুরি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মূলনীতি মাফিক ঢেলে সাজান। প্রতিটা হালকায় খোদাভীরু উলামায়ে কেরামকে আমীর নিযুক্ত করেন। মুজাহিদীনের শরীয়াহ ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। শরীয়াহর বিচার-ফয়সালার জন্য কাজী নিযুক্ত করেন এবং মেহসুদ গোত্রের প্রতিটি কোণা থেকে দখলদার সেনাবাহিনীর ওপর তীব্র হামলা শুরু করেন। তিনি কর্মকৌশল ও দৃঢ় প্রত্যয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু ফিতনার মোকাবেলা করেন। দুষ্কৃতিকারীদেরকে দমন করেন। মুজাহিদীনের সারি পবিত্রকরণ এবং তাদের শরীয়াহ ও নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। সবর তথা ধৈর্যধারণ, উচ্চ মনোবল ও সাহসিকতা মাওলানা অলিউর রহমান রহিমাহুল্লাহ এর উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল। মুসলিমদের রক্তপাতের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। মতবিরোধের পথ বন্ধ করার জন্য কয়েকবার নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি মুজাহিদীনের মাঝে উন্নত গুণাবলি দূরদৃষ্টি খোদাভীতি এবং অবিচলতার দিক থেকে তিনি অনন্য নেতা ছিলেন।

অন্যান্য ঈমানী গুণের পাশাপাশি আমীর মাওলানা অলিউর রহমান রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর দীনের সাহায্যের জন্য ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে আসা মুহাজিরীনের সাহায্য-সহযোগিতায় সবার আগে ছিলেন। অন্যান্য মুহাজিরীনের মতোই আল-কায়েদার সাথিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন ছিল, যেন এক প্রাণ দুই দেহ। আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ সভায় তিনি থাকতেন এবং নিজের বিভিন্ন

[713]

কাজ তিনি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করতেন। আল-কায়েদার নেতারাও মাওলানা সাহেব রহিমাহুল্লাহকে নেতৃবৃন্দের মাঝে গণ্য করতেন। মুহাজিরীনের সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক বড় অবদান রাখার তাওফীক দিয়েছেন। জিহাদের আকাবিরীন হযরতের নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহযোগিতার কাজ আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা করিয়েছেন। এসব কিছুকে আল্লাহ তাআলা তার জন্য পরকালের পাথেয় বানিয়ে দিন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আমীন।

আল-কায়েদার অন্যান্য দায়িত্বশীল-এর মতোই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মাওলানা অলিউর রহমান রহিমাহুল্লাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অধিকাংশ সময় এই দুই নেতার দীর্ঘ বৈঠক হতো। জিহাদ, সমর, ইসলাহ বিষয় নিয়ে তারা মতবিনিময় ও পরামর্শ করতেন। মাওলানা অলিউর রহমান রহিমাহুল্লাহর জীবন ক্যানভাসে আল-কায়েদা ও মেহসুদ অঞ্চলের মুজাহিদীনকে একই পাখির দুই ডানা বলে মনে হতো।

অবশেষে মুসলিম উম্মাহর এই মহান নেতা ২০১৩ সালের মে মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। যে সময় মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর দুঃসংবাদ আমরা পাই, তখন ঘটনাক্রমে আমি আল-কায়েদার দুইজন মহান নেতা শায়খ ইবরাহীম আল মাগরিবি হাফিযাহুল্লাহ এবং উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে বসা ছিলাম। এক সাথি ভাই মাওলানা রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের সংবাদ নিয়ে আসেন। শোনা মাত্রই ওই দুই হযরত এতটা চিন্তিত হয়ে যান, যেমনটা নিজেদের কোনো মহান নেতার মৃত্যুতে হয়ে থাকেন। সম্ভবত আমি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে এতটা চিন্তিত হতে আর কখনও দেখিনি। তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে। তিনি [714]

মাওলানা অলিউর রহমান রহিমাহুল্লাহর প্রশংসা করেন। তার মহান কীর্তি অবদান উন্নত চরিত্র এবং খোদাভীতির সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি এক বিবৃতিতে পাকিস্তানে বসবাসকারী মুসলিম এবং মেহসুদ গোত্রের আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন ঈমানদারদের কাছে মাওলানা রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত কেন্দ্র করে কিছু শোক বার্তা তুলে ধরেন। তার একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে হচ্ছে। উক্ত বার্তায় তিনি বলেন:

“সর্বপ্রথম আমি আপনাদের কাছে আপনাদের আরও এক সন্তান, একজন মহান নেতা, একজন প্রজ্ঞাবান সংস্কারক, একজন নির্ভীক মুজাহিদ, একজন সত্য উচ্চারণকারী আলেমে দীন মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে শোক প্রকাশ করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কামনা, তিনি যেন মাওলানা সাহেবের মর্যাদা উন্নীত করেন, জিহাদের পথে কাটানো তার প্রতিটি মুহূর্ত কবুল করে নেন, মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সাধনের জন্য তার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে তার মাগফেরাত ও ক্ষমার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন, তার রক্ত পাকিস্তানের অধিবাসীর নবজাগরণের এবং মুজাহিদীনের মাঝে আরও অধিক অবিচলতা ও ঐক্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কবুল করেন, আমীন।

আমার প্রিয় জাতি! আজ আরও একবার ওয়াজিরিস্তানের ভূখণ্ডে মেহসুদ গোত্র তার এক কলিজার টুকরাকে এক ভয়াবহ যুদ্ধে উৎসর্গ করে দিয়েছে, যেন এই দেশে শরীয়তের বসন্ত আসে এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তির আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। আত্মমর্যাদাশীল এই সমস্ত মুজাহিদ অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিরূপ অবস্থায় নিজেদের রক্ত দিয়ে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাহসিকতার এমন সোনালী ইতিহাস রচনা করে যাচ্ছেন, এই অধিক অঞ্চলের অধিবাসীরা যে ঋণ কখনোই শোধ করতে পারবে না। [715]

গোত্রীয় অঞ্চলে চলমান এই যুদ্ধ গোটা উপমহাদেশের ভবিষ্যত নির্ধারণের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইসলামের যোদ্ধাগণ লাশের বাঁধ তৈরি করে প্রিয় উম্মাহকে রক্ষা করে যাচ্ছে। হে আমার প্রিয় গোত্রবাসী! তারাই আপনাদের প্রকৃত নেতা এবং অনুগ্রহশীল। তারাই সত্য চিনেছেন এবং দুনিয়ার তিরস্কার নিন্দার তোয়াক্কা না করে সেই সত্য তুলে ধরেছেন। সাজ-সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারা ইসলামের ওই প্রকৃত সিংহ, যারা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের পথ অনুসরণ করছেন, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সত্যের বাণী উচ্চারণ করছেন, হিজরত ও নুসরতের কাঁটা বিছানো কিন্তু প্রেমময় পথে তারা চলছেন। ত্যাগী ও সুসংবাদের অধিকারী আল্লাহর এই বান্দারা উম্মাহকে প্রশান্তিময় একটি সন্ধ্যা এবং সম্মান ও গৌরবের একটি প্রভাত উপহার দেয়ার জন্য নিজেদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। এ কাজে তারা সন্তুষ্ট রয়েছেন। তাদেরকে চিনুন। তাদেরকে মূল্যায়ন করুন। তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করুন এবং তাদের দাওয়াতে লাব্বাইক বলুন। এমনই একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন আমাদের প্রিয় ভাই এবং মুহতারাম কায়েদ মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ। তার ব্যাপারে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। তিনি সুদীর্ঘ জিহাদী সফর এবং মুহাজিরীন মুজাহিদীনের দৃষ্টান্তহীন সাহায্য-সহযোগিতার দীর্ঘ অধ্যায় রচনার পর কিছুদিন আগে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাকে নিজ সন্তুষ্টি দান করুন। তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও সিদ্দিকদের সঙ্গে তার ঠিকানা তৈরি করুন। মেহসুদ গোত্রকে আল্লাহ তাআলা

[716]

মুহাম্মদী শরীয়তের মাঝে আরও গভীরতা , সংযুক্তি , অবিচলতা, জিহাদের পথে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দান করুন। কারণ সবর ও ইয়াকীনের মাধ্যমেই দীন , ইমামত (নেতৃত্ব) ও আমানত লাভ হয়। মেহসুদ গোত্রকে আল্লাহ ইয়াকীন ও দৃঢ়বিশ্বাস অন্তর স্থাপন করে দিয়ে গন্তব্য পানে অগ্রসর হবার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ তাদেরকে এই বিশ্বাস দান করুন যে , সত্যের পথে পরীক্ষা ও প্রতিকূলতা এসেই থাকে ; কিন্তু পরিশেষে শুভ পরিণতি হকপন্থিদেরই পদচুম্বন করে। এমনটাই বলেছেন আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ :

والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن

لكنما العقبة لاهل الحق ان فاتت هنا كانت لدى الديان[99] [100]

আমীর খালেদ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ

মেহসুদ গোত্রে সর্বশেষ যখন তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন এবং সকল সাথির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন , ঐ দিনগুলোতে আমীরে মুজাহিদীন মেহসুদ গোত্রের সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রতীক কমান্ডার খালেদ সাঈদ সাজনা রহিমাহুল্লাহ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তার সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কমান্ডার খালেদ সাঈদ রহিমাহুল্লাহ একদিকে সাহসিকতা ও অবিচলতায় ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন অপরদিকে উন্নত আখলাক, বিনয় , শরীয়ত অনুসরণ এবং মুহাজিরদের সাহায্য -সহযোগিতা ও ভালোবাসার

[99] এই কবিতাগুলোর অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে : "সত্যকে সাহায্য করা হয় আর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই , কারণ এটাই রহমানের সুন্নত। কিন্তু পরিণতিতে সত্যপন্থীরাই সফল হয় — দুনিয়াতে যদি নাও হয় আল্লাহর কাছে তো অবশ্যই তারাই সফল হয়।"

[100] উস্তায আহমদ ফারুক রহমতুল্লাহি আলাইহির বিবৃতি معرکۂ اسلام اور جمہوریت میں فتح حق کی ہوگی থেকে উদ্ধৃত

ক্ষেত্রে সমকালীনদের মাঝে অনন্য ছিলেন। এক কথায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশন জারি থাকা অবস্থায় অপরদিকে মেহসুদ অঞ্চলের মুজাহিদীন কিছু বিশৃঙ্খলাকারীর অবরোধে আটকা অবস্থায় খালেদ আমীর সাহেব রহিমাহুল্লাহ একা সশরীরে কোনো রক্ষী ছাড়াই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ঠিকানায় আগমন করেন, তার সিকিউরিটির বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করেন এবং সামরিক বিষয়ে পরামর্শ করে বিদায় নেন। মেহসুদ অঞ্চলের সাহসী আত্মমর্যাদাশীল সিংহ দল ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। জিহাদী নেতাদের মাঝে খালেদ আমীর সাহেব রহিমাহুল্লাহ শেষ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি শাহাদাতের কিছুদিন আগে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মেহসুদ গোত্রের মুজাহিদীনের প্রতি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর আস্থা ও ভালোবাসার এটাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কমান্ডার আমীর খালেদ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকান ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আমীন।

একাকী বন্দীর মতো অবরুদ্ধ
মেহসুদ এলাকায় বিভিন্ন আনসারের বাড়িতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে রাখা হয়। ড্রোনকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তাকে পাঁচদিনের জন্য এক কক্ষে আবদ্ধ থাকতে হয়। ঐ কক্ষে শুকনো রুটি এবং পানি দিয়ে তার দিন গুজরান করতে হয়। জানুয়ারি মাসে মেহসুদ ডেরার আকাশচুম্বী পাহাড়ের ওপর কোনো আগুন ছাড়া শীতের মধ্যে থাকতে হয়। এ সময় রাতে আলো জ্বালানোর সুযোগ থাকতো না —আলো জ্বালানো হলে

[718]

শত্রু বুঝে যেতে পারে এখানে কেউ আছে, সে আশঙ্কায়।

একাকিত্বের এই জগতে মারেফতের অনেক অর্থ, অনেক অধ্যায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর বুঝে আসে। আল্লাহর একত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং এই বিশ্বজগতের রহস্য ও প্রজ্ঞা ঈমানী দূরদৃষ্টি দিয়ে বোঝার সুযোগ তিনি লাভ করেন। এতসব কষ্ট এবং শাহাদাতের সময় ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অবিচলতার পা কিছু মাত্র পিছলে যায়নি। তিনি সকল সাথিকে শুধু উপদেশ ও অসিয়ত করছিলেন, কিছুতেই তারা যেন নত না হন, আমেরিকা ও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই যেন তারা বন্ধ না করেন। তিনি সাথিদের মনোবল বৃদ্ধি করতে থাকেন। হতাশ হতে নিষেধ করেন।

শেষ নিঃশ্বাসের সময়ও উম্মাহর চিন্তা
যখন তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন, শত্রু তার পেছনে রয়েছে এবং তিনি পুরোপুরি বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছেন; শাহাদাতের সম্ভাবনা যখন প্রবল হয়ে যায়, এমন প্রতিকূল ও কঠিন অবস্থার ভিতরেও তিনি মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদীনের জন্য তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর এই গুণ নিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে নিশ্চিত বোঝা যায়, তিনি সমকালের সত্যপন্থি ইমাম ছিলেন। তিনি দেয়ালে নিজের শাহাদাত দেখতে পাচ্ছিলেন, আকাশে চারিদিকে ড্রোন বিমান মাথার ওপর ঘোরাঘুরি করছিল। এলাকা থেকে সাধারণ জনবসতি প্রায় সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এ অবস্থায় তার জন্য ওই অবরোধ থেকে বের হওয়া কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহর এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যেন নীরবে এ কথা বলে যাচ্ছিলেন: “হে আল্লাহ যদি আপনি আমাকে এই ময়দানে [719]

শহীদ করতে চান, তাহলে আমি পুরোপুরি প্রস্তুত। আপনার ভালোবাসার তরে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত। সাইয়েদুনা ইসমাইল আলাইহিস সালাম যেমনিভাবে তার পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন: আব্বাজান! আপনি ছুরি চালান আমি কুরবান হওয়ার জন্য তৈরি আছি— হে আল্লাহ আমিও তেমনি প্রস্তুত।”

এই অবস্থায়ও তিনি কিছু মহান কাজ করেন:

** আল-কায়েদা উপমহাদেশের মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের শেষ অডিও বয়ান রেকর্ড করেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি জিহাদ চালু রাখা, সবর, ধৈর্য, অবিচলতা ধরে রাখা, নিরাশ না হওয়া এবং নেতৃবৃন্দের শাহাদাতে হতাশ না হবার উপদেশ দেন। সে সঙ্গে পেশোয়ারে আর্মি পাবলিক স্কুলে পরিচালিত হামলা জায়েয না হওয়া, নিষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যার সঙ্গে তার এবং তার জামাতের কোনো সম্পর্ক না থাকার কথা ঘোষণা করেন। সবদিকে বোমাবর্ষণ এবং শাহাদাতের ধারা প্রবাহ সত্ত্বেও ওই সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর উপর কোনো দুশ্চিন্তার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু যখন কিছু নির্বোধ লোক আর্মি পাবলিক স্কুলে হামলা করে শত শত শিক্ষার্থীকে পিতাদের অপরাধের কারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তখন তিনি কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন, আমরা যেই জিহাদ ও দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছি, পেশাওয়ার স্কুলের ঘটনা তার জন্য খুবই ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি সকল মুজাহিদের কাজের দুর্নামের কারণ হবে এই ঘটনা। পাকিস্তানের মুসলিমদের অন্তর থেকে মুজাহিদীনের মুহব্বত ভালোবাসা বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হবে এই অন্যায়।

[720]

এই ঘটনায় তিনি এতটা ব্যথিত হয়েছিলেন, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তাই তিনি বারবার সাথিদেরকে নসীহত করতে থাকেন, এ ঘটনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না থাকা এবং উক্ত ঘটনা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ হবার কথা ঘোষণা করা আমাদের জন্য জরুরি। আল-কায়েদা উপমহাদেশের তৎকালীন মুখপাত্র উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ যে সময় এক বিবৃতিতে পেশোয়ার আর্মি পাবলিক স্কুলে সংঘটিত হামলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক না থাকার কথা ঘোষণা করেন, ওই সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ তার শাহাদাতের মাত্র তিন দিন আগে তার নামে একটি পত্র লিখেন। পত্র থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

“পেশোয়ার ঘটনার পর দুশ্চিন্তায় আমার অবস্থা অনেক খারাপ ছিল। কিন্তু আপনার বিবৃতি ও আলোচনা ইউসুফজাই'র কাছ থেকে (বিবিসি রেডিওতে) শুনে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে দোয়া ও তাকবীর বের হয়ে এসেছে। আল্লাহ আপনার মর্যাদা উন্নীত করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে এই অন্যায়ের ব্যাপারে পুরোপুরি সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। দুনিয়া আখিরাতে এই অন্যায়ের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি আপনার জন্য এবং আমার সম্মানিত আমীর শায়খ আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর প্রতি আমার শেষ কথা। শরীয়ত বহির্ভূত কোনো কাজের ব্যাপারে গোলমেলে কথা বলার প্রয়োজন নেই।”

** অবরুদ্ধ অবস্থায় তিনি পাকিস্তানে দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ চালু রাখা, এই সংগ্রামের গুরুত্ব ও শরীয়তী অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যা পরবর্তীতে ‘পাকিস্তানে জিহাদ চালু রাখা উচিত’ নামে প্রকাশিত হয়। ওই পুস্তিকায় তিনি শরীয়ত, ঈমান, সমরনীতি, নৈতিকতা ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীল প্রমাণ আলাদা

[721]

আলাদাভাবে বর্ণনা করে পাকিস্তানে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পুস্তিকাটি পাঠ করার দ্বারা একদিকে যেমন পাকিস্তানে জিহাদ অব্যাহত রাখার ব্যাপারটি অনুধাবিত হয়, অপরদিকে আলেমে রব্বানী আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর দৃঢ় সংকল্প, মনোবল এবং শেষ মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নিঃসন্দেহে আমেরিকা ও মিত্রশক্তি পাকিস্তানি আর্মির সকল শক্তি সামর্থ্য ও অস্ত্রশস্ত্র তার ঈমান ও আস্থায় কিছু মাত্র চির ধরাতে পারেনি। শত্রুপক্ষ তাকে এক পা-ও পেছনে সরাতে পারেনি। তিনি নিজের জায়গায়, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ়সংকল্পে সর্বদাই বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আমীন।

** সে সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর কাছে কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর প্রজ্ঞা ও সারগর্ভ জিহাদী ইতিহাস এবং তার দূরদর্শিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রচিত ‘ফুরসান’ গ্রন্থের একটি কপি ছিল। তার কাছে কাগজ-কলমের ব্যবস্থা ছিল না। তাই তিনি ভয়েস রেকর্ড করে উক্ত গ্রন্থের কিছু অধ্যায় অনুবাদ করেন। এ কাজটি শুরু করার পর কয়েকটি অধ্যায় তিনি শেষ করেন। তার শাহাদাতের পর তার আত্মীয় ও সহচর শহীদ রায়হান আফফান রহিমাহুল্লাহ সেগুলো সংকলন ও বিন্যস্ত করেন।

** ওই সময় তিনি তার বিশদ অসিয়ত নামা রচনা করেন। সেটি তার নিকটতম সাথি ও প্রিয় ব্যক্তি দাউদ গৌরী হাফিযাহুল্লাহর নামে চিঠি আকারে ছিল। জ্ঞান-প্রজ্ঞাগর্ভ ওই অসিয়ত নামায় তার আত্মীয়-স্বজন ও কাছের মানুষজন ছাড়াও সকল মুসলিমের প্রতি অনেক উপদেশ বাণী ও মূল্যবান কথা রয়েছে। ইসলামের এক মহান নেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় কতটা ঈমান ও [722]

আস্থা অন্তরে ধারণ করেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ উক্ত চিঠি। আমাদের এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে অসিয়ত নামাটি বিস্তারিত লিখে দেয়া হয়েছে।

বন্দী মুক্ত করো! : নববী নির্দেশে আমল করো

মেহসুদ ডেরায় ওই দিনগুলোতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর ঠিকানা থেকে একটু দূরে আল-কায়েদার অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ বন্দীদের একটি বন্দীশালা ছিল। মুজাহিদীনের হাতে গ্রেফতার কাফের সৈন্য এবং তাদের হাই-প্রোফাইল সাহায্যকারীদেরকে রাখার জন্য ওই বন্দীশালা তৈরি করা হয়। বন্দী বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্প। মুসলিম বন্দী এবং বিশেষ করে মুসলিম মা- বোনদেরকে কাফের ও মিত্রশক্তির হাত থেকে মুক্ত করা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহের মৌলিক উদ্দেশ্য। গোটা পৃথিবীর কারাগারগুলোতে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী-পুরুষ -কাফের গোষ্ঠী ও মিত্রশক্তির কাছে বছরের পর বছর বন্দী হয়ে আছে। তাদের মুক্তির জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। ইসলামী ফিকহের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী মুসলিম মা-বোনদের মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য যদি মুসলিমদের সকল সম্পদ বিলিয়ে দিতে হয়, তবুও এই কাজে ত্রুটি করা যাবে না। বন্দী ভাই-বোনদের মুক্তির জন্য কাফের গোষ্ঠী ও মিত্রগোষ্ঠীর সৈন্যদেরকে গুম করে বন্দী বিনিময়ের চেষ্টা করা বর্তমান সময়ের উপযুক্ত একটি ব্যবস্থা।

অপরদিকে মুসলিমদের দেশে বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পের আড়ালে এনজিওগুলোর বিদেশি কাফের প্রতিনিধিরা আমাদের সমাজে এসে কুফরী শক্তির নানান লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে। তারা মুসলিম উম্মাহর ভূমিগুলোতে আমেরিকা ও [723]

মিত্রশক্তির জন্য ঠিকানা ও উপযুক্ত আশ্রয় তৈরি করে। সেই সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তি করেও তারা কাফেরদের পরিকল্পনা সফল করতে ভূমিকা রাখে।[101]

এক কথায় মুসলিম বন্দী এবং বিশেষ করে বন্দী মা-বোনদের মুক্তির জন্য আল-কায়েদার আমীর মুহতারাম কায়েদুল মুজাহিদীন আইমান আযা-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন বিদেশি কাফেরকে গ্রেফতার করা হয়। বিদেশি বন্দীদের মধ্যে ছিল মার্কিন ইহুদী নাগরিক ওয়ারেন ওয়েইনস্টাইন (Warren weinstein)। তিনি সত্তরের দশক থেকেই মার্কিন সহায়তার নামে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং এরই মধ্যে আমেরিকার কয়েকটি নিকৃষ্ট মিশন বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছিলেন। গ্রেপ্তার হবার সময় তিনি ইউএসএইড (USAID)-এর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। একইভাবে ইতালির নাগরিক নাস্তিক গিয়োভানি লো পোর্তো (Giovanni Lo Porto) ছিল আরেকজন বন্দী। ব্রিটিশ সহায়তাকারী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সে পাকিস্তানে এসেছিল। শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ এই বন্দীদের বিনিময়ে উম্মাহর কন্যা আফিয়া সিদ্দিকী (আল্লাহ তাকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্তি দান করুন) সহ সকল মুসলিম বোনকে মুক্ত করার দাবি জানান।

[101] এই কাফেররা যদিও আমাদের দেশে আমাদের সরকার ও শাসকবর্গের অনুমতি নিয়ে আসে কিন্তু সরকার তো নিজেই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে নিরাপত্তা লাভের যোগ্য নয়; কারণ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ, তাহলে কেমন করে অন্যদেরকে তারা নিরাপত্তা দিতে পারে? দ্বীনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্যদেরকে যে নিরাপত্তা দেবে, তা কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এরপরেও যদি মেনে নেয়া হয় বিদেশি কাফেররা এক রকম নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দেশে এসেছে, তবু তো মুসলিম সমাজে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ, ওই অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণের বিরুদ্ধে শাসকবর্গের যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং এমনই বিভিন্ন অপরাধের কারণে ওলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট মত অনুযায়ী তাদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহর التبرئة গ্রন্থটি পাঠ করা উপকারী হবে।

কুরআনে কারীমের মুজেযা ও অলৌকিক শক্তি; বন্দীদের ইসলাম গ্রহণ

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, কাফেররা নিঃসন্দেহে মুসলিমদের ওপর বন্দী অবস্থায় জুলুম-নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দেয় কিন্তু আমরা বন্দীদের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী ভালো ব্যবহার করবো। শায়খের নির্দেশনা অনুযায়ী মুজাহিদীন ওই বন্দীদের সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। মুজাহিদীন নিজেরা হালকা- পাতলা খেয়ে দিন পার করতেন কিন্তু বন্দীদেরকে ভালো ভালো খাবার খাওয়াতেন। তাদের সুস্থতা ও বিশ্রামের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখতেন। মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আদেশ ছিল, কোনো সাথি যেন বন্দীদের সঙ্গে কঠোরতা বা মারপিট না করে। সাথিরা চেষ্টা করতেন ইসলামের সত্যতা তুলে ধরে তাদের অন্তরে ইসলামের মুহব্বত বসিয়ে দিতে। এই উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীমের অনুবাদ পাঠ করতে তাদেরকে বলতেন এবং কখনও প্রসিদ্ধ মুবাল্লিগে ইসলাম জিহাদী দাওয়াতের সাধক ইয়ামেনের শায়খ আন্ওয়ার আল আওলাকী শহীদ রহিমাহুল্লাহর ইংরেজি দরসগুলো শোনাতেন।

শুরুতে বন্দীরা কুরআনে কারীমের অনুবাদ পাঠ করতে অনীহা প্রকাশ করে। সময় পার করার জন্য তারা বিভিন্ন বিনোদনের বস্তু দাবি করে; কিন্তু পরবর্তীতে মুজাহিদীনের আখলাক ও আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং দীন ইসলামের প্রতি তাদের অবিচল আস্থায় বিস্মিত হয়ে উভয় বন্দী কুরআনে কারীমের অনুবাদ নিজে থেকেই পাঠ করতে শুরু করেন।

এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা ভালো। মুজাহিদীন কখনও বন্দীদেরকে ধর্ম পরিবর্তন করতে জোর-

[725]

জবরদস্তি করেননি। এমনটা করা উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লাহর একটি আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ বলে গণ্য। আয়াতটি হচ্ছে :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

- অর্থ : দীনের বিষয়ে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। (সূরা আল বাকারা , ০২: ২৫৬)

তবে মুজাহিদীন নম্রতার সাথে ভালো আচরণ করে তাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করতেন। আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করে তাদেরকে জানিয়ে দিতেন , আপনারা ইসলাম গ্রহণ করলেও আপনাদের বন্দী অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

কিন্তু মহান কুরআনের অলৌকিক শক্তি কিয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে। কিছুদিন পরেই নাস্তিক ইতালিয়ান নাগরিক — যিনি কিছুদিন আগেও বিশ্ব জগতের কোনো রব থাকার কথা অস্বীকার করতেন ; সাথিরা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : “এই দুনিয়ার কোনো রব রয়েছে ?” তখন তিনি মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিলেন : “may be” (হতে পারে আছে); যে কাফের সকল আসমানি ধর্মের প্রতি নিরাশ হয়ে নাস্তিকতা কবুল করে নিয়েছিলেন — কুরআনে কারীম পাঠ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। এরপর একদিন কারাগারের শিকে আওয়াজ দিয়ে রক্ষী মুজাহিদকে বলে ওঠেন , আমাকে মুসলিম বানাও !

৭০ বছরের ইহুদী ওয়ারেন ওয়েইনস্টাইন যখন কুরআনে কারীম নিয়ে চিন্তা -ভাবনা করে ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছেন , তখন রাতের শেষ প্রহরে পাশ ফিরতে ফিরতে হঠাৎ উঠে পড়েন , কারাগারের শিকে আওয়াজ করেন এবং রাত দুইটা বাজে দুজন প্রহরী মুজাহিদকে বলেন : আমাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলিম বানাও। পাহারাদার ভাইয়ের মুখ থেকে সাথে সাথে তাকবীর বাণী বের হয়।

তিনি আনন্দ ও বিস্ময়ে ভরে তাকে বলেন: “চাচা এখন তো রাত! আগামীকাল শুক্রবার দিন সকালে উঠে গোসল করে ইসলাম কবুল করলেই তো ভালো হয়।” ওয়ারেন ওয়েইনস্টাইনের অন্তরে ঈমানের নূর চমকাচ্ছিলো। তিনি শান্ত কন্ঠে বলে ওঠেন: “যদি আমি এই রাতে মারা যাই তাহলে কি কাফির হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব না? এমনটা কখনোই হতে পারে না, এজন্য রাতের এই শেষ প্রহরেই আমাকে ইসলামে প্রবেশ করাও।”

এককথায় মুজাহিদীনের মাঝে মার্কিন ইহুদী ওয়ারেন ওয়েইনস্টাইন হয়ে ওঠেন চাচা ইসহাক আল আমরিকি। ইতালিয়ান নাগরিক Giovanni Lo Porto হয়ে ওঠেন মুহাম্মদ ইতালাবি। তাদের ইসলাম গ্রহণে সকলের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। রবের প্রতি এবং তাঁর প্রিয় কিতাবের প্রতি সকলের আস্থা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মহান কারামতে সকলের মনোবল বৃদ্ধি পায়। এই বন্দীরা মুজাহিদীনের সঙ্গে থেকে তাদের অবস্থা খুব ভালোভাবে দেখেছেন। আমেরিকা ও পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর হামলার সময় মুজাহিদীনের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন অবস্থায় তাদের মাঝে মুসলিম হওয়ার আগ্রহ মুজাহিদীনের অন্তরে ইসলামের সত্যতার প্রতি আস্থা আরও বাড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে কাফের বাহিনীর দুর্বলতা এবং ইসলামী লস্করের বিজয়ী হবার প্রতিও তারা আস্থাবান হয়ে ওঠে। চাচা ইসহাক অপারেশনের কিছুদিন আগেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ভাই মুহাম্মদ ইতালাবী বোম্বিং চলা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদের উপর রহম করুন, আমীন।

মার্কিন বন্দী ওয়ারেন ওয়েইনস্টাইনের নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ের দায়িত্বশীল উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ চাচা ইসহাকের ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে [727]

বলেছেন: “চাচা ইসহাকের মুসলিম হবার পর যখন আমি তার কেন্দ্রে যেতাম, তখন চাচা ইসহাক এবং পাহারাদার ভাইদের মুহব্বত ও সম্পর্ক দেখে কখনও মনে হতো, একজন স্নেহশীল পিতা তার অত্যন্ত আদরের ছেলেদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। চাচা কুরআনে কারীমের সঙ্গে অতি মুহব্বতের কারণে খুব অল্প সময়ের মাঝে আরবী শেখেন। এরপর যখন ভাষাগত দিক থেকে কুরআনের আয়াতগুলো তিনি বিশ্লেষণ করতেন এবং সাথে থাকা ভাইয়েরা আরবী নিয়ম-কানুনের ছোটো ছোটো ভুলগুলো মজা করে মুচকি হেসে ঠিক করে দিতেন, তখন মনে হতো, কুরআনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নতুন নয়; অনেক দিনের।”

মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দ চাচা ইসহাকের ইসলাম গ্রহণের কারণে এতটা আনন্দিত হন যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। অথচ বস্তুবাদী বিচারে এতে তাদের ক্ষতি হয়েছিল। কারণ ইসলাম গ্রহণের পর কোনো অবস্থাতেই তাকে হত্যা করা যাবে না; অথচ কাফের বন্দীদেরকে ফুকাহায়ে কেরামের মত অনুযায়ী জিহাদী কল্যাণ বিবেচনায় হত্যা করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মুজাহিদীন কাফেরদেরকে হত্যা করার দ্বারা যতটা আনন্দিত হন, তাদের ইসলাম কবুল করার দ্বারা আনন্দিত হন তার চেয়ে বেশি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর শতশত দরূদ ও সালাম। মুজাহিদীন প্রিয় নবীর উম্মাহর মাঝে একজন নতুন সদস্য পেয়ে অধিক আনন্দিত হন। এ কারণে সকল মুজাহিদের অন্তরে চাচা ইসহাকের প্রতি ভালোবাসা স্থান করে নেয়। সকলেই তার নেতৃত্ব মেনে নেন। এমনকি কায়েদে জিহাদ শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ নিজে চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এই সম্পর্কে উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ যা বলেছেন তা কিছুটা নিম্নরূপ:

[728]

“ওয়ারেন ওয়েইনস্টাইন- চাচা ইসহাক হবার পর শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ তাকে মুহব্বত ভরে পত্র লিখেন। তাকে মোবারকবাদ জানান, সেই সঙ্গে উম্মাহর সমস্যা ও জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করেন। বন্দী জীবনে কষ্টের ব্যাপারে সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং দাগিস্তানে শায়খ নিজে বন্দী থাকা অবস্থায় যে সমস্ত বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলো শুনিয়ে ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহর সঙ্গে মজবুত সম্পর্কে স্থাপনের উপদেশ দেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ উক্ত চিঠিতে আফিয়া সিদ্দিকীর কথা আলোচনা করেন এবং চাচার মুক্তিকে আফিয়া সিদ্দিকীর মুক্তির সঙ্গে শর্তযুক্ত হওয়ার বিষয়টি অবহিত করেন। তাকে বলেন: যদি আপনি ধৈর্য ধারণ করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আফিয়ার মুক্তিতে আপনারও অংশ থাকবে এবং আল্লাহ আপনাকে অনেক বড় প্রতিদান দান করবেন। ওই পত্র সহকারে শায়খ আইমান রহিমাহুল্লাহ চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহকে উপহারস্বরূপ কম্পিউটার, গালিচা, চেয়ার-টেবিল এবং নগদ কিছু অর্থ প্রেরণ করেন। নগদ অর্থ এজন্য, যেন চাচা নিজের মনমতো কিছু আনাতে পারেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ চাচা পত্র লিখেন এবং ওই অর্থ দিয়ে মূল্যবান সুগন্ধী আনিয়ে শায়খকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন।”

চাচা ইসহাক আমরিকী রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে মুহব্বত ও বন্ধুত্ব

মুসলিম হবার পর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহর সীমাহীন মুহব্বত তৈরি হয়। তার সঙ্গে বসতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর অনেক ভালো লাগতো, ঈমানী প্রশান্তি লাভ হতো। চাচা অত্যন্ত নিষ্পাপ ভঙ্গিতে ইসলামের বিধি-বিধান

[729]

জিজ্ঞেস করতেন এবং মনের মাঝে জেগে ওঠা প্রশ্ন তুলে ধরতেন। তিনি সেগুলোর জবাব দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করতেন। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুহতারাম স্ত্রী লিখেছেন:

“চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহ ইসলাম কবুল করার পর যখন তিনি (আমাদের ফারুক ভাই) প্রথমবার তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নেন, তখন আমি যাওয়ার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: নিষ্পাপ চেহারা দেখার জন্য যেতে চাচ্ছি; আর অন্য কিছু নয়।”

তার সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর এতটা মুহব্বত ছিল, যখনই ভাইয়ের কাছে কোনো ভালো জিনিস আসতো তখন তার একটা অংশ চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহর জন্য অবশ্যই পাঠিয়ে দিতেন। এরপর তার মন ভালো রাখতে বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তার বিশ্রামের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এই সম্পর্কের কারণেই খোদ চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহর অন্তরে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জন্ম নেয়।

চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুহব্বত ও সদাচরণ এবং চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহর আখলাক সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ। তা কিছুটা নিম্নরূপ: “ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে আমেরিকার নাগরিক এক বন্ধু সেখানকার মূল্যবান চকলেট উপহার দেন। সেগুলো খুবই দামি চকলেট ছিল। তিনি সেখান থেকে কিছুটা নিজের জন্য রেখে বাকিটা আমার কাছে দিয়ে চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহকে দিতে বলেন। চাচা সাহেব সেগুলোর স্বাদ নিয়ে অনেক আনন্দিত হন এবং এ কারণে আল্লাহর শোকর আদায় করেন যে, এখানেও আল্লাহ তাআলা তাকে এতটা দামি চকলেট খাওয়ালেন। একথা বলে চাচা নিজের জন্য সেখান থেকে

[730]

অল্প একটু নেন আর বাকিটা পাহারাদার সাথিদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে শুরু করলেন। আমি নিষেধ করি যে, অন্য সাথিরা নিজেদের অংশ পেয়েছে, তাদেরকে দিয়েন না; তখন চাচা বলেন: এখানে থাকা সকল জিনিস তো আপনাদেরই। এখান থেকে কাউকে আমি উপহার দিলে সেটাতো আমার পক্ষ থেকে হবে না। কিন্তু এই চকলেট আমি উপহার হিসেবে পেয়েছি। এটা আমার নিজের। তাছাড়া এটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এ কারণে এগুলো আমি তাদেরকে দিতে চাচ্ছি। এভাবেই তিনি খুবই পছন্দনীয় জিনিসও পাহারাদার ভাইদেরকে দিতেন।”

এক কথায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ যখন মেহসুদ ডেরায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছুদিন পার করলেন এবং বাহ্যিকভাবে সেখানে ড্রোন বিমান তেমন একটা দেখা যাচ্ছিলো না, তখন এক রাতে তিনি পায়ে হেঁটে নিজের ঠিকানা থেকে বের হয়ে চাচা ইসহাকের কেন্দ্রে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত সাথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিকূল অবস্থায়ও অবিচল থাকার জন্য মনোবল বৃদ্ধি করেন। বোঝাই যাচ্ছিলো, তার সেখানে যাওয়ার বড় উদ্দেশ্য চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। এটা খুব সম্ভব ১৪ই জানুয়ারি ২০১৪ রাতের কথা।

দীনের জন্য শির বিসর্জন দিয়ে তিনি সফল

পরের দিন তিনি পাহারাদার সাথি এবং বন্দী ভাইদের সঙ্গে কাটান। দিনের বেলা হঠাৎ ড্রোন বিমান আগের চেয়ে অধিক মাত্রায় আসতে দেখা যায়। অবশেষে রাতের শেষ প্রহরে ড্রোন বিমান ওই কেন্দ্রে মিসাইল হামলা করে। উক্ত হামলায় যুগের ইমাম, ইসলামের রাহবার, দাওয়াতী অঙ্গনের সফল সাধক, উচ্চ

[731]

মনোবল সম্পন্ন মর্দে মুজাহিদ, আলেমে রব্বানী, ধৈর্য অবিচলতার মূর্ত প্রতীক, সালফে সালেহীনের স্মৃতিচিহ্ন, দুনিয়া বিমুখ আবেদ ও কামেল ওলী হযরত উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ দুনিয়ার পেরেশানি থেকে মুক্তি নিয়ে আখিরাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বছর। তাঁরই সঙ্গে আমেরিকার চাচা ইসহাক রহিমাহুল্লাহ, ভাই মুহাম্মদ ইতালাবি, ইসলামাবাদের আতাউর রহমান মিনহাস ভাই, ইসলামাবাদের ফয়সাল (মোজাম্মেল) ভাই এবং শিয়ালকোটের রায়হান শোয়াইব ভাই (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) সকলেই শহীদ হন! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলামের এই মহান সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকে আপনার জান্নাতে সন্তুষ্ট করুন। হে আল্লাহ! যে দীনের জন্য তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, ওই ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং আমাদেরকেও জান্নাতে আমাদের ভাইদের সান্নিধ্য দান করুন, আমীন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়:
অসিয়তনামা

নোট: এটি ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সর্বশেষ অসিয়ত। শাহাদাতের প্রায় এক সপ্তাহ আগে অত্যন্ত [732]

প্রতিকূল অবস্থায় তিনি এটি লিখেন। যদিও ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে দাওয়াতী ও মিডিয়া অঙ্গনের যে কাজ হয়েছে, সেখানেই তার প্রকৃত নসীহত অসিয়ত ও উপদেশমালা নিহিত রয়েছে, কিন্তু ঈমান ও আস্থাপূর্ণ এই শব্দগুলো জীবন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে দিতে, ঈমানী পতাকা উড্ডীন করতে এবং তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে অসাধারণ ভূমিকা পালনকারী। উক্ত পত্রে তার ঈমানী দূরদর্শিতা এবং কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। স্মরণ রাখতে হবে, তিনি এমন অবস্থায় পত্রটি লিখেছিলেন, যখন তিনি শত্রুর ঘেরাও থেকে বের হওয়ার জন্য সকলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে মেহসুদ অঞ্চলে ওয়াজিরিস্তানের বরফ ঢাকা পাহাড়ের এক ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন। এই অসিয়ত তিনি প্রিয় শিষ্য ও একান্ত সহকারী বেরাদার দাউদ গৌরী হাফিযাহুল্লাহর নামে লিখেছেন। অসিয়ত নামায় তিনি যেই হযরতগণের নাম প্রিয় ব্যক্তিদের তালিকায় লিখেছেন, তাদের মাঝে অধিকাংশের আলোচনা এই কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় আমরা নিয়ে এসেছি। তারা ছাড়া যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন, তাদের পরিচয় আর কি বলবো? এছাড়া আরও যে সমস্ত অপ্রসিদ্ধ নাম রয়েছে, তাদের মাঝে অধিকাংশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ফুট নোটে তুলে ধরা হয়েছে।

(নোট শেষ)

ফারুকের পক্ষ থেকে ‘আমার দাউদের’ নামে

[সঠিক তারিখ জানা নেই সম্ভবত ০৩ অথবা ০৪ ই জানুয়ারি ২০১৫]

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

হে প্রিয় কেমন আছো? আল্লাহ তোমাকে জাহেরি- বাতেনী সকল অনিষ্ট ও ফিতনা থেকে হেফাযত করুন।

[733]

কিয়ামতের দিন আমার জন্য এমন সুপারিশকারী বানিয়ে দিন, যার সুপারিশ কবুল করা হবে, আমীন।

আমার প্রিয় সুহৃদ!

অল্প এই কয়েকটি কথা শুধু এজন্যই লিখছি, যদি জীবন এখানে শেষ হয়ে যায়, তাহলে সম্ভবত এই কথাগুলো তোমার জন্য এবং তোমার মাধ্যমে যাদের কাছে এই পত্র পৌঁছবে সকলের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

আমার কলিজার টুকরা! নিঃসন্দেহে এই একমাস (আজ সম্ভবত ২৯ তম দিন) খুবই অসাধারণ ছিল— তোমার সাথে কাটানো ১২ / ১৩ দিন আবার এরপরের পুরোপুরি একাকী কাটানো ৫ দিন, এরপর আনসারদের ওইখানে কাটানো ১০ দিন।

নিঃসন্দেহে এই দিনগুলো কঠিন ছিল এবং তার মধ্যে পুরোপুরি একাকী কাটানো ওই পাঁচ দিন তো সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল। এক একটি করে জীবন যাপনের সকল উপকরণ হাত থেকে চলে যায়। মনের সান্ত্বনা বা নিজেকে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমগুলোও থাকে না। সর্বশেষ ভরসা এবং সান্ত্বনার বস্তু ছিলে তুমি, এখন তুমিও চলে গেলে। এরপর খাবার, আলো, গরমের ব্যবস্থা সবকিছুতেই সংকীর্ণতার পরীক্ষা আসে। শুধু আল্লাহ তাআলাই ভরসা হন; অন্য কিছু নয়। অতএব এই দিনগুলোতে যা কিছু শিখতে পেরেছি, সম্ভবত এগুলোই গোটা জীবনে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ও ওজনদার। আল্লাহ এখানে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত কবুল করুন এবং মুহূর্তগুলোর মাধ্যমে যে সমস্ত উত্তম নেয়ামত দান করেছেন সেগুলো আমার থেকে ছিনিয়ে না নেন! আল্লাহ উত্তম পরিসমাপ্তি দান করুন। কারণ শেষ অবস্থা দিয়েই বিচার করা হবে।

হে আমার প্রিয়!

[734]

আমি এই দিনগুলোতে চারটি জিনিস অনুধাবন করেছি ... এভাবে বললে ভালো হয় — আল্লাহ আমাকে চারটি বিষয় বুঝিয়েছেন, অনুধাবন করিয়েছেন:

০১. আমি অনুধাবন করেছি যে, মানুষ কতটা দুর্বল, অপারগ, দরিদ্র। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী:

والله الغني وانتم الفقراء[102]

وخلق الانسان ضعيفا[103]

وكان الانسان عجولا[104]

رب اني لما انزلت الي من خير فقير[105]

সবকিছুই আমার বুঝে এসেছে। নিজেদের দুর্বলতা ও দরিদ্রতা বুঝে আসায় আল্লাহর বড়ত্ব বুঝে এসেছে। এই দিনগুলো কিছু জিদ ও অহং ভেঙে দিয়ে গেছে এমনটাই আশা করছি। অহঙ্কার পুরোপুরি ভেঙেছে কিনা সেটা আল্লাহ ভালো জানেন। আল্লাহ পর্দা টেনে দিন।

০২. মৃত্যুর ব্যাপারে সঠিক ধারণা। কিংবা এভাবে বলতে পারো, যেমনটা আল্লাহ বলেছেন:

قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم[106]

এই আয়াত অন্তরে বসে গিয়েছে। বুঝে এসেছে, মৃত্যু যখন আসবেই তখন তা থেকে পলায়নের কি দরকার? বরং মৃত্যুমুখে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মৃত্যুমুখে অগ্রযাত্রা অথবা শাহাদাতের ভালোবাসারও দুটি স্তর রয়েছে। একটি হলো মানুষ

---

102 এবং আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং তোমরাই হলে মুখাপেক্ষী [সূরা মুহাম্মদ আয়াত নং: ৩৮]

103 এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে [সূরা আন নিসা আয়াত নং: ৪]

104 এবং মানুষ খুবই তরাপ্রবণ হয়ে থাকে [সূরা আল ইসরা আয়াত নং ১১]

105 হে আমার রব আপনি যা কিছু আমার জন্য অবতীর্ণ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী [সূরা আল কাসাস, আয়াত নং: ২৪]

106 আপনি বলে দিন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন করছো অবশ্যই তোমরা তার মুখোমুখি হবে [সূরা আল জুমুআ আয়াত নং: ৮]

শাহাদাতের কঠিন অবস্থা দেখে পথ ছাড়বে না ; বরং সেই পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকবে। আর যখনই শাহাদাত এসে যাবে তখনই মারহাবা। অপরটি এর চেয়েও উচ্চস্তর। শাহাদাতই তার একমাত্র কামনা -বাসনা হবে। সর্বত্র সে মৃত্যু খুঁজে বেড়াবে [107]। এরপর যখন মৃত্যুর সামনে আসবে , তখন কুরআনের এই আয়াতের মতো অবস্থা হবে না :

فقد رأيتموه وأنتم تنظرون[108]

অর্থ : "কাজে এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো। " »

বরং মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে , ওই মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর পিছনে লটকে যাবে এবং হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো মন থেকে বলবে : "হে মৃত্যু আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিও না। "[109] অথবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো কামনা করবে : শত্রু যেন তার নাক কান কেটে দেয় (তার ভাষ্য অনুযায়ী) অতঃপর তারা আমার পেট চিরে ফেলুক এবং নাক কান কেটে দিক ![110] সুবহানাল্লাহ ! আমার মতে আমি এখনও এই দ্বিতীয় স্তর পর্যন্ত উন্নীত হতে পারিনি কিন্তু আল্লাহ করেন প্রথম স্তর থেকে নিচে নই।

০৩. কুরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থ যা আমাকে সম্বোধন করছে।

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم[111]

---

[107] মৃত্যুকে তার সম্ভাবনাময় স্থানে খোঁজ করা [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা]

[108] অতএব এখন তোমরা মৃত্যু দেখে নিলে এই অবস্থায় যে , তা তোমাদের চোখের সামনে [সূরা আলে ইমরান , আয়াত নং: ১৪৩]

[109] হে আল্লাহ আমাকে আমার ঘরে ফিরিয়ে দিও না — شرح الزرقاني على الموطأ

[110] অতঃপর আমার পিঠ বিদীর্ণ করে দেয় এবং আমার নাক কান কেটে দেয় [হায়াতুস সাহাবা]

[111] আমি তোমাদের কাছে এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে [সূরা আল আম্বিয়া আয়াত নং ১০]

ولن تجد من دونه ملتحدا[112]

এই দুইখানা আয়াতের মর্ম অর্থ অন্তরে প্রবেশ করেছে। কয়েক বছর আগেও কুরআনের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল — বিশেষ করে ফার্স্ট ইয়ারের পরে। কিন্তু জিহাদী কর্মব্যস্ততার মধ্যে একেবারে যন্ত্রের মতো হয়ে যেতে হল। আল্লাহ পুনরায় তার কিতাবের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। পদে পদে আল্লাহর আয়াতের বাস্তবতা ধরা পড়ছে —{এমন গ্রন্থ যে গ্রন্থে তোমাদের আলোচনা রয়েছে }। কুরআনের এই অলৌকিকতা প্রতিদিন অনুভব হচ্ছে যা সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন

رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنـوا وعملـوا الصالحات من الظلمات إلى النور[113]

এই দিনগুলোতে আল্লাহ অনেক আয়াতের রহস্যের অংশবিশেষ আমার সামনে উন্মোচন করেছেন। কুরআনের সঙ্গে এই জীবন্ত সম্পর্ক আর কখনোই যেন আমার থেকে হারিয়ে না যায়। আল্লাহ সকল মুজাহিদকে এবং গোটা উম্মাহকে এই কিতাব যথার্থ রূপে তিলাওয়াতের তাওফীক দান করুন।

০৪. রিযা বিল কাযা তথা তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহর উক্তি সামনে এসেছে এবং আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে —

فان أشرف الأحوال أن تختار لنفسك حالة سـوى ما اختـار الله لك فكن مع مراد الله منك ولا تكن مع مرادك مع الله[114]

অর্থ : "সবচেয়ে উত্তম অবস্থা হলো সেটাই , যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। অতএব ওই অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থার কথা চিন্তা করো

[112] না তুমি তাকে ছেড়ে অন্য কোন আশ্রয়স্থল পেতে পারো [সূরা কাহাফ আয়াত নং ২৭]

[113] ঐ রাসুল যিনি তোমাদের সামনে আলো -দানকারী আল্লাহর আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনান যেন ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন।[সুরা তালাক আয়াত নং ১১]

[114] الفوائد لابن القيم رحمه الله

না। তাই আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যা চান, সেটা আপন করে নাও; আল্লাহকে নিজের চাহিদা অনুযায়ী চালাতে চেষ্টা করো না।”

এই উক্তি আমলে নেয়ার না জানি কত স্তর রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া অনেক কঠিন। কিন্তু প্রত্যাশা রয়েছে, এই নেয়ামতের কিছু না কিছু অংশ এই দিনগুলোতে আল্লাহ আমার অন্তরে দান করেছেন। আল্লাহ কখনোই এগুলো যেন ছিনিয়ে না নেন। সারকথা এটা বুঝে এসেছে যে, আমরা একটি গ্রুপের আমীর হয়ে কোনো সাথির নিজের মতো চলাকে পছন্দ করি না। আমরা চাই, সকলেই আমাদের ধার্যকৃত এজেন্ডা অনুযায়ী চলুক। তাহলে আমাদের রবের সঙ্গে আমরা নিজেদের এজেন্ডা কেন চালাতে চাই? আল্লাহ কিছু জায়গায় আমাদেরকে ইচ্ছাধিকার দান করেন। নিজেদের মর্জি মতো গাড়ির স্টিয়ারিং চালানোর সুযোগ দেন। ওই সুযোগকে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা যথাসাধ্য আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যেখানে আল্লাহ আমাদের ইচ্ছা ব্যর্থ করেন, আমাদের পরিকল্পনা পণ্ড করে দেন, স্টিয়ারিং নিজের হাতে নিয়ে অবস্থা অন্যদিকে নিয়ে যান, সেখানে যতক্ষণ এই অবস্থা চলতে থাকবে ততক্ষণ আমরা আল্লাহর সাথে চলতে রাজি। আল্লাহর সিদ্ধান্ত সফল হওয়া এবং আমাদের ইচ্ছা ব্যর্থ হওয়ার কারণে কিছুতেই আমরা হতাশ-নিরাশ নই। তাই একদমই টেনশন নেবে না। “আল্লাহর কাছে আমাদের দাবি”—এ পথে যাওয়ার চেষ্টা করো না; বরং “তোমার কাছে আল্লাহর দাবি”-এই পথে যাওয়ার চেষ্টা করো। উদ্দেশ্য হলো এমন এক অবস্থা যেন তৈরি হয়ে যায়, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم[115]

[115] যাতে যে জিনিস তোমাদের থেকে হারিয়ে যাবে, তাতে তোমাদের দুঃখ না হয়; আর যে জিনিস আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেন, তাতে খুশি না হও [সূরা হাদীদ: ২৩]

দুনিয়ার আনন্দ বেদনা উভয়টি যেন একাকার হয়ে যায়। আমাদের দৃষ্টিতে সুখ-দুঃখ জাগতিক সাফল্য ব্যর্থতা যেন এক সারিতে চলে আসে। এগুলোর চেয়ে আল্লাহর প্রতি যেন আমাদের মনোনিবেশ বেশি থাকে। আমাদের দীনি কাজগুলোকেও আমরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার জন্য নিজেকে একনিষ্ঠ ও একত্ববাদী বানাবার পথে যেন প্রতিবন্ধক হতে না দিই। অবশ্য যদি আল্লাহ পুনরায় জাগতিক উপায় অবলম্বন ও ইচ্ছা-সুযোগ দান করেন, তাহলে আমরা আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চেষ্টা করবো। পুনরায় যদি আল্লাহ আমাদেরকে ব্যর্থ করেন, তাহলে পুনরায় আমরা সন্তুষ্ট থাকবো। আবার ইচ্ছাশক্তি দান করলে আবার পরিকল্পনা করবো। এভাবেই আমরা একটি মহান বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবো এবং এই স্তরে পৌঁছে যাবো, যা সম্পর্কে বলা হয়েছে: "আমার দৃঢ় সংকল্প ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমে আমি আমার রবকে চিনতে পেরেছি"[116]। আমরা পরিকল্পনা করতেও ছাড়বো না, আবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও হতাশ হবো না। উভয় অবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট থাকবো। এটাকেই বলে রিযা বিল কাযা তথা তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ এবং তার ইলম সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ, তিনি সবচেয়ে বেশি প্রজ্ঞাবান।

এই চারটি বিষয় এই দিনগুলোতে শিখেছি।

اللهم لا تكلـني إلى نفسي طرفة عين ولا تـنزع مـني صـالح ما أعطيتني[117]

অর্থ: "হে আল্লাহ আপনি এক মুহূর্তও আমার নফসের কাছে আমাকে ছেড়ে দিয়েন না এবং যেই কল্যাণ সমূহ

[116] "আমার ইচ্ছা পূরণ না হবার মাধ্যমে আমি আমার রবকে চিনেছি।"— সাইয়িদুনা আলি ইবনে আবি তালেব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর উক্তি

[117] হে আল্লাহ আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নফসের কাছে অর্পণ করে দিয়েন না এবং যে কল্যাণ আপনি আমাকে দান করেছেন তা কখনো আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েন না"

আমাকে দান করেছেন তা আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েন না।” »

হে আমার প্রিয়!

অতিরিক্ত আরও একটি বিষয় বুঝে এসেছে। বিশেষ করে এই ০৫ দিনে বুঝতে পেরেছি, বন্দী সাথিদের কষ্ট কতটা বেশি? আল্লাহর কসম তাদের মধ্য থেকে এক একজনকে মুক্ত করা আমাদের ওপর ফরয। বিশেষ করে মিলিটারি সার্ভিস অফিসারদেরকে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে এবং উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তিকে বন্দী করতে হবে। আল্লাহ আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করুন।

হে আমার প্রাণ!

যেই অসিয়ত বাণী সামনা সামনি তোমাকে বলেছিলাম এখানে সেগুলো আবারও উল্লেখ করতে চাই, যেন সকল সাথির কাছে পৌঁছে দিতে পারো।

** এই ঐক্য (আল-কায়েদা উপমহাদেশ) অনেক বড় নেয়ামত। কোনো অবস্থাতেই এই ঐক্য ভেঙে যেতে দিও না —নেতারা যতই শহীদ হন না কেন। বরং এই ঐক্যের পরিসর আরও বিস্তৃত করতে এবং মুজাহিদীনের মাঝে একতা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবে।

** পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে, সেগুলোর ওপর বিবেচক মহলকে একত্রিত করে পুরো বিষয়টা পর্যালোচনা করবে এবং সংশোধন সংস্কারের পথ খুঁজবে। বিশেষ করে শরীয়ত বহির্ভূত কার্যকলাপ এবং জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে দেয়ার মতো ব্যাপারগুলো অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। পাকিস্তানে জিহাদ চলমান রাখা হবে কিনা এই আলোচনার পথে যাওয়ার দরকার নেই। বরং মনে রাখতে হবে, শত্রু পক্ষ এই যুদ্ধ শুরু করেছে আর আমরা শুধু প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করছি। অতএব মরদে

[740]

মুজাহিদের মতো এই যুদ্ধ পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে — চাই এর জন্য ২০/৩০ বছরের বেশি সময় লেগে যাক, শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করে তবেই থামতে হবে।

** নিজেদের সঙ্গী-সাথি ও অন্যায়ের প্রতিশোধ আমেরিকা থেকে নেয়ার কথা ভোলা যাবে না। এই নিকৃষ্ট শত্রুকে পাকিস্তানের ভেতরে বাহিরে সর্বাগ্রে টার্গেট করতে হবে।

প্রিয় ভাইয়া!

আমি পত্র শেষ করার আগে আরও একটি কথা বলতে চাই। আমার চেয়ে জুনিয়র জীবিতদের মধ্যে তুমি আমার সবচেয়ে বেশি মুহব্বতের মানুষ। তুমি কতটা প্রিয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যথেষ্ট নয়। তোমার পর প্রিয় হচ্ছে মুসান্না

118

, এরপর উমর খাত্তাব

119
,

রায়হান

120

, সায়েম, যুবায়ের বাসেম, সুরাকা

121
,

হুযাইফা ভাই, উয়াইস বারুদি, হিশাম গুল

122

, আব্দুল

118 মাওলানা মুসান্না হাসসান হাফিজাহুল্লাহ

119 শরিয়া উলুমের তালিবুল ইলম ওমর খাত্তাব (আলী তারেক) রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফারুক ভাইয়ের শেষ দিনগুলোতে তার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। আই এস আই’র টর্চার সেলে তিনি শাহাদাত বরণকারী মুজাহিদে ইসলাম মেজর ডক্টর আজিম তারেকের সুপুত্র ছিলেন। ২০১৫ সালের শেষ দিকে কানদাহার মরুভূমিতে আমেরিকার ফাঁদ-আক্রমণে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

120 ফারুক ভাইয়ের খালাতো ভাই এবং নিকটতম সাথী লাহোরের অধিবাসী UET এর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মেধাবী শিক্ষার্থী রায়হান (আফফান গনী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফারুক ভাইয়ের খুবই আস্থাভাজন সাথীদের একজন ছিলেন। গোপনীয়তা রক্ষার গুণ ছিল পুরো মাত্রায়। স্পর্শকাতর পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন। মেধা বুদ্ধি দূরদর্শিতা সবদিক থেকেই অনন্য ছিলেন। বেশ কিছু সামরিক ও ব্যবস্থাপনা গত দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ২০১৯ সালে আমির মাওলানা আসিম ওমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

121 করাচির যুবক আলেম দ্বীন জামিয়া দারুল উলুম করাচির ফাযেল মৌলভী সুরাকা (সাআদ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উন্নত আখলাক চারিত্রিকতা, দ্বীনী বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও সম্ভ্রান্ত জীবন আচারের বদৌলতে ফারুক ভাইয়ের খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন। ২০১৫ সালে কান্দাহার মরুভূমিতে আমেরিকার ফাঁদ-আক্রমণে শাহাদাত বরণ করেন।

122 তার আসল নাম ছিল সালমান আলী আশরাফ মালিক। মিডিয়া বিভাগের এক প্রতিভাবান দায়িত্বশীল রাওয়ালপিন্ডির অধিবাসী হিশাম গুল্ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং উসামা ইব্রাহিম গৌরী রহমাতুল্লাহির তত্ত্বাবধানে ছিলেন। বিনয়নম্রতা ও উন্নত চারিত্রিকতার কারণে আপাদমস্তক কল্যাণের সমাহার ছিলেন। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির তত্ত্বাবধানে কয়েকটি মিডিয়া প্রকল্পে তিনি কাজ করেছেন। ২০১৮ সালে ওয়ারদক প্রদেশে ক্রুসেডারদের

[741]

হাসিব

123 সহ অনেক ভাই রয়েছেন। সকলের সঙ্গেই প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক। আমার চেয়ে ছোটোদের মধ্যে শাহাদাত বরণকারী হিশাম রহিমাহুল্লাহ, মুআওয়ায রহিমাহুল্লাহ অতঃপর হামজা (অর্থাৎ আমার আপন ভাই) রহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মুহব্বত ছিল। এতটা মুহব্বত সম্ভবত কমই ছিল অন্য কারও সঙ্গে। এরপর উসমান

124রহিমাহুল্লাহ, উযায়ের এবং
সুলাইমান

125রহিমাহুল্লাহ, আইয়ুব

126রহিমাহুল্লাহ
সহ অনেক শহীদ ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের সঙ্গে সীমাহীন মুহব্বত ছিল।

আমার সমবয়সী জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুহব্বত আবুজর ভাইয়ের

127 সঙ্গে। এরপর কাসেম ভাই,
আমজাদ

128 ভাই আতিফ

129ভাই ইয়াসির ভাই (আল্লাহ তাকে
মুক্তি দান করুন বন্দী দশা থেকে), খাত্তাব মনসুর

বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।

123 সারগোদার হাফেজ আব্দুল হাসিব সামরিক প্রশিক্ষক, যুদ্ধফ্রন্টের নেতা এবং ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে প্রতিভারধর ব্যক্তি ছিলেন। খুবই সুন্দর আওয়াজ ও সুললিত কন্ঠের কারী ছিলেন। উন্নত আখলাকের কারণে যেখানেই থাকতেন কল্যাণের বিস্তার ঘটাতেন। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য তাকে নির্বাচন করেছিলেন। ২০১৭ সালে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের গোমেল এলাকায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।

124 দিয়ার জেলার ওসমান মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ছোট ভাই ছিলেন। সদা সর্বদা মুচকি হাসি, অন্যের সেবা করার আগ্রহ, তাকওয়া, লিল্লাহিয়াত ও একনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। সকলের প্রিয়ভাজন ছিলেন। ২০০৮ সালে ভানা ওয়াজিরিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন।

125 ডাক্তার আবু খালেদ সারবুলন্দ খানের ১৩ এবং ১১ বছর বয়সী দুই সন্তান উজায়ের ও সুলাইমান। তারা মার্কিন ফাঁদে পিতার সঙ্গে শাহাদাত বরণ করেন।

126 আফগানিস্তানের মুজাহিদ ইদ্রিস জকি আইয়ুব রহমতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। ইবাদত ও উন্নত-আখলাকের অধিকারী ছিলেন। উম্মাহর এই সন্তান ২০০৮ সালে অ্যান্টি অ্যায়ার ক্রাফট অস্ত্র দিয়ে ড্রোন বিমান আঘাত করতে গিয়ে ড্রোন হামলায় শহীদ হন।

127 উস্তায উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ
128 ইঞ্জিনিয়ার উসামা ইব্রাহিম গৌরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
129 এই কিতাবের লেখক
[742]

ভাই, হামযা দার্নাবি

130

, আবুল হাসান ওয়ায়েলি

131
,

হুসাইন ভাই

132

, হারেস ভাই (আল্লাহ তাকে বন্দী দশা

থেকে মুক্তি দান করুন) মুনিব ভাই, আব্দুল্লাহ বেলুচ ভাই, তারেক বাঙালি ভাইসহ আরও অনেক ভাইয়ের সঙ্গে সীমাহীন মুহব্বত। সমবয়সী শাহাদাত বরণকারীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি মুহব্বত ছিল বদর মনসুর ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে। আল্লাহ জান্নাতে আমাকে তার সঙ্গী করুন। এরপর সুহাইল ভাই রহিমাহুল্লাহ, মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, ফায়েজ ভাই রহিমাহুল্লাহ, আবু সাইফ ভাই রহিমাহুল্লাহ, নাবিল মালদ্বীপী

133রহিমাহুল্লাহ, তৈয়ব

ভাই

134রহিমাহুল্লাহ, সুলাইমান বাঙালী

135

রহিমাহুল্লাহ, আবু সাআদ

136ভাই রহিমাহুল্লাহ,

130 লিবিয়ার আরব মুজাহিদ। তিনি আলকায়দার টেকনিক্যাল বিভাগের দায়িত্বশীলও ছিলেন। জরবে ওজব’ অপারেশন চলাকালে আলকায়দার অধিকাংশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ২০১৫ সালে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন।

131 আবুল হাসান ওয়ায়েলি আলকায়দার নওজোয়ান নেতাদের একজন। চমৎকার লেখনীর অধিকারী এবং দিনের দাঈ। আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন!!
132 লাহোরের রানা উমায়ের এফযাল (মুস্তফা আব্দুল করিম) রহমতুল্লাহি আলাইহির আলোচনা করা হয়েছে।

133 মালদ্বীপের মূল্যবান রত্ন নাবিল মালদ্বীপি একজন সুরুচি সম্পন্ন অসাধারণ মেধার অধিকারী মুজাহিদ ছিলেন। মালদ্বীপ থেকে ওয়াজিরিস্তানে হিজরতকারীদের প্রথম সারিতে ছিলেন যারা সর্বপ্রথম হিজরত করেন। ২০০৭ সালে ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর যেই ড্রোন হামলা হয় তাতে তিনি আহত হন এবং এক পা হারান। তবুও ধৈর্যধারণ ও অবিচলতার সাথে জিহাদের বেশ কয়েকটি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। ইলমে দ্বীনের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। ২০১৩ সালে মিরান শাহে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক গোয়েন্দা আপতৎপরতার ফলে মার্কিন ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

134 লাহোরের অধিবাসী ইঞ্জিনিয়ার তৈয়ব ওয়াক্কাস রহমতুল্লাহি আলাইহি মিডিয়া অঙ্গনের অশ্বারোহী ছিলেন। উন্নত জাগতিক ভোগ্য সামগ্রীকে খোদা হাফেজ বলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহির দায়িত্ব পালনের জন্য হিজরত করেন। উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক এবং সুস্থ ও উন্নত রুচি-প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। যে ব্যক্তি তার সঙ্গে সময় কাটিয়েছে সেই তাকে ভালবাসতে বাধ্য হয়েছে। ২০১৪ সালে জরবে ওজব’ অপারেশনের সময় এক পাহাড়ের পাদদেশে সাথীদের পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য তীব্র শীতে রাত পার করছিলেন। এই অবস্থায় তার ওপর মার্কিন ড্রোন হামলা হয়।

135 বাংলাদেশের সুলাইমান ভাই (আশিকুর রহমান) উন্নত প্রতিভাধর সজ্জন ছিলেন। মিডিয়া বিভাগে কাজ করতেন। উত্তম আখলাকের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। মিডিয়া বিভাগের যোগাযোগ রক্ষাকালে কাপুরুষ আমেরিকানদের ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন।

136 করাচীর আবু সাআদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আলকায়দার প্রশিক্ষণ শিবিরের একজন দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষক ছিলেন। উন্নত-আখলাক, চরিত্র এবং ব্যবস্থাপনা প্রতিভার ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন। কোন এক সামরিক প্রশিক্ষণে ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহিরও প্রশিক্ষক ছিলেন। সোয়াত অপারেশন চলাকালে মুজাহিদীনকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে গিয়েছিলেন। ২০১০ সালে আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের ওপর আত্মঘাতী হামলার প্রস্তুতির সময় উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বদরীবাহিনীর এক কেন্দ্রে ড্রোন হামলায়

[743]

মাওলানা আব্দুস সামাদ[137] রহিমাহুল্লাহ, আবু সাবেত কুয়েতি[138] রহিমাহুল্লাহ সহ অনেক অনেক শহীদান এমন রয়েছেন, যাদেরকে কখনোই ভোলা যায় না। তাদের সঙ্গে অনেক মুহব্বত ছিল। আমার চেয়ে প্রবীণ জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুহব্বত শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী রহিমাহুল্লাহ (আল্লাহ তাঁকে শত্রুপক্ষের গলার কাঁটা হিসেবে দীর্ঘ হায়াত দান করুন!)-এর সঙ্গে, এরপর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে, অতঃপর শায়খ ইবরাহীম[139], আমীর মুহতারাম মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ, জেরার ভাই, সাআদ ভাই (আল্লাহ তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন!), কারী ইমরান সাহেব, মাওলানা আব্দুস সালাম (ডেরা ওয়াল), আমার শিক্ষক শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব[140] হাফিযহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল আজীজ সাহেব, মাওলানা ফজলে মুহাম্মদ সাহেব, শায়খ তাকী উসমানী সাহেব, শায়খ আবু ওয়ালিদ ফিলিস্তিনি[141] (আল্লাহ তাকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত

তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

137 সিন্ধু প্রদেশের মাওলানা আব্দুস সামাদ (মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী) রহমাতুল্লাহি আলাইহি সালাফি ঘরানার গভীর জ্ঞানের অধিকারী ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের একজন আলিমে দ্বীন ছিলেন। বেশ কিছু কিতাব অনুবাদও করেছেন। কয়েদে জিহাদ শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ রচিত পাকিস্তানের সংবিধান ইসলামিক হবার দাবি অপনোদন করে লিখিত গ্রন্থ الصبح والقنديل উর্দুতে তিনি سییدہ سحر اور ٹمٹماتا چراغ শিরোনামে ভাষান্তর করেছেন। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার ইলমি অবস্থান উন্নত ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলেন। দ্বীনী দাওয়াতের বিস্তর অভিজ্ঞতা ছিল তার। ২০০৯ সালে সিন্ধুতে এক ট্রাফিক দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন আমিন!!

138 একজন আরব ভাই, ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে যার ছিল খুবই কাছের সম্পর্ক। তিনি উন্নত আখলাখের অধিকারী ছিলেন।

139 ফারুক ভাইয়ের প্রশিক্ষক, অভিভাবক, কায়েদে জিহাদ, প্রখর মেধা ও দূরদর্শিতায় আল্লাহর নিদর্শন, উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত, জিহাদী দাওয়াতের অখ্যাত দিশারি, আলকায়দার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কমিটি -সদস্য মরক্কোর শাইখ আবু আব্দুর রহমান আল মাগরিবি হাফিজাহুল্লাহ।

140 আলেমে রব্বানী, দা 'ঈয়ে জিহাদ, মুরুব্বী, আত্মশুদ্ধিকারী, অবিচলতার পাহাড় শাইখুল মুজাহিদীন আব্দুর রহমান আখন্দযাদাহ হাফিজাহুল্লাহ।

141 আরব ওলামায়ে কেরামের মাঝে অতি অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি ইলমি অবস্থান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে মুজাহিদীনের মাঝে অতি নির্ভরযোগ্য আলেম বলে গণ্য হতেন। রুশ জিহাদের একজন গাজী তিনি। যেই হযরতগণ মুজাহিদীনের তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে বাধ নির্মাণ করেছিলেন এবং সংস্কার মূলক কর্মকাণ্ড, শরিয়া দরস ও লেখালেখির মাধ্যমে আহলে সুন্নতি ওয়াল জামায়াতের ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তিনি তাদেরই একজন। ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার লেখালেখি ও চিন্তাধারার মানস সন্তান

করুন!), শায়খ আবু কাতাদা, শায়খ ইউনুস মৌরিতানি[142] (আল্লাহ তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করুন!), শায়খ আবু বাসীর নাসির আল উহাইশী[143] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমার খুবই মুহব্বত রয়েছে।

আমার প্রবীণ শহীদানের মাঝে শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহ সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। অতঃপর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আবু ইয়াহিয়া রহিমাহুল্লাহ। তাদের পরে শায়খ আজমিরায়ে, শায়খ আবু দুজানা, আবু খালেদ ভাই, ইমরান ভাই[144], হাজী অলিউল্লাহ সাহেব, উস্তাদ ফয়েজ মুহাম্মদ, আমার শিক্ষক ও অভিভাবক শায়খ আহসান আজীজ, মাওলানা অলিউর রহমান মেহসুদ, মাওলানা গাযী আব্দুর রশিদ, শায়খ সুফিয়ান আল মাগরিবি[145], শায়খ আব্দুল্লাহ সাঈদ[146], শায়খ ইহসানুল্লাহ[147], ইলিয়াস কাশ্মীরী সাহেব এবং শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ সহ অনেক হযরত রয়েছেন, যাদের সঙ্গে মুহব্বত ছিল। আল্লাহ জান্নাতে তাদের সঙ্গ দান করুন।

ছিলেন। চিন্তাগত বক্রতা ও বিচ্যুতি থেকে বাঁচার জন্য ফারুক ভাই তার লেখাগুলো পাঠ করার উপদেশ দিতেন।

[142] আলকায়দার শরিয়া কমিটির সদস্য, জ্ঞান ও দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদর্শন, উন্নত মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী এবং নেতৃত্বের প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাকে কাফেরদের কয়েদ থেকে মুক্তি দান করুন!

[143] আলকায়দা জাজিরাতুল আরবের শহীদ আমির নাসির আল-উহাইশী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ ঈমান, প্রজ্ঞা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কারণে গোটা বিশ্বের মুজাহিদীনের প্রিয়ভাজন ছিলেন।

[144] মেজর আদেল আব্দুল কুদ্দুসের আলোচনা ইতিপূর্বে গিয়েছে।

[145] আলকায়দা খোরাসানের মজলিসে আমেলার জিম্মাদার (কার্যকরী পরিষদের প্রধান সদস্য) ইসলামী মাগরেব বা মরক্কোর কারী সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর ইবাদতগুজার দুনিয়া-বিমুখ ওলিদের একজন। কল্যাণ সাধনে অগ্রসর, শরিয়া উলুমে পারদর্শী, কেরাআতে সাবআ বা সাত ক্বারীর কেরাতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কায়েদে জিহাদ শাইখ আইমান হাফিজাহুল্লাহর প্রধান সহকারী মনে করা হতো তাকে। ২০১৪ সালে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের زوئی سود کئی নামক সীমান্তবর্তী এলাকায় মার্কিন ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি একজন সহনশীল প্রজ্ঞাশীল বিনয়ী ব্যাক্তি ছিলেন।

[146] শাইখ আবু লাইস লীবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রিয় ব্যক্তি। আলকায়দার সামরিক নেতা। আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের উপর পরিচালিত হামলাগুলোর পরিকল্পনায় তিনি ছিলেন। ওয়াজিরিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলায় শহীদ হন।

[147] মিশরের সন্তান আলকায়দার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুদক্ষ প্রশিক্ষক, যিনি ফারুক ভাই রহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও প্রশিক্ষণ দান করেছেন। ওয়াজিরিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলায় শহীদ হন।

তাদের সঙ্গে তো ছিল ঈমানী সম্পর্ক। তারা ছাড়া আমার আপন ভাইও অনেক প্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে আনাস এবং সবচেয়ে বেশি কলিজার টুকরা যিনি ছিলেন, তিনি আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে আমার নিজের, হিশাম রহিমাহুল্লাহর এবং তার স্ত্রীর পিতা-মাতা খুবই প্রিয় মানুষ ছিলেন। খালাদের সাথেও ভালো সম্পর্ক ছিল—বিশেষ করে রায়হানের মাতা এবং পিন্ডি ওয়ালি খালা। দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি মুহব্বত ছিল পিতা-মাতা এবং স্ত্রীর সঙ্গে। এখন পিতা-মাতা এবং স্ত্রীর মধ্যে কে বেশি প্রিয়? — নিজেকে এই পরীক্ষায় ফেলাটা জরুরি নয়। কারণ পিতা-মাতার জন্য হৃদয়ে এক জায়গা আর স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গা। মুহব্বত আলাদা ধরনের। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাদের সাথে থাকার ব্যবস্থা করুন।

এইতো মনের কথাগুলো শেষ পর্যায়ে চলে এলো। চিঠির চেয়ে বেশি এটি অসিয়তনামা হয়ে গিয়েছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। এর আগেও আমি কয়েকবার লোকদেরকে অসিয়ত করেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত জীবিত আছি। যাই হোক এবারের কথা জানা নেই। এ কারণে এই পত্র স্ক্যান করে এক একটি কপি আমার প্রিয় আমীর সাহেবকে, আমজাদ ভাইকে, আনাসকে, আবু জর ভাইকে এবং আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবে। এখনও যদি শহীদ না হই, তাহলে ইনশাআল্লাহ একসময় তো অবশ্যই হবো। এ কারণে পাঠিয়ে দিলে অসুবিধা নেই। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

প্রিয় ভাইয়া! তুমি আজ পর্যন্ত যত খেদমত করেছ, সেবা করেছো, খেয়াল রেখেছো, কঠিন অবস্থায় সাথে থেকেছো, আল্লাহ সেগুলোর কারণে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি আল্লাহর জন্য তোমাকে অনেক ভালোবাসি, দোয়াতে আমাকে ভুলো না কিছুতেই।

[746]

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

তোমার প্রিয় ব্যক্তি, তোমার হাবিব।

পরিশিষ্ট: প্রতিটি প্রভাত নিয়ে আসে সন্ধ্যার বার্তা

শহীদ উসামা ইবরাহীম গৌরী রহিমাহুল্লাহ রচিত

নোট: ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতে তার নিকটতম বন্ধু ও বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী জনাব ইঞ্জিনিয়ার উসামা ইবরাহীম শহীদ রহিমাহুল্লাহ মনের আবেগ প্রকাশ করার জন্য এই রচনা লিখেছেন। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উত্থান পতনের নানা অবস্থায় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর পাশে থাকার কারণে তার সমবয়সী সহচর, নিকটতম বন্ধু মনের গভীর থেকে যেভাবে প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন, এ থেকে বোঝা যায়, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সাথি- সঙ্গীরা তাকে নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। তারই ভিত্তিতে এই রচনা বিশেষভাবে এই কিতাবে যুক্ত করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়: এই রচনা পুরো কিতাবের সারবস্তু অর্থাৎ সীরাতে উস্তাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহর আলোচনা এবং এই [747]

রাহবারের দেখানো পথের ওপর চলার আগ্রহ উদ্দীপনা।
রচয়িতা ২০১৬ সালের ঈদুল আযহায় আফগানিস্তানের জাবুলে মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে শাহাদাত বরণ করেন।

“কিছুদিন থেকে মনটা খুবই অস্থির হয়ে আছে। অস্থিরতার কারণ হলো কিছু বিব্রতকর সংবাদ। বিস্তারিত কোনো কিছু জানতে পারছিলাম না। উত্তর ওয়াজিরিস্তানের শাওয়াল এলাকায় এক সপ্তাহ যাবৎ পুরোপুরি স্থল অবরোধের কারণে ওখানে উপস্থিত ভাইদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। শাওয়াল থেকে আঙ্গুর আদা'র পথ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছিল। আফগানিস্তানের সীমান্তে আফগান বাহিনী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল মার্কিন সেনাবাহিনী। তারা সবদিকেই টহল দিচ্ছিলো। জেট বিমান দিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েক জায়গায় বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল। গোটা অঞ্চলে প্রায় দেড় মাস যাবৎ ২৪ ঘন্টা ড্রোন মাথার ওপর পাগলের মতো চক্কর দিয়ে যাচ্ছিলো। এই অবস্থায় মিডিয়াতে ওখানকার ড্রোন হামলার ব্যাপারে কিছু সংবাদ প্রচারিত হয়, যেগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ কথা বোঝা যাচ্ছিলো, ইসলামের শত্রুরা ওই এলাকায় কোনো হাই ভ্যালু টার্গেটের সংবাদ পেয়ে গিয়েছে। ওই এলাকা থেকে কোনো গাড়ি বের হলেই ড্রোন বিমান দিয়ে পিছু করে যাত্রীদেরকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হতো। কতক মুজাহিদ এভাবেই গ্রেফতার হন। আমাদের ধারণা মাফিক তাদেরকে গ্রেফতার করে ওই এলাকার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করা হতো। এই অবস্থায় ক্রমাগত ২/৩টা ড্রোন হামলার খবর রেডিওতে শোনা যায় কিন্তু বিস্তারিত কোনো কিছুই জানা যাচ্ছিলো না। যেহেতু ঐ অঞ্চলে অবরুদ্ধ ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এজন্য এজাতীয় যেকোনো খবরের প্রতি আমরা

[748]

উৎকর্ণ ছিলাম। মনে মনে আমরা দোয়া করে যাচ্ছিলাম, হে আল্লাহ সকল ভাইকে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন এবং দ্রুত আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার ব্যবস্থা করে দিন। এবারও এটাই ছিল আমাদের প্রার্থনা —হে আল্লাহ এই সংবাদ যেন মিথ্যা হয় এবং আমাদের প্রিয় সকলেই যেন নিরাপদে থাকে। এর দুইদিন পর কোথাও আমার সফরে যেতে হয়। তখন বেদনাদায়ক সংবাদ কানে আসে যে, ড্রোন হামলায় ০৮ জন প্রিয় ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। হৃদয় বিদারক বিষয় হচ্ছে, আমার প্রিয় বন্ধু, অভিভাবক, নেতা, আমীর, রাহবার, পথপ্রদর্শক এবং ১৯৯৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমার ঈমানী সাথি ভাই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকেও আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।

১৯ বছর পর্যন্ত যার সঙ্গে ঘরে সফরে, মাতৃভূমিতে প্রবাসে, উঠতে বসতে, হাসি-কান্নায়, আনন্দ-বেদনায় জীবন কাটিয়ে এসেছি। তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, অনেক আগেই আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়াটা মেনে নেয়া সহজ ছিল না। আল্লাহর কসম এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা, সবচেয়ে বড় ধাক্কা। কিন্তু ইসলামও আশ্চর্য ধর্ম! কুরআন আশ্চর্য গ্রন্থ! এই কুরআন মানুষের বিদারিত হৃদয়কে এমনভাবে শক্তি যোগায়, যার দরুন মানুষ হাসি-খুশি অবস্থায় পাহাড় সমান বেদনা সহ্য করে নেয়। « আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা চিরস্থায়ী » পাহাড় সমান বিপদ আসুক না কেন, সবই তো ইহজগতের বিষয়। এই ইহজগৎ কতটা তুচ্ছ আর এর সময় কতটা সংক্ষিপ্ত! এ বেদনার মাঝেই তো রয়েছে আমার প্রশান্তি। আমার ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলার কাছে চলে গিয়েছেন এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মৃত্যু লাভ করেছেন। ঈমান, ইখলাস ও সৎ কর্মের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে গিয়েছেন। একটি বিশেষ মর্যাদার জন্য আল্লাহ তাকে

[749]

বাছাই করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ১৪০০ বছর দূরের একজন উম্মতের জন্য এটাই তো সবচেয়ে বড় মর্যাদা। তিনি যদি চলে না যেতেন, শহীদ না হতেন, থেকে যেতেন, তাহলেও তো দুঃখ ছিল। এখন তো আনন্দের বিষয়। আল্লাহ তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করেছেন। তার নিকটে আশ্রয় দিয়েছেন। তার নৈকট্য দান করেছেন। প্রিয় বান্দাদের মাঝে শামিল করেছেন। শহীদ হিসেবে আম্বিয়া কেরাম, শহীদান ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের আয়োজনে সজ্জাদানের জন্য তাকে বাছাই করেছেন। সে কারণে অনেক প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ত ভাব।

আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আমি দুনিয়ার মানুষের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি তার সঙ্গে ১৯ বছর কাটিয়েছি। তিনি ছিলেন তাকওয়া ও খোদাভীতির মূর্ত প্রতীক। তাকে আমি দেখেছি তিনি আল্লাহ এবং প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের সামনে সর্বদা মাথা পেতে দিয়েছেন। এই গুণাবলিতে তিনি এমন এক স্তরে উন্নীত ছিলেন, আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কাউকে এতটা উচ্চস্তরে আমি দেখিনি। বই পুস্তকে সালফে সালেহীন এবং উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মের যে আলোচনা পাই, তার মাঝে আমি সেগুলোর প্রতিফলন দেখেছি। এই যুগে এতটা উচ্চ স্তরে অন্য কেউ থাকতেই পারে কিন্তু আমি দেখিনি। আমি নিকট থেকে যতটুকু প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে এমন কাউকে পাইনি। আর জীবনে আমি কম লোক দেখিনি। দীনদার লোক, সাধারণ লোক, বিভিন্ন দলীয় লোক, নানান জাতীয়তার লোক, মুজাহিদীন মুহাজিরীন, অ-মুজাহিদ মুসলিম, কাফের, ইউনিভার্সিটি কিংবা কলেজ পড়ুয়া অথবা দীনী মাদরাসার ছাত্র, বিভিন্ন রুচি প্রকৃতির মানুষকে এই ৩২ বছরে আমি দেখেছি কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি

[750]

মনোনিবেশকারী, সবচেয়ে অগ্রসর। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা যেমন সবচেয়ে বেশি ছিল, অনেকটা সেরকমই। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু সৎকর্মে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন। “কল্যাণের বিষয়ে তোমরা প্রতিযোগিতা করো”— কুরআনের এমন নির্দেশে তারা আমল করতেন। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন না। তিনি তো সবচেয়ে অগ্রসর থাকতেন। অন্য সাহাবীরা তাকে দেখে তার মতো আমল করার চেষ্টা করতেন কিন্তু তিনি সর্বদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকতেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে কেউই প্রতিযোগিতা করতে পারতেন না। এ যুগে যত রকমের ভালো কাজ রয়েছে অর্থাৎ অন্তত আমি যত ভালো কাজ দেখেছি, সবকিছুতেই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে দেখেছি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সবচেয়ে অগ্রসর। এ কথা ঠিক, হিশাম রহিমাহুল্লাহ এবং জাওয়াদ রহিমাহুল্লাহ তাকে যথার্থরূপে অনুসরণ করেছেন কিন্তু ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ সবচেয়ে অগ্রসরই ছিলেন। যে সমস্ত ভাই এখনও জীবদ্দশায় রয়েছেন (যারা এখনও শহীদ হননি আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাত দান করুন।) আমি তাদের আলোচনা করবো না। কিন্তু এমন ব্যক্তিদের জীবনী দিয়ে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে অবশ্যই চেনা সম্ভব, যারা তার দীক্ষা লাভ করেছেন। অর্থাৎ হিশাম রহিমাহুল্লাহ, জাওয়াদ রহিমাহুল্লাহ, ইলিয়াস রহিমাহুল্লাহ (মাওলানা সাঈদুল্লাহর ভাই), খোদ মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, হামজা আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ, ঈসা রহিমাহুল্লাহ (লাহোরের এক ভাই যিনি শেষ ২/৩ বছর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন), সুহাইল ভাই রহিমাহুল্লাহ, বদর মনসুর ভাই রহিমাহুল্লাহ এবং যারা তাদের সঙ্গে শাহাদাতের মিছিলে এখনও যোগ দেননি, তাদেরও এক

[751]

লম্বা তালিকায় রয়েছে। আল্লাহ সকলকে হেফাযত করুন এবং ঈমান ও জিহাদের সফরে অবিচল অটল রাখুন।

তাদের জীবনকথা খুবই আশ্চর্যের। হতবাক হয়ে যেতে হয়। যারা নিজেরা এতটা পবিত্র আত্মার অধিকারী, তাদের প্রশিক্ষক অভিভাবক কেমন হবে তা অনুমান করা যায়। আমি তো যেই ব্যথা ও ধাক্কার কথা বলছি, তা আমার পেছনে থেকে যাওয়ার কষ্ট। এক সময় ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ নিজের দোয়ায় বলতেন, আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে একসঙ্গে শাহাদাত দান করুন। কিন্তু আমি বলতাম: না! আমার প্রার্থনা হচ্ছে, আমি প্রথমে শহীদ হবো; তাকে আমার সঙ্গে শহীদ হবার দোয়া করতে নিষেধ করতাম। আমি বলতাম: প্রথমে আমার শাহাদাতের দোয়া করুন। কিন্তু শেষ কয়েক বছর যাবৎ তিনি শুধু নিজের শাহাদাতের দোয়া করতেন। তিনি এতটা অস্থির চিত্তে প্রার্থনা করতেন যে, আমার আফসোস হতো, কেন আমি তার দোয়া থেকে নিজের নাম বের করে দিলাম? আল্লাহ আমাকে শাহাদাত থেকে কখনও বঞ্চিত না করুন এবং দ্রুত শহীদ হিসেবে তার কাছে তুলে নিন।

বেদনার দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। একজন মাত্র মানুষ হয়েও তিনি গোটা একটি জামাত, একটি আন্দোলন এবং একটি দাওয়াতের কর্ণধার ও প্রতিবিম্ব ছিলেন। একই সময়ে তিনি ইবাদাতগুজার, দুনিয়া বিমুখ, আলেমে রব্বানী, মুত্তাকী, দীনি দাওয়াতের সাধক, মুহাজির, মর্দে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ, আমীর, নেতা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক, ব্যক্তিগত ও দলীয় বিষয়ের সংস্কারক, সংশোধনকারী, উপদেশদানকারী, পথপ্রদর্শক, রাহবার, সাহিত্যিক, বক্তা, কলম ও জবান দিয়ে দীনী দাওয়াত প্রদানকারী, কলম ও জবান দিয়ে দীনের প্রতিরক্ষাকারী; এমনিভাবে সমর বিদ্যা, সামরিক জ্ঞান, রাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী, আত্মশুদ্ধিকারী...এতসব গুরুত্বপূর্ণ [752]

গুণের অধিকারী ছিলেন, যার কারণে তিনি বর্তমান সময়ে বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ— অথবা অন্যভাবে বললে—মেরুদণ্ড ছিলেন। যেই নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি দায়িত্বের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, এরপর উত্তমরূপে সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন, এতে সকল শায়খ ও জিহাদী অঙ্গনের আমীর, তার পদাঙ্ক অনুসারী মুজাহিদীন সকলেরই প্রত্যাশা ছিল, দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহ তার দ্বারা দীনের অনেক বড় খেদমত নিতে থাকবেন। এমন নেতার বিদায় হয়ে যাওয়াটা আমাদের সকলের জন্য হৃদয় বিদারক। কিন্তু এটা আল্লাহর দীন। যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখনও এই দীন বাকি ছিল। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তাই অন্য কোনো ব্যক্তি চলে গেলেও অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছায় এই দীন ইসলাম মিটে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব। তাঁর দীন চিরস্থায়ী। কুরআন আমাদের মাঝে রয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইসলাম বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হবার অঙ্গীকার সত্য। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহ না থাকলে আল্লাহ তাআলা অন্য কারও মাধ্যমে তাঁর দীনের কাজ নেবেন। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফায়সালা। ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর অংশের কাজ নিয়েছেন এবং তিনি দীনি সংগ্রামে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার লাখ লাখ শোকর আদায় করি, তাঁর তাওফীকে ফারুক ভাই অনেক অবদান রেখেছেন। খুব অস্থির চিত্তে তাঁর জীবনের এক একটি মুহূর্তে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে কাজ করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাতে অনেক বরকত দান করেছেন। তার লিল্লাহহিয়াত, তাকওয়া, ইসলামের প্রতি মুহব্বতের কারণে তিনি এই বারাকাত লাভ করেছেন। এমনটাই তাঁর ব্যাপারে আমাদের

[753]

প্রত্যাশা। «আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাউকে আমরা পবিত্র বলতে পারি না।»

«» এই চিহ্ন দেয়া কথাগুলো আমি লিখেছি কারণ, এটাই আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ; সর্বোপরি মহান আল্লাহ তাআলা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আরও ভালো জানেন। অন্যথায় এতগুলো বছর ঘরে-বাইরে, একাকী অথবা জনসমক্ষে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহকে চোখের সামনে দেখেছি, এতে তাঁর তাকওয়া, খোদাভীতি এবং আল্লাহর হুকুমের পাবন্দী ইত্যাদির ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে। এই ১৯ বছরের মধ্যে এবং ২০০১ সাল থেকে গভীর বন্ধুত্ব হবার পরের ১৪ বছরের মধ্যে এমন কিছু মুহূর্ত এসেছে, যখন কার্যক্ষেত্রে দুনিয়াবি কিছু বিষয়ে আবার কখনও কখনও জিহাদী কর্ম কৌশল বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চেয়ে ভিন্ন ছিল (আমার দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার কারণেই এমনটা হয়েছে)। সে বিষয়ে তিনি নিজের অবস্থানের যৌক্তিকতা আমাকে বোঝাতে পারেননি। কিন্তু তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যে তিনি এতটাই অগ্রসর ছিলেন, আমাদের মনের মাঝে এই আস্থা ছিল, যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন, তাহলে আমার বুঝে না আসলেও তার কথাই সঠিক। পরবর্তীতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা গিয়েছে, তার কথাই সঠিক ছিল, আমি নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে যৌক্তিকতা ধরতে পারিনি। তাঁর লিল্লাহহিয়াত, একনিষ্ঠতা, তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা এরূপ দূরদর্শিতা, সঠিক উপলব্ধি ও চিন্তার গভীরতা তাকে দান করেছিলেন। এ কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৌভাগ্য মনে করে তাঁর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলা যেত। বিশেষ করে ২০০৯ সাল এবং তার পরবর্তী সময় থেকে এ বিষয়ের প্রয়োজন আরও বেশি দেখা দেয়। ওই সময়টায় শহীদ আহসান আজীজ ভাই রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে ছেড়ে চলে

[754]

যান। সত্যিই ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মতো একজন বিচক্ষণ নেতা ওই মুহূর্তে ছিল সময়ের দাবি। মাঝ নদীতে ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মতো এরূপ দক্ষ নেতা ও মাঝি যদি আমাদের ছেড়ে চলে যায়, সেটা কি কম বেদনার? কিন্তু উদ্ধারকারী তো একমাত্র আল্লাহ আর তিনি সর্বদা রয়েছেন। তিনি তো আমাদের আসল ভরসা।

وكفى الله المؤمنين القتال

অর্থ: "লড়াইয়ের ময়দানে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।"

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এই জগতে কিসের এত বিচ্ছেদ-বেদনা? প্রতিটি প্রভাতের আলো নিয়ে আসে সন্ধ্যার বার্তা

তাই আলহামদুলিল্লাহ। এই বেদনা অস্থায়ী, যতই তা তীব্র হোক না কেন। খারাপ তো এজন্য লাগছে যে, এতগুলো বছর ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে থেকেছি, তাকে সালাতে ইবাদাতে ক্রন্দন করতে দেখেছি, দোয়ার মাঝে কাঁদতে দেখেছি। আর বিপদের সময় শুধু আল্লাহর সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করে রোনাজারি করতে দেখেছি। এছাড়া কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির এবং আল্লাহর আয়াত থেকে নসীহত গ্রহণ করতে দেখেছি। এবং তাকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তামগ্ন হতে দেখেছি। তাঁর উন্নত আখলাক ও স্বভাব চরিত্র দেখেছি, এছাড়া জবানের হেফাযত ও ভাষা সংবরণ করতে দেখেছি। আর আল্লাহর পুণ্যবান মুহাজির মুজাহিদ বান্দাদের সঙ্গে তাঁর অসামান্য মুহব্বত ভালোবাসা ও সদাচরণ দেখেছি। এমনকি জিহাদের পথে তাঁর সকল যোগ্যতা উজাড় করে দিতে দেখেছি, নিজের নিদ্রা, সুস্থতা, যৌবন, শক্তি সামর্থ্য সবকিছু উৎসর্গ করে দিতে দেখেছি। সর্বোপরি শাহাদাতের জন্য ব্যাকুল থাকতে দেখেছি, শাহাদাতের জন্য রবের কাছে ক্রন্দন করতে

দেখেছি। কিন্তু আমি তাঁর মতো হতে পারিনি, তাঁর ধারে কাছেও যেতে পারিনি। আমি কবে ঠিক হবো? আমার সামনে সালফে সালেহীনের কাজগুলো জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছিল। এত কাছ থেকে সেগুলো দেখা সত্ত্বেও আমি পরিবর্তন হইনি। তাহলে আমি আর কবে বদলাবো? এটাই তো দুঃখ, যা কোনো অবস্থাতেই দূর হচ্ছে না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি যেন বদলে যেতে পারি। আমার উদাসীনতা ছেড়ে উঠে আসতে পারি। আল্লাহর নেক বান্দা হতে পারি। শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুহব্বত ভালোবাসা পোষণ করতে পারি। আমি যেন আমার অর্থ-সম্পদ, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে, মেধা-বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করে, সর্বোপরি দিন-রাত জীবন যৌবন সবকিছুই আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর দীনের খেদমতে উৎসর্গ করতে পারি। এভাবেই যেন আমি উৎসর্গিত হতে পারি, শেষ হয়ে যেতে পারি - এগুলোই কামনা করছি আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ আমাকে শাহাদাত থেকে বঞ্চিত না করুন। শাহাদাত লাভের সফর এতটা দীর্ঘ হবে কল্পনাও করিনি।

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا

অর্থ: "রব হিসাবে আল্লাহর প্রতি আমি সন্তুষ্ট, দীন হিসেবে ইসলাম নিয়ে আমি সন্তুষ্ট এবং নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আমি আনন্দিত।"

وأفوض أمري إلى الله

অর্থ: "আমি আমার অবস্থা আল্লাহর কাছে সঁপে দিচ্ছি।" আল্লাহ যেন দ্রুত আমাকে কবুল করে নেন। আমীন। হে আল্লাহ আমাদের সকলকে যখন মৃত্যুদান করবেন তখন শাহাদাতের মৃত্যু দান করবেন।

বছরের পর বছর ধরে ড্রোনের ছায়ায় আছি। আশপাশে শাহাদাতের ও শহীদানের মিছিল দেখছি। মন খুশি আছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর প্রতি প্রত্যাশা রয়েছে, একদিন না একদিন তিনি শাহাদাত দান করবেন। একদিন অবশ্যই তিনি জান্নাতের শহীদানের সঙ্গী করবেন। কিন্তু ওই দিনটি যেন দ্রুত চলে আসে এখন সেটাই প্রার্থনা। অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত এর মাঝেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ রয়েছে।

জানা নেই শেষ পর্যন্ত কবে আমার চোখের তৃষ্ণা মিটবে? কবে শাহাদাতের বাহন আসবে?

সম্ভবত সকল ফারুকী ও সালমানীর মাঝে এমনি আবেগ ব্যাকুলতা নিহিত থাকে। কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা, ইনশাআল্লাহ ওই প্রিয় রব্বে কারীম আমাদেরকে বেশি অপেক্ষা করাবেন না এবং সর্বাবস্থায় আমাদের ব্যাপারে কল্যাণের ফায়সালা করবেন। ইনশাআল্লাহ, হে আল্লাহ! এমনই যেন হয়, আমীন।

*****

[757]